ফররুখ আহমদ
রচনাবলী
২

ফররুখ আহমদ রচনাবলী
দ্বিতীয় খণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদ রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদ রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড
প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০৩/ জুন ১৯৯৬

বাএ ৩৪১৭

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

FARRUKH AHMAD RACHANABALI [Dwitiya Khanda] (Complete Works of Farrukh Ahmad, vol. II). Edited by Abdul Mannan Syed. Published by Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition : June 1996. Price : Taka 200.00.

ISBN 984-07-3426-1

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা [এগার—উনচল্লিশ]

হে বন্য স্বপ্নেরা [১—৩৮]

যৌবসেনা ৩ কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি ৪ শেষ মুহূর্ত ৪ নাটকীয় ৫ সমস্যা ৬ ত্রয়ী ৭ সমাপ্তি ৮ নির্বিষ ৯ প্রতীক্ষা ৯ মধুমতীর তীরে ১০ দোয়েলের শিস্ ১১ রাত্রিচর ১২ ঝিল্লী ১৩ পথিক ১৪ শাহেরজাদী ১৫ সাড়া ১৬ বিদায় ১৭ নিষ্প্রদীপ ১৭ পটভূমি ১৮ সামুদ্রিক ২০ তিমি ২০ পদ্মার ফাটল ২১ পদ্মার ভাঙন ২১ কালো দাগ ২২ প্রেক্ষণ ২২ পরিপ্রেক্ষিত ২৩ শিকার ২৪ জোয়ার ২৪ নাবিক ২৫ পাথরের দিন ২৫ স্মরণ ২৬ শূন্য মাঠ, মরা ঘাস ২৬ মৃগতৃষ্ণিকা ২৭ নৈশ কুকুরের ডাক ২৭ হের মোর আগ্নেয় বক্ষ ২৮ সুর ২৮ সংগতি ২৯ সে নামে ডেকেছি আমি ২৯ হীরার কুচির মত ৩০ প্রেমের আবির্ভাব ৩০ ঘুম ৩১ প্রতীক ৩১ বৈশাখ ৩১ জ্যৈষ্ঠ ৩২ নৈরাজ্য ৩২ ব্যক্তিগত ৩৩ প্রেসম্যান ৩৪ সসাগরা ২৪ হে বন্য স্বপ্নেরা ৩৬

কাফেলা [৩৯—১০৪]

কাফেলা ৪১ কাফেলা ও মন্‌জিল ৪৩ তারেফের পথে ৪৫ মদীনার মুসাফির ৪৬ খলিফাতুল মুস্‌লেমিন ৪৮ এজিদের ছুরি ৫০ বেলাল ৫২ আলমগীর ৫৩ কোন্ বিয়াবানে ? ৫৩ নতুন সফর ৫৫ নতুন মিনার ৫৭ চতুর্দশপদী ৫৮ দুই মৃত্যু ৫৯ হে আত্মবিস্মৃত সূর্য ৬০ জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে ৬১ বৈশাখ ৬২ ঝড় ৬৬ বর্ষায় ৬৯ পদ্মা ৭২ আরিচা-পারঘাটে ৭৫ দ্বীপ নির্মাণ ৭৮ সৃষ্টির গান ৭৯ স্বর্ণ-ঈগল ৮০ ইনকিলাব ৮১ কিস্‌সাখানির বাজার ৮২ পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে ৮৪ ঈদের স্বপ্ন ৮৬ ঈদের কবিতা ৮৭ নয়া সড়ক ৮৯ শেরে বাঙলার মাজারে ৮৯ শিকল ৯২ বিরান সড়কের গান ৯৩ ইব্‌লিস ও বনি আদম ৯৪

হাবেদা মরুর কাহিনী [১০৫—১৩৬]

এক— উনপঞ্চাশ ১০৭-১৩৫

দিলরুবা [১৩৭—১৬০]

প্রথম স্তবক ১৩৯ দ্বিতীয় স্তবক ১৪১ তৃতীয় স্তবক ১৪৫ চতুর্থ স্তবক ১৪৮ পঞ্চম স্তবক ১৫০ ষষ্ঠ স্তবক ১৫৩ সপ্তম স্তবক ১৫৬

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য [১৬১—২০০]

মীর-জাফরের কৈফিয়ত ১৬৩ হায়াত দারাজের নসিহত ১৭৬ মীর-জাফরের শিকায়েত ১৭৭

তসবিরনামা [২০১—২৩০]

মুখবন্ধ ২০৩ বাজ ও বহুরূপী ২০৩ মৃগ ও শাখামৃগ ২০৩ বানর ও হুমাপাখী ২০৩ চড়ুই-বাবুই ২০৩ পোষা পাখী ও জালালী কবুতর ২০৪ বনগাঁয়ে ২০৪ রাজহাঁস ও পাতিকাক ২০৪ পিঁজরা ও পলাতক পাখী ২০৪ নেকড়ে ও কুকুর ২০৪ বাঘ ও বলদ ২০৫ ভাড়াটিয়া ঘোড়া ও সিংহ ২০৫ শকুনি ও স্বর্ণশৃগাল ২০৫ বাছুর ও বিড়াল ২০৫ চিলের আলাপ ২০৫ ফিঙে ও চিল ২০৬ ফিঙে ও চিল (২) ২০৬ ফিঙে ও পর-পুচ্ছধারী ২০৬ চিতাবাঘের তরিকত শিক্ষা ২০৬ একরকম বাঘের কিস্‌সা ২০৬ ঐ কিস্‌সার জের ২০৭ নেংটে ইঁদুরের আলাপ ২০৭ কুমীর ও তথ্যজ্ঞানী ২০৭ কাঁকড়ার গর্তে ২০৭ সজারু ও ডালকুকুর ২০৭ সেগুনের চারা ও বুনো কচু ২০৮ শবেবরাত পীলখানায় ২০৮ শবেবরাত—বক ও জাহুকের এলাকায় ২০৮ রাত্রিশেষে ২০৮ নৈশ পরিস্থিতি—আলোচনা প্রসঙ্গে ২০৮ সী-মোরগের দফতরে ২০৯ বিতর্ক ২০৯ ডিম চুরি ২০৯ পাখীর দরবার ২০৯ সাপুড়ে ও সাপের পীর ২০৯ সাপ ও ছুঁচো ২১০ ব্যাঙমা ব্যাঙমীর আলাপ ২১০ দাড়িপাল্লা ও বাটখারা ২১০ বাটখারা ও সিন্দুক ২১০ সিন্দুক ও পাছ দরজা ২১০ অসহায় অবস্থায় ২১১ শিয়াল ও হরিণ ২১১ কেরোসিনের কুপি ও ইমারতের ছাদ ২১১ 'ব্যাঙের মৃত্যু'—হাটুরিয়াদের আলাপ ২১১ 'ব্যাঙের মৃত্যু'-ধারা বর্ণনা (১) 'ব্যাঙের মৃত্যু' — ধারাবর্ণনা (২) ২১২ আগুন ও পানি ২১২ ডেগচির পানি ও দরিয়ার পানি ২১২ পেয়ালার পানি ও দরিয়ার পানি ২১২ পাহাড় ও দরিয়ার পানি ২১২ সমুদ্র ও বাষ্পবিন্দু ২১৩ প্রাণ ও প্রাণী ২১৩ পোকা ও মাকড়সা ২১৩ মাটি ও সিংহাসন ২১৩ ইটের কাহিনী : এক ২১৩ ইটের কাহিনী : দুই ২১৪ ইঞ্জিন ও চাকা ২১৪ খেয়াঘাট ও খেয়ানৌকা ২১৪ পাঁচিল ও দরজা : এক ২১৪ পাঁচিল ও দরজা : দুই ২১৪ কড়িকাঠ ও চৌকাঠ ২১৫ পিঁপড়ে ও প্যাঁচা ২১৫ পিঁপড়ে ও প্রজাপতি ২১৫ পিঁপড়ে ও ফড়িং ২১৫ ফড়িং ও মৌমাছি ২১৫ কওম তকদির ২১৬ ইবলিসের বৈঠক : এক ২১৬ ইবলিসের বৈঠক : দুই ২১৬ ইবলিসের চেলা ও নবীর উম্মত ২১৬ শাহী লেবাস ও সাধারণ মানুষ ২১৬ পিতা-পুত্রের আলাপ ২১৭ বাঘ ও ভল্লুক ২১৭ ভল্লুক মর্কট ২১৭ দুই হাওয়া ২১৭ পাতাবাহার ও পেঁপে গাছ ২১৭ পাতাবাহার ও পেয়ারা গাছ ২১৮ আরণ্য বিবাহ ২১৮ মধু চাঁদে ২১৮ চড়ুই দম্পত্তির পরচর্চা ২১৮ হাঁস ও কবুতরের প্রতিবাদ ২১৮ হুলোর কীর্তি ২১৯ শামাদান জুজদান ও মস্‌জিদ ২১৯ মস্‌জিদ ও জুতাচোর ২১৯ বৈঠকী আলাপ : এক ২১৯ বৈঠকী আলাপ : দুই ২১৯ ইল্‌ম ও আমল ২২০ কালি, কলম ও মন ২২০ আঙটি ও হিরা ২২০ বিদেশী গল্প ২২০ দুই কলমের বাহাস ২২০ স্থূল-সূক্ষ্ম সংলাপ ২২১ বাঁশ ও শরিফা ২২১ বাঁশ ও কঞ্চি ২২১ কবি ও কঞ্চি ২২১ আজাদী

www.pathagar.com

বার্ষিকীর আলাপ ২২১ পাহাড় ও পাতিকাক ২২২ ইরানী কিস্‌সা : এক : মুসাফির ও লোকমান হাকিম ২২২ দুই : চিনি ও ছাই ২২২ তিন : মানুষের আলাপ ২২২ চার : কুসঙ্গ ২২২ পাঁচ : মাটি ও মুসাফির ২২৩ কাঁকড়া বিছা ও খেজুর গাছ ২২৩ ইঁদুর ও বেজি ২২৩ বিছুটি ও মেহেদিপাতা ২২৩ কচ্ছপ ও প্রবালকীট ২২৩ সুর্মা ও পাথুরে কয়লা ২২৪ শীতরাত্রির আলাপ ২২৪ শীত ও উত্তরের হাওয়া ২২৪ শীত ও ফাল্গুনের হাওয়া ২২৪ ফাল্গুনের হাওয়া ও বিরান মাঠ ২২৪ ফাল্গুন ও পৃথিবী ২২৫ সৃষ্টির গান : কবির প্রতি ২২৫ কর্মীর প্রতি ২২৫ জ্ঞানীর প্রতি ২২৫ ধ্যানীর প্রতি ২২৫ অকর্মণ্যের প্রতি ২২৬ গুহার আঁধার ও নৈশ অন্ধকার ২২৬ ভোরের সূর্য ও গুহার অন্ধকার ২২৬ ভোরের সূর্য ও বিশ্বপ্রকৃতি ২২৬ আরশি ও আফতাব ২২৬ আরশি ও বদসুরাত ২২৭ য়েমনী মেহমান ও ইরানী মেযবান ২২৭ হরিণ ও কুয়োর ব্যাঙ ২২৭ ভূগোল পাঠ ২২৭ পোনা মাছ ও প্রবীণ রুই ২২৭ 'মৌচাক নির্মাণ' ২২৮ পাখী ও বাসা ২২৮ পাখী ও আস্‌মান ২২৮ ঝড় ও পাখী ২২৮ গাছ ও তাল : এক ২২৮ গাছ ও ভাল : দুই ২২৮ আস্‌মান ও জমিন ২২৯ হুমা পাখীর আলাপ : এক ২২৯ হুমা পাখীর আলাপ : দুই ২২৯ মাখলুকাত ও মানুষের রূহ ২২৯ মোমবাতি ও শামাদান ২২৯

ইকবালের নির্বাচিত কবিতা [২৩১—২৭০]

আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন ২৩৩ শাহীন ২৩৪ ইনকিলাব ২৩৫ খোদার ফরমান ২৩৫ গজল ও গীতিকা ২৩৫ তারেফের দো'আ ২৩৭ কর্ডোভা মস্‌জিদ ২৩৭ জিব্রাইল ও শয়তান ২৪১ বু'আলী কলন্দর ২৪২ পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে ২৪৩ পাশ্চত্যের শক্তি ২৪৪ গতি ২৪৪ আলমে বরজাখ ২৪৪ জামানা ২৪৬ মোনাজাত ২৪৭ অশ্বেতর ও সিংহ ২৪৯ 'শেকোয়া' থেকে ২৪৯ জওয়াব-ই শিক্‌ওয়া ২৫১ খোদার দুনিয়া ২৫৩ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ২৫৩ আসরারে খুদী : সূচনা খণ্ড ২৫৫ ভিক্ষা ২৬০ আকাঙ্ক্ষা ২৬১ ঈমান ২৬৪ শৃঙ্খলা ২৬৪ মর্দে মুমিন ২৬৪ কণিকা ২৬৫ পাহাড় ও কাঠবিড়ালি ২৬৮ দোওয়া ২৬৯

হাল্কা লেখা [২৭১—৩১৮]

ভূমিকা ২৭৩ নামভূমিকায় ২৭৩ প্রেমানন্দ গোস্বামী ২৭৪ ধ্যানী প্রেমানন্দ সমীপে ২৭৪ 'নিরপেক্ষ' প্রেমানন্দ গোস্বামীকে ২৭৫ গুরু-শিষ্য সংবাদ ২৭৬ যোগ-সংবাদ ২৭৬ সংলাপ ২৭৭ দুই বিড়ালের কথা ২৭৮ আরণ্য কাহিনী ২৭৯ ইরানী কিস্‌সা ২৭৯ ব্যাঙের গল্প ২৮০ আজব 'প্রগতি' ২৮০ **টুকরো কবিতা : [এক]** আজাদীর লক্ষণ ২৮১ গোলামী স্বভাব ২৮১ সওয়াল-জওয়াব ২৮১ মৌলিকতা বিষয়ক বিতর্কে ২৮১ অনুকারীর আব্দার ২৮২ প্রহসন ২৮২ মূল্য নির্ণয় ২৮২ [দুই] অনাত্মীয় পরিবেশ ২৮৩ অখণ্ড লোভের বেপারিকে ২৮৩ 'এক আশা' ২৮৩ 'এক ভাষা' ২৮৩ 'এক কৃষ্টি' ২৮৩ সাহিত্যে ঐতিহ্য : এক ২৮৪ সাহিত্যে ঐতিহ্য : দুই ২৮৪ কুয়োর

www.pathagar.com

ব্যাঙ ২৮৪ পলাণ্ডু গবেষণা ২৮৪ দাঁও ২৮৫ দুঃখের কারণ ২৮৫ কাকচরিত ২৮৫ [তিন] তল্পী ২৮৫ তৈল ২৮৫ কৌশলী ২৮৫ দু'নৌকায় ২৮৬ কথা প্রসঙ্গে ২৮৬ 'যেখানে' ২৮৬ আদর্শবাদী লেখকের প্রতি ২৮৬ [চার] জিজ্ঞাসা ২৮৬ প্রচার ২৮৭ প্রচারের ধারা ২৮৭ দোহাই ২৮৭ ইটের বদলে ২৮৭ হিংসা ২৮৭ সর্পিল ২৮৭ শিল্প বিচার ২৮৮ শিল্পী ২৮৮ কবিতা ২৮৮ অশ্লীল কবিতা প্রসঙ্গে ২৮৯ অবোধ্য কবিতা ২৮৯ পরগাছা ২৮৯ ঐতিহ্য-বোধ ২৮৯ বিক্রীত ২৮৯ কাফেলার অগ্রগতি ২৮৯ দুসরা হিস্‌সা ২৮৯ উদ্ভট ব্যাপার ২৮৯ অন্তর্দ্বন্দ্ব ২৯০ আত্মবিক্রয়ের পন্থা ২৯০ অদ্ভুত উদারতা ২৯০ হজম শক্তি ২৯০ মাৎস্যন্যায় নীতি ২৯০ আদর্শের নামে ২৯১ শক্তির উৎস ২৯১ স্বপ্নচারী ২৯১ পরিণতি ২৯১ উৎকট পরিকল্পনা ২৯১ সহজ পন্থা ২৯১ বাস্তব বুদ্ধি ২৯১ ব্যবসায় ২৯১ পলায়নী ভাব ২৯২ পলাতকের কৃতিত্ব ২৯২ মামার দৌলৎ ২৯২ 'কাজীর গরু' ২৯২ 'সরিষার ভূত : ২৯২ কওমী দায়িত্ব ২৯২ 'ক্ষেতের বেড়া' ২৯২ খেশারত ২৯২ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ২৯৩ হুজ্জতের ফায়দা ২৯৩ চক্রও চক্রান্ত ২৯৩ একটি প্রতারণার কাহিনী ২৯৩ দুর্দিনের পরিচয় ২৯৩ উচ্চবিত্ত ২৯৪ মধ্যবিত্ত ২৯৪ নিম্নবিত্ত ২৯৪ পরিস্থিতি : এক ২৯৪ পরিস্থিতি : দুই ২৯৪ প্রশ্নোত্তর : এক ২৯৪ প্রশ্নোত্তর : দুই ২৯৪ মাতব্বর ও স্পষ্টবাদী ২৯৪ বর্ণচোরা ও হায়াত দারাজ : এক ২৯৫ বর্ণচোরা ও হায়াত দারাজ : দুই ২৯৫ বর্ণচোরা ও হায়াত দারাজ : তিন ২৯৫ ঐতিহাসিক ও ইতিহাস ২৯৫ নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ২৯৫ অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ২৯৫ মড়ক ও ভুক্তভোগী ২৯৫ গেঁটে বাত ও রোগী ২৯৫ ব্যাঙ ও রুই মাছ ২৯৫ ফড়িঙ ও পিঁপড়ে ২৯৬ অধর্ম ও ধর্ম ২৯৬ 'প্রগতি' পন্থী ও হায়াত দারাজ : এক ২৯৬ 'প্রগতি' পন্থী ও হায়াত দারাজ : দুই ২৯৬ প্যাঁচা ও বাজ ২৯৬ কুমীর ও সমুদ্র ২৯৬ তার্কিক ও ধার্মিক ২৯৬ গাধা ও সিংহ ২৯৭ দোস্ত ও হায়াত দারাজ ২৯৭ ইবলিস ও হায়াত দারাজ ২৯৭ তিস্‌রা হিস্‌সা : এক : ঈদের চাঁদ ২৯৮ দুই : মরদের কথা ২৯৮ তিন : দো-দেল বান্দা ২৯৮ চার : মোল্লার নজর ২৯৮ পাঁচ : দিল্লীর লাড্ডু ২৯৮ ছয় : মেকীর প্রাধান্য ২৯৮ সাত : অতি সংসারী ২৯৮ আট : ধুবীর কুকুর ২৯৮ নয় : পিঁপড়ের পাখা ২৯৮ দশ : বে-হায়ার লক্ষণ ২৯৯ এগারো : ইল্লৎ ও খাস্‌লৎ ২৯৯ বারো : অভ্যাস ২৯৯ তেরো : সঠিক মূল্যবোধ ২৯৯ চৌদ্দ : প্রকৃত গুণী ২৯৯ পনেরো : হিংসুক ২৯৯ ষোল : ছিদ্রান্বেষী ২৯৯ সতেরো : মূর্খতা ২৯৯ [দুই] সংশয়িত ২৯৯ ফাঁকা বুলির পশারীকে ৩০০ হিতৈষী ও হায়াত দারাজ ৩০০ প্রজাপতি ও মৌমাছি ৩০০ অকর্মা ও কর্মী ৩০০ জেওর ও জহুরী ৩০০ অনভিজ্ঞতার খেশারত ৩০০ প্রকৃত বিড়াল ৩০১ [তিন] অবারিত প্রশ্ন ৩০১ বানরের পিঠা ভাগ ৩০১ বকরি ও বলদ ৩০২ দুই বুদ্ধুর আলাপ ৩০২ গতি ৩০২ সওয়াল -জওয়াব ৩০২ রূহানী আলাপ ৩০২(কোরবানি উপলক্ষে) কবিতাগুচ্ছ কিঞ্চিৎ ভূমিকা ৩০৩ দস্তুরি ৩০৩ নাম মাহাত্ম্য ৩০৪ টুকরো আলাপ ৩০৬ আজব চিড়িয়া ৩০৮ তাজ্জব ব্যাপার ৩০৯ গুরু শিষ্য সংবাদ ৩১০ সংস্কৃতি সংবাদ হরিদাসের পুনরার্বিভাব ৩১১ হরিদাসের স্বগতোক্তি ৩১১ হরিদাসের আক্ষেপ ৩১২ হায়াত দারাজ—স্বপ্নচারী সংবাদ ৩১২ হায়াত দারাজ শূন্যচারী সংলাপ ৩১৬

www.pathagar.com

প্রবন্ধ [৩১৯—৩৩২]

ইকবাল প্রসঙ্গ ৩২১ নজরুল-প্রসঙ্গ ৩২৬ নজরুল সাহিত্যের পটভূমি ৩২৭ পাকিস্তান : রাষ্ট্র ভাষা ও সাহিত্য ৩২৯ ব্যায়াম শিক্ষক মোহাম্মদ জনাব আলী ৩৩০

নাটক [৩৩৩—৩৭২]

রাজ রাজড়া ৩৩৫-৩৬২ আনারকলি ৩৬৩-৩৭১

গল্প [৩৭৩—৪২০]

মৃত-বসুধা ৩৭৫ বিবর্ণ ৩৮৫ অন্তর্লীন ৩৯১ যে পুতুল ডলির মা ৩৯৪ প্রচ্ছন্ন নায়িকা ৩৯৮

উপন্যাস [৪২১—৪২৬]

সিকান্দার শা-র ঘোড়া ৪২৩

পরিশেষ [৪২৭—৫০৪]

জীবনপঞ্জি ৪২৯
গ্রন্থপঞ্জি ৪৩৪
সাক্ষাৎকার ৪৩৬
প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপরিচয় ৪৪২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

১

১৯৯৫ সালে "ফররুখ আহমদ রচনাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এতে ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় প্রকাশিত ছয়টি কবিতাগ্রন্থ ("সাত সাগরের মাঝি", ১৯৪৪ ; "আজাদ করো পাকিস্তান", ১৯৪৬ ; "সিরাজাম মুনীরা", ১৯৫২ ; "নৌফেল ও হাতেম", ১৯৬১ ; "মুহূর্তের কবিতা", ১৯৬৩ ; "হাতেম তায়ী", ১৯৬৬) এবং অপ্রকাশিত একটি কবিতাগ্রন্থ ("অনুস্বার") অন্তর্ভূত হয়েছিলো।

"ফররুখ আহমদ রচনাবলী" দ্বিতীয় খণ্ডে ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পরে এতাবৎকালে প্রকাশিত ও কবি-পরিকল্পিত কবিতাগ্রন্থগুলি সংকলিত হয়েছে ("হে বন্য স্বপ্নেরা", ১৯৭৬ ; "কাফেলা", ১৯৮০ ; "ইকবালের নির্বাচিত কবিতা", ১৯৮০ ; "হাবেদা মরুর কাহিনী", ১৯৮১ ; "তসবিরনামা", ১৯৮৬ ; "ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য", ১৯৯১ ; "দিলরুবা", ১৯৯৪)। সেইসঙ্গে "ফররুখ আহমদের গল্প" (১৯৯০), ফররুখ আহমদের অসম্পূর্ণ উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য ও কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থিত হয়েছে। সঙ্গে কবির পরিকল্পিত ও অপ্রকাশিত একটি কবিতাগ্রন্থ "হাল্কা লেখা"।

অন্তর্ভূত গ্রন্থ ও রচনাসমূহ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি গ্রন্থশেষে 'পরিশেষ' অংশে সন্নিবিষ্ট করা হলো। কবির একমাত্র সাক্ষাৎকারটি এখানে যুক্ত হয়েছে।

বাংলা একাডেমীর তৎপরতায় "ফররুখ আহমদ রচনাবলী" প্রথম প্রকাশের এক বছর পরেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে।

২

ফররুখ আহমদের (১৯১৮-৭৪) প্রথম প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" (রচনাকাল : ১৯৪৩-৪৪) ; কিন্তু ফররুখ কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছিলেন ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৬-৪৩ কালপর্বের কবিতাগুলি কোথায়? না, ফররুখ নিজেই এই কালপর্বের এবং পরবর্তী আরো কবিতার একটি পাণ্ডুলিপি বারবার তৈরি করার কথা ভেবেছেন। সেই গ্রন্থের নাম "হে বন্য স্বপ্নেরা"। ফররুখের অনেক পাণ্ডুলিপিতে "হে বন্য স্বপ্নেরা"র পরিকল্পনা দেখা যায়। কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম তাঁর, কবিতার নির্বাচন তাঁর। ১৯৭৫ সালে আমি যখন "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" সম্পাদনা করেছিলাম, তখন স্বাভাবিকভাবেই 'অগ্রন্থিত কবিতা' অংশে ফররুখের "হে বন্য স্বপ্নেরা" স্থান পেয়েছিলো। "হে বন্য স্বপ্নেরা"র ১৬টি কবিতা "শ্রেষ্ঠ কবিতা"য় অর্ন্তভুক্ত হয়। ১৯৭৬ সালেই কবি-সমালোচক অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় "হে বন্য স্বপ্নেরা" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো। ফররুখ নিজেই তাঁর কাগজপত্রে উল্লেখ করেছিলেন "হে বন্য স্বপ্নেরা"র রচনাকাল : ১৯৩৬-৫০। আমরা

www.pathagar.com

জানি, এই সময়টা মূলত কবির আবাস ছিলো কলকাতায়। কলেজে পড়া, বিবাহ, চাকরি, গ্রন্থপ্রকাশ এসব তো ছিলোই ; মূল ছিলো কবিতা-চর্চা, কলেজী পাঠ শেষ না-করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সাহিত্যস্রোতে। ১৯৪৮ সালে সপরিবারে ফররুখ চলে আসেন ঢাকায়। মহানগরী কলকাতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশবিভাগ — এসবও এই কাব্য পাঠে মনে রাখতে হবে আমাদের।

"হে বন্য স্বপ্নেরা"র পাণ্ডুলিপি ফররুখ যেভাবে তৈরি করেছিলেন, তাতে ফররুখের ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের আমূল পরিবর্তনের ছাপ নেই, কিন্তু এ-ও ফররুখীয় চারিত্রেরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময়। উত্তরকালে ফররুখ আহমদের কবিতার কেন্দ্রীয় স্বর হিশেবে যা পরিচিহ্নিত — ইসলামী পুনরুজ্জীবন, পুঁথির পুনর্ব্যবহার, আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার, অতীতচারিতা — তা নেই। আছে কী? — আছে নাগরিক জীবন ; সমকালের স্বাক্ষর : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দিনগুলির ছাপ ; ফররুখের কবিতায় এই প্রথম ও শেষবারের মতো প্রেমের পরাক্রম (পরবর্তী "দিলরুবা"র সনেটগুচ্ছ ভিন্নধর্মী) ; কিন্তু আবার সব ছাপিয়ে-ছাড়িয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নতাও আছে এখানে। "হে বন্য স্বপ্নেরা"য় স্বপ্নাচ্ছন্নতা ও সংগীতময়তা আছে, কিন্তু তা বাস্তবের জমি থেকেই উদ্ভূত। তাঁর সেই প্রথম পর্যায়েও ফররুখ ছন্দময়। এই সময় গদ্য-ছন্দের প্রবল প্রতাপ চলছে। কিন্তু দেখা যাবে ফররুখ কবিতা লিখেছেন ছন্দ-মিলেই, এমনকি তখনি তাঁর প্রবল ঝোঁক সনেটীয় সংগঠনের কবিতা রচনায়। তবে ধ্রুপদের দিকে টান সত্ত্বেও এই কাব্যেও ফররুখ প্রবল রোমান্টিক। বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার মিশেলে "হে বন্য স্বপ্নেরা" ফররুখ-কাব্যে এক ভিন্ন স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসীন। একদিকে রূঢ় নাগরিক বাস্তবতা :

১. এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু পড়ে আছে শব [সমাপ্তি]

২ এল ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ বধির
(শাসন-সৃজিত সর্বনাশ), নিমেষে পুড়ায়ে দিল
আমরা ক্লীবের দল শুনিলাম নির্বিরোধ মনে। [পদ্মার ফাটল]

৩. জননীর সম্ভ্রম লুটালো ধূলিতলে,
শিশুর কান্নার বেগে শান্ত করি দিল মৃত্যু ঘুম।
নাগরিক আঘাতের বর্শা আর রুখিল না জলে
অগণন শবদেহে তুলিল সে মৃত্যুর মৌসুম। [পদ্মার ভাঙন]

৪. রুদ্ধশ্বাস নিশীথের বিষাক্ত প্রশ্বাস কালো দাগ
চুপিচুপি ঘোরে-ফেরে অন্তরীক্ষে পাহাড় ও জলে,
সূর্যের মিনার মুছে, গুঁড়ায়ে সূর্যের অনুরাগ
যেন আলেয়ার শিখা দিকভ্রান্ত করি একা চলে।
ঘনতর অন্ধকারে (কোথা পাবো মুক্তির পরাগ?)
মানুষের মৃত্যু হল বিকৃত পশুর পদতলে। [কালো দাগ]

৫. নিরাশার কবন্ধ সংগীতে
ক্লান্ত আত্মরতি মগ্ন মরিতেছে ঠুকিয়া ললাট ;
পাইনি আঁধারে খুঁজে প্রাণ-চিহ্ন সে মৃত পল্লীতে। [নৈরাজ্য]

৬. বীভৎস ক্ষুধার ছায়া, ম্লান সন্ধ্যা, স্বপ্নের জগৎ
অন্ধ দিবসের তীরে শ্রান্তিভরা ওঠে হাহাকার। [শূন্য মাঠ, মরা ঘাস]

www.pathagar.com

একদিকে এই হতাশা, নৈরাশা, অবক্ষয়, মৃত্যু, কালো দাগের ক্রমপ্রসার, অন্যদিকে উধাও রোমান্টিকতা, প্রবল কুণ্ঠাহীন অলজ্জ রোমান্টিকতা :

১. আকাশ ঢাকিবে মুখ, তুমি দাও সজল আবেগ
আজ প্রতীক্ষায় আছি। কবে তুমি দেখা দেবে মেঘ? [প্রতীক্ষা]

২. আকাশের মাঠ ঘিরে ঘন সূর্যাস্তের নলবন
তারি মাঝে ডুব দিয়ে পাখি চাঁদ দেখে আলোর স্বপন,
দিনের কুশ্রীতা ঝেড়ে ফেলে ওড়ে কোন শুভ্র রাজহাঁস
জ্যোছনা ভেজানো তনু তার নিচে ফেলে মাঠ, মরা ঘাস
উড়ে চলে আকাশের ধারে অন্তহীন নীলের কিনারে। [মধুমতীর তীরে]

৩. নীল স্রোতে ভাসমান সংখ্যাহীন জয়ের স্বাক্ষর
বন্দরের রশি ছিঁড়ে শুরু হল নতুন সফর। [জোয়ার]

৪. হাল ধরে তবু দেখি সে নাবিক রাত্রির প্রহরে
সিন্ধু-শকুনের চোখে খোঁজে তার বাঞ্ছিত বন্দর। [নাবিক]

রোমান্টিকতার প্রেম ও প্রাকৃতিক প্রসঙ্গ আরো আছে এই কাব্যে। সে কথায় পরে আসছি।

'প্রতীক্ষা' কবিতায় যে-বৃষ্টির প্রতীক্ষা তা যেন মনে হয় শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বর্ষণ নয়, যে-মৃত্যু ও অবক্ষয় ও কৃষ্ণত্ব বিরাজ করছিলো যেন তার সুশান্ত অবসানের প্রতীক্ষা। এই কবিতায় কবি লিখেছেন, 'স্বাতী নক্ষত্রের বারি খুঁজি উর্ধ্বমুখী পিপাসায়'। কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ে অস্তি-অনস্তির একটি দ্বন্দ্ব ছিলো, তার মধ্যে কবির এই পিপাসা সারাক্ষণ জাগ্রত ছিলো এবং কবি অনতিকালের মধ্যে সেই স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টিবিন্দু পান করেছিলেন। 'মধুমতীর তীরে' কবিতার যে-ডাহুক, তা কবির গ্রামের নদী মধুমতীর তীরে-কার স্মৃতিবহ। কীটস্-এর ছায়াচারী এই কবিতায় সৌন্দর্যতৃষ্ণার এক অপরূপ নৈশ দৃশ্যকে ধরে রেখেছে। এই কবিতার ডাহুক, 'দোয়েলের শিস' কবিতার দোয়েল, 'রাত্রিচর' কবিতার রাত্রিচর কোনো নামহীন পাখি, 'ঝিল্লী' কবিতার ঝিঁঝি ফররুখের নিসর্গ-প্রেমিকতাকে চিরকালের মতো ধরে রেখেছে। 'জোয়ার', 'নাবিক', 'সসাগরা' প্রভৃতি কবিতায় সেই সমুদ্রচারণা, "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থে যাকে কবি কাব্যসাফল্যের এক শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'সসাগরা' কবিতায় কবির প্রথম জীবনের কাব্যনায়ক সিন্দাবাদেরও দেখা পাওয়া যায় : 'হে নাবিক। হে মাঝি সিন্দবাদ/ভেঙে ফেলো পরিচিত মৃত্তিকার ডোর।' আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদের মতো শাহেরজাদীও এই কাব্যগ্রন্থে এসেছে। 'শাহেরজাদী' কবিতাটি আসলে তার বন্দনা : 'যেখানে জীবন-মৃত্যু আলোর কালোর তীব্র ঝারি/সেখানে ছিটালে তোমার প্রেমের রক্তিম পিচকারী।' 'বিদায়' কবিতাটিও শাহেরজাদীর উদ্দেশে নিবেদিত। 'শাহেরজাদী' কবিতায় কবি যখন বলছেন, 'আমারি রুধিরে হবে প্রাণরস, তুমি পাপড়ির লালী — /এক হয়ে যাবো দু'জনে মিলিয়া পুষ্পের ভরা ডালি।' কিংবা 'বিদায়' কবিতায় 'তোমার প্রেমের জাফরানে আজ সব রঙিন।/শাহেরজাদী, বিদায়। দেখ জাগছে দিন।' তখন "সাত সাগরের মাঝি"র ইতিহাস-সন্ধানের কথা মনে পড়ে না। মনে হয়, এর আড়ালে রয়েছে ব্যক্তিগত প্রেমের উপাখ্যান। কয়েকটি কবিতায় তো প্রেমই প্রধান :

www.pathagar.com

১. আমার নিবিড় ঘুম ভেসে যেত কবির অঞ্জনে
যদি না তোমার স্বপ্ন দোলা দিত আমার আকাশে। [সংগতি]
২. সে নামে ডেকেছি আমি যে নামে ডাকেনি কেউ তাকে
সে মন দেখেছি আমি যে মন দেখেনি কেউ আর। [সে নামে ডেকেছি আমি]
৩. দোলা দাও, দোলা দাও, হে পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ রাত্রে পথ চিনে প্রেম এল বুকে। [প্রেমের আবির্ভাব]

প্রেম ও প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে 'প্রতীক' কবিতায় :

ফাল্গুনে যে সবুজ শিখা সেই পাতা
ভরল যেদিন তাকিয়ে দেখি মোর শাখায়
ফুলের জোয়ার রিক্ত শাখায় শেষ সীমায়
প্রেমের নতুন জয়ধ্বনি জয়গাথা। [প্রতীক]

"হে বন্য স্বপ্নেরা" কাব্যে অন্ধকার আছে, প্রকৃতি আছে, প্রেম আছে। ফররুখ প্রথম থেকেই তিমির-বিদারী কবি। ফলে কখনো অন্ধকার গেড়ে বসতে পারেনি তাঁর কাব্যাধারে। কিন্তু বাস্তবতা ও স্বপ্নের দ্বন্দ্ব আছে, আছে দ্বন্দ্বোত্তরণ, মুক্তি, আলো, বিজয়। এরকম বাস্তবতা ও স্বপ্নের এক আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটেছে একটু কাহিনীরেখাময় 'পটভূমি' কবিতায়। প্রথম পঙক্তিতেই এক জুগুপ্সাউদ্রেকী চিত্রকল্প : 'সাড়ে আটটার ট্রেন উগারিয়া গেল তার আহার্য রাতের।' অদ্ভুত এক চিত্রকল্প : সকালবেলার ট্রেন স্টেশনে যেন যাত্রীদের বমন করে গেলো। এই চিত্রকল্প একেবারেই অ-ফররুখীয়, কিন্তু এই কবিতার সঙ্গে সুসমঞ্জস। কবিতার কাহিনীরেখায় আছে এক পাহাড়ী কিশোরের কলকাতা মহানগরীতে রাস্তায় ছাতা সারানোর জন্য ডাক দিয়ে ফেরা। যেন সেই পাহাড়ী কিশোরের কণ্ঠস্বরে মহানগরীর ফুটপাতে-কারখানা-যন্ত্রযান-বদ্ধ ঘরের পর্দা সরে গেলো, দেখা গেলো 'নিবিড় আঙুর বন, বরফ-জমানো চূড়া, সুদৃঢ় পাথর।' এক স্বপ্নজগৎ — যেখানে সেব, নাশপাতি, পেশীদৃঢ় হাত, তরুণীর কেশদামের সঙ্গে জেগে আছে 'পাহাড়ের চূড়া-ঘেরা তারা-ভরা রাত।' কবিতার শেষে ফিরে আসে আবার বাস্তবতা : বৃষ্টিতে ভিজে পাহাড়ী কিশোর ছাতা সারানোর আহ্বান জানিয়ে চলেছে নগরীর পথে-পথে।

এই বই-এর কবিতাগুলি লেখা হয়েছিলো এই শতাব্দীর সবচেয়ে আরক্ত দশকে — চল্লিশের দশকে। ব্রিটিশ শাসনকালেই তো পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দিয়েছিলো, কবি সেই মন্বন্তরকে বলেছিলেন, 'শাসন-সৃজিত সর্বনাশ'। বলেছিলেন, 'দুশো বছরের খেলা। বলে গেল হাড়ের মিছিল/দুশো বছরের মারীরোগ সম্পূর্ণ রাখিয়াছিল/অন্তঃসারশূন্য করি।' ('পদ্মার ফাটল') এই বই-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়েছে, নৈরাশা ও অবক্ষয় আছে, এক সংক্রমণশীল কালো দাগের কথা আছে, কিন্তু তারি মধ্য থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার আশ্বাস ধ্বনিত-রণিত হয়েছে। 'প্রেক্ষণ' কবিতার প্রথমদিকে 'বিশীর্ণ ক্ষুধার ছায়া, কৃষাণের ক্লান্ত দেহ, শ্রমিক কংকালে'র ছবি কিন্তু শেষ হচ্ছে এই বলে : 'অপঘাত, অপমৃত্যু এরি মাঝে স্বপ্নসাধ খুঁজিয়া বেড়াই,/হায়।...জীবনের স্বপ্ন চাই।' 'পরিপ্রেক্ষিত'

www.pathagar.com

কবিতায় প্রবল ক্ষুধা ধর্ষিতা নারীর শবের পরেই 'তবু মন, ওরে মোর মন/কান পেতে শোনো তুমি জীবনের বিপুল স্পন্দন।' শিশুর কান্না, মৃত্যুর খবরের পরেই কবির প্রতিজ্ঞা 'মরণ দিনের/ সমুদ্র-সীমানা মোরা পার হয়ে নিয়ে যাব/আত্মার পাথেয়,/এই ভাঙা দল, এই অবজ্ঞাত, এই লুণ্ঠিত ধূলিতলে হেয়/বিশীর্ণ যাত্রিক নিয়ে গড়ে যাবো ধরণীর নতুন মিছিল,/দিনের বল্লম হেনে খুলে যাবো রজনীর কারা অন্ধ খিল।' 'পাথরের দিন' কবিতায় কর্মের ক্লান্তি নয় কর্মের সফলতাই দ্যোতিত, যেখানে গাঁইতির ওঠা-নামা 'দুঃস্বপ্নের শেষে আনে ফসলের রক্তিম সকাল।' বইএর নাম-কবিতা 'হে বন্য স্বপ্নেরা' যেন পুরো চল্লিশ দশকের মর্মবাণী, রূঢ় বাস্তবতা থেকে স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষার ঢেউকে ছিনিয়ে দিয়েছে। শিশুর কান্না, মানুষের অপমৃত্যু এসব পার হয়ে এক স্বপ্নবৃক্ষের ডালে-ডালে লাল-নীল ফুল ফুটে ওঠার স্বপ্ন দেখেছে।

প্রথম থেকেই ফররুখ আহমদের প্রিয়তম মাধ্যম সনেট। ১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্তেই ফররুখ সাধারণত সনেট লিখেছেন। যেমন, এই গ্রন্থান্তর্গত 'কাঁচড়াপাড়ার রাত্রি' (আবু সাঈদ চৌধুরী-সম্পাদিত 'রূপায়ণ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে — ফররুখের খ্যাততম কবিতার একটি), 'শেষ মুহূর্ত', 'লুব্ধ', 'শ্রান্ত', 'বিদূষক', 'সমাপ্তি', 'প্রতীক্ষা', 'সামুদ্রিক', 'তিমি', 'পদ্মার ফাটল', 'পদ্মার ভাঙন', 'কালো দাগ', 'শিকার', 'জোয়ার', 'নাবিক', 'পাথরের দিন', 'স্মরণ', 'শূন্য মাঠ, মরা ঘাস', 'মৃগতৃষ্ণিকা', 'নৈশ কুকুরের ডাক', 'সুর', 'সংগীত', 'সে নামে ডেকেছি আমি', 'হীরার কুচির মতো', 'ঘুম', 'নৈরাজ্য', 'প্রেসম্যান' প্রভৃতি। ফররুখের সময় কবিরা ১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্তেই সনেট লেখার রেওয়াজ চালু করেছিলেন। তখনো বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী, এরকম কেউ-কেউ ১৪-মাত্রার পুরোনো অক্ষরবৃত্তেও সনেট লিখছিলেন। "হে বন্য স্বপ্নেরা"র 'নির্বিষ', 'রাত্রিচর' ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে রচিত সনেট। স্বরবৃত্তে কবি বেশি কবিতা লেখেননি যেখানে, সেখানে স্বরবৃত্তিক সনেট বিস্ময়করই বলতে হয় : 'প্রতীক', 'বৈশাখ', 'জ্যৈষ্ঠ' প্রভৃতি। যে-কোনো বিষয় নিয়ে ফররুখ সনেট লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন।

১৮-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছাড়া ফররুখের প্রিয় মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ও ৬-মাত্রার মাত্রাবৃত্তে "হে বন্য স্বপ্নেরা"র অনেকগুলি কবিতা লেখা হয়েছে। ফররুখের একটি অসামান্য কৃতিত্ব এই মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ও ৬-মাত্রার মাত্রাবৃত্ত দু'রকম ছন্দেই তিনি তাঁর স্বপ্নাক্রান্ত সংগীত-রণিত কবিতা লিখতে পারতেন ; যেমন, একদিকে 'দোয়েলের শিস', অন্যদিকে 'শাহেরজাদী'। আবার 'মধুমতীর তীরে' কবিতায় অপরূপ সুরঝংকার সৃষ্টি হয়েছে ২০-মাত্রার মিলান্ত অক্ষরবৃত্তে, কিন্তু প্রতি স্তবকের শেষ পঙক্তিতে ১০-মাত্রা মধ্যবর্তী অন্তমিলে। বিস্ময়কর এই কুশলতার উদাহরণ হিশেবে ঐ কবিতার উপান্ত স্তবকটি উদ্ধৃত করছি :

তার কালো দীর্ঘ তরঙ্গের একটানা সুর ভেসে আসে,
সে অতল সমুদ্র গহনে সারা মন সংকুচিত ত্রাসে,
জনতার মুখর সভায় খোঁজে ভীরু কথার আড়াল
অসংখ্য জোনাকি শিখা নিয়ে জ্বলে দূরে ছায়াচ্ছন্ন তাল
আর পাশে তমিস্রা প্রচ্ছায় রাত্রির তরঙ্গ বয়ে যায়।

www.pathagar.com

'শিল্পী' কবিতার সংগঠন একটু আলাদা : প্রথমে ১৮-মাত্রার সনেট, তারপর মুক্তক অক্ষরবৃত্ত।

কবির একেবারে প্রাথমিক এই কাব্যগ্রন্থেও তাঁর ছন্দ ও রূপকল্পের বৈচিত্র্যপিপাসা স্পষ্ট। এই কাব্যগ্রন্থে তিরিশের পূর্বসূরী কবিদের — সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ('যৌবসেনা'র মাত্রাবৃত্ত ছন্দ), জীবনানন্দ দাশ ('নৈশ কূকূরের ডাক' কবিতার শেষ পঙক্তি 'আমারে ঘিরিয়া ফেলে মিশরের প্রেতায়িত স্বর'), অজিত দত্ত ('সে নামে ডেকেছি আমি', 'হীরার কুচির মতো', 'প্রেমের আবির্ভাব', 'ঘুম' প্রভৃতি), প্রেমেন্দ্র মিত্র (বিভিন্ন কবিতায়) প্রমুখ কবিদের রণন আছে। কিন্তু সমস্ত রণনকে তিনি নিজের চারিত্রে রূপান্তরিত করেছেন। "হে বন্য স্বপ্নেরা" ফররুখের আদি কাব্যগ্রন্থ। ফররুখের প্রকৃত প্রথম উন্মেষের চিহ্ন আছে এই গ্রন্থে। "সাত সাগরের মাঝি"-তে ফররুখ আমূল রূপান্তরিত হয়ে গেছেন সত্য, কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থেও ফররুখ-চারিত্রের বহু বিচ্ছুরণ আভাসিত। 'ব্যক্তিগত' কবিতায় 'মুসা কালীমের খোঁজে সেনানী যে নির্ভীক সত্যের' এরকম একটি লাইনও আমরা দেখি এই কাব্যে। ফররুখ উত্তরকালে এই পথেই অগ্রসর হয়েছেন। একমাত্র এই 'ব্যক্তিগত' কবিতাতেই মনে হয় ফররুখের কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে ; তা না হলে ফররুখ তাঁর সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মতো এ বই-এও 'নৈর্ব্যক্তিক'। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিধ্বনি করে এই কবিতায় তিনি বলেছেন, 'ইতরের মধ্যে আমি খুঁজে ফিরি সত্তা মানুষের।' নির্জিতের জন্য এই মর্মবেদনাই মানবপ্রেমে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীকালে ইসলামের মানবতাবাদে ফররুখ উজ্জীবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মানবপ্রেমের বীজ তো এই কাব্যেই বপিত হয়েছিলো। ফররুখ আহমদের সমগ্র মানস-প্যাটার্ন জানতে হলে, তাঁর মনোগতি জানতে হলে, সমগ্র ফররুখকে বুঝে নিতে হলে "হে বন্য স্বপ্নেরা" অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন।

৩

ফররুখ আহমদের কবিজীবনে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ সমূহ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৬ বা ১৯৩৭ সালে কবির কবিতা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। স্বভাবতই তিরিশের প্রধান ও বিখ্যাত কবিদের দ্বারা ফররুখ তাঁর কবিজীবনের সেই প্রথম পর্বে খানিকটা প্রভাবিত হয়েছেন। ১৯৪৪ সালে বন্ধু কথাশিল্পী আবু রুশদের সমালোচনা এবং খুব সম্ভবত ১৯৪১ সালেই মওলানা আবদুল খালেকের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ তাঁর কবিজীবনের বিরাট এক মোড় ফিরিয়ে দেয়। (কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসানের মুখে শুনেছি, মওলানা আবদুল খালেকের বিখ্যাত রসূল (সা.)-চরিত "সাইয়েদুল মুরসালীন" গ্রন্থে ফররুখ আহমদের হস্তাবলেপ ছিল।) একদিকে কবি হয়ে ওঠেন বলিষ্ঠ ও রোমান্টিক, অন্যদিকে ইসলামী পুনরুজ্জীবনে দৃঢ়মূল। আমরা সকলেই জানি, কবির প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"র রচনাকাল ১৯৪৩-৪৪। কবির পরিকল্পিত ও প্রস্তুত অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হতে পারেনি, মৃত্যুর পরে বেরিয়েছিলো। "কাফেলা" কবি-পরিকল্পিত এমন একটি গ্রন্থ।

www.pathagar.com

"কাফেলা" কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল কবির একটি টুকরো কাগজে লেখা আছে ১৯৪৩–৫৮। ১৯৭৫ সালে আমার সম্পাদিত "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"য় প্রথমবারের মতো "কাফেলা" থেকে পাঁচটি কবিতা গ্রহণ করা হয়। ১৯৮০ সালে "কাফেলা" প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। এই গ্রন্থে ৩৪টি কবিতা গৃহীত হয়, কিন্তু ১৯৬৯ পর্যন্ত রচিত কবিতা স্থান পায় তাতে। এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর ইসলামী পুনরুজ্জীবন। পুনরুজ্জীবনকামী কবিতাগুচ্ছের রচনাকাল মূলত চল্লিশের দশক। কিছু ষাটের দশকে লেখা কবিতাগুচ্ছে বাংলাদেশের আলো-হাওয়া রূপায়িত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, "কাফেলা" গ্রন্থের কেন্দ্রীয় স্বর বিস্তারিত হয়েছে এই দুই ধারায়। ১৯৪৩ সালে রচিত কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছিলো ফররুখের "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা" কাব্যগ্রন্থদ্বয়।

"কাফেলা" কাব্যগ্রন্থের রচনাকালের সূচনা ১৯৪৩-এই। "সাত সাগরের মাঝি"র মূল পটভূমি ছিলো সমুদ্র, "কাফেলা" কাব্যগ্রন্থের মূল পটভূমি মরুভূমি। 'নতুন সফর' কবিতাটি ব্যতিক্রম, এই কবিতার পটভূমি সমুদ্র এবং নায়ক সিন্দাবাদ। প্রাসঙ্গিক আবহ রচনায় অদ্বিতীয় ফররুখ "কাফেলা" কাব্যে মরু-আবহাওয়া তৈরি করেছেন কবিতার পর কবিতায়। ফররুখের কবিতায় সমুদ্রের মতোই মরুভূমির এই জগৎকে তিনি তাঁরই নিজস্ব অর্থে অন্তরাখ্যানে ভ'রে তুলেছেন। এই মরুভূমি এবং মরুভূমিতে যাত্রীদল অর্থাৎ কাফেলার বর্ণনার মধ্যে কোথাও পরিস্কার লেখা নেই কিন্তু নিঃশব্দে রয়েছে একটি আদর্শিকতার অনুধ্যান। একটিমাত্র স্তবক উদ্ধৃত করছি, যেখানে কবির অভিপ্রায় বর্ণনার মধ্যে সংগোপন :

> প্রবল গতির ঝড় বুকে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে উড়িছে ঈগল
> দিগন্তে সোনালি বানে খুলে গেছে শর্বরীর তিমির শিকল
> উটের সারির পাশে জমা হ'ল একে একে দৃঢ় অচপল
> দূরযাত্রীদল।

উড়ন্ত ঈগল, খুলে-যাওয়া ভোর, এবং কাফেলার যাত্রীদলের বিশেষণে 'দৃঢ় অচপল' শব্দ যখন ব্যবহৃত হয় তখনই বোঝা যায় কবির অভীষ্ট। 'কাফেলা ও মঞ্জিল', 'তায়েফের পথে', 'মদীনার মুসাফির', 'কাফেলার প্রতি' প্রভৃতি সমস্ত কবিতায় বারবার আছে কাফেলা-প্রসঙ্গ। ফররুখের সমুদ্রচারণার পাশে মরুচারিতার অন্তর্গত চারিত্র অনন্য : এক প্রবল গতিময়তা। এই গ্রন্থে ফররুখ "সাত সাগরের মাঝি"র মতোই কাফেলার মধ্য দিয়ে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের বাণী শোনালেন ; আবার "সিরাজাম মুনীরা"র ধরনে হজরত উমর (রা.), বেলাল, আওরঙ্গজেব প্রমুখ ব্যক্তির বন্দনা করলেন। সব-মিলিয়ে তাঁর লক্ষ্য একটিই ছিলো।

এই কবিতাগুলির রচনাকাল চল্লিশের দশক। কিন্তু "কাফেলা" কাব্যেই অন্তর্ভূত ষাটের দশকে রচিত দীর্ঘ কবিতাগুলির — 'বৈশাখ', 'ঝড়', 'বর্ষায়', 'পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাটে' প্রভৃতির — পটভূমি বাংলাদেশ। ১৯৬৬ সালে কবি ফরিদপুরে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণেরই অনেকখানি ফল এই অসামান্য কবিতাগুচ্ছ। এই গুচ্ছের কয়েকটি কবিতাই সম্বোধনের ভঙ্গিতে রচিত। কয়েকটি কবিতায় কবির প্রার্থনা বাণীরূপ পেয়েছে। কবিতাগুলিতে গতির বন্দনা করা হয়েছে কিংবা ধ্বংসের

www.pathagar.com

পরে পুনর্নির্মাণের। অন্যত্র যেমন, এই কাব্যগ্রন্থেও ফররুখ শেষ-পর্যন্ত মানবতাবাদী। গ্রন্থের শেষাংশে নিবিষ্ট 'ইবলিস ও বনি আদম' কবিতানাট্যটি তার সাক্ষ্য দেবে। শয়তানের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের জয় অনিবার্য। বনি আদমের কণ্ঠে এই উচ্চারণ তাই স্বাভাবিক :

আমি চলি ইন্‌সানের শেষহীন সম্ভাবনা নিয়ে।
তোমার সুতিক্ত দ্বন্দ্ব তীব্রতর হোক, তবু জেনো
এখানে মাটির বুকে সর্বশেষ জয় মানুষেরি।

"কাফেলা" কাব্যগ্রন্থের প্রাকরণিক দিকটি আলোচনাযোগ্য। নাম-কবিতা "কাফেলা"র রূপকল্পেই কবি মরুভূমিতেই কাফেলার একটি ছবি ধরে রাখতে চেয়েছেন। দীর্ঘ কবিতাটির প্রতি স্তবক চার পঙক্তিতে বিভাজিত। প্রতি স্তবকের প্রথম তিন পঙক্তি ২৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত আর শেষ পঙক্তি ৬-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে লেখা, আর স্তবকগুলি এমনভাবে সাজানো যেন আমরা মরুভূমিতে কাফেলার যাত্রাপথ দেখতে পাচ্ছি দূর থেকে। শুধু ছবি নয়—সুরের মধ্যেও ধরে দেওয়া হয়েছে একটি উদাস ক্লান্ত মন্থরতা। শেষ স্তবকটি উদ্ধার করা যাক :

এখানে চলেছে তারা ধুলির তুফান তুলে আকাশের গায়
ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,
কোথায় চলেছে তারা কোন দূর ওয়েসিসে কিংবা সাহারায়
জানি না কোথায়...

বিষ্ণু দে-অনুরাগী ফররুখ বিষ্ণু দে-র ধরনে কোনো-কোনো কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার আছে : 'কাফেলা ও মন্‌জিল' কবিতার প্রথমাংশ অক্ষরবৃত্তিক সনেট ১৮-মাত্রায় ; দ্বিতীয়াংশ ছ-মাত্রার মাত্রাবৃত্তের ; কিন্তু সেখানেও দুটি অংশের স্তবকের গড়নে স্বাতন্ত্র্য আছে। 'তায়েফের পথে', 'বেলাল', 'আলমগীর' প্রভৃতি কবিতার কোনো-কোনো পঙক্তি বা পঙক্তি-অংশ ধ্রুবপদের মতো ফিরে-ফিরে প্রযুক্ত হয়ে এক ভিন্নরকম ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করেছে। 'বেলাল' ও 'আলমগীর' কবিতাদ্বয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পাহাড়' কবিতার ধাঁচ ব্যবহৃত হয়েছে। ফররুখের আগে নজরুল ইসলাম, শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ কবি অনুরূপ কবিতা লিখেছেন। 'নতুন মিনার', 'শেরে-বাংলার মাজারে', 'মেঘনা-তীরের চাষিকে' প্রভৃতি কবিতা গদ্যছন্দে লেখা। কিন্তু অন্যত্র যেমন, তেমনি এখানেও দেখি গদ্যছন্দ ফররুখের আত্মস্বভাবী নয়। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ছন্দে — বিশেষত ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তে ও মুক্তক অক্ষরবৃত্তে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই ওই দুই ছন্দে প্রণীত।

এমন কোনো বই নেই বোধহয় ফররুখের, যেখানে তিনি কিছু-না-কিছু সনেট দিয়েছেন। মনে হয়, সনেটই ছিলো ফররুখের প্রিয়তম রূপকল্প। 'কাফেলার প্রতি', 'ঈদের স্বপ্ন', 'নয়া সড়ক' প্রভৃতি একক সনেট। 'ঝড়', 'বর্ষায়', 'পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাটে' প্রভৃতি দীর্ঘ কবিতা সনেট-সিকোয়েন্স। আবার এই ৮টি সনেট-সিকোয়েন্সেই এক-একটি সনেটের সংগঠনে তেরজা-রিমা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন কবি। এখানেও তিনি বিষ্ণু দে-র উত্তরসাধক। আবার, 'বৈশাখ' দীর্ঘকবিতাটি মুক্তক অক্ষরবৃত্তে লেখা। প্রথম দুটি

www.pathagar.com

আলাদা একক পঙক্তির পরে ছয় পঙক্তির উনিশটি স্তবকে কবিতাটি গঠিত। বৈশাখ ফিরে-ফিরে আসছে 'দৃপ্ত', 'দুর্জয়', 'প্রমত্ত', 'উন্মত্ত', 'নির্ভীক', 'দুর্বার', 'নির্মম' প্রভৃতি বিশেষণে। ফররুখে রোমান্টিকতা ও ধ্রুপদের দোলাচল বোঝা যায় তাঁর এমনকি অন্তমিলের বা সংগঠনেরও স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের মধ্যে। ধ্রুপদের সাধনা করলেও ফররুখ শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক — তুমুল রোমান্টিক। মাত্র ৫৬-বছরের আয়ুষ্কালে ফররুখ আহমদ এমন অজস্রপ্রসূ কবি ছিলেন যে কতো কবিতা তিনি লিখেছেন, এখন পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ হিশেব আমাদের আয়ত্তের বাইরে। কবির জীবদ্দশায় তাঁর ছয়টি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো ; কবির মৃত্যুর পরে তাঁর পরিকল্পিত আটটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ("হে বন্য স্বপ্নেরা", "ইকবালের নির্বাচিত কবিতা", "কাফেলা", "হাবেদা মরুর কাহিনী", "তসবির-নামা", "ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য", "দিলরুবা" ও "অনুস্বার"— "ফররুখ আহমদ রচনাবলী" প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভূত) ; কবি-পরিকল্পিত অপ্রকাশিত আরো কয়েকটি গ্রন্থ আছে, আর আছে কবিপরিবারে সংরক্ষিত পত্রকর্তিকা। এসবের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এসবেরও বাইরে কলকাতা ও ঢাকার পত্র-পত্রিকায় কবির এতো অজস্র কবিতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যা নিঃশেষে সংগ্রহ করা কোনোদিনই বোধহয় সম্ভব হবে না। এরই মধ্যে গ্রন্থিত বইগুলি যে কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে, এটাই আমাদের জন্যে আনন্দের। এরকমই একটি গ্রন্থ "কাফেলা"। প্রথমাবধি ফররুখ আহমদ একটি সুপরিকল্পনায় তাঁর গ্রন্থগুলি (জীবদ্দশায় প্রকাশিত ও প্রস্তুত — মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) তৈরি করেছেন তা আমরা দেখতে পাই। প্রধানত তাঁর পাণ্ডুলিপি কবি সজ্জিত করতেন বিষয়ভিত্তিকভাবে — "মুহূর্তের কবিতা" অবশ্য কবিতার রূপকল্প (এখানে সনেট) অনুযায়ী নির্মিত। "হাবেদা মরুর কাহিনী"ও তাই — গদ্যকবিতার বই। "কাফেলা" গ্রন্থটি কবি তৈরি করেছিলেন বিষয়ের দিক থেকে। "হে বন্য স্বপ্নেরা"র সঙ্গে এর কোনো মিল নেই ; এর সাধর্ম্য "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা"র সঙ্গে। আপাতভাবে এর কবিতাগুচ্ছ দুই কক্ষে বিভক্ত — একটিতে ইতিহাস : মরুভূমি ; অন্যদিকে সমকালীন বাংলাদেশ। এর হয়তো কারণ এই যে প্রথমোক্ত কবিতাগুলি লেখা হয়েছিলো চল্লিশের দশকে, দ্বিতীয়োক্ত কক্ষের কবিতাগুলি ষাটের দশকে। ষাটের দশকে ফররুখ ঘরে ফিরেছিলেন। কিন্তু দুই পর্যায়ের কবিতার মধ্যেই তাঁর অভিন্ন আদর্শ শিখায়িত — তা আর কিছু নয় — মুসলিম পুনরুজ্জীবন। "সাত সাগরের মাঝি"র 'তুফান' কবিতায় কবি ইকবালের তিনটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে তরঙ্গ তখনি তরঙ্গ যখন সে গতিমান। "কাফেলা"র দুই পর্যায়ের কবিতার মধ্যেই এই গতির বন্দনা করা হয়েছে — এইখানে এর এককত্ব। 'পদ্মা' কবিতার তিনটি পঙক্তি স্মরণ করছি : 'তোমার স্রষ্টার কাছে (কুল মখলুকের যিনি রব)/হে নদী! তোমার মতো আমারো প্রার্থনা রাত্রিদিন/সকল প্রান্তরে, পথে পাই যেন গতির বৈভব।'

৪

১৯৩৭ সালে ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা যখন প্রকাশিত হলো অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদ কবি হিশেবে যখন আবির্ভূত হলেন, তখন বাংলা কবিতায় চলেছে গদ্যকবিতার যুগ। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)-সম্পাদিত 'কবিতা' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৫)

www.pathagar.com

পত্রিকার তখনকার সংখ্যাগুলোতে এর সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার যে-পত্রালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ, স্বভাবতই সেখানেও গদ্যছন্দ প্রসঙ্গই প্রধানত আলোচিত হয়। পরবর্তী চল্লিশের দশকেও গদ্যছন্দ এক প্রধান কাব্যিক মাধ্যমে পরিণত হয়েছিলো। তিরিশের ও চল্লিশের দশকে গদ্যছন্দ বাংলা কবিতার প্রধান এক ছন্দমাধ্যম হয়ে ওঠে। তারপরও গদ্যছন্দ বাংলা কবিতায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ; তবে, পঞ্চাশের দশকে পদ্যছন্দ ফিরে আসে আবার।

'কবিতা' পত্রিকায় লিখেছেন ফররুখ, সমাজতন্ত্রী-বামপন্থী কবিতাসমূহে ('পরিচয়', 'অরণি', 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি পত্রিকায়) লিখেছেন কিন্তু ফররুখ গদ্যছন্দকে তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন করেননি। তার অর্থ এই নয় যে, ফররুখ গদ্যছন্দে আদৌ লেখেননি। বরং তাঁর প্রথম দিক্‌কার কবিতাতেও গদ্যছন্দের ব্যবহার আছে। 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা 'আঁধারের স্বপ্ন' গদ্যছন্দ ও কাব্যছন্দের মিশেলে রচিত (পৌষ ১৩৪৫), 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইতিহাস আর আজকের রাত্রি' (ফাল্গুন ১৩৪৫) এবং আরো কিছু-কিছু কবিতা গদ্যছন্দে লেখা। দেখা যাচ্ছে, ১৯৩৮ সালেই ফররুখ গদ্যছন্দে লিখছেন। তবে, তখনো সেই প্রথম যুগেও গদ্যছন্দই ছিলো ফররুখের প্রধান অবলম্বন।

তাহলেও শেষ পর্যন্ত ফররুখ তাঁর অজস্র কবিতার মধ্যে কোনো-কোনো কবিতা হঠাৎ গদ্যছন্দে লিখে গেছেন। এবং একটি পূর্ণাঙ্গ গদ্যকবিতাগ্রন্থ "হাবেদা মরুর কাহিনী"। "হাবেদা মরুর কাহিনী" বইয়ের সংখ্যাচিহ্নিত গদ্যকবিতাগুচ্ছ কবি লেখেন ১৯৫৭-৫৮ সালে। এ বই-এর তিনটি কবিতা প্রথমবার প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে, "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" গ্রন্থে 'গদ্য-পৃথিবী' শিরোনামে। এটি ছিলো "হাবেদা মরুর কাহিনী"র কবিকল্পিত আরেকটি নাম। ১৯৮১ সালে "হাবেদা মরুর কাহিনী" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে। সাধারণত ফররুখ তাঁর কবিতাগ্রন্থের ভূমিকা লিখতেন না। এ বই-এর পাণ্ডুলিপিতে কবি-প্রণীত এক টুকরো প্রবেশক দেখা যায়, যেখানে কবি বলছেন :

> রূপকথার 'হাবেদা মরু'র অন্য নাম 'হাওয়ার ময়দান'। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে ঐ মাঠের সওয়ালে। "হাবেদা মরুর কাহিনী" গদ্যে লেখা রূপক কবিতা। ঈসায়ী উনিশশো সাতান্নোর শেষ ভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশশো আটান্নোর প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর ঈদ-উল-আজহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতাটি লেখা হয়। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল। আর সেই মারাত্মক নৈরাশ্যের মুখে তখন প্রত্যেক দেশাত্মবোধসম্পন্ন নাগরিক কামনা করেছিলেন একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের।

ফররুখ আহমদ রাশি-রাশি কবিতা লিখেছেন। তাঁর অনেক কবিতা রচনার পিছনে একটি নিঃশব্দ নক্‌শা কাজ করেছে। তাঁর কোনো-কোনো কবিতাগ্রন্থ একটা পারম্পর্যময় ও অখণ্ড রচনা। যেমন : "দিলরুবা" বা "হাবেদা মরুর কাহিনী।" এই নকশা ফররুখের অন্তর্গত ক্লাসিক মানসের পরিচায়ক।

www.pathagar.com

ফররুখের প্রাথমিক গদ্যকবিতার সঙ্গে "হাবেদা মরুর কাহিনী"র গদ্যকবিতাগুচ্ছের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। তাঁর প্রাথমিক গদ্যকবিতা অনেকখানি রোমান্টিক। "হাবেদা মরুর কাহিনী" অনেকখানি আদর্শায়িত। তার মানে এই নয় যে, "হাবেদা মরুর কাহিনী" একেবারেই কবিত্বরিক্ত। এই গ্রন্থে কবি বহুলাংশত আদর্শময়, উদ্দেশ্যময়। যেমন দু'একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

১. ... কোথায় সেই স্থির লক্ষ্য কামিল ইনসান
আর কোথায় সেই নাজাতের রাহা? [চার]

২. মুক্ত জীবনের ময়দানে,
মহৎ আদর্শের মঞ্জিলে
তুলে নিতে হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে
সকলের আগে প্রয়োজন আদর্শবাদী কর্মীর। [তেরো]

৩. ইসলামী সাহিত্যকে হতে হবে
একাধারে ইসলামী ভাবাদর্শে
আর সাহিত্যের গুণে সমৃদ্ধ। [একুশ]

কিন্তু এই বইএও উপমার পর উপমা গ্রথিত হয়েছে :

১. ... জোরালো ডানার পাখি
যে প্রান্তর পার হওয়ার পথে
ডানা গুটিয়ে হঠাৎ পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে
আজদাহার তীব্র দৃষ্টিতে সম্মোহিত শিকারের মতো। [দুই]

২. এর পর আসবে
আতশী দরিয়া,
কহর দরিয়া,
রক্ত সমুদ্র
আর কোফাফের কালো পাথরের মতো ঘন অন্ধকার রাত্রি । [তিন]

৩ ... যে দেশের দিকে জেগে আছে আমার দৃষ্টি
নীড়-প্রত্যাশী ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতো
গৃহ-প্রত্যাশী মাল্লার আগ্রহী দৃষ্টির মতো। ...
... সে দেশের খোঁজে আমার ভ্রাম্যমাণ মন
ঘুরছে দিন-রাত্রির আলো-ছায়ায় ঘেরা
সময়ের সমুদ্র জরিপ করে
ব্যাকুল সিন্ধু-কপোতের মতো... [চল্লিশ]

একটি পরিপূর্ণ কবিতা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

সমস্ত ঘুমন্ত শিশুকে বুকে নিয়ে
যখন ঘুমিয়ে পড়ে পৃথিবী
শূন্যে জেগে ভাসমান এক বিশাল দোলনার মত,
তখন জেগে থাকে শুধু ধ্যানীর দৃষ্টি

www.pathagar.com

অতন্দ্র তারাদের সাথে
রাতজাগা পাখিদের সঙ্গে.....
স্বপ্ন দেখে হাবেদা মরুপ্রান্তরে এক নতুন ভোরের
স্বপ্ন দেখে এক নতুন যুগের.....
দু'চোখ বেয়ে যখন নেমে আসে
দু'ফোঁটা শিশিরবিন্দু
দুনিয়ার সব দৌলতের চেয়ে কিম্মতী সকলের দামী। [ছেচল্লিশ]

গদ্যছন্দে তৈরি করতে হয় ব্যক্তিগত ছন্দ। (বিষ্ণু দে) ফররুখ আহমদে ঐ ব্যক্তিগত ছন্দ খুব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি, এটা স্বীকার না-করে উপায় নেই। কিন্তু ফররুখের নিজস্ব মুদ্রা নানাভাবে সারা বই-এর কবিতায়-কবিতায় খচিত হয়ে আছে। ছন্দের আভাস দু'একবার দুলে উঠেছে। 'এক' সংখ্যক কবিতায় 'যে বাতাসে মিশে আছে' পঙক্তি প্রভৃতিতে। উল্লেখযোগ্য ফররুখী মুদ্রা শব্দ ব্যবহারে, মুসলিম ইতিহাসের উল্লেখে, আরব্য-উপন্যাসের ঘটনার প্রয়োগে। ফররুখের কবিতার পাঠক এখানে খুঁজে পাবেন তাঁরই নিজস্ব পৃথিবীর প্রতিধ্বনি : কাফেলা, দশতে হাবেদা, কহর দরিয়া, বাদগর্দ হাম্মাম, কাফেলা সালার, আতশী দরিয়া, কামিল ইনসান, আদম সুরাত, মুশতারি, সুরাইয়া, কোকাফ, ইয়াকুত, পোখরাজ, জমরুদ, জওয়াহেরাত, রকপাখী, কুতুব তারা, সিন্দাবাদ, নবী সুলায়মান, শাহীন, আজদাহা, কিশতী. মাল্লা, খিজির, মুসা কালীম প্রভৃতি। ঘুরে-ফিরে এখানেও দেখা দিয়েছে 'নির্ভীক মাল্লার দল'। ফররুখ আহমদ প্রথম জীবনে রোমান্টিক লিরিক কবিতা লিখতেন। ক্রমশ 'বলিষ্ঠ রোমান্টিসিজম' (আবু রুশদ) দেখা দিলো তাঁর কবিতায়। একই সঙ্গে ফররুখের কবিতায় নির্যাতিত মানুষের জন্য বেদনা ও ক্রন্দন দেখা দিলো। ফররুখ তাঁর লিরিক কবিতায় যেমন তেমনি গদ্যকবিতাতেও নৈর্ব্যক্তিক জাতিগত চিন্তায় আত্মনিবেদন করেছেন। এমনকি প্রেমের কবিতার মতো আত্মজৈবনিক বিষয়েও ফররুখ বিস্ময়করভাবে নিজেকে উন্মোচন করেননি। ফররুখের সমগ্র কবিতা আত্মতা আড়াল করার কবিতা। বাম বলয়ের সঙ্গে ফররুখের একটি যোগাযোগ ছিলো। কিন্তু মওলানা অধ্যাপক আবদুল খালেকের সঙ্গে সংস্পর্শের পর ইসলাম দু'ভাবে তাঁর কবিতায় দেখা দিলো : একদিকে তার অন্তরাত্মা ; অন্যদিকে তাঁর রাজনৈতিক দিক। এই সময় ফররুখের একটি কবিতাগ্রন্থের নাম "আজাদ করো পাকিস্তান"। কিন্তু অধিকাংশ সময় কবিতার ভিতর দিয়েই তিনি রাজনৈতিক অভীপ্সা চরিতার্থ করেন — প্রকৃত কবিতার ভিতর দিয়ে। ১৯৪৭ সালের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র যে-আবাসভূমি তৈরি হলো, তা ফররুখ আহমদের আরাধ্য বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই ফররুখের কবিতায় নানারকম সংশয়-সন্দেহে ভরে যায়। সেও ভালোবাসা থেকেই। "হাবেদা মরুর কাহিনী"র সম্পূরক বই "ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক" কাব্য। এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতা কবিতা হিশেবে উত্তীর্ণ, এ কথা কেউ বলবে না। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে মাঝে-মাঝে এমন-সব কথা বেরিয়ে এসেছে, যা ফররুখের স্বল্প গদ্যরচনায় দেখা যায়নি। যেমন ফররুখের সাহিত্যাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে একুশ সংখ্যক কবিতায়, যেখানে তিনি পরিস্কার বলেছেন : 'কোরআন-সুন্নার রৌশনিতে যা হয়নি, রওশন/তাকে কিছুতেই বলা চলে না ইসলামী,/আর শিল্পবিচারে যা হয়নি উত্তীর্ণ /তাকেও কোনো মতে বলা চলে না

www.pathagar.com

সাহিত্য।' অর্থাৎ ইসলামী সাহিত্য' সম্পর্কে ফররুখের নিজস্ব অভিমত পাওয়া গেলো। ইসলামী সাহিত্যকে একই সঙ্গে ইসলামের স্বরূপ ধারণ করতে হবে এবং সাহিত্য হিশেবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এই নিরিখে ফররুখ আহমদের নিজস্ব কবিতা ইসলামী সাহিত্য হিশেবে গৃহীত হতে পারে। এই মানদণ্ড প্রয়োগ করলে অনেক তথাকথিত ইসলামী সাহিত্য খারিজ হয়ে যাবে — হয় দেখা যাবে সাহিত্য হিশেবে অনুত্তীর্ণ অথবা ইসলামের স্বরূপ তাতে অনুপস্থিত।

ফররুখ আহমদ ছন্দের কবি, সংগীতঝংকারের কবি। তাঁর শিক্ষক ও অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে'র সঙ্গে (যাঁকে তিনি একটি বিলুপ্ত কবিতায় শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন) এদিক থেকেই তাঁর সাযুজ্য দেখতে পাই আমরা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, গদ্যছন্দ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যা করণীয়, অন্যদের পক্ষে তা সর্বনাশের সূত্রপাত।' এতোদূর না বললেও ফররুখ আহমদও কবিতায় সুরঝংকারের পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য উদ্ধৃত করতে চাই। ফররুখ আহমদের পরবর্তী প্রজন্মের পঞ্চাশের কবি আবদুস সাত্তারের অনবদ্য একটি কবিতা আছে — 'দিন-রাত্রির কাব্য'। ফররুখ কবিতাটি পড়ে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু বলেছিলেন, কবিতাটি গদ্যছন্দে লিখিত না-হয়ে ছন্দোবদ্ধ হওয়া উচিত ছিলো। "হাবেদা মরুর কাহিনী" তাহলেও কবি কিন্তু লিখেছিলেন গদ্যছন্দেই। এর একটি কারণ কবিতার আত্মার সঙ্গে কবিতার শরীর ওতপ্রোত যুক্ত। যে ধূসরতা ও ম্লানিমা এই বই-এর উষর কবিতায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তার জন্যে তো সংগীত-ঝংকারের দরকার ছিলো না, ঐ গদ্যভাষা ঐ পদ্যছন্দের কবিতা শেষ হয় না নৈরাশায়, ফররুখ আহমদের কবিতা শেষ হয় 'মাটির জান্নাত' নির্মাণের স্বপ্নে, যে-মাটির জান্নাত 'দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে/ দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে।'

৫

দার্শনিক-কবি স্যার মুহম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) সম্পর্কে ফররুখ আহমদের ছিলো অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা। ফররুখ-অনূদিত ইকবালের কবিতা প্রথম গৃহীত হয়েছে সৈয়দ আবদুল মান্নান-সম্পাদিত "আসরারে খুদী" (১৯৪৫, কলকাতা) সংকলনে। দ্বিতীয়বার সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত "ইকবালের কবিতা" (১৯৫২) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে কবি আবুল হোসেন ও কবি সৈয়দ আলী আহসান-অনূদিত ইকবালের কবিতাও সংকলিত হয়েছিলো। এই সংকলনে ফররুখ অনূদিত কবিতাগুলি এই : ১. পূর্বাণী, ২. শাহীন, ৩.আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন, ৪. জিব্রাইল ও শয়তান, ৫. গজল ও গীতিকা, ৬. আসরার-ই-খুদী থেকে, ৭. ভিক্ষা, ৮. বু'আলী কলন্দর, ৯. তারেকের দো'য়া, ১০. খোদার দুনিয়া, ১১. খোদার ফরমান, ১২. ইকবাল-কণিকা। তৃতীয়বার ফররুখ-অনূদিত ইকবালের কবিতা সঞ্চিত হয় "ইকবাল-চয়নিকা" (১৯৬৭) সংগ্রহে। সংগৃহীত কবিতাগুলি : ১. রুমীর প্রতি, ২. তিনটি কবিতা (ঈমান, শৃঙ্খলা ও মর্দে মোমিন), ৩. বু'আলী কলন্দর। কবির মৃত্যুর পরে "ফররুখ-রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড, ১৯৭৯, আহমদ পাবলিশিং হাউস) সংকলনে 'ইকবালের কবিতা' শিরোনামে এই ক-টি কবিতা : ১. আসরার-ই-খুদী : সূচনা খণ্ড, ২. আকাঙ্ক্ষা, ৩. ভিক্ষা, ৪. ঈমান, ৫. শৃঙ্খলা, ৬. মর্দে মোমিন, ৭. রুমীর প্রতি, ৮. আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার

www.pathagar.com

অভিনন্দন, ৯. জিব্রাইল ও শয়তান, ১০. শাহীন, ১১. গজল ও গীতিকা, ১২. তারেকের দো'আ, ১৪. কর্ডোভা মসজিদ, ১৪. পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে, ১৫. পাশ্চাত্যের শক্তি, ১৬. গতি, ১৭. আলমে বরজাখ, ১৮. ইনকিলাব, ১৯. খোদার ফরমান, ২০. জামানা, ২১. কণিকা, ২২. মোনাজাত, ২৩. অশ্বেতর ও সিংহ, ২৪. "শেকোয়া" থেকে, ২৫. জওয়াব-ই শিক্ওয়া, ২৬. জওয়াব, ২৭. ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, ২৮. মহামানব ও ঐশী নর সম্বন্ধে, ২৯. ইতিহাস প্রসঙ্গে, ৩০. মিল্লাতের (সমাজের) সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ, ৩১. শিশুদের জন্য : পাহাড় ও কাঠবিড়ালী, ৩২. দোওয়া। সর্বশেষে, কবির পাণ্ডুলিপি অনুসরণে, স্বতন্ত্র গ্রন্থ "ইকবালের নির্বাচিত কবিতা" (১৯৮০)। এই গ্রন্থে অন্তর্ভূত ফররুখ-অনূদিত ইকবালের কবিতাগুচ্ছ এই :

> ১.আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন, ২ শাহীন, ৩. ইনকিলাব, ৪. খোদার ফরমান, ৫. গজল ও গীতিকা, ৬. তারেকের দো'য়া, ৭. কর্ডোভা মসজিদ, ৮. জিব্রাইল ও শয়তান, ৯. বু'আলী কলন্দর, ১০. পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে, ১১. পাশ্চাত্যের শক্তি, ১২ গতি, ১৩. আলমে বরজাখ, ১৪. জামানা, ১৫. মোনাজাত, ১৬. অশ্বেতর ও সিংহ, ১৭. "শেকোয়া" থেকে, ১৮. জওয়াব-ই-শেকোয়া, ১৯. খোদার দুনিয়া, ২০. ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, ২১. আসরারে খুদী : সূচনা, ২২. ভিক্ষা, ২৩. আকাঙ্ক্ষা, ২৪. ঈমান, ২৫. শৃঙ্খলা, ২৬. মর্দে মুমিন, ২৭. কণিকা, ২৮. পাহাড় ও কাঠবিড়ালি, ২৯. দোওয়া।

ফররুখ আহমদের প্রস্তুত পাণ্ডুলিপির নাম "আল্লামা ইকবালের নির্বাচিত কবিতা" — খাতার মলাটে এবং প্রথম পৃষ্ঠায় এই নামই আছে। সূচিপত্রও কবি তৈরি করেছিলেন। ঐ পাতায় কবিতাগুলো এভাবে সজ্জিত আছে, তা এরকম :

> ১. শাহীন, ২. আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন, ৩. গজল ও গীতিকা, ৪. তারেকের দো'আ, ৫. কর্ডোভা মসজিদ, ৬. জামানা, ৭. ইকবাল থেকে (এক : পাশ্চাত্যের শক্তি, দুই : গতি, দুই : মামার জয় [এই অংশটি কেটে-দেওয়া]), ৮. আলমে বরজাখ, ৯. 'ইনকিলাব', ১০. খোদার ফরমান, ১১. আসরারে খুদী : সূচনাখণ্ড, ১২. আসরারে খুদী থেকে (এক : 'ভিক্ষা', দুই : 'আকাঙ্ক্ষা'), ১৩. কালামে ইকবাল (এক : ঈমান, দুই : শৃঙ্খলা, তিন : মর্দে মোমিন), ১৪. বু'আলী কলন্দর, ১৫. শিশুদের জন্য (এক : পাহাড় ও কাঠবিড়ালি, দুই : দোওয়া), ১৬. পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে [তিনটি খশড়া, দ্বিতীয়টি ক্রসচিহ্ন-দেওয়া], ১৭. ওয়াতান ও মিল্লাৎ [কেটে-দেওয়া], ১৮. ইকবাল-কণিকা ['সারা জাহানের জিন্দেগী শুধু চলার মাঝে' অংশটি কেটে-দেওয়া]।

কেটে-দেওয়া 'মামার জয়' কবিতাটিই 'অশ্বেতর ও সিংহ' নামে গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। 'ওয়াতান ও মিল্লাৎ' কবিতাটি কেটে-দেওয়া, কিন্তু সূচিপত্রে উল্লিখিত হয়েছে। কবিতাটি এই :

www.pathagar.com

ওয়াতান ও মিল্লাৎ

বোঝেনি ঐ আজমবাসী
দ্বীনের মর্ম, — বিহ্বলতা ;
দেওবন্দে তাই হুসাইন
আহমদ কন আজব কথা।
'ওয়াতান থেকে মিল্লাৎ হয়'
এই কথা ফের গান যে তিনি,
বোঝেননি হায় নবীর মকাম
আল আরাবীর মান যে তিনি।
নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দাও
নিজেকে, — এই দ্বীনের দাবি ;
পৌঁছাতে না পারো যদি
সব-ই হবে 'বু লাহাবী'॥

নিজস্ব কবিতায় তো বটেই, অনুবাদেও যে ফররুখ অনেকসময় কতো পরিমার্জনা-পুনর্মার্জনা করতেন তার সাক্ষ্য দেবে 'পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে' কবিতাটির তিনটি লেখন। তৃতীয় লেখনটি বই-এ গৃহীত হয়েছে। আমরা এখানে পর-পর তিনটি লেখনই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে

(প্রথম লেখন)
হাজির হলাম মুজাদ্দিদের সমাধিতে বেকারার।
আকাশের নিচে ঐ মাটি যেমন আলোকিত সম্ভার॥
এ মাটির পাক ধূলিকণা দেখে সিতারা শরম পায়,
এখানে শায়িত রহস্যজ্ঞানী — সে সাহেবে আস্‌রার॥
জাহাঙ্গীরের সম্মুখে যাঁর হয় নাই নত শির,
যাঁর নিশ্বাসে পায় ইনসান আজাদী উষ্ণতার॥
হিন্দের বুকে নেগাহ্‌বান যিনি ছিলেন মিল্লাতের,
বারিতা'লা যাঁকে সঠিক সময়ে করেছেন হুঁশিয়ার॥
করেছি আরজ ফকীরীর তরে : আমাকে ফকীরী দাও,
দু-চোখে রয়েছে দৃষ্টি যদিও জাগ্রত নই আর॥

আফসোস্‌! শত আফসোস্‌! হায় পারোনি শাহীন হতে,
দেখেনি তোমার মুক্ত দৃষ্টি, চেনে নাই ফিতরাত,
জেনো তক্‌দির প্রণেতার বিধি রোজ-ই-আজল থেকে
দুর্বলতার পাপে নামে সাজা মৃত্যু অকস্মাৎ॥

(দ্বিতীয় লেখন)
হাজির হলাম আমি মুজাদ্দিদ আলফেসানির
সমাধিতে, এ দিগন্ত আলোকের অনন্ত সম্ভার,

www.pathagar.com

এখানে শায়িত সেই মর্দে খোদা — সাহেবে আস্‌রার
— যাঁর পূর্ণতার কাছে ম্লান দীপ্তি নক্ষত্র রাত্রির।
জাহাঙ্গীর বাদশার কাছে যিনি নন নতশির,
আতপ্ত নিশ্বাসে হিন্দের বুকে এ দ্বীনি সওয়ার
নেগাহ্‌বান (নেমে এলে অন্ধকার — প্রগাঢ় তিমির)।
দিলের আরজু ওঠে পূর্ণতার, অস্পষ্ট আলোতে
(যদিও বিমুক্ত দৃষ্টি চেতনার পায়নি সংঘাত)
শুনেছি ধিক্কার শতবার : পারোনি শাহীন হতে ;
দেখেনি তোমার দৃষ্টি, চেনে নাই নিগূঢ় ফিতরাত।
ভাগ্যের নিয়ন্তা যিনি তাঁর বিধি সময়ের স্রোতে
দুর্বলতার পাপে নামে সাজা — মৃত্যু অকস্মাৎ॥

(তৃতীয় লেখন)
মুজাদ্দিদের মাজারে আজ এ দিল্ বেকারার।
আকাশতলে মাটি যেমন আলোর সম্ভার॥
পায় সিতারা শরম যে এই ধূলিকণা দেখে,
হেথায় গোপন মর্দে মুমিন সাহেবে আস্‌রার॥
জাহাঙ্গীরের সম্মুখে যাঁর হয়নি নত শির,
নিশ্বাসে যাঁর উষ্ণতা পায় আজাদী — আজহার॥
হিন্দে যিনি মিল্লাতেরি ছিলেন নেগাহ্‌বান,
আল্লা যাঁকে ক্রান্তিকালে করেন হুঁশিয়ার॥
আরজি ওঠে তখন প্রাণের : দাও ফকীরী মোরে,
দুই চোখে হায় দৃষ্টি তবু জাগ্রত নই আর॥

আফসোস এই জিন্দেগীতে হওনি শাহীন তুমি,
দৃষ্টি তোমার এই জীবনে চেনেনি ফিত্‌রাত,
সকল ভাগ্য নিয়ন্তার এ অমোঘ বিধান জেনো
দুর্বলতার কঠিন সাজা মৃত্যু অপঘাত॥

ইকবালের আরো কয়েকটি কবিতা তর্জমা করেছিলেন ফররুখ আহমদ। সেগুলি হচ্ছে :

জওয়াব

["জওয়াব-ই-শিকোয়া"র অনুকরণে]

বেদনা-ক্ষুব্ধ হৃদয়ের বাণী মোর
তীব্র ব্যথায় ছিঁড়ে যায় নীলাকাশ,
বল্‌গা-হারানো দুর্বার গতিবেগে
ওড়ে নভ-নীলে সঞ্চারিয়া সে ত্রাস।

www.pathagar.com

সে-কথা বোঝে না প্রাচীন আকাশ ; খোঁজে
ঝড়ের মতন কার এ আর্তস্বর !
চাঁদ ও সিতারা করে শুধু কানাকানি
: আদম শিশুর ভাঙে বুঝি অন্তর।

আমার করুণ শিকোয়া বুঝতে পারে
একা সে প্রাচীন ফিরদৌসের দ্বারী
একবার সে তো দেখেছে আমাকে জানি
এলাম যখন জান্নাত-পথ ছাড়ি !

আদম শিশুর বিপুল দুঃসাহসে
ফেরেশতা-দল হয়ে যায় নির্বাক,
বলগা-হারানো দুর্বার গতিবেগে
উর্দ্ধ নীলায় উড়ে যায় মোর ডাক...

ভেসে আসে বাণী : কাহিনী তোমার তিক্ত বেদনা ভরা,
বন্ধনহীন অশ্রুর স্রোতে পূর্ণ পেয়ালা তব,
নিন্দা তোমার বন্দনা হল অপরূপ ভঙ্গীতে
আল্লার সাথে কথা বলবার ভাষা পেলে অভিনব।

আমি তো চেয়েছি করুণা বিলাবো, প্রার্থী পাই না খুঁজে,
পথনির্দেশ করি আমি যদি পথিকের দেখা পাই,
রয়েছে জ্ঞানের মঞ্জিল পড়ে নাই কোনো মুসাফির,
যে মাটিতে আমি গড়েছি আদম তার তো চিহ্ন নাই !

যোগ্যজনারে দান করি আমি গৌরব আলীশান
চাওয়ার মতো চাইলে তখন করি এ পৃথ্বী দান।
আল্লার দেওয়া জ্যোতির চিহ্ন নাই আজ এতটুকু,
শূন্য সুরাহি, নাই তার মাঝে শারাবের কোনো চিন্ !
জন্ম নিয়েছে আজর, — খলিল ইব্রাহিমের তরে।
নিজের নবীকে দেয় বদনাম, হায় এ কী দুর্দিন !
প্রভাতে তোমার আলস্যে কেটে যায়
কেটে যায় বৃথা কত রমজান দিন।

: তুমি মুসলিম ? ঈমানদারের চিহ্ন কোথায় বলো ?
বহ্ন্ দহন তোমার বক্ষে হয়েছে জড়ের মতো !
পিতার সমাধি বেচে দিয়ে তুমি
আজ কোন পথ দিয়ে চলো ?

www.pathagar.com

: তবু আশা করো — এইভাবে পাবে হুর?
কোথা সেই মুসা কালীম? এখনো জ্বলে মোর্ কোহিতুর।

: ঐক্যসূত্র কোথা তোমাদের মাঝে
স্বর্ণদিনের সফলতা কেন খোঁজো এ ব্যর্থ কাজে?

: কারা অন্যের দুর্বল পদলেহী?
সুবিধাবাদের চরণ-পূজারী কারা?
অনুভূতিহীন আত্মা যাদের ; বলো
আখেরী নবীর বাণী কি বুঝবে তারা?

: মসজিদে যায় গরিব আমাকে স্মরি
বণিক আমাকে ভুলেছে গর্বভরে,
রমজান মাস ধনিকের দ্বার থেকে
ফিরে যায় শুধু দীন গরীবের ঘরে।

মুফতী হারালো ঈমান, আজকে তাই
প্রাণহীন তার ভাষা বিদ্যুৎহীন
মসজিদে ওঠে আজান! বেলাল নাই ;
দর্শন আছে, নাই গাজ্জালী জ্ঞানের সায়রে লীন।

মসজিদ শোকে মর্সিয়া পড়ে নামাজী পাই না খুঁজে
নাসারার নীতি নিয়ে অনায়াসে আছো তুমি চোখ বুঁজে।
তুমি সৈয়দ, মীর্জা, আমীর অথবা সে আফগান
হতে পারো সবই ; শুধু নও তুমি সাচ্চা মুসলমান।

হায়দরী ত্যাগ নাই আজ তোমাদের,
নাই তোমাদের বিত্ত ওসমানের ;
পিতার শিক্ষা ভুলে যেয়ে অনায়াসে
সত্য কালাম ছাড়িয়াছো কোরানের।

ধরেছো কেবল আত্মবিনাশী নীতি
ছেড়েছো তাদের মহান আত্মজ্ঞান,
ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন মেলে না হায়
কর্মবিহীন। ধর্মে সন্দিহান!
ইব্রাহিমের ঈমান থাকতো যদি
প্রলয়-বহ্নি হত জানি গুলশান॥

* * *

www.pathagar.com

নিরাশ হোয়ো না তবু বাগবান বাগিচার দশা দেখে
ফুটবে ফুলের সিতারা আবার ভরবে তাহার ডালি
শহীদী খুনের রক্তিমা ফের আনবে ফুলের লালি,
দেখ চেয়ে দেখ দিনের সূর্য কার ছবি যায় এঁকে?
ছায়া সুশীতল ইসলাম তরু তার
শত বর্ষের সাধনায় আজো দিয়ে যায় ফলভার।

লেবাস তোমার হয়নি মলিন ওতানের ধূলি লেগে
তুমি ইউসুফ নিখিল মিশর কেনান তোমার চোখে
কাফেলা তোমার ভুলবে না পথ শতকের গতিবেগে
শিরায় তোমার জ্বলবে আগুন আতশী চিন্তালোকে
সত্য ন্যায়ের কাণ্ডারী তুমি এই জামানার বুকে
যুগের আঁধার কেটে সিতারার আলো দাও সম্মুখে।

এই দুনিয়া মরণাবর্তে শুনি জাগরণ-বাণী
শক্তি পরখ হয়ে যাবে এই জঙ্গের ময়দানে,
দেখা দাও তুমি আপন সুরাতে ; আঁধারের জড়তাকে
দূর করে দাও তৌহিদী ঐ আলোকরশ্মি দানে।

কুঁড়ির বক্ষে গন্ধের মতো লুকিয়ে থেকো না আর,
করো ক্ষুদ্রকে মহান তোমার প্রেমের শক্তিবলে
শারাব যদি না থাকে সুরাহিতে, সুরাহি থাকে না আর,
মুহম্মদের নামের মহিমা ছড়াও পৃথ্বীতলে।
ঐ ফুল যদি না ফুটতো বনে গাইতো না পাখি আর
জাগতো না কুঁড়ি গুলশানে জামানার...

ঐ নামে আছে মরু বিয়াবান, সাগর, কানন জুড়ে
ঐ নাম নিয়ে সাহারার ঝড় চলে মরু-পথ সুরে
ঐ নাম মুখে আরব আজম কাঁপছে সাগর যত
সুদূর দেশের বালুকণা আজো জেগে ওঠে ঐ সুরে...

জ্ঞানের বর্ম পরো যদি তুমি প্রেম তলোয়ার হাতে
রইবে তাহলে অটুট তোমার খিলাফত ধরণীতে,
আগুনের মতো প্রোজ্জ্বল হয়ে জাগবে ও তক্‌বির,
হবে তদ্‌বির তক্‌দির যদি চলো ঠিক সরণিতে...

তুমি যদি হও মুহম্মদের প্রেমিক, আমিও তবে
তোমার প্রেমিক হবো ;
দুনিয়া তো ছোটো ; 'লওহ্-কলম' দেবো আমি তোমাকেই
চিরদিন আমি তোমার প্রেমিক রবো॥

www.pathagar.com

মহামানব বা ঐশী নর সম্বন্ধে

বিদ্যুৎবহ্নির মতো নেমে আসে নভাঙ্গন থেকে
জ্বালায় আগুনে তার শহর ও সমতল প্রাচ্য ও প্রতীচী
উদ্দীপ্ত আমরা তার মননের শিখায়
নতুবা সঞ্চারী এক ব্যর্থ মূর্তি আমরা সে মাটি ও পানির।

ইতিহাস প্রসঙ্গে

চেয়ে দেখো সুপ্ত শিখা ইতিহ্-অনলে
চেয়ে দেখো ভবিষ্যকে অধুনার কোলে
দীপ তার আলো দেয় অদৃষ্টে জাতির
উজ্জ্বল করিয়া তোলে আজ আর কালের শর্বরী।

অতীতের গর্ব হতে মাথা তোলে অধুনা তোমার
ভবিষ্যৎ জন্ম নেয় বর্তমান থেকে,
যদি তুমি পেতে চাও জীবন অশেষ
ছিঁড়ো না বাঁধন তবে অতীতের — অধুনা ও ভবিষ্যের সাথে
চিরন্তন জীবনের গতিস্রোতে তরঙ্গের দৃঢ় অনুভূতি
সুরাহির মর্মমূলে শরাবের কলশব্দ মাতালের কানে।

মিল্লাতের (সমাজের) সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ

যে-জন করেনি পান মিল্লাতের আব-ই-জমজম
বীণার তন্ত্রীতে তার সংগীতের বহ্নিশিখা নিষ্প্রাণ বিভূতি।

* * *

হে বিহঙ্গ! সে রুজীর চেয়ে মৃত্যু কাম্য ঢের
যে রুজী তোমার প্রতিবন্ধক গতিপথে জীবনের॥

সৈয়দ আবদুল মান্নান-অনূদিত "আসরারে খুদী"র (১৯৪৫, কলকাতা) উৎসর্গ-কবিতা রচনা করেছিলেন ফররুখ আহমদ। কবিতাটি এই :

সিনাই পাহাড় জ্বলে জ্বলে হল খাক
মোর অনাগত নতুন মুসার তরে
নার্গিস তার বেদনার জ্বালা ঢেলে
চলে মুসাফির ব্যথাতুর অন্তরে
ওতানিয়াতের চার পাথরের কাটায়ে ক্ষুদ্র সীমা
দেখে সুবিশাল মখলুকাতের বিমুক্ত মাধুরিমা
কাফেলার পথ মুখরিত আজ শোনে সে বাঙ্গে দেরা
ঘুমন্ত নিশি শেষে বেদুইন আবার ছেড়েছে ডেরা।

www.pathagar.com

আফতাব আজ ভুলেছে অপরিচয়
জাগো বিমুগ্ধ মনে আপনারে চিনিবার বিস্ময়...
বাগে গুলের শিখা হল লালে লাল
পাকিস্তানের স্বর্ণ-ঈগল ভেঙেছে জীর্ণ ডাল...

দূর মদিনার শামিম সবুজ শীষে
এনেছে নূতন গান
স্বপ্নে দেখিছে হেজাজী হাওয়ায় মিশে
সোনালি পাকিস্তান
স্বপ্ন দেখিছে বোড-শিকলির দিন
জিঞ্জিরহীন লাখো অমলিন দিন।

সী-মোরগ এক শোনে আকাশের ডাক
মুর্দার মতো বন্দী ও'তান পরে,
নও-বাহারের দিনে এলো বৈশাখ
আজাদীর পথে ডেকে গেলো হাহাস্বরে।*

দেরি শুধু তার জিঞ্জির খোলবার —
দেরি শুধু তার নীল নেশা ভোলবার....
তবু তোলপাড়ে শোনে সে তারার উধাও বহ্নিস্রোতে
দুর্মর বেগে পয়ামের সুর ওঠে কোথা রণরণি —
ফারানের বুকে বহুদূর পর্বতে
নতুন দিনের বিশাল পক্ষধ্বনি॥**

ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) ইকবাল-কে উৎসর্গ করা হয়। তাঁর দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ "আজাদ করো পাকিস্তান" (১৯৪৬)-এও 'পাকিস্তানের কবি' নামে ইকবালের উদ্দেশে রচিত কবিতা স্থান পেয়েছে। (এই কবিতা দুটি "ফররুখ আহমদ রচনাবলী"র প্রথম খণ্ডে প্রাপ্তব্য।) ইকবাল সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ আছে — যেখানে কবি-অনূদিত ইকবালের কবিতাও আছে বেশ-কিছু। (এই প্রবন্ধ বর্তমান খণ্ডে প্রাপ্তব্য ।) এ ছাড়াও ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকার 'ইকবাল ও নজরুল সংখ্যা'য় ইকবালের উদ্দেশে ফররুখের একটি গান কবিতা হয় :

ইকবালের স্মরণে

তোমার স্বপ্ন বহ্নি-শিখায়
ধরা হল উত্তাল।
সারা জাহানের ধ্যানী কবি ইকবাল॥

---

* পরবর্তীকালে কবি-কৃত পরিশোধন : 'আজাদীর পথে ডেকে গেলো হাহাস্বরে।'

** পরবর্তী কবি কবি-কৃত পরিশোধন : 'নতুন উষার বিশাল পক্ষধ্বনি।'

www.pathagar.com

শত নিশীথের টুটি কাল-ঘুম
জাগে দুনিয়ার কোটি মজলুম
মৃত্যু-নিথর ধরণী আমার
হল যে রক্ত-লাল॥
জাগলো আবার সারা দুনিয়ার
ভুখা গরীবের দল
উৎপীড়িতের পদভারে ধরা
হল আজ চঞ্চল॥
হে কাবার পাখী, তুমি গেছ ডাকি
জাগায়ে মাটিতে কালবৈশাখী
ব্যথিত মনের সাগরে জাগায়ে
তরঙ্গ সুবিশাল॥

ফররুখ আহমদ বিভিন্ন সময়ে পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে এবং রুমী, শেখ সাদী, হাফিজ, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই, মওলানা লিয়াকত আলী এলাহাবাদী প্রমুখের কবিতা অনুবাদ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে ব্যাপকভাবে তিনি অনুবাদ করেছেন ইকবাল থেকে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের যেমন হোমার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেমন ইংরেজ রোমান্টিক কবিবৃন্দ, কাজী নজরুল ইসলামের যেমন হাফিজ, জীবনানন্দ দাশের যেমন ইয়েট্স্, তেমনি ফররুখ আহমদের কাছে স্যার মুহম্মদ ইকবাল।

কবি ইকবাল সম্পর্কে ফররুখ আহমদের যুক্ততা প্রসঙ্গে আমরা ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক দুটি সাক্ষ্য উপস্থিত করবো। মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলছেন, 'তিনি [ফররুখ] আমার সঙ্গে কথা বলতেন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং বিশেষভাবে ইকবালের দর্শন ও কাব্য নিয়ে। কেননা ইকবাল ছিলেন দার্শনিক কবি, ইসলামের কবি, মানবতার কবি। ইসলামের শিক্ষা তার কাব্যে যেভাবে ছড়িয়ে আছে তার দৃষ্টান্ত বিরল।' ('অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ আহমদ', 'অগ্রপথিক', ফররুখ-সংখ্যা, ৮ জুন ১৯৮৯) ফররুখ আহমদের সমকালীন কবি সমালোচক বন্ধু সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, '....মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের অর্থ ইকবালের কাছে স্তিমিতপ্রাণ ব্যক্তির আত্মসমর্পণ নয় ; ইসলামের অর্থ শক্তিমত্তা, ন্যায়ানুসরণ ও সাধনা একই সঙ্গে। ইকবালের এই বলিষ্ঠ আবেগ তরুণ মুসলমানের মনকে নাড়া দিয়েছিলো প্রচণ্ডভাবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এ আলোড়নের সংবাদ পাই ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে। যাদেরে অনেকটা পরিহাস করে কাজী আবদুল ওদুদ 'আত্মনিয়ন্ত্রণী দল' বলেছেন, তাদের উদ্ভব এ সময়েই। দুটি সাহিত্য সংসদ মুসলিম সাহিত্য-সাধনার পথনির্দেশ দিতে চাইল। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতাই ছিল এ আন্দোলনের সজীবতার উৎস। কাব্যক্ষেত্রে নেমে এলাম ফররুখ আহমদ ও আমি। ইকবালের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করলেন ফররুখ আহমদ। তার কাছে পরম মূল্যবান হলো উন্মেষ যুগের ইসলাম। হয়তো বিপর্যয় এবং পরিবেশের সঙ্গে অসদ্ভাব আছে কিন্তু বিশ্বাস ও উপলব্ধির রাজতোরণই তাঁর লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে বিশ্বমুসলিম ঐক্যবোধের প্রয়োজন হয়।' ('বাংলা সাহিত্য ও ইকবাল', 'মাসিক মোহাম্মদী', চৈত্র ১৩৫৮)

www.pathagar.com

৬

কবির পাঁচটি প্রবন্ধ বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে : 'ইকবাল প্রসঙ্গ', 'নজরুল প্রসঙ্গ', 'নজরুল সাহিত্যের পটভূমি', 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' এবং 'ব্যায়াম-শিক্ষক মোহাম্মদ জনাব আলী'। কবির আরো কয়েকটি টুকরো গদ্যরচনা এখানে গ্রথিত হলো।

এক

আহসান হাবীবের শিল্পানুরাগ উল্লেখযোগ্য। এদিক দিয়ে তিনি সফলতা অর্জন করেছেন। হাবীবের প্রেমের কবিতায় শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজচেতনভাবে তিনি যখন কবিতা লেখেন তখনও প্রকৃত বিপ্লবীর চাইতে অনুশীলনরত শিল্পীমনের পরিচয় বেশি পাওয়া যায়।

হাবীবের মতো আবুল হোসেন ও মতিউল ইসলাম শিল্পানুরাগের পরিচয় দিয়েছেন, অবশ্য এই দুজন কবির মধ্যে প্রভেদ স্পষ্ট, আবুল হোসেনের সাম্প্রতিক কবিতায় সমাজ যেখানে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মতিউল ইসলাম সেখানে সমাজের প্রাধান্য দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে। সমাজসচেতন হতে যেয়ে মতিউল ইসলামের কাব্যের স্খলন ঘটেছে।

ফররুখ আহমদ ও হাবীবের জনপ্রিয় কবিতাগুলিই এ পর্যন্ত আলী আহসানের আদর্শ হয়ে আছে, যতদিন তিনি এই নির্মোকে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন ততদিন তাঁর কাছ থেকে আমরা মৌলিক সৃষ্টি আশা করতে পারি না।

দুই

অনেকের আনন্দ এবং বিপদের মধ্যে আমরা ঘোষণা করছি যে, "ধোলাই কাব্যে"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণের বই ভৌতিক ব্যস্ততার মধ্যে ছাপা হয়েছিল বলে কিছু ভুলচুক থেকে গিয়েছিল। নতুন সংস্করণে সে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি আমরা বিলকুল সংশোধন করে ফেলেছি। তার ফলে 'ধোলাই কাব্যে"র পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, — অতীব পরিষ্কার সংস্করণ ভূপৃষ্ঠে অভিনব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করলো। [আশা করি, "ধোলাই কাব্যে"র এই সহীহ বড় সংস্করণকেই এখন থেকে সহৃদয় ও হৃদয়হীন পাঠকপাঠিকাবৃন্দ নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করবেন। আর "ধোলাই কাব্যে"র কোনো নকল সংস্করণ দেখলে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবেন। কেননা নকল করাটাই এদেশের 'আড়ষ্ট কাক' বা তথাকথিত এ্যারিস্টোক্র্যাট 'আঁতালেকচুয়ালদের' বৈশিষ্ট্য।]

তিন

জনাব,

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, 'বাঙলা না সংস্কৃত' — শিরোনামায় যে রিপোর্ট আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে আমরা পরম পুলকিত হয়েছি। বস্তুত

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির অগ্রদূত হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষায় যে 'সংস্কৃতের সংস্কৃতির' শুভাগমন হচ্ছে এ তারই নির্ভুল পূর্বাভাস। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই 'আচার্য' 'পুরোহিত' 'পৌরোহিত্য' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ আমাদের বহুল প্রচলিত শব্দগুলোকে স্থানচ্যুত করেছে। অতঃপর আমারা আশা করছি যে, উর্দু-ভাষীদেরকে আমরা বাঙলার নামেও সংস্কৃত শিখিয়ে দেব, সে সংস্কৃত আমাদের জবানে থাকুক আর নাই থাকুক। এজন্যে 'অংশভাক' 'অংশটুকু' 'অজরামর' 'অজহলিঙ্গ' জাতীয় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাংলার নামে চালিয়ে দিতে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। কেননা 'সংস্কৃতের সংস্কৃতি' রক্ষা করতেই হবে।

এই 'সংস্কৃত-বাঙলা'র প্রসঙ্গে পঞ্চাশ বৎসর আগে একজন বিখ্যাত অভিধান-প্রণেতা লিখেছিলেন : 'বাঙালার এমনও দিন গিয়াছে, যখন মহামহোপাধ্যায় পন্ডিতগণ অমর কোষাদি সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত অথবা বিভক্তিহীন করিয়া বঙ্গীয় পদ্ধতি সিদ্ধ ক্রিয়া যোগ সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালা পন্ডিতী বাংলার সৃষ্টি করিতেছিলেন.....।'

কেন, কি উদ্দেশ্যে ইংরেজ আমলে এই পন্ডিতী বাংলা চালু করা হয়েছিল সে কথা সকলেই জানেন। উক্ত অভিধানপ্রণেতা বৌদ্ধ যুগের কথা উল্লেখ করলেও আসলে যে আরবি ফার্সি মিশেল মুসলমানী বাংলা ও বিরাট মুসলিম ঐতিহ্যবাহী পুথি-সাহিত্যকে নস্যাৎ করার জন্যেই 'সংস্কৃতের সংস্কৃতি' আমদানি করা হয়েছিল সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়াজন।

এ ক্ষেত্রে তমদ্দুনের দাবীতে পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পরেও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিনিয়ন্তা কেন যে আবার সংস্কৃতের ভূত পাকিস্তানে টেনে আনছে সে কথা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। তবে এ ব্যাপারে শুধু বাংলা উন্নয়ন বোর্ড একাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার কর্ণধারগণ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক মহোদয়ও এই কাজে যেভাবে অগ্রসর হ'চ্ছেন তাতে ক'রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে অচিরে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উৎখাত এবং 'সংস্কৃতের সংস্কৃতি' বহাল হয়ে যাবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কেননা, উপরোক্ত মহোদয়গণ সংস্কৃতজ্ঞ না হয়েও যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানে 'সংস্কৃত-বাঙলা'র পরিচর্যা করেছেন তাতে আরবি-ফারসি মিশেল মুসলমানী বাংলা কয়েক সহস্র পুথি-পুস্তক সহ অচিরেই বঙ্গোপসাগরে নিক্ষিপ্ত হবে তা উল্লেখ না করলেও চলে।

চার

আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে 'কাফেলা'র যাত্রা শুরু হ'ল যাকে আমরা বহু কারণে স্মরণীয় ব'লতে পারি। দু'শো বছরের দাসত্ব বন্ধন মুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান-স্বীকৃতির বহু-প্রার্থিত এই মুহূর্ত অক্ষয় হ'য়ে থাকবে আমাদের মনের মণিকোঠায়। তবু আমাদের আজ বিশেষ করে এ কথাই মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান-স্বীকৃতিই আমাদের চরম কাম্য নয়। যে স্বীকৃতির প্রথম সোপান

www.pathagar.com

পাকিস্তান সংগঠনের পথ উন্মুক্ত করে আমরা শুধু সেই পর্যায়েই উন্নীত হয়েছি। পাকিস্তান সংগঠনের কাজ কেবল শুরু হ'ল।

এই কাজ বহুমুখী। আমাদের কর্মসূচি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার রকম পরিকল্পনায় ভরে উঠবে। তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আমাদের নিবেদন : যে যাঁর যোগ্যতামত অংশ গ্রহণ করুন পাকিস্তান সংগঠনের সংঘবদ্ধ হোন অত্যাচারী শোষক সমাজের বিরুদ্ধে। যে অত্যাচারী পুঁজিবাদী সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনীতির নামে বিভিন্ন মুখোশে পাকিস্তানের জনগণকে শোষণ করেছে তাদের মূল উপড়ে ফেলার জন্য এক জামাআতে শামিক হোন। কল-কারখানার উপর যতদিন শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ভূমি খনি ও বনজ সম্পদ যতদিন না জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে, জমিদার ও জোতদারদের প্রভাব যতদিন অপ্রতিহত ততদিন আমরা কিছুতেই একথা বলতে পারবো না যে পাকিস্তান সংগঠিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সংগঠনের সাথে সাথে সমান তালে শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশরক্ষা ও অন্যান্য অসংখ্য দিকে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বস্তুত পাকিস্তান-স্বীকৃতি আদায় করতে আমাদের যতখানি কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তার চাইতে লক্ষ গুণ বেশি শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার ক'রতে [হবে] পাকিস্তান-সংগঠনের কাজে। যাঁরা এই কাজে শরিক হবেন তাঁদেরকে আমরা পূর্বাহ্নেই অভিবাদন জানাই কেননা 'কাফেলা' হবে তাঁদেরই মুখপত্র।

পাঁচ

গ্রন্থকারের নিজস্ব ভূমিকা

(যার জন্য প্রকাশক দায়ী নন)

আমার বইয়ের ভূমিকা আমি নিজেই লিখছি কারণ কোন খ্যাতনামা ব্যক্তিই অখ্যাত লেখকের ভূমিকা লিখতে চান না আর লিখলেও এমন বাহাদুরি করেন যার ফলে লেখকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। সুতরাং পেরেশান হালতে থাকা সত্ত্বেও আমি ছহীহ বাংলা জবানে যে কিতাব লিখেছি সেই কিতাবের ভূমিকা প্রণয়নের দায়িত্বও আমাকে নিজের হাতেই নিতে হয়েছে। অবশ্য পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য নির্বোধ সাহিত্যিক দলে বুদ্ধিমান পারমাণবিক সদৃশ নরুণ বুদ্ধি নাট্যকার জজ বার্নার্ড শয়ের মত দীর্ঘ ভূমিকা আমি লিখবো না। আর বলতে কি শ'য়ের প্রতিভা আমার চাইতে অনেক উঁচুদরের।

তবে একথা বলা বাহুল্য যে আমার রচনাও উঁচুদরের। সমঝদার লোকের দুর্ভিক্ষ হওয়ায় আমার রচনার (যথোপযুক্ত দূরে থাকুক) মোটেই তারিফ হ'চ্ছে না। এই কথাগুলো বলার জন্যেই বিশেষ ক'রে আমার ভূমিকা লেখার প্রয়োজন ছিল। কেননা, কোন কোন পণ্ডিতই সমঝদারের দুর্ভিক্ষের কথা মেনে নিয়ে আমার রচনার মূল্য স্বীকার করতেন না। বরং দাড়ি, কমা, সেমিকোলন থেকে শুরু করে স্টাইল

www.pathagar.com

পর্যন্ত হাজার গণ্ডা কল্পিত ভুল প্রকাশ ক'রে দিয়ে শেষদিকটায় সাহিত্যে সাধনা করার জন্যে এমনভাবে পিঠ চাপড়িয়ে দিতেন যাতে ক'রে মাতব্বরি ছাড়া অন্য কিছুই জাহির হয় না।

অথচ তাঁরা একথা ভেবে দেখেন না যে সাহিত্যচর্চা করা পূর্ব পাকিস্তানে আদম সন্তানের সাধ্যের কত লক্ষ মাইল বাইরে। কারণ এখানে শিক্ষিত সমাজ ব'লে যে একটা অদ্ভুত সমাজ আছে বেসরকারি ফার্ম থেকে শুরু করে সরকারি অফিস পর্যন্ত আর বেতনভোগী মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে অবৈতনিক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দহলিজের পেছন অবদি যাদের আনাগোনা — ঘুষ এবং চুরির একচেটিয়া কারবার ছাড়া অন্য কোন জিনিষের প্রবেশাধিকার যেখানে নাই। সে দেশে উপরোক্ত সমাজের পেট ক্রমাগত মোটা হলেও যাঁরা সাহিত্যিক তাঁদের পাকস্থলী অনাহারে লীলাভূমি অথবা বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার আতশী মঞ্জিল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। সুতরাং এই সমাজে থেকে সাহিত্য চর্চা করার মানে আত্মহত্যা করা — যা সম্পূর্ণ শরিয়তবিরোধী। আর আমি নিজে কদাচ শরিয়তবিরোধিতা করি না, অতএব সাহিত্য চর্চা অথবা আত্মহত্যা করার অবসর আমার জীবনে এ পর্যন্ত আসেনি। শোনা যায় যে অন্যান্য সভ্য দেশে রাষ্ট্রশক্তি সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদের সাথে সহযোগিতা ক'রে থাকে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের উপরোক্ত কলকব্জা উপরোক্ত বৈতনিক ও অবৈতনিক বড় কর্তাদের হাতে থাকায় সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক নামধারী দুর্বল মানুষেরা এ পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে কোন ফায়দা হাসেল করতে পারেননি। অদূর ভবিষ্যতে যে পারবেন এমন কোন সম্ভাবনাও আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

এই অবস্থাকে সাধু ভাষায় হতাশাব্যঞ্জক বলা হয়। এবং এই পরিস্থিতির গুঁতোয় পূর্ব পাকিস্তানের বৈজ্ঞানিকদের বারোটা অনেক আগেই বেজে গেছে। সাহিত্যিকদের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে আমার মত যারা নির্ভীক সে সব সাহিত্যিকের কথা স্বতন্ত্র। এই নির্ভীক জমাতের সাহিত্যিকরা ভিটে মাটি বিক্রি করে অথবা স্ত্রীর গহনা (যদি থাকে) বন্ধক রেখে সাহিত্য চর্চা না করেই বই প্রকাশ করেন এবং দোকানদারের চক্রান্তে ফতুর হন। আর যাঁরা নিজেদের পয়সা খরচ ক'রে বই ছাপাতে পারেন না তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের দুর্লভ প্রকাশকদের শরণাপন্ন হয়ে আত্মহত্যার পথ পরিষ্কার করেন।

বলতে ভুলে গেছি যে, আর এক শ্রেণীর মানুষ যাঁরা বড়লোক নামে বিখ্যাত তাঁরাও অনেক সময় সাহিত্যের ময়দানে আসা যাওয়া করে থাকেন। তবে এঁদের অনেকেই লিখতে বসলে কলমের নিব ভাঙেন বলে নিব বাঁচানোর জন্য মৌলিক সাহিত্যিকদের দুরবস্থার সুযোগে কানাকড়ি দাম দিয়ে লেখা কিনে নিজেদের নামে প্রকাশ করেন। অনেকে সেটুকু করার প্রয়োজন না থাকায় তাঁদের ফার্মে যে সমস্ত কর্মচারী সাহিত্য চর্চা করে থাকেন তাদের লেখা চুরি ক'রে অথবা কেড়ে নিয়ে নিজেদের নামে পুস্তক আকারে বাজারে ছাড়েন। এঁরাও আমাদের মতই স্মরণীয়। আমাদের মহফিল থেকে ধরে বসলেও অনেকটা এক তালেই আমরা চলাফেরা করি। কারণ আমাদের প্রথম লক্ষ্য খ্যাতি, দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করা। এইজন্য যৌন বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

পরিচ্ছন্ন আলোর থেকে শুরু করে ধনতান্ত্রিক অজ্ঞানতার সফল অন্ধকার আমাদের ছেনায় প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। কারণ আমরা নাম ও টাকা ছাড়া অন্য কিছুই চাইনে। নছীব বুলন্দ থাকলে দুটো জিনিষই মিলে যায়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এক শ্রেণীর লোকের উৎপাতে আমাদের জীবন অনেক সময় ওষ্ঠাগত হ'য়ে পড়ে। দুনিয়ায় চিরকালেই এঁরা উৎপাত করেছেন এবং এখনও করছেন — মুজাহিদ কেতাব পেয়ে এঁদের উৎসাহ ক্রমাগত বেড়ে চলছে। এঁদের ধারণা এই যে তাঁরা যেমন এবাদত হিসেবে জেহাদ করেন, করবেন অথবা ক'রছেন মুসলিম সাহিত্যিকরাও ঠিক সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের দেখমতের জন্যে খালেস দিলে কলম ধরবেন, নাম অথবা টাকার পূজা লেখকেরা ক'রতে পারবেন না। আমাদের যদিইবা কিছু বক্তব্য থাকে তাঁদের ধমকে সব ডুবে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য এই ভাবেই চলছে। এখন তা হলে আসি। আদব আরজ।

—ইতি—হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানি

পুনশ্চ : আমার বই পড়ে যদি কারুর মনে রচনার সত্যাসত্য, মৌলিকত্ব অথবা অন্য কোনো রকম খটকা জাগে তাহলে অকারণে আমাকে প্রশ্ন ক'রে উত্যক্ত করবেন না। প্রশ্ন ক'রলেও আমি উত্তর দেব না। কারণ একটি সওয়ালের যওাব দিলেই হাজার সওয়াল উঠবে। বাহ্যত জনমত ও গণতন্ত্রকে বাচনিক শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হলেও উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমি মনে করি। এ শিক্ষা আমি পেয়েছি ধুরন্ধর মুর্শিদানের কাছে যাঁরা ইসলামের নাম নিয়ে নির্বিকার চিত্তে ইসলামের বরখেলাপ করে থাকেন। মসজিদে জনসেবার ময়দানে অথবা রাজনীতির আখড়ায় ইয়াজুজ মাজুজের বংশাবলীর মত এঁদের ক্রমবর্দ্ধমান শাগরিদ সংখ্যা দেখে আমি নিজেও তরক্কীর আশায় সজাগ হ'য়ে পড়েছি।

তবে যাঁরা আমার তারিফ করতে চান (আমীরানা জবানে যাকে মোসাহেবী বলা হয়) তাঁরা নিশ্চিত মনে আমার কাছে চিঠি লিখতে পারেন। শুধু মেহেরবানী ক'রে বেয়ারিং চিঠি পাঠাবেন।

এই পাঁচটি গদ্যরচনা সম্পর্কে আমাদের আহৃত তথ্যাবলি এখানে পেশ করা হচ্ছে। ১– চিহ্নিত রচনাটি কবির মৃত্যুর পরে তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকে রচিত অথবা তারো আগে। লেখাটি প্রথমবার আবদুল মান্নান সৈয়দ–এর "ফররুখ আহমদ" (১৯৮৮) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। ২–চিহ্নিত রচনাটি ফারুক মাহমুদ–সম্পাদিত "ধোলাই কাব্যে"র (প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৩, দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৮৬) তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা হিশেবে লেখা স্থাপিত হয়েছে। স্মরণীয় : "ধোলাই কাব্যে"র অনেকগুলি কবিতা ফররুখ আহমদের লেখা — কিন্তু ঠিক কতোগুলি ও কোনগুলি তা এখনো অচিহ্নিত অবস্থায় রয়েছে। সেজন্য আমরা এই গ্রন্থের কবিতাগুলি এখনো "ফররুখ আহমদ রচনাবলী"র অন্তর্ভূত করিনি। "ধোলাই কাবে"র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে সম্পাদক ফারুক মাহমুদের উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয় :

ইসলামী খিলাফতের সামাজিক সাম্যে শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল যে জনসাধারণ বাটপাড় নেতাদের সীমাহীন বঞ্চনার শিকার হওয়ায় তাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে

www.pathagar.com

ফেলে সর্বগ্রাসী হতাশার করাল কালো ছায়া। ঠিক তখনই, নব্য সুবিধাবাদী আরেকটি মুসলিম লীগের কতিপয় ব্যর্থতা ও অপকীর্তিকে ধরার মতলবে মেতে ওঠে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের বিচিত্র অবস্থানে স্থান করে নেয়া এসব ব্যক্তিদের ব্যবহারিক জীবনের বৈপরীত্য ও অসংগতি কবিতার রচনা ও প্রকাশ। ১৯৪৯ সালেই কবি ফররুখ আহমদের লেখনীতে তার সূত্রপাত। সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠার সৌভাগ্যের অধিকারী আমিও সে কার্যক্রমে শরীক হই। কিন্তু জালিমশাহীর সেই দুরন্ত দাপটের যুগে তাঁর বা আমার কারো লেখাই স্বনামে কোথাও প্রকাশ পায়নি — সরকারবিরোধী সাপ্তাহিক ও সাময়িকী পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে এলোপাথাড়ি ভাবে। সে-সব লেখার মধ্যে থেকে বাছাই করা কবিতা কিছু গ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়। "ধোলাই কাব্য" গ্রন্থে জানুয়ারি ১৯৬৩-তে। "ধোলাই কাব্যে"র অর্ধেক লেখাই ফররুখ ভাইয়ের। বাকিগুলো আমার।

২-চিহ্নিত লেখাটি পত্রকর্তিকা। সম্ভবত ষাটের দশকে কোনো দৈনিক পত্রিকার চিঠিপত্র কলমে প্রকাশিত হয়েছিলো। ৩-সংখ্যক লেখাটি একটা 'সম্পাদকীয়' নিবন্ধ, কলকাতা থেকে প্রকাশিতব্য 'কাফেলা' পত্রিকার জন্যে লিখিত হয়েছিলো, 'কাফেলা' পত্রিকায় ফররুখ আহমদের যোগদান করার কথা ছিলো। ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে ফররুখ আহমদ যশোর থেকে প্রাবন্ধিক আবদুল হককে এক পত্রে লিখেছিলেন :

> আপনার ৮.৯.৪৭ তারিখের লেখা চিঠি বারো তারিখ হাতে এল। কাফেলার পরিচালকবর্গকে আমি যে চিঠি লিখিছিলাম (যা আপনি পৌঁছে দিয়েছেন) তাতে সেপ্টেম্বরের আগে কাফেলার ভার গ্রহণ করতে আমি অসম্মতি জানিয়েছিলাম। ... অথচ ব্যাপারটা বহুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে যে আমি নতুন পত্রিকা সম্পাদনা করছি। সুদূর পল্লীতেও বর্তমানে পত্রিকার যে প্রকার চাহিদা দেখা দিচ্ছে তা আনন্দদায়ক। সুতরাং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য নতুনভাবে উৎসাহ বোধ করছি। আপনি অনুগ্রহ করে 'কাফেলা' অফিসে গিয়ে তাদের মনোভাব অবগত হতে পারেন।
>
> ['ফররুখ আহমদ : কালের শিকার', আবদুল হক। 'সওগাত', মাঘ ১৩৮১]

৫-সংখ্যক রচনাটি ফররুখ আহমদের কোনো ব্যঙ্গকাব্যের ভূমিকা হিশেবে লিখিত বলে মনে হয়। ৪ ও ৫-সংখ্যক রচনাদুটি কবির পাণ্ডুলিপির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিলো। এগুলো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো 'শিল্পতরু' পত্রিকার অক্টোবর ১৯৮৮ সংখ্যায়।

৭

"ফররুখ আহমদ রচনাবলী"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এতাবৎকাল-প্রকাশিত সমস্ত প্রধান গ্রন্থ — শিশুসাহিত্য ও পাঠ্যবইগুলি বাদে — গ্রন্থনার কাজ সম্পন্ন হলো। সেই সঙ্গে অগ্রন্থিত গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদিও সংকলিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা আশা করছি, তৃতীয় খণ্ডে কবির পত্রপত্রিকা ও সংকলনসমূহে ছড়িয়ে-থাকা কবিতা, নাটক, গদ্যরচনা, অনুবাদ, গান ইত্যাদি সংকলিত হবে। প্রথম খণ্ডে "অনুস্বার" ও দ্বিতীয় খণ্ডে "হাল্কা লেখা" নামে কবি-পরিকল্পিত দুটি সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আমরা প্রকাশ করেছি। অনুরূপ কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলে তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভূত হবে। তৃতীয় খণ্ডে কবির বিস্তারিত জীবনী ও বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত হবে। ফররুখ আহমদের জীবৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যাকে অতিক্রম করে গেছে তাঁর মৃত্যু-পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ। কিন্তু কবি যা লেখেননি, তেমন একটা শব্দও আমরা গ্রন্থভুক্ত করিনি। তবে মুদ্রণবিভ্রাট রয়েই গেছে। যেমন, সুবিন্যাসও সম্ভব হয়নি। এই গ্রন্থমালা যদি কখনো দ্বিতীয় সংস্করণের মুখ দ্যাখে, তাহলে পুনর্বিন্যস্ত করা যাবে আরো পরিচ্ছন্নভাবে। ফররুখ আহমদের রচনা এতো বিপুল যে প্রথমবারের একত্রগ্রন্থনা নিশ্ছিদ্র করে তোলা কঠিন। চতুর্থ খণ্ডে কবির সমস্ত শিশুকিশোর-সাহিত্য গ্রথিত হবে।

এই খণ্ড প্রকাশে অনেকের প্রত্যক্ষ সহায়তা পেয়েছি। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর মনসুর মুসা খণ্ডটি যাতে দ্রুত প্রকাশিত হয় তার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন। সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব সেলিনা হোসেনের তাগিদও আমার আলস্য ঘুচিয়েছে। এই উপবিভাগের অফিসার জনাব মোবারক হোসেন সারাক্ষণ সঙ্গ দান করেছেন। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক জনাব ওবায়দুল ইসলাম তাঁর সরস সক্রিয় সহযোগিতায় আমাকে তৎপর রেখেছেন। এই প্রেসের উৎপাদন অফিসার জনাব আফজল হোসেনের চিরকালের সাহিত্য ও সাহিত্যিকপ্রেমের প্রমাণ পেলাম আরেকবার। কবিপুত্র আহমদ আখতারের সুপরামর্শ এবারও কাজে লেগেছে। আমি এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

"ফররুখ আহমদ রচনাবলী"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশমুহূর্তে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

৫১ গ্রীন রোড, ঢাকা ১২০৫

আবদুল মান্নান সৈয়দ

www.pathagar.com

হে বন্য স্বপ্নেরা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যৌবসেনা

মরুর বাতাসে ঝোড়ো এলোচুল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিছে তার
আগমনী পদ–ধ্বনি চটুল
প্রিয়–বাঞ্ছিত অত্যাচার !

দূর দিগন্ত মরীচিকা ছায়া দোলে
বালু সৈকতে বিহঙ্গ নির্ভয়
শিকারী পাখীর আঁখিতেও বিস্ময়
উড়িতে পারে না, আকাশের পথ ভোলে।

তরল শোণিতে তপ্ত প্রদাহ জ্বলে
মদির ফেনায় ধমনীতে উচ্ছলে
শিরায় শিরায় উষ্ণ সংক্রামক
রক্তেই তার লোভ সে মারাত্মক।

কামনার বিষ লাল তার চোখে মাখা
ক্রূর দৃষ্টির হাজার শিখায় বাঁধে
তৃপ্ত নহে সে, সোনালি ভোগলিপ্সাতে
আজীবন তাই দেহ মন তার কাঁদে।

পায়ের তলায় মরুভূমি হ'ল লীন,
বালু সমুদ্র উদ্দাম অস্থির
নিশ্বাস ফেলে চ'লেছে দীর্ঘ দিন
মরু সাগরের অশান্তি ওঠে জাগি
রুক্ষ আঁখিতে সহসা ঘনায় নীর।

হে বিজয়ী বীর ! অধীর চিত্তে জ্বলে
আমারো অমনি শিকারীর মত নেশা,
শুনি যেন কোন চতুষ্পদের হ্রেষা
বল্লমখানি আঁকড়িতে চাই বলে !
আমারে কি দেবে দীক্ষা তোমার মন্ত্রণায়
যাযাবর বেদুইন !
যাত্রা করিব দিগন্ত ধরি পথ সন্ধান–হীন
ভাঙিব গোধূলি–তন্দ্রা ধরার মরু ধুলায়।

তবে তুমি শোনো—আমি সেই অতীতের
পশুর শোণিত শিরায় শিরায় বহি

www.pathagar.com

উদ্ধত মূক বুকের বেদনা সহি
আবার জাগিব এই মোর প্রার্থনা।

যে বন-ভুজগ ক্রমে হ'য়ে তীক্ষ্ণধী
অনায়াসে পার হ'য়ে গেল গিরি নদী,
বহুদিন পরে বৃদ্ধ সে অজগর
পশ্চাতে শুনি আহ্বান মৃদুতর
ফিরে যেতে চায় আদিম প্রাণের টানে।
রক্তে আমার পথ চলিবার নেশা
পথ খুঁজি তাই অন্ধের সন্ধানে॥

কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি

কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি। ডিপোতলে এঞ্জিন বিকল—
সুদীর্ঘ বিশ্রান্ত শ্বাস ফেলে জাগে ফাটা বয়লার,
—অবরুদ্ধ গতিবেগ। তারপর আসে মিস্ত্রিদল
গলানো ইস্পাত আনে, দৃঢ় অস্ত্র হানে বারবার।

জ্বলন্ত অগ্নির তাপে এইসব যন্ত্র জানোয়ার
দিন রাত্রি ঘোরেফেরে সুদুর্গম দেশে, সমতলে
সমান্তর, রেলে রেলে, সেতুপথ পার হয়ে আর
অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে দার্জিলিঙে আসামে জঙ্গলে।

আহত সন্ধ্যায় তারা অবশেষে কাঁচড়াপাড়াতে।
দূরে নাগরিক আশা জ্বলে বাল্‌বে লাল-নীল-পীত;
উজ্জীবিত কামনার অগ্নিমোহ—অশান্ত ক্ষুধাতে;
কাঁচড়াপাড়ার কলে মিস্ত্রিদের নারীর সঙ্গীত।

(হাতুড়িও লক্ষ্যভ্রষ্ট) ম্লান চাঁদ কৃষ্ণপক্ষ রাতে
কাঁচড়াপাড়ায় জাগে নারী আর স্বপ্নের ইঙ্গিত॥

শেষ মুহূর্ত

এ মুহূর্ত দীর্ঘ হোক, জনতার প্রমত্ত কল্লোল
দোলা দিক তৃপ্তিহীন অনির্বাণ কামনার মুখে
নগ্ন মুমূর্ষুর বুকে শেষবার দিক শেষ দোল,
দীর্ঘ হোক এ মুহূর্ত। পথ প্রান্তে পাথরের বুকে
(শিলীভূত মূর্তি বুঝি) সাড়া জাগে নাই কোনদিন

www.pathagar.com

জাগে নাই জনতার মত্ততায় সর্বগ্রাসী ঝড়
মুহূর্ত বিজয়ী সেই পাথরের মূর্তি স্পন্দহীন
কান পেতে শোনে নাই জীবনের অতৃপ্ত মর্মর।

আমি শুনিয়াছি গান, ভুলের মুহূর্তে কতবার
উঠেছি চঞ্চল হ'য়ে, ব্যবধান দীর্ঘ সময়ের
সে গান নিয়েছে মুছি। তবু মুখ তোলো শেষবার
সব কথা ব'লে যাবো, দেখে যাব সব শেষ এর
আমি তো পাথর নই—পাথরের মূর্তি নির্বিকার—
তাইতো এখনো আমি স্বপ্ন দেখি শেষ মুহূর্তের॥

নাটকীয়

সুদীর্ঘ দিন রাত্রির মাঝে গোধূলির অবসর
তবু তো স্বপ্ন এলো।
হালকা হাসির বুকে পুঞ্জিত মন্দার–মেঘভার
তারি মাঝখানে অবসাদ এল জানি না তো কতবার,
শ্রান্তি রশ্মি মেলো
হায় পূর্ণিমা পাণ্ডুর রাতে প্রথম বিরহী চাঁদ
অমাবস্যার নিরাশ আঁধারে খোঁজে তারে উন্মাদ।

২
কেটে গেছে কবে ভরা জোয়ারের প্রচুর প্রগল্‌ভতা
আজ রাতে যবে শুধাইনু, তুমি কহ নাই কোন কথা ;
পরিহাস নয় শুধু মনে করো মিছে অভিনয় ভার
আজ রাত তাই গভীর কৃষ্ণ কঠোর নীরবতার।

৩
কৃষ্ণচূড়ার ফুল ধরেছিল একদিন তুমি জানো
সবুজ প্লাবনে অগ্নিশিখার দোলা
সেদিন আমরা কাছাকাছি থেকে কতবার পথ ভোলা
ভরা মুকুলের দিনে ঝরে যেতে দেখে বিস্ময় মানো।

৪
কাল রাত্রির অজানা লগ্নে প্রহরী তারকা এসে
যে কথা শুনেছে আকাশের বুক ঘেঁষে
চতুর্দশীর পূর্ণতা পেয়ে অনাগত পূর্ণিমা
সে হাসি ছড়াল আমার ললাটে অকুণ্ঠ ভালবেসে ;
আকাশ ! তোমার প্রহরী তারকা–রশ্মি সে কোথা জানে
যে চতুর্দশী অস্ত গিয়াছে আলোকের ব্যবধানে ?

www.pathagar.com

৫
স্বপ্ন জীবন মেঘের অন্তরালে,
লক্ষ–শিখায় অগ্নি ছড়ানো মেঘ–বিমুক্ত দিন
যে স্বপ্ন ছিল গৃহের প্রদীপ ক্ষণ অবকাশ কালে
লক্ষ–শিখার অগ্নি–শিখায় সে স্বপন আজ লীন।

৬
পদতলে মোর বাষ্পাভরণ মৃত্তিকা হল কবে
দেখিলাম কত মৌসুমী সঞ্চয়,
ফুল ফসলের পথিক যাত্রী চলে গেল একে একে
দেখিলাম সব আশা আজো শেষ নয়।
সরল শাখায় দুরতিক্রমণীয়
পুষ্পিত মোর আনন্দ রমণীয়
কৃষ্ণচূড়ার শিখায় আমার ব্যর্থ রক্ত–লোভ।
তবু সে তো চায় অনাগত দিন, রাত্রি বিস্মরণ
হালকা হাসির মেঘ কেটে যাবে—একদিন যারা প্রিয়
আজিকে তাদের কাছে নাহি পেয়ে ক্ষুব্ধও নহে মন।

ক্লান্তি জরার অবকাশ কালে মুহূর্তে দিলে দেখা
সমাকর্ষণ রয়ে গেল অক্ষয়
সুদীর্ঘ দিন–রাত্রির মাঝে গোধূলির অবসর
আতপ্ত মোর চুম্বন আজো প্রিয়তম শেষ নয়।

সমস্যা

এখন শহর ঘুমায়েছে, রাত শেষ
রাত শেষ নয় এখন অনেক রাত
(পাণ্ডুতা দূরে?) ম্লান বিদ্যুৎ আলো
কুয়াশায় মেঘে প্রভাতের ভুল হয়,
জীবনে এখন চূড়ান্ত পরাজয়;
কারখানা দৃঢ় পেশীও শিথিল ঘুমালো।

আজ রাতে ঘুম আসেনি তোমার শুধু?
বেকার জীবন (বেকার তারার মত)।
আলোক ছড়ায়; গ্যাসবাতি পথে পথে
আলো ছড়ায়েও মূল্য পেল না ওরা
প্রাণহীন ওরা পুতুলের মত তাই
বেকার জীবনে প্রাণহীনতার কোন দাম মেলে নাই।
আলো ছড়ায়েছি আঁধারের বুকে অলক্ষ্য সুগোপন
সে গোপনতার পিছে ফেলে ভুল সন্ধান করা মন।

www.pathagar.com

তারপর? শেষে রাত শেষ হবে—যখন কুয়াশা নাই
বেকার মনের শ্রান্তি তখন—বেকার দেহের তরে
বৃথা চেষ্টার পথ খুঁজে মরে, ফুটপাথ হাতড়াই
তখনো বেকার মন অচেতন কালো রাত্রির ডরে।

একদিন হবে দিনের বেকার সমস্যা সমাধান
দেহের সকল প্রয়োজন মিটে পথ খোলা সন্ধ্যায়
তখন মনের বেকার ক্ষুধার রাত্রির হাহাকার
আর শুধু ঝড় তারকা হারানো নোঙ্গর ছেঁড়া গান
কক্ষচ্যুত উল্কা পেল না অলক্ষ্য সমাধান॥

ত্রয়ী

লুব্ধ

চ'লেছি। চলার পথে দীন লোভে চেয়েছি বিশ্রাম :
পউষের শীত রাত পৃথিবীতে আকাশে তুহিন,
বরফের হিমস্পর্শ—তারি মাঝে চাহিয়াছি দিন,
চেয়েছি প্রাণের উষ্ণ নিবিড় সান্নিধ্য অবিরাম
দুঃসহ রাত্রির বোঝা তার মাঝে একটু আরাম !
রাত্রির তিমিরারণ্যে সুপুষ্পিত তারার আলোক
চেয়েছি আঁধার কেটে নীহারিকা স্বপ্নময় হোক
পথশ্রান্ত চাহিয়াছি—দীনতায় ম্লান ব্যর্থকাম।
কখনো ছেয়েছে মেঘ—অন্ধকারে কখনো বিদ্যুৎ।
চকিতে চেয়েছি ঊর্ধ্বে (এ আশ্বাস, ক্ষণিক আশার
বিদ্যুৎ ঢেকেছে মেঘে দুর্নিবার নিয়তি অদ্ভুত
ক্ষণিক বিদ্যুৎ আশা নিরাশায় মোছে বারবার।)
তার পর? আরো চলা, আরো চলা—শেষ লক্ষ্য জানি
দুঃসহ আশঙ্কা বুকে সমাপ্তির ব্যর্থতার গ্লানি।

শ্রান্ত

হায়রে মানুষ ! কভু পথের সন্ধান নাহি পেলে
চ'লেছো তো কতকাল চলিবার নাহি হ'ল শেষ
তবুও বেদনা-শ্রান্ত বেলাশেষে ম্লান আঁখি মেলে
ব'লেছ—আমরা যাত্রী আমাদের পথ নিরুদ্দেশ।
দিগন্তে হারায় পথ স্বপ্ন-শেষ ছায়া দিকে দিকে
তোমার মুহূর্ত ভিক্ষা, তারে বাধা দেয় মহাকাল !
সহসা পেয়েই ভয় কাঁদিয়া চেয়েই চারিদিকে :
অশ্রুত মলিন নয় বুকে তার জন্মে না শৈবাল !

www.pathagar.com

অশ্রুর কখন জন্ম? মানুষের জন্মদিন জানি।
পার হ'য়ে আসিয়াছি শতাব্দীর কত মৃত নদী—
ক্রমে পথে বোঝা ভারী। সেই ভারী বোঝা নিত্য টানি
চলেছি সন্ধ্যার পথে যেতে হবে তিমির অবধি।
আকাশে উঠিবে তারা, আমাদের ললাট-সন্ধানী
জাগিবে সম্মুখে আরো অনাগত শতাব্দীর নদী।

বিদূষক

তুমি কি পুতুল? তুমি অতি সাবধানী বিদূষক।
ব্যঙ্গ করো জীবনের প্রচ্ছন্ন বেদনা গুপ্ত করি,
যে ব্যথা গুমরি মরে, আঘাত হানিতে তারে সখ
মৃতের শ্মশান 'পরে জাগো তুমি শবের প্রহরী।
জানি তুমি হাসো কাঁদো। সেই হাসি অশ্রুর আশ্রয়ে
জানো না তোমার মন নিরন্তর কি ব্যথায় দহে,
প্রতিদিন হাসো কাঁদো, দোলো আশা-নিরাশা সংশয়ে
মধু মিলনের রাতে ভীত হও সুদূর বিরহে!

তবু তুমি বলো নিত্য : দীন রজনীর পাত্র হ'তে
পান ক'রে যাব সূর্য তারকার স্বপ্ন সমুজ্জ্বল
নিশীথে প্রিয়ার ওষ্ঠ, শ্যাম ধরণীর পুষ্পদল—
যা কিছু দিয়েছে দেখা, দেয় নাই অস্পষ্ট আলোতে
সব নেব। নাহি পাও। বঞ্চনা করিছে প্রবঞ্চক
তাই বৃথা হাসো কাঁদো ব্যর্থ ভ্রান্ত বিদূষক।

সমাপ্তি

এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু প'ড়ে আছে শব।
গোধূলির অপূর্ণতা প্রভাতের কথা মনে আনে
এ গোধূলি শেষ কিনা এই কথা কেউ বলো জানে!
আজিকার এ গোধূলি ঊষার নির্মম পরাভব;
এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু প'ড়ে আছে শব।
আমরা তো শববাহী যাত্রীদল চ'লেছি অশেষ,
এ শবের জীবাণুতে পান করি বিষাক্ত নিমেষ
শুনে যাব বেলাশেষে পিপাসার তৃপ্তিহীন রব।

আমার আকাশ আজ মুছে যাক পৃথিবী মুছুক,
ঝ'রে যাক পুষ্পগন্ধ মৃতদল ফাল্গুন মনের
একদিন যে এসেছে, একদিন যে ভ'রেছে বুক

www.pathagar.com

আজ তার চিহ্ন নাই, মনে হয় বসন্ত বনের
শেষ চিহ্ন মুছে দিয়ে জাগে মৃত্যু ভয়াল উৎসব :
এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু প'ড়ে আছে শব॥

নির্বিষ

ভাঙা নীল-কুঠিবাড়ী, চারদিক তার
শেয়াকুল কণ্টকিত। সন্ধ্যায় সেখানে
সাপের পাহারা, সাপ ! সকলেই জানে
শঙ্খচূড়, পদ্মরাজ—ভিড় গোখুরার।
অনেক বছর আগে যে পাতাবাহার
ম'রে গেছে অবেলায় অতৃপ্ত তৃষ্ণাতে
সেখানে (সকলে বলে) শ্বাপদের সাথে
জোনাকি আলোয় ঘোরে মৃত আত্মা কার।

একদিন সে কুঠির ভেঙে পড়া ভিতে
শুনিলাম একবার দোয়েলের শিস,
মৃদুস্বর, আর্তনাদ—যেন প্রতি ইটে,
বাঁকা চাঁদ দিকপ্রান্তে সন্ধ্যার আশিস।
কে যেন বলিল মৃদু : হ'য়েছি নির্বিষ
মৃত গোখুরার সাথে মিশেছি মাটিতে॥

প্রতীক্ষা

কোথায় অনেক দূরে নামিয়াছে বৃষ্টির কোমল
সজল সহানুভূতি—কোথায় জ'মেছে যেন মেঘ
দূর বহুদূর হ'তে বাতাসের সাথে সেই জল
স্বপন আশ্বাস আনে। কবে তুমি দেখা দেবে মেঘ?
আমার আতপ্ত বুকে রাত্রিভরা তারার ইঙ্গিত,
বন্ধ্যা ধরণীর বুকে আজ শুধু মেঘের উদ্বেগ
চাতকের ব্যগ্র ওষ্ঠে আজ শুধু তৃষ্ণার সঙ্গীত
তৃষ্ণার্ত অন্তর কাঁদে : কবে তুমি দেখা দেবে মেঘ?

কবে তুমি দেখা দেবে? নিবিড় নীলের পরিহাস
কবে ঢেকে দেবে তুমি শ্যামলিম সজল ছায়ায়
অশ্রুহীন তারকার বুকে দেবে মুক্তার আশ্বাস?
স্বাতী নক্ষত্রের বারি খুঁজি ঊর্ধ্বমুখী পিপাসায়।
আকাশ ঢাকিবে মুখ, তুমি দাও সজল আবেগ।
আজ প্রতীক্ষায় আছি। কবে তুমি দেখা দেবে মেঘ?

www.pathagar.com

মধুমতীর তীরে

আকাশের মাঠ ঘিরে ঘিরে ঘন সূর্যাস্তের নলবন
তারি মাঝে ডুব দিয়ে পাখী চাঁদ দেখে আলোর স্বপন,
দিনের কুশ্রীতা ঝেড়ে ফেলে ওড়ে কোন শুভ্র রাজহাঁস
জ্যোছনা ভেজানো তনু তার নীচে ফেলে মাঠ, মরা ঘাস
উড়ে চলে আকাশের ধারে অন্তহীন নীলের কিনারে।

নলবনে জ্যোছনার বাঁশী ছড়ায় সুরের আস্তরণ
ঝিম হয়ে আসে সেই সুরে সকল আকাশ, নদী বন !
স্বচ্ছ নীর নদীর আরশি, মাটি ফেলে গভীর প্রশ্বাস
তারাভরা ছবি বুকে নিয়ে নদী হ'ল দ্বিতীয় আকাশ ;
চাঁদ সেথা ডুবে ডুবে চলে বহুদূরে সমুদ্র অতলে।
জনতার কোলাহল নাই প্রশান্তির স্বপ্ন মধুমতী
দুই পাশে ধানক্ষেত রেখে অবিশ্রান্ত চলে সেই নদী
সূর্যাস্তের তোরণে যেখানে জ্বলে সন্ধ্যাতারকার টিপ
রাত্রির দুর্গম পথে পথে মহাকাশ জ্বালালো প্রদীপ
কর্কশ দিনের দাঁড়কাক যেথা এসে হল স্তব্ধ বাক্।

এখন এ নলবন শুধু রাত্রিচর পাখীদের পাড়া।
নিঃশব্দের সুবিপুল নীড়ে নেমে এল চাঁদের ইশারা,
স্তব্ধ নীল পটভূমিকায় রিক্ত সাকী সংগীতমুখর
সেই শুধু করিছে উতলা ব্যথা ক্ষুব্ধ ধরণীর ঘর—;
বনতলে শূন্য করি বুক ডেকে ডেকে ফিরিছে ডাহুক।

তারাফুল ফোটানো সে কোন নলবনে গভীর মেঘের
ছায়াম্লান মাটির বাঁশরী সুর ভেসে চলে ডাহুকের,
সে বাঁশীর ঘন সুর-জালে মুগ্ধ মন, উতলা আকাশ
ভঙ্গুর মাটির দেহলিতে ক্রমাগত ফেলিছে নিশ্বাস ;
নলবনে জমানো অশ্রুর ডাহুকের সুগভীর সুর।

সেই সুরে এ মাটি আকাশ কোথা দূরে চলে ভেসে ভেসে
পদতলে মেলে না ঠিকানা চলে কোন সুদুর্গম দেশে
সুদূরে, নিকটে, ঘনবনে—বন্ধুর, দুর্গম পথে ভয়ে
নিজেরে অচেনা ভাবি মনে জেগে ওঠে পরম বিস্ময়ে
পড়ে থাকে প্রান্তর আকাশ পাখা মেলে ওড়ে শাদা হাঁস।

দীর্ঘ তার মৃণালের মত কণ্ঠ বেয়ে স্বর ফেটে পড়ে
পাড়ি দিয়ে বহু জনপদ চলে কোন অচেনা গহ্বরে।
অপরিচয়ের নীড় পানে মেলেছে সে আলোকিত ডানা
ডাহুকের দূরচারী সুর অরণ্যের পায় না ঠিকানা ;
ম্লান সন্ধ্যা ; ছায়া পথ ধরে চাঁদ নামে রাত্রির সাগরে।

www.pathagar.com

তুমি যদি আজ কাছে আসো এই রাত্রে নাহি যাবে চেনা
গোধূলির পূর্ণ পরিচিতি ছায়া–ম্লান হল সে অচেনা,
আঁধারের এই যবনিকা পাখীদের করেছে আড়াল,
হয়তো সে মুহূর্তের নদী কিংবা সে দিগন্তহীন কাল
সমুদ্র ফিরিছে কাছে কাছে বহিতেছে আমাদের মাঝে।

গভীর মেঘের নলবনে শুক্লা দ্বিতীয়ার সাদা পাখী
ডুব দিয়ে তিমির অতলে সে বিহঙ্গ ঘুমায় একাকী
পরিত্যক্ত দিনের পালক ভেসে যায় শর্বরীর বানে
অন্তহীন ছায়া–পথ ধরে ফিরিছে সে অশ্রান্ত সন্ধানে ;
এখন নিকটে যায় দেখা রাত্রির নিকষ তটরেখা।

তার কালো দীর্ঘ তরঙ্গের একটানা সুর ভেসে আসে,
সে অতল সমুদ্র গাহনে সারা মন সংকুচিত ত্রাসে,
জনতার মুখর সভায় খোঁজে ভীরু কথার আড়াল
অসংখ্য জোনাকি শিখা নিয়ে জ্বলে দূরে ছায়াচ্ছন্ন তাল
আর পাশে তমিস্রা প্রচ্ছায় রাত্রির তরঙ্গ বয়ে যায়॥

দোয়েলের শিস্

দুর্ভেদ্য তিমির ঘন রাত্রির তোরণ হ'তে ভেসে আসে দোয়েলের শিস্
সন্ধ্যার বালুতে জ্বলে দিবসের শেষ সূর্য বিচিত্র ভূষায়
অজ্ঞাত রাত্রির তীরে শোনা গেল শেষবার দোয়েলের শিস্
তীক্ষ্ণ সুর সুতীব্র সংগীত !
জানি এ তো বজ্র নয়
বজ্রেরও বিস্ময়
রাত্রি আর মৃত্যুর ইংগিত
দোয়েলের শিস্।

সাদা–কালো দুই রঙে আবদ্ধ তনুকা সুকোমল
সেই পাখি ! কণ্ঠে তার বয়ে নিয়ে আসে গীতিশতদল
গোধূলি–ভরানো সুর মুমূর্ষু সূর্যের রক্ত রাগে,
কণ্ঠের নির্ঝর খুলি শেষবার রাঙায়ে সে গেল চলি বিদায়ী পরাগে
সুকোমল সুরে।
এখন আকাশে তার ক্রমাগত কালো রাত্রি পড়ে ঝুরে ঝুরে
তিক্ত–তীব্র বিষ,
দিগন্তের তীর ছেড়ে আঁধারে চলেছে ভেসে দূর হ'তে দূরে
দোয়েলের শিস্॥

ঘুম পাড়ানোর সুরে এ তো শুধু ঘুম ভাঙানোর তিক্ত মাদকতা
এই সুরজালে শুধু ব'য়ে আনে বিপুল স্তব্ধতা

www.pathagar.com

দীর্ঘ নারিকেল তাল রৌদ্র দীপ্ত দিনের মিনারে
ভয়-স্তব্ধ শর্বরীর ধারে
বর্ণহীন তাল-স্তম্ভে, আকাশের গম্বুজে, খিলানে
রাত্রি তার কালো তীর হানে
তীর হানে দোয়েলের শিস্।
সে বিষাক্ত মৃত্যুতীরে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে রঙ দিগন্তের ধারে
আর্শির পারার মত জমা হয় এক কোণে স্মৃতির কিনারে
মৃত্যুর আশিস ;
দোয়েলের শিস্।।

শুনি দোয়েলের শিস্, সুতীব্র ঝাঁঝালো—
সবে নীড়ে ফেরে পাখী, নিভে যায় আলো,
জ্বলে ওঠে আলো,
ঘুমের সময় আসে, ঘুম ভাঙানোর
তীব্রতায় কেঁপে ওঠে দোয়েলের সুরের ঝাঁঝর।
মরা গাছে, ডালে ডালে
লঘুপাখা মেলিয়া সে বিদায়ের ক্রূর করতালে
জানায় ভাষণ
জানায় শাসন
নেশাতুর বিষ :
দোয়েলের শিস্।।

ঘুমের সময় হ'ল রুদ্ধদ্বার। পাখী
উজাড় করিয়া সুর বনপ্রান্তে ফিরিছে একাকী
শূন্য নীড়ে।
কোন নীড়ে?
যেখানে মৃত্যুর ছায়া ঢাকিয়াছে সে পাখীর সুর
প্রান্তরের শেষ সীমা যেথা হ'ল কাঁকর-বন্ধুর
রাত্রির পর্দায়
সব জ্বালা ঢেলে যেথা পড়ে আছে কল্পকালের কামনা নির্বিষ
সেখানে ঘুমের পাখি, আবছায়া হ'য়ে আসে
তন্দ্রাতুর দোয়েলের শিস্।।

রাত্রিচর

রাত্রিকে দ্বিখণ্ড করি তীক্ষ্ণ খরধার
দীর্ঘ বিলম্বিত এক পাখীর আওয়াজ
কর্কশ পাখার সঞ্চরণ। স্তব্ধতার
চাপা ছুরি ছিঁড়ে আনে নিকষ নিভাঁজ

www.pathagar.com

অরণ্যের বাহু থেকে সঙ্গীহীন ঝড়
নিবিড় রাত্রির স্রোতে শুনি হাহাকার,
জমানো আঁধারে স্তব্ধ রাত্রির মর্মর
স্তব্ধতা, পাখীর স্বর : শোনো শেষবার।

চেয়ে দেখো এইসব সঙ্গীহীন পাখী
গলানো আগুন মাটি সুঠাম সবল
দীর্ঘ রাত্রি বনে বনে ফিরেছে একাকী
পালকে লুকায়ে রেখে প্রচ্ছন্ন অনল
অনেক প্রগাঢ় সন্ধ্যা, আসন্ন বৈশাখী
অসংখ্য মাটির টাল, মাটি ঘোলাজল॥

ঝিল্লী

নিবিড় নিথর রাত্রি, স্তব্ধতায় যে কলভাষণ—
তুমি তারি দূতী, তুমি ভর দিয়ে নিশীথ-পাখায়
শোনালে হারানো গান। মর্মরিত পাতার স্বপন
ধূলিতলে অবিশ্রাম দূর হতে দূরে কেঁদে যায়।
রাত্রিচর নভযাত্রী নীরব সঞ্চারে মেলে ডানা,
কৃষ্ণা আকাশের পথে জমে আছে স্তব্ধতা গভীর।
কলভাষ থামাও তোমার। কিছু হয় নাই জানা
তোমার অপরিচয় : অন্ধকার দীর্ঘ শতাব্দীর।
হাজার সূর্যের আলো যে গুণ্ঠন পারেনি খসাতে—
তোমার সুরের লাস্য তার পায়ে চপল মঞ্জীর।
কলভাষ থামাও তোমার, আজ এই দীর্ঘ স্তব্ধ রাতে
চেনা পৃথিবীতে চলে—সন্ধান অচেনা ধরিত্রীর।
এখনো নূপুর বাজে ঝিল্লীকণ্ঠে, ফেরে সে বাসাতে
যেথা নীড় বাঁধা আছে নবারুণ আলোকরশ্মির।
সারারাত ঝিল্লীর নূপুর বাজে ঝিমঝিম
আকাশের গায়ে শুধু ঘুম
নীরব নিঝুম।

ধান-কাটা মাঠে
পড়ে আছে শস্যগন্ধী খড়,
এক মনে গণিছে প্রহর তারা
ধরণীর ঘুমের পাড়ায়
নীরব পাহারা।

www.pathagar.com

ঝল্লি ডাকে অবিশ্রাম :
তুমি জাগো, তুমি স্তব্ধ হও
তুমি শুধু কথা পুঞ্জ শুধু শব্দ নও,
তুমি তারা, তুমি ঝিল্লীস্বর
শস্য সম্ভাবনা নিয়ে তোমার রজনী কাটে
ধূসর প্রান্তর।
বিদ্যুৎসংকুল পথে তুমি স্বাতীতারা—
প্রবল বাধার মুখে আবর্তমুখর গতিধারা
—তীর–তীব্র বেগ
জীবন মৃত্যুর দোলে সুতীব্র আবেগ।
তোমার চলার তালে প্রলয় সৃষ্টির বাজে সুর
ঝিম্‌ঝিম্ ঝিম্‌ঝিম্ কলোল্লাসে বাজিছে নূপুর
থামায়ে সকল কোলাহল।
তোমার ঘুমের কুঁড়ি পাপড়ি মেলিছে অবিরল
জীবন্ত উল্লাস রসে
পরম আশ্বাসে অচঞ্চল,
তোমার পথের ধারে অশ্রান্ত ডাকিছে ঝিল্লীদল॥

পথিক

হাজার জনতা যেথা পার হ'ল —চির যাত্রীদল
লক্ষ যুগ যুগান্তর ফোটায়েছে সেখানে কমল
কঙ্কালের শীর্ণ বুকে। বাদুড় মেলিয়া যায় পাখা।
সেখানে রজনী অন্ধ গাঢ়–কৃষ্ণ তমসায় ঢাকা।
শুধু অন্ধকারে ক্লিন্ন দেখা যায় সে পথের ধূলি
যে পথে চলিয়া গেছে মানুষের ছিন্ন দলগুলি॥

সে পথের ধূলি তুলে শুধানু তাদের ইতিহাস :
আনন্দ বেদনা আর ঘরভাঙা, ঘরের আশ্বাস;
সে পথের ধূলি নিয়ে অন্তরের বাতায়ন খুলি
ধূলিস্তূপ মাঝে আমি দেখিলাম হয়ে গেছি ধূলি !
দেখিলাম মরুপ্রান্তে চেঙ্গিসের করোটি–মিনার
আকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে পরশিছে ধূলির কিনার,
দেখিলাম সমুদ্রের যাযাবর মিশেছে ধুলায়
সহস্র রজনী–কথা বাগদাদের ধূলি–জনতায়॥

মানুষের মনের গহনে দেখিলাম শুধু অশ্রুজল
মিলনে, বিরহে চির–শ্রাবণের ধারা অবিরল
ঝরিতেছে অন্তহীন কাল, নাই তার প্রদোষ সকাল;
যত ভুলে যাওয়া গান উঠায়েছে বেদনা আড়াল॥

www.pathagar.com

চরম ব্যথার দিন হে পথিক ! যদি ভুলে থাকো
স্বপ্নের রঙিন ক্ষণ কোনদিন তুমি ভুলো না কো।
ব্যথা-বারিধির বুকে সেই স্বপ্ন সে আশার দীপ
শূন্যতার মরুরাত্রে ধরিবে সে পথের প্রদীপ ;
বধূ তব দীপশিখা পথ চাওয়া সোনার কমল
লক্ষ যুগ যুগান্তর যেথা প্রিয় মেলিয়াছে দল ॥

শাহেরজাদী

রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী !
পাতার আড়ালে জাফ্‌রানী রং ; গোলাবের ফোটাদল,
সেতার বাজিছে কণ্ঠে তোমার রসায়িত উচ্ছল,
কখনো চটুল পুলকে হাসিয়া বেদনায় কভু কাঁদি ;
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী ॥
সুর চঞ্চল তোমার আঙুল আমি শুধু বাঁধা তার,
তোমার আঘাতে আমার ব্যথাতে হ'য়ে আসে একাকার,
জোছনা-জোয়ারে চাঁদের প্লাবন, ঢেউ ওঠে সেতারার ;
চাঁদ হেসে যায় শুনিয়া তোমার কাহিনী এ লজ্জার ॥

তুমি কথা কও আরো চুপি চুপি স'রে এসো আরো কাছে,
তোমার তপ্ত নিশ্বাসে মোর শিরায় রক্ত নাচে,
লীলা-রসে ভরা কামতনু তব মুছি কলঙ্ক কালি
রঙ্গীন হ'ল রক্ত প্রেমের ফোটা গোলাবের ডালি।
কখনো এসেছো আলিঙ্গনের আড়ালে ও বাহু বাঁধি ?
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী ॥

ঘুমে ঢুলে পড়ে বাদশা হারুন দুই চোখে ভরা নিঁদ,
দজলার জলে পেতেছে আকাশ ঘুম-প্রাসাদের ভিত,
জলপরীদের শত লাস্যের চটুলতা হ'ল শেষ,
রাজ-প্রহরীর দুচোখে লেগেছে মোহন তন্দ্রাবেশ,
তুমি শুধু আসো আরো কাছে সরে ভেঙে দাও মোর ঘুম,—
শিহরিয়া ওঠে তব চুম্বনে সুপ্ত নিশি নিঝুম,
ধরা পড়ে ওই ঘন চুম্বনে ব্যাকুল শুক্লা রাতি ;
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী ॥

মম স্বপ্নের চির-রাণী তুমি, কে বলে তোমারে বাঁদী ?
তোমার কাহিনী আমার মর্মে অশেষ শাহেরজাদী।
তোমারে দেখেছি ঘুমভাঙা রাতে মোর উপাধান পাশে,
বহুদূর হ'তে যেন ও বুকের পুষ্প-সুরভি আসে ;

www.pathagar.com

জানি না সে কোন অচেনা বেনের তরুণী হাস্‌নাহেনা
চিরদিন মোর অচেনা থেকেও হয়েছে পরম চেনা ;
চেনা-অচেনার হাস্‌নাহেনার মালঞ্চে চির-সাথী
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী।।

যেখানে জীবন-মৃত্যু আলোর কালোর তীব্র ঝারি
সেখানে ছিটালে তোমার প্রেমের রক্তিম পিচকারী।
সাগর-বেলার বাঁকা দিগন্তে তোমার ভ্রূ-বিলাস,—
বাঁকা কটাক্ষ করেছে ক্ষণিক কালিমারে উপহাস,
বিপুল স্রোতের মোহনায় তুমি অঞ্চল দিলে পাতি
রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী।।

তুমি আছো তাই ভয় নাহি পাই। এ তীব্র স্রোতধার
মুছে নেবে যবে তখনো আমরা ফুটিব গুলে-আনার,
আমারি রুধিরে হবে প্রাণরস তুমি পাপড়ির লালী—
এক হ'য়ে যাব দু'জনে মিলিয়া পুষ্পের ভরা ডালি,
হব মিলনের প্রেম-উপহার, হব চুম্বন-তরী,
সেই রঙ্গীন শিখায় মিলন পার হবে বিভাবরী,
তিমির-সাগর হবে তার ভোর পুলকানন্দে মাতি;
রাত শেষ তাই কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী।।

সাড়া

টুকরো কাগজ উড়লো আকাশে পৃথিবীর জঞ্জাল,
এইটুকু লেখা, তোমার খবর পাইনি অনেক কাল।
চেয়ে দেখি লাখো টুকরো ওড়ে
দিন রাত্রির শুকনো ঝড়ে।
রস-বঞ্চিত তনু-মনে তবু বদলায় দেখি চাল,
সংবাদ চাই, 'তোমার খবর পাইনি অনেক কাল।'
সংবাদ আমি পাই নাই আজো, তোমরাও পাও নাই,
আমিও জানতে চাইনি খবর তোমরাও চাও নাই,
এরি মাঝে কবে ভিত্তি টুটি,
সোনার ধরণী পৃথ্বী-টুটি,
আমাদের মাঝে গড়েছি কখন আকাশের ব্যবধান
পাখা-ভেঙে-পড়া দূরের যাত্রী ভুলেছি চলার গান।
সেই দিন থেকে পাই না খবর। কোথায় না তুমি থাকো ?
উত্তর দিও, উত্তর দিও এ মিনতি মোর রাখো।
আঁধারে হারায়ে তিমির-পথ
নিঃস্ব রাতের ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

বঞ্চিত তনু–মনে শুধু জাগে রুক্ষ কঠিন হাড়,
শ্রাবণ–সঘন–বাদল–ঝরানো রজনী ব্যথা–নিসাড়।
ঝরে বনান্তে অবিরাম ধারা অশ্রুর মত মেঘ,
আমার অশ্রুহীন অন্তরে শুধুই বজ্র বেগ,
শূন্যের মাঝে ঝাপটে পাখ
ভুলেছি অশ্রু, ভুলেছি ডাক,
তিক্ত শোণিতে জ্বলে স্ফুলিঙ্গ অশ্রু বেদনাহীন,
মৃত্যুর মত নিরাশ পৃথিবী, বিষাক্ত ক্রূর দিন।
তুমি যদি শুধু উত্তর দাও, পাই যদি শুধু সাড়া,
বইবে আমার শিরায় আবার সহস্র প্রাণধারা,
রবে না এ তনু–মন শ্রীহীন,
জাগবে স্বপ্ন–স্বর্ণ দিন,
হালকা পাখায় তুরীয়ানন্দ ব্যাকুল দুচোখে নীর,
পুরানো ভিটায় বাঁধবো আমরা আবার নতুন নীড়॥

বিদায়

শুনেছিলাম স্বপ্নঘোরে তোমার নাম,
ছুঁয়েছিলাম কেশররাশি অলকদাম।
হাজার রাতের কথায় তোমার জেগেছে ভয়,
তোমায় হারাই! চিত্ত আমার শঙ্কাময়,
পুরানো চাঁদ দেখি দ্বারে চির–নূতন,
চম্পা হ'য়ে ফোটে আমার বিস্মরণ,
প্রাচীন কথায় গাঁথা তোমার নতুন মালা,
চির–নতুন পূর্ণিমা ওই চাঁদের থালা,
তোমার প্রেমের জাফরানে আজ সব রঙিন।
শাহেরজাদী, বিদায়! দেখ জাগছে দিন॥

নিষ্প্রদীপ

মানুষ খুঁজিয়া ফিরি জনতায় : মানুষ কই?
পথে প্রান্তরে এ মনে আমার নিষ্প্রদীপ,
জাগল না আর তিমির সাগরে আলোর দ্বীপ,
ব'য়ে মরি মৃত প্রবালের বোঝা হাড় অথই;
মানুষ কই?

তোমাকে তো আমি খুঁজেছি বন্ধু অনেকদিন,
চিনতে পারিনি কখনো তোমাকে পাশে থেকেও,

www.pathagar.com

প্রদীপ নেভানো যে রাত্রে আমি দৃষ্টিহীন—
নিষ্প্রদীপ সে ভোলালো তোমাকে পাশে রেখেও !
আমাকে খুঁজতে জানি তুমিও যে ভয়-ব্যাকুল !
শুধু কি আড়াল নিষ্প্রদীপের—তিমির ভুল ?

তা তো নয় জানি—জনতার ভিড়ে সঙ্গীহীন
এ চোখে, এ মনে আলো নিভে গেছে অনেকদিন
—অনেকদিন,
তাইতো তোমাকে ভুল হয় পেতে, পাও না তুমি,
জনতার মাঝে তাই দেখো কোন্ শ্বাপদ-ভূমি,
তোমাদেরো আমি পারি না চিন্‌তে পালাই ভয়ে ;—
একলা রই।
মানুষ কই ?

মানুষ কই ?
এ যে প্রেতপুরী প্রেত-জনতার কালো মিছিল,
তিমিরাবরণে নাই হেথা ফাঁক মুক্তি নীল,
সাঁড়াশির মত শীর্ণ হাতের প্রবল চাপে
শ্বাস রোধ করে দিতে চায় হায় সবল চাপে ;—
পাশে চেয়ে দেখি জনতার মাঝে সঙ্গীহীন
চির-পরিচয় ভুলে যাওয়া আজ এ দুর্দিন
কালো অথই।
মানুষ কই ?
মানুষ কই ?

পটভূমি

সাড়ে আটটার ট্রেন উগারিয়া গেল তার আহার্য রাতের :
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নিয়ে রাতজাগা মানুষের দল
পথের দু'ধার ঘেঁষে চলে যেন সরীসৃপ পাথর শীতল
আর চলে প্রাণহীন নাগরিক, নাগরিকাদের
উজ্জীবিত পাশবিকতার
নগ্নরূপ মৃত জনতার।

বিকট শব্দের মেঘ বিছায়েছে নগরীর আকাশে ধূসর
রঙচটা বিবর্ণ চাদর
ট্র্যাফিকের আর্তনাদে, ট্রামে, বাসে পথের পাথর
ম্লান হ'য়ে যায় যেন,

www.pathagar.com

এমন সময়
পাহাড়ী কিশোর কণ্ঠে শোনা গেল ছাতা-সারানোর
শ্যেন-তীব্র স্বর।
মৃত অরণ্যের বুকে যেন কোন উদ্দাম, বলিষ্ঠ দাঁড়কাক
ডেকে গেল কর্কশ প্রবল শেষ ডাক।
শব্দ ওঠে ছাতা-সারানোর
নির্জীব রাত্রির ম্লান-স্বপ্ন তন্দ্রাঘোর।

ছুটে গেল সে আরণ্য বলিষ্ঠ শব্দের তাপে তালে তালে,
লাল দীঘি তীরে তীরে অচেনা ঝাউয়ের ডালে ডালে
রক্ত-রাঙা বিরাট মহালে
চাতালের 'পর
তীক্ষ্ণ বল্লমের মত ছুটে যেয়ে লাগে সেই ছাতা-সারানোর
তীর-তীব্র স্বর।
ভেসে যায় চোখের পলকে
ফুটপাত, কারখানা, যন্ত্রপীড়া এই বদ্ধ ঘর—
শুনি যেন জীবন্ত উচ্ছল
প্রাণবন্ত জীবনের পাখার খবর,
নিবিড় আঙুরবন, বরফ-জমানো চূড়া, সুদৃঢ় পাথর।

বিদেশী সাইপ্রেস শাখে দৃঢ় পাহাড়ের ঘ্রাণ
দুর্গম পথের
অচেনা বন্ধুর জগতের,
সাথী তার পাথুরে বাদাম,
সেব নাশপাতি আর পেশী দৃঢ় হাত
তরুণীর কেশদাম, পাহাড়ের চূড়া-ঘেরা তারা-ভরা রাত।
সেখানে যে চাঁদ ওঠে
(কলুষিত বিকৃত দৃষ্টির
ব্যর্থতায় নহে অসুন্দর)
সূর্যের জাফরান নিয়ে যেখানে বাসায় ফেরে নীল কবুতর
পরিপূর্ণ নীড়ে,
অসংখ্য সেতারা জ্বলে ঘন নীলে, রাত্রিরে তিমিরে।
পাহাড়ের বিপুল স্তব্ধতা,
প্রাণবন্ত জীবনের চরম পূর্ণতা
আকাশের গাঢ় নীল চুঁয়ে পড়ে
আনারের ঘন রক্ত-পাপড়ির 'পরে,
তরুণীর রক্তিম কপোলে
নরম বুকের রঙ ক্ষণে ক্ষণে রাঙা ঢেউ তোলে।
নিস্তব্ধ প্রগাঢ় শান্তি,
মাঠ, ঘন বন,
বলিষ্ঠ সুঠাম তনুমন
বুলবুল, সুরের প্লাবন...

www.pathagar.com

জানি না সে কতদূরে পাহাড়ী বন্যায়, ঝড়ে ভাসিতেছে সাতরঙা কুচি
ভাঙা আনারের দানা অনর্গল ঝরে পড়ে হিমেল হাওয়ার সাথে যুঝি
স্তূপীকৃত জমে ওঠে গালিচার একপাশে পেস্তার রঙিন পাথর
আঙুরবনের হাওয়া, পাহাড় পথের হাওয়া বয়ে আনে চাঁদের খবর—

যান্ত্রিক চাপের নীচে সে স্বপ্ন ভাঙিয়া পড়ে জানি না কখন,
আখরোট বন ছেড়ে দুঃস্বপ্নের মত জেগে ফাইলের বন ;
এখানে সমস্ত দিন প্রবল বর্ষায় ভিজে পাহাড়ী কিশোর
শতাব্দীর ব্যর্থতায় রাজপথে ঘুরে ঘুরে ছাতা-সারানোর
তোলে তিক্ত সুর...

সামুদ্রিক

নীল যৌবনের দিন রুদ্ধ করি পাথর জমাট
দাঁড়ায়েছে শিলাশৃঙ্গ, ভিড় ক'রে চ'লেছে অন্ধেরা
পাহাড়ের সানুদেশে। অবলুপ্ত সামুদ্রিক ডেরা।
রাত্রির বিষণ্ন মেঘে বদ্ধ হ'ল সকল কপাট,
নর্দমার ভোজ্য তুলে ভরিছে বুভুক্ষু রাজ্যপাট
ভীরু যাত্রীদল—যেথা ধ্বংসমুখী জীবনের ভিত
এক পাশে নুয়ে প'ড়ে শোনে অস্ত চাঁদের সংগীত
রুধিরাক্ত বন্যাবেগে ভেসে যায় অথর্ব ললাট।

ঊষর মধ্যাহ্নে তার মরুভূর দীর্ঘ অবকাশ
ভরে মনসার ঝোপে, দীর্ঘ পথ কণ্টকবিক্ষত,
শিকারীর বর্শাবিদ্ধ ভুলেছে সে সকল বিশ্বাস
প'ড়ে আছে পথপ্রান্তে স্তূপীকৃত হতাশার মত,
ডেকে যায় সমুদ্রের লোনাজল, বিস্তীর্ণ আকাশ
প'ড়ে থাকে মাংসস্তূপ শিকারীর ফলকে আহত॥

তিমি

পুরাকথা শেষ হ'ল, নর্দমায় প্রাগৈতিহাসিক
প্রাণীরা বাড়ে না আর। ক্ষীয়মাণ কীটাণুর দল।
তিমিরা বিলুপ্ত আজ। যত হানি কঙ্কালে শাবল
বাহিরে আসে না সেই সমুদ্রের যাত্রীরা নির্ভীক।
শতকের নর্দমায় আজ তারা পঙ্কিল পথিক
মৃত্যুমুখী ক্রিমিদল জরাস্তব্ধ ধ্বংসের কিনারে
ব'য়ে চলে অফুরান মারী বিষ নির্বোধ বিকারে
যেখানে মৃত্যুর ছায়া কঙ্কালে আচ্ছন্ন দশদিক।

www.pathagar.com

তিমিরা বাড়ে না নর্দমায়। ক্লেদাক্ত পুরীষে যত
বেড়ে চলে খর্বকায় জীবাণুর মুমূর্ষু সন্ততি,
সংকীর্ণ মৃত্যুর মাঝে আবিলতা ক্লিন্ন তার গতি
ভুলেছে বিপুল স্রোতে ছুটেচলা তারকার মত,
সমুদ্রের বল্গা টেনে জীবনের দুর্দান্ত সারথি
যে গতি উদ্দাম নীলে রেখেছিল তা'রা অব্যাহত॥

পদ্মার ফাটল

পদ্মার পাড়ের মত ক্ষয়মাণ জনতার তীর
সামান্য অস্তিত্ব নিয়ে শঙ্কাতুর বুকে জেগে ছিল
সর্বহারা নিরাশায়। এল ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ বধির
(শাসন–সৃজিত সর্বনাশ), নিমেষে পুড়ায়ে দিল
আমরা ক্লীবের দল শুনিলাম নির্বিরোধ মনে।
সে ক্ষীণ অস্তিত্ব। পথে পথে ঘরে ঘরে হাহাকার
তখনো জ্বলিছে আলো, কামোন্মত্ত আনন্দ সেতার
সব আর্তস্বর পিষে ফিরিতেছে বাংলার গগনে।

দু'শো বছরের খেলা। ব'লে গেল হাড়ের মিছিল
দু'শো বছরের মারীরোগ। সম্পূর্ণ রাখিয়াছিল
অন্তঃসার শূন্য করি। দেরী ছিল চরম পঙ্কিল
আঘাতের। পদ্মার পাড়ের মত চূর্ণ ক'রে দিল
সে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু (শাসন–সৃজিত অপঘাত)
পদ্মার দু'তীরে শুধু গাঢ়তর হ'ল কৃষ্ণরাত॥

পদ্মার ভাঙন

তারপর বন্যা এল মৃত্যু–বেগে পদ্মার ফাটলে
জরাস্তব্ধ জীর্ণতটে জাগিল আকুল আর্তনাদ।
তীব্র সংগ্রামের বার্তা উঠে এল রুধিরাক্ত জলে
পদ্মার দু'তীর চূর্ণ করি দূরে চলিল নিষাদ।
দুঃস্থের দুর্বল বাধা মানিল না পদ্মা ও প্রকৃতি,
শোষণের পূর্ণ দেহ দেখা দিল পূর্ণ রূপ ধরি
সে কী আর্তনাদ, মৃত্যু, সংখ্যাহীন ক্ষুধিতের ভীতি
পদ্মার ভাঙনে এসে জমা হ'ল বুভুক্ষু শর্বরী :

ক্ষুধাশীর্ণ। জননীর সম্ভ্রম লুটালো ধূলিতলে,
শিশুর কান্নার বেগে শান্ত করি দিল মৃত্যু ঘুম।
নাগরিক আঘাতের বর্শা আর রুখিল না জলে
অগণন শবদেহে তুলিল সে মৃত্যুর মৌসুম।

www.pathagar.com

নদীতে প্রশান্তি এল, থেমে গেল বন্যার প্রকোপ।
থামিল না সেই বর্শা—শোষকের মেদস্ফীত লোভ॥

কালো দাগ

জরাগ্রস্ত এ মাটির ভিতরে বাহিরে কালো দাগ
যেন এক কালো মৃত্যু প্রত্যেক অসাড় অবয়বে।
সন্ধ্যার ঔজ্জ্বল্য মিছে। দিগন্তে হারালো রক্তরাগ
এখন তিমির প্রান্তে হাহাকার করি ওঠে সবে।
অসাড় গলিত কুষ্ঠে প্রাণহীন মৃতের মিছিলে
কুৎসিত কামনা আর পাশবিক লোভে ম্রিয়মাণ
ক্রমাগত কালো দাগ ছুড়ে ফেলে সমগ্র নিখিলে
জঘন্য পিশাচ মূর্তি তোলে আজ অস্তিমের গান।

রুদ্ধশ্বাসে নিশীথের বিষাক্ত প্রশ্বাস কালো দাগ
চুপিচুপি ঘোরেফেরে অন্তরীক্ষে পাহাড়ে ও জলে,
সূর্যের মিনার মুছে, গুড়ায়ে সূর্যের অনুরাগ
যেন আলেয়ার শিখা দিকভ্রান্ত করি একা চলে।
ঘনতর অন্ধকারে (কোথা পাব মুক্তির পরাগ?
মানুষের মৃত্যু হ'ল বিকৃত পশুর পদতলে)॥

প্রেক্ষণ

পুরানো সমাধিস্তম্ভ পার হ'য়ে কারখানা, প্রাচীন দেয়াল।
বিশীর্ণ ক্ষুধার ছায়া, কৃষাণের ক্লান্তদেশ, শ্রমিক—কঙ্কাল,
নুয়েপড়া শ্রান্ত মূর্তি শ্রমজীবী কেরানীর, বুভুক্ষু নিখিল,
অবসন্ন বসুন্ধরা খোলে কর্মজগতের খিল।
এসেছে প্রভাত।
সারাদিন, সারারাত
দশদিক ঘিরে পড়ে মেদস্ফীত শোষকের ঊর্ণনাভ-জাল,
জনতার রক্তস্রোত কেটে কেটে চলে তার জাহাজের হাল,
ওড়ে তার বিজয়-পতাকা
শোষিত-করোটি-চিহ্ন-আঁকা।
দিকে দিকে তারি শব্দ, তারি হুইসিল
অবসন্ন বসুন্ধরা খোলে কর্মজগতের খিল
বিস্বাদ প্রভাতে।
রাতে
স্বপ্ন নাই।

www.pathagar.com

অপঘাত, অপমৃত্যু, এরি মাঝে স্বপ্নসাধ খুঁজিয়া বেড়াই,
হায়।...জীবনের স্বপ্ন চাই।

পরিপ্রেক্ষিত

মাটীর আরশি হেথা। মানুষের মৃত্যু দেখে—
অপমৃত্যু এই,
প্রবল ক্ষুধার জ্বালা, ধর্ষিতা নারীর শব মৃত্যুর আগেই।
তবু মন, ওরে মোর মন
কান পেতে শোনো তুমি জীবনের বিপুল স্পন্দন।
তুমি জানো এ-মৃত্যুর চির বন্ধ্যা রুক্ষ মরুতল,
দীর্ণ করি অনায়াসে যেতে পারে আমার লাঙল।
সে সূর্য ফলার মুখে-বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ প্রতাপ
নিমেষে নিমেষে ছেড়ে গাঢ় কৃষ্ণ শর্বরীর চাপ,
আকাশ গহ্বর ছিঁড়ে রজনীর ক্রূর নাগপাশ
নিমেষে ফাটিয়া পড়ে রক্ত উষা—আগ্নেয় কাপাস,
দিগন্তে সোনালি রঙে পেঁজা তুলা ছিটায় আকাশ,
পলকে ঘুচিয়া যায় আলস্যের দীর্ঘ অবকাশ,
ওরে মন, ওরে মোর মন
দিকে দিকে সেই তীক্ষ্ণ লাঙলের করো অন্বেষণ।

ঐ দেখ শিশু কাঁদে, ঐ শোনো দিকে দিকে মৃত্যুর খবর,
চিরদিন বয়ে মরে ধরণীর সুপ্ত শিশু নিরাশার স্তর,
ওরা জাগে চিরদিন ব্যথাতুর ঘুমহারা রাত্রির প্রহর,
পেষণের মর্মান্তিক কালো চাপ রচিতেছে ওদের কবর,
কলকারখানা গর্ভে আঁকড়িয়া প্রতিদিন ধনীর শহর,
মাঠে মাঠে, শস্যখেতে জলেস্থলে রচিতেছে ওদের কবর।

বাতাসে মৃত্যুর হাহাকার,
সন্ধ্যা নামে আসন্ন শীতের।
ওরে মন তুমি কারে ডাকো?
আর্তসুর ওঠে সংগীতের :
আজ রাত্রে ফুটিবে না তারা?
আজ হবে নিশ্বাস নিসাড়?
আজ শুধু ভাসিবে কেবল
বাতাসে মৃত্যুর হাহাকার?
বলো 'নহে', বলো 'নহে', বলো 'নহে'
এই ক্লিন্ন, এই অসমান—
বাতাসের হাহাকার দীর্ণ করি নিয়ে যাব সম্পূর্ণ আঘ্রাণ
পূর্ণ জীবনের।
মরণ দিনের

www.pathagar.com

সমুদ্র-সীমানা মোরা পার হয়ে নিয়ে যাব
আত্মার পাথেয়,
এই ভাঙা দল, এই অবজ্ঞাত, এই লুণ্ঠিত
ধূলিতলে হেয়
বিশীর্ণ যাত্রিক নিয়ে গড়ে যাব ধরণীর নতুন মিছিল,
দিনের বল্লম হেনে খুলে যাব রজনীর কারা অন্ধ খিল।
...দিকে দিকে সুসম্পূর্ণ চাষ,
স্তরে স্তরে ফেটে-পড়া, আকাঙ্ক্ষিত আগ্নেয়-কাপাস,
সুদীর্ঘ ফলার মুখে এ ভয়াল নিরাশার দীর্ঘ কালো চাপ,
সূর্যের বল্লম জানি উচ্ছেদ করেছে আরও রজনীর ছাপ।
তারপর কী আশ্চর্য ! সপ্তবর্ণ শুভ্রতায় দীপ্ত জলস্থল
মাঠে মাঠে সোনার ফসল,
সূর্যের লাঙল॥

শিকার

বিদ্যুৎ বন্যার বহ্নি বুকে পুরে হাঙরের মত
মেঘেরা চলেছে ডুবে আকাশের গহীন নদীতে
নিঃশব্দ সঞ্চারে, জ্বলে অগ্নিগর্ভ পাহাড়ের মত
বিপুল প্রত্যঙ্গ, আর অবরুদ্ধ কোটি ধমনীতে
জাগে এক চাপা ঝড় ঘনীভূত বাষ্পের ধোঁয়ায়।
তীর বেগে ছুটে চলে দুর্নিবার সে আগুন বুকে।
অতর্কিত আক্রমণে অকস্মাৎ দূরে শোনা যায়
অরণ্যের আর্তভীতি হাঙরের লেলিহান মুখে...
সারা বন তোলপাড় করে সেই ভয়াল হাঙর
বিদ্যুতের হিংস্র দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে অরণ্যের টুঁটি
সবুজ বনানী স্বপ্নে তুলি নগ্ন শাখার ভ্রূকুটি
তন্বী তমালীর দেশে টেনে আনে কঙ্কালের ঘর ;
জেগে ওঠে সে মুহূর্তে শিরদাঁড়া ভাঙা হাহাকার
এ বনে শিকারশেষে অন্য বনে খোঁজে সে শিকার।

জোয়ার

বন্দরে জোয়ার এল বিশাল বলিষ্ঠ অবয়ব
নিমিষে জাগিল সাড়া ঘুমন্ত বেলার স্থির জলে,
রুদ্ধশ্বাস দীর্ঘদিন পড়েছিল যেন মৃত শব ;
বিপুল ত্রস্ততা নিয়ে পাঠাল সে ফেন উপকূলে
সেনানীর বন্দনায় সহসা-প্রস্তুত সান্ত্রীদল।

www.pathagar.com

কী তীব্র গতির ঝড়ে পিষে গেল ঘুমন্ত বন্দর
জাগায়ে জীবন্ত জল, স্ফীতকায় গতিমান জল
তার আগমন বার্তা জানালে সে নিয়ে নির্ভয় অন্তর।

আমাদের সিন্ধুপোতে সে জোয়ার দুরন্ত আবেগে
সহসা অধীর হ'ল শুনি দূর দিগন্তের গান
উতলা হাওয়ার মাঝে উঠিল বিস্মৃত মোহ জেগে।
অজস্র সংঘাত, স্বেদ স্বপ্ন মোহ উন্মত্ত তুফান;
নীল স্রোতে ভাসমান সংখ্যাহীন জয়ের স্বাক্ষর
বন্দরের রশি ছিড়ে শুরু হ'ল নতুন সফর॥

নাবিক

পাহাড়ে খোদাই বুক, পাথরের মূর্তি যেন তার
খোঁজে সমুদ্রের তীর সিন্ধু-শকুনের দৃষ্টি মেলে;
দুস্তর তরঙ্গ শেষে গ্র্যানাইট মাটির কিনার!
রুক্ষ ললাটের 'পর সমুদ্রের হাওয়া যায় খেলে।
তিমি'র পুচ্ছের মত হাল ঘোরে অভ্যস্ত মুঠিতে।
সিন্ধু-শকুনের দৃষ্টি খোঁজে শুধু মেহগনি বন,
শাখার ইশারা আর কোন এক অজানা মাটিতে
রাশিকৃত স্বপ্ন তার ছেড়ে যায় দৃঢ় পাটাতন।

ভাঙে সমুদ্রের তীর চূর্ণ হয়ে বালুবেলা 'পরে,
ভাঙে পৃথিবীর তট দুস্তর সে সর্বগ্রাসী ঝড়
ডুবে যায় অস্তমুখী সূর্য এক অজ্ঞাত বন্দরে
কালো আকাশের নীচে জাগে তার জীবন্ত কবর;
হাল ধ'রে তবু দেখি সে নাবিক রাত্রির প্রহরে
সিন্ধু-শকুনের চোখে খোঁজে তার বাঞ্ছিত বন্দর॥

পাথরের দিন

গাঁইতির দীপ্ত মুখে বেজে ওঠে পাথরের দিন,
ম'র্চে-ধরা মাঠ শোনে বহু নিম্নে ফসলের শ্বাস,
উপরে উদ্ধত ক্রূর পাথরের উষর সঙ্গিন
বিক্ষিপ্ত আঘাত হানে মুছে দিতে সকল আশ্বাস।
বিগত যবের মাঠে, জোয়ারের অবলুপ্ত মাঠে
অনুর্বর দুঃস্বপ্নের শ্রান্তি নামে মরুভূ উন্মুখ,
বহু আলস্যের স্তরে চাপা পড়া সে-মৃত কপাটে
পাথরে আহত হ'য়ে ফিরে আসে গাঁইতির মুখ।

www.pathagar.com

তারপর দেখি সেই পাথরের দিন ক্রমাগত
সকল প্রান্তর জুড়ে অবিশ্রান্ত ফেলে বেড়াজাল,
নুড়ির শিকলে তার জমা হয় কোটি পঙ্গপাল,
যেখানে গাঁইতি এক ওঠে নামে বিদ্যুতের মত
দীর্ণ করি পাথরের মৃত স্তর সংগ্রাম আহত
দুঃস্বপ্নের শেষে আনে ফসলের রক্তিম সকাল॥

স্মরণ

সহজ সত্যের মত কতবার মৃত্যু এল, আর
কতবার মৃত্যু গেল চ'লে। কত ফুল ঘুমালো ধুলায়
কত ফুলে গাঁথা হ'ল বাসর শয্যায় উপহার।
মৃত্যু এল কত গৃহে। ভেঙে দিয়ে পুরানো কুলায়
মৃত্যু এল নতুনের বুকে। তুমি যারে ভালোবাসো
মৃত্যু তার বুকে বসি পান করে সব ভালোবাসা।
এও তো সহজ সত্য। কত ভোলো আর কত হাসো
তোমার বুকের কোণে ঘুমালো যে তার শেষ আশা

সমাধির বুকে ঢাকো। দিন আসে—সে দিন ফুরায়।
তবু তিমিরের বুকে তারকা–স্মরণ স্বয়ম্বর
—বিগত দিনের স্মৃতি। হারানো সুরের বীথিকায়
গানের সন্ধান করো, ভেঙে যায় সুরের নির্ভর
তবুও স্মরণে জাগে। কত গান আসে আর যায়
কত পথ–ভোলা গান রেখে যায় অটুট স্বাক্ষর।

শূন্য মাঠ, মরা ঘাস

শূন্য মাঠ, মরা ঘাস, বিবর্ণ পাপড়ি গন্ধহীন
বিক্ষুব্ধ প্রান্তর পথে দল বেঁধে মৃত্যুর চাতালে
কারা যেন ছুটে যায় অন্ধকারে অথবা পাতালে
মনের আগ্নেয়গিরি সে মাটিতে তুলেছে সঙ্গিন।
বিবর্ণ মানসে ধরি যত ব্যর্থ রাত্রি আর দিন
বিস্বাদ কামনা তার অতৃপ্তির ছায়া সহচর
ছুটে চলে পিছে ফেলি পৃথিবীর প্রত্যন্ত ধূসর
আগ্নেয়গিরির সন্ধ্যা তার শান্তি ক'রেছে বিলীন।

গলানো তামায়, তাই পিছনের আবছায়া পথ
যত হাসি, যত গান, যত ফুল সবুজ শাখার

www.pathagar.com

সভয়ে সম্মুখে দেখে শুধু এক বহ্নির পর্বত
অবিরাম জ্বলিতেছে, ধূমাচ্ছন্ন শিখরে তাহার
বীভৎস ক্ষুধার ছায়া, ম্লান সন্ধ্যা, স্বপ্নের জগৎ
অন্ধ দিবসের তীরে শ্রান্তিভরা ওঠে হাহাকার॥

মৃগতৃষ্ণিকা

যে মৃগতৃষ্ণিকা মোরে ঘোরায়েছে দূর হ'তে দূরে
এক মরু মাঠ ছেড়ে অন্য মরু–অদিত্যকা পানে
(উত্তপ্ত নেশার রঙ গলিত রূপার স্তরে স্তরে)
আজো আমি ঘুরি সেই মরীচিকা মায়ার সন্ধানে।
জানি পান্থপাদপের শেষ চিহ্ন লুপ্ত দীর্ঘকাল
ফেনমুখ ছুটি তবু মরীচিকা পথে হতাশ্বাস
দিগন্তের নীলপটে জলবিম্ব অস্পষ্ট শৈবাল
ছায়ার নৈরাজ্যে সেই খুঁজি বৃথা পানীয় আশ্বাস।

সজ্ঞান চেতনা এই আত্মঘাতী অতৃপ্ত নেশার
বঞ্চিত জীবন জ্বালো বর্ণমেঘে বিচিত্র ভ্রান্তির
অপরূপ শোভাময়। পাই নাই খুঁজে তার পার
কামনার ঘূর্ণাস্রোতে কোনদিন মেলে নাই তীর;
সূর্যের ঐশ্বর্য খুঁজি স্বর্ণ–ছায়া বিভ্রান্ত সন্ধ্যার
আকাশে,—আঁধারে শুনি তৃষ্ণার অতৃপ্ত হাহাকার॥

নৈশ কুকুরের ডাক

নৈশ কুকুরের ডাক স্তব্ধতা ভাঙায় ক্ষণে ক্ষণে
রাত্রির কোমল বর্ণে দিয়ে যায় সুতীব্র আঁচড়
অজ্ঞাতে এল কি চোর তন্দ্রাতুর গৃহস্থ প্রাঙ্গণে
অথবা মৃত্যুর মুঠি তুলিয়াছে উদ্যত পাথর
(আধো ঘুমে অন্ধকারে)! এখানে কি বাতাস বহে না
সমস্ত মৃত্তিকা বুঝি ফিরে যায় নিজের সত্তায়;
জমাট বাঁধার আগে যে পেয়েছে সমুদ্রের ফেনা
ঘুম–শ্রান্ত চোখ মেলে ফিরিছে সে রাত্রির হাওয়ায়
ধূমল আকাশ–প্রান্ত দীর্ণ করি কুকুরের স্বর
কোথায় অনেক দূরে মিশে যায় রাত্রির হাওয়ায়,
যেমন হারায়ে গেল ধূলিস্রোতে প্রাচীন মিশর
মমির বিদ্রূপ রেখে করোটি–বন্ধুর সাহারায়,—
নৈশ কুকুরের ডাক মিশে যায়, দূরে মিশে যায়—
আমাকে ঘিরিয়া ফেলে মিশরের প্রেতায়িত স্বর॥

www.pathagar.com

হে মোর আগ্নেয় বক্ষ

হে মোর আগ্নেয় বক্ষ
হে মোর আগ্নেয় বক্ষ অশ্রু কই তোমার শিলায় !
জমেছে কান্নার মেঘ তোমার শিখরে
অশ্রু কই অন্তরে তোমার ?
নিরুদ্ধ কান্নার বেগে কতবার ফেটে যেতে চায়
শিলাতল,
লক্ষ ধারে বাহিরিয়া আসে তিক্ত জ্বালা—
শ্রান্তিহীন প্রবাহ লাভার,
সঞ্চিত সুতীব্র জ্বালা পৃথিবীর জমানো উত্তাপ
কত বার পার হ'য়ে আসে কণ্ঠতট ;
তিক্ত বেদনার ভারে কত বার বুক ফেটে যায় ;
অশ্রু জাগে না তো !
কান্না কই
হে শিলা হৃদয়
কান্না কই নয়নে তোমার ?
অশেষ উত্তাপ জ্বালা পারো না কি ম্লান ক'রে দিতে
অজস্র বর্ষণে ?
বেদনায় পারো না নামাতে
শ্রান্তিহীন বর্ষণের ধারা ?
উষ্ণ লাভা স্রোত নয়—কান্নার অঝোর
ঝর্ণা শিশু
মুক্ত মাঠ, বন ঘিরে মরুভূর বন্ধ্যা হাহাকারে
পারো না কি মুক্তি দিতে কান্নার শিশুকে ?
তাম্রাভ দিগন্ত ঘিরে হে পর্বত ! হে শিলা হৃদয় !
কতকাল আকাঙ্ক্ষা কান্নার
মিশে যাবে হতাশ্বাস অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গের মত ?
কত দিন
হায় কত দিন ?

সুর

যে সুর সমস্ত রাত্রি বেজে যাবে বাতাসের ছড়ে
দীঘল নদীর মত সারারাত্রি বাজিবে যে সুর,
দৃঢ় তটরেখা পারে জীবনের আগ্নেয় অঙ্কুর
ছড়ায়ে পাবে যে মুক্তি অগ্নিশিখা রাত্রির প্রহরে
তমিস্রা-পাথর পটে কক্ষচ্যুত অজানা বন্দরে
সেই নদী, সেই তারা লুপ্ত মোর মননের মত
নিঃশব্দে বহিয়া চলে আয়োজন করি অবিরত

www.pathagar.com

দিন ও নদীর শেষে অবচেতনায়; ঘুমঘোরে।
তির্যক সর্পিল গতি বহি ক্লিষ্ট বিস্মৃতি-প্রচ্ছায়
অস্তিত্ব হারায়ে চলে আতপ্ত উজ্জ্বল দিবালোকে,
রাত্রির তরঙ্গ-মেঘ যে মুহূর্তে নামিবে সন্ধ্যায়
গোধূলির ক্লান্ত বক্ষে, মুক্তি পাবে ঝলকে ঝলকে
আমার তারার স্বপ্ন, নদী-তীর, শ্রান্ত ঝাউবন,
পীতাভ সূর্যের স্রোতে চলেছিল যার আয়োজন॥

সংগতি

আমার নিবিড় ঘুম ভেসে যেত রাত্রির অঞ্জনে
যদি না তোমার স্বপ্ন দোলা দিত আমার আকাশে,
যদি না তোমার কথা মর্মরিত দক্ষিণ পবনে
আমার মনের প্রান্তে রাত্রির বিশ্রান্ত অবকাশে
ভাসিয়া আসিত তবে এ বিষণ্ন সঙ্গীহারা নীল
মুহূর্তে বিষাক্ত হ'ত, ঢেকে যেত তিক্ত তীব্র বিষে,
আমার আকণ্ঠ তৃপ্তি নিমেষেই বিভ্রান্ত ফেনিল
খুঁজিয়া পেত না শান্তি প্রশান্তির সমগ্র আশিসে।
আজ রাতে স্বপ্ন তব ভেসে এল পরীর পাখায়,
আজ রাত্রে স্বপ্ন তব ভেসে এল মনের গলিতে,
যেমন চামেলি গন্ধ ভেসে আসে নীল জোছনায়,
যেমন সমুদ্র-হাওয়া ভেসে আসে শহরতলীতে,
মৃত্যুর অপরিসর কক্ষে আনে সবুজ খবর
তপ্ত জীবনের প্রাণে মুক্তি পায় আবদ্ধ কবর॥

সে নামে ডেকেছি আমি

সে নামে ডেকেছি আমি যে নামে ডাকেনি কেউ তা'কে,
সে মন দেখেছি আমি যে মন দেখেনি কেউ আর :
শরৎ রাত্রির মত যে মন মেলেছে লঘুভার
স্বপ্ন-সুরভিত পাখা ম্লান করি ধূসর সন্ধ্যাকে।
অজস্র সংঘাতক্লিষ্ট জীবনের ক্লান্তি-দীর্ণ বাঁকে
যে মনের দীপ্ত সাড়া পেয়েছি অজ্ঞাতে বহুবার
—প্রেমের ক্ষণিক দ্যুতি সে উজ্জ্বল বিস্ময় আমার
মুছেচে ক্লান্তির মেঘ—পুঞ্জীভূত মৃত্যু-তমিস্রাকে।
হাজার ঝড়ের দেশ পার হ'য়ে করিনি সংশয়,
সে দীপ্ত মুহূর্ত মোর অকলঙ্ক মাধুর্য স্বপ্নের
মনের নিভৃত কোষে রেখে গেছে অশেষ সঞ্চয়

www.pathagar.com

সুসম্পূর্ণ আকাশের প্রতিভাস বক্ষে শিশিরের ;
যে আকাশে তারা জ্বলে যে আকাশে নাই মৃত্যু ভয়
শরৎ রাত্রির মত যে আকাশ অমেয় প্রেমের॥

হীরার কুচির মত

হীরার কুচির মত এ হৃদয় পৃথিবীর ক্রূর নিষ্পেষণে
বেদনার দীপাধারে জ্ব'লে ওঠে অঙ্গার বক্ষের
সুগোপন মর্মমূলে—শিহরিয়া তিমির স্ফুরণে,
সঞ্চারিয়া শুক্লা, কৃষ্ণা দুই পক্ষ সুদূর কক্ষের।
গ্রহ তারকার পথে ঘূর্ণমান কালের খেলায়
কোটি সূর্য ফেটে পড়ে সে বঞ্চিত তিক্ত বেদনার
আগুন পরশ পেয়ে দিগ্বলয় তীরে অবেলায় :
হীরার কুচির মত আলো নিয়ে অশেষ কান্নার।
অনেক দীঘল রাত্রি এ কান্নার শেষ চেয়ে আমি
কাটায়েছি তন্দ্রাহীন, বেদনার অনির্বাণ দাহে
তাকায়ে নিজের পানে সবিস্ময়ে মধ্যপথে থামি
দেখেছি বিপুল সৃষ্টি এই তীব্র বেদনা প্রবাহে
নিজেকে হারায়ে ফেলে মুক্তি চায় বিপুল আগ্রহে
হীরার কুচির মত নীহারিকা হ'তে দূর গ্রহে॥

প্রেমের আবির্ভাব

দোলা দাও, দোলা দাও, হে পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ রাত্রে পথ চিনে প্রেম এল বুকে,
জীবন-মৃত্যুর ঝড় জাগে আজ আমার সম্মুখে
বৈশাখ পাংশুল শাখে চমকায় বিদ্যুৎ-বিভাষ।

মেঘ বক্ষে সঞ্চারিত গুরু গুরু শাঙনের ত্রাস
দিগন্ত ছাড়ায়ে অন্য দিকচক্রে খুঁজিছে বন্ধুকে,
কখনো বেদনা-রিক্ত, কখনো বা পরিপূর্ণ সুখে
ঝড়ের প্রলয় তালে শুনিতেছে বর্ষণ আশ্বাস।

তার ক্ষীণ পদধ্বনি গুরু গুরু বজ্রধ্বনি যেন
নিরুদ্ধ শিরায় মোর আনিয়াছে শঙ্কার জোয়ার।
ব্যগ্র-বাহু আলিঙ্গনে মৃত্যুকে সে এনেছে লুকায়ে।

আজ প্রেম মুক্তি পাবে, মুক্তি পাবে সমুদ্র সফেন,
আঁধারের সাথে হবে পরিচয় অজানা তারার
ফুলের নিশ্বাস হবে পরিপূর্ণ ঘন বনচ্ছায়ে॥

www.pathagar.com

ঘুম

বলিষ্ঠ মন্থর এক দীর্ঘদেহ সাপের মতন
ঘুম আসে। ক্ষুব্ধ জলে সঞ্চারিত ছায়া পড়ে তার।
স্নায়ুর প্রান্তর জুড়ে অবসন্ন চেতনার বন
সাপের বিষাক্ত শ্বাসে আচ্ছন্ন অসাড়; বারবার
আড়ষ্ট আঘাত তুলে মুহূর্তেই পড়ে সে ঝিমায়ে;
বনের আদিম পশু, কিংবা মৃত্যু কিংবা এক পাখী
সাপের কুণ্ডলী তলে সুবিপুল ঘুমের প্রচ্ছায়ে
ভুলেছে নিজের সত্তা, ভুলে গেছে সে আছে একাকী।

সে নিকষ মৃত্যু-ঘুম অরণ্য-সবুজ-রসায়ন
গতির সম্পূর্ণ উৎস মুক্ত করে পাখীর ডানায়;
পূর্ণ করি তোলে কণ্ঠ সুগভীর সুপ্তির স্বনন।
তারপর আলো আসে অজগর দূরে সরে যায়
ঘুমন্ত কন্যার পাশে সাড়া দিয়ে জাগে হীরামন
সদাগর পুত্র জাগে চোখ মুছে ভোরের হাওয়ায়॥

প্রতীক

যৌবন যে প্রেমের প্রতীক বলি না তা
বাসন্তী নীল দিনগুলি যার রূপ বিভায়
কাটলো সুরের দাই নিয়ে ঝড় হাওয়ায়
পিছন পানে তাকিয়ে শুনি সেই গাঁথা।
ফাল্গুনে যে সবুজ শিখা সেই পাতা
ঝ'রল যেদিন তাকিয়ে দেখি মোর শাখায়
ফুলের জোয়ার রিক্ত শাখার শেষ সীমায়
প্রেমের নতুন জয়ধ্বনি জয়গাথা।

প্রৌঢ় শরৎ রাত্রে দেখি তৃপ্তিলীন
এই পৃথিবীর তপ্ত শিরা শান্ত হিম,
শ্রান্তি মধুর স্বপ্ন ছড়ায় মধ্য দিন
পাপড়ি ধূসর পরান তবু আরক্তিম;
দীর্ঘ স্মৃতির রন্ধ্রে জাগে বর্ণহীন
গন্ধভারে পূর্ণ আমার মন অসীম॥

বৈশাখ

বৈশাখ আজ মেঘে সোয়ার তোলে চাবুক,
বিজলী শিখার চমক হানে সেই পথিক,

www.pathagar.com

যাই ভুলে মোর কর্মসূচী প্রাত্যহিক ;
ত্রস্ত তবু তৃষার্ত মন সমুৎসুক।

হে সেনানী ! বজ্র হানো ভাঙো এ বুক,
নিষ্প্রভ এ প্রান্তর, মন, নির্নিমিখ
প্রতীক্ষমান নিঃসাড় মোর সকল দিক,
তোমার সাথে পাক ভাষা মোর কণ্ঠ মূক।

নিস্তরঙ্গ জীবন সে তো মৃত্যু মোর,
তুফান তুরঙ্গমে আনো প্রাণ সেথায়,
আকাশ জুড়ে ছড়াও ঝড়ের বর্ণ ঘোর
মৃত্যু নিবিড় বর্ণে পাংশুল রঙ কে চায় ?
দস্যু তুমি প্রলয় আনো নও তো চোর
মৃত্যু–মদির জীবন আনো ঝড়–শিখায়॥

জ্যৈষ্ঠ

জ্যৈষ্ঠ তোমার সূর্য কিরণ বর্শা হানো
এ নৈরাজ্য যাক পুড়ে আজ তীব্র দাহে,
যাক সরে আর, যাক দূরে আজ তীব্র দাহে,
জ্বালো তোমার প্রলয় মশাল ধ্বংস আনো।
জ্যৈষ্ঠ তোমার উপপ্লবের বর্শা হানো,
আনো দাহন, মৃত্যু–মহান এ খাব গাহে ;
আঙুরবনের স্বপ্ন জ্বালাও তীব্র দাহে ;
যাক সরে আর যাক দূরে যা ছায়া ম্লান !
চৈত্র–উদাস মর্মরে আর পাতবো না কান,
যুগান্তরের বহ্নি মেঘে পাব না ভয়
জ্যৈষ্ঠ–দাহে ভরবো আমার জয় বিষাণ
ছড়াবো সে উগ্র জ্বালা বিশ্বময় ;
মরণ–ভীতু দেখবে জেগে সেই সময়
প্রলয় দিনের মাঠে আমার জয় নিশান॥

নৈরাজ্য

সে রাত্রে দেখেছি এক মরুমাঠ জনশূন্যতার
তুষার মেরুর মত সে মরুতে নাই তৃণদল,
হালকা সুরের রেশ মুহূর্তের আনন্দ উজ্জ্বল
সে বালু–সমুদ্রে যেন ডুবে যায় বুদ্‌বুদ নিঃসাড়।

www.pathagar.com

প্রতি ক্ষণে শোনা যায় চাপা শ্বাস নৈশ স্তব্ধতার ;
সুদীর্ঘ শতাব্দী লুপ্ত মননের প্রচ্ছন্ন অনল
জাগে নাই, রাতে নাই শর্বরীর স্থির তনুতল
আত্মকেন্দ্রিকতা মাঝে চিহ্ন নাই জীবন্ত সত্তার।
আশ্চর্য মৃত্যুর মত সে-জীবন সেই মরু মাঠ
কৃপণ রাত্রির এক মুষ্টিবদ্ধ কুটিল ইঙ্গিতে
অনায়াসে রুধিয়াছে আকাশের সকল কপাট
নিজেকে আবদ্ধ রেখে। নিরাশার কবন্ধ সংগীতে
ক্লান্ত আত্মরতি মগ্ন মরিতেছে ঠুকিয়া ললাট ;
পাইনি আঁধারে খুঁজে প্রাণ-চিহ্ন সে মৃত পল্লীতে॥

ব্যক্তিগত

হিতৈষী মহল থেকে বহুবার শোনা গিয়েছিল
আমার সম্মুখে নাকি বিরল সৌভাগ্য-সম্ভাবনা
অর্থাৎ অর্জিত পাপে,
মোটা নোক্‌রি,
টাকা,
পার্ক সার্কাসের বাড়ী ;
ধনী কন্যা প্রমোদ-সঙ্গিনী।
কিন্তু সময়ের চক্রে অকালে যখন
নিভলো তাঁদের আশা তখন আমার ভীমরতি
(অকালে, কুষ্মাণ্ড দলে ভ্যাগাবণ্ড) ! আমি
আদর্শের ফালি নিয়ে ফিরি ফুটপাতে।
পার্ক সার্কাসের সাথে মেলাতে বাধে না
হাভিয়ার কোন পল্লী ;
পুঁজিবাদী পুঁজ
যেহেতু জমানো দেখি উক্ত ডাস্‌টবিনে
(যদিও সজ্জিত আহা বিচিত্র ভূষায়) !
দুর্মর তাকিদ আসে
পার্শ্ববর্তী বস্তি থেকে তবু ;
'ইতরের' মধ্যে আমি
খুঁজে ফিরি সত্তা মানুষের
ক্ষুধিত প্রাণীর শ্বাসে
মেশায়ে নিজের দীর্ঘশ্বাস
আদর্শের পন্থা কতো দুরারোহ বুঝি প্রতি পায় !

দিনরাত্রি চেয়ে দেখি বিপক্ষে আমার
অগণন ফেরাউন—কারুণের ব্যূহ,

www.pathagar.com

দেখি চেয়ে শড়কের
প্রতি প্রান্তে অসহায় বনি-ইস্রাইল
তেমনি সন্ধান করে মুসা কালীমের,
সারা পথ কেঁপে ওঠে বন্দী বেদনায়...
মজলুমের লোহুধারে ভেসে যায়

পৃথিবী তেমনি...
সংগ্রাম-বিধ্বস্ত মন ভুলে যেয়ে সংঘাতের গ্লানি
জেগে ওঠে দিকে দিকে সর্বগ্রাসী আসন্ন জেহাদে,
মুসা কালীমের খোঁজে সেনানী যে নির্ভীক সত্যের॥

প্রেসম্যান

যন্ত্রের গর্জন-শ্রান্ত তন্দ্রাতুর প্রেসম্যান দেখে
নতুন বিস্ময় এক : পথচারী আহত বুলেটে,
নির্ভীক জনতা চলে বারুদের বুকে পথ কেটে :
চলেছে শতাব্দীকাল যারা পথে ক্লান্তি-চিহ্ন রেখে
যৌবন-বন্যার মত আজ তারা এসেছে অনেকে,
আজ তারা প্রাণ পেল একসাথে কঠিন বুলেটে
আজ তারা প্রাণ পেল রক্তনীল তীক্ষ্ণ বেয়নেটে
রেখে গেল পথপ্রান্তে প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ মৃত্যুকে...

আরণ্য ঝড়ের শব্দ শোনা যায় সেই পদক্ষেপে
মাটির নতুন ঘ্রাণ ভেসে আসে সে ঝড় মৌসুমে
যে ঝড় (বিশীর্ণ-শ্রান্তি) চলেছিল দীর্ঘ পথ মেপে
মৃত্যুর মর্সিয়া হয়ে, রূপ নিল আজ সাইমুমে !
সসাগরা পৃথিবীর আদিগন্ত স্নায়ু ওঠে কেঁপে
রাত্রি-শ্রান্ত প্রেসম্যান স্বপ্ন দেখে পরিপূর্ণ ঘুমে॥

সসাগরা

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায়
দূর সমুদ্রের ডাক শুনি
(যেন মেঘে মেঘে চাপা দৃঢ় বজ্রস্বরে)
তৃষিত বনানী-বক্ষ মোর।
হে নাবিক ! হে মাঝি সিন্দবাদ
ভেঙে ফেলো পরিচিত মৃত্তিকার ডোর।
ভুলে যাই একদিন এ মৃত্তিকা সহস্র বন্ধনে

www.pathagar.com

বেঁধেছিল পলে পলে, দিয়েছিল জীবন-দোলানি ;
ভুলে যাই মোর রক্তে মৃত্তিকার লক্ষ অনুকণা !
শিরায় শিরায় মোর সমুদ্রের নীল ঢেউ
করে কানাকানি
—পৃথ্বি সসাগরা।

মাটি দূরে সরে যায়—
মাটি দূরে মরে যায়—
সমুদ্র কি বুকে দেয় ধরা ?
চঞ্চল দুরাশা নাচে
সমুদ্রের সর্পিল মালায়
দ্বীপ হ'তে নোনা স্রোতে
কোন্ এক অতৃপ্ত জ্বালায় ;
নারিকেল বন ভরি ওঠে কার গান :
সমুদ্র সে নাবিকের প্রাণ।

পেয়েছি নারীর স্পর্শ,
জনতার পরিপ্রেক্ষণায়—
পেয়েছি উজ্জ্বল দিন
তবু তার প্রাণবন্ত সুর
তনুমন করিছে রঙিন !
মাস্তুলে হেলান দিয়ে
শুনি সেই সংখ্যাহীন সুর
কে যেন ছড়ায়ে যায়
অগণন তারার নূপুর,
সমুদ্র আমার প্রাণ
সসাগরা প্রেমের মুকুর
(এলোমেলো উদাসীন চিন্তার বিশুষ্ক খড়ে
যেন এক উজ্জ্বল আগুন)
কারা যেন ডেকে বলে ;
হে নাবিক হাড়ে আজ ধরে এল ঘুণ,
জরাস্ফীত মেদরাশি
চারপাশে হ'ল আজ জমা ;
জীবন্ত সূর্যের তাপে
শুরু করো সিন্ধু পরিক্রমা।
সে আহ্বান নেমে আসে অস্থি-পরম্পরা—
সমুদ্র-দোলায় দোলে পৃথ্বি সসাগরা
লক্ষ কোটি শিশু বক্ষে ধরি।
আসে অনাগত ভ্রূণ
সমুদ্রের তরঙ্গে শিহরি
জীবনের কুয়াশা গহ্বরে !

www.pathagar.com

কোথায় অযুত শিশু
ভেসে চলে তরঙ্গের উদ্দাম কবরে।
যেখানে উত্তাল স্রোতে দিশাহারা মত্ত এ নাবিক
সমুদ্রের ঘন বনে নাহি খুঁজে পায় তার দিক
শুধু দেখে বহু দূরে জোনাকির উজ্জ্বল প্রদীপ
জ্বলিয়া মাটির মেয়ে মরীচিকা ভালে পরে টিপ ;
যার লাগি প্রতি রগে জেগে ওঠে টান
মৃত্তিকা সে নাবিকের প্রাণ॥

হে বন্য স্বপ্নেরা

হে বন্য স্বপ্নেরা মোর ! কোনদিন যদি ফুটেছিল
তোমার শাখায় লাল, নীল,
জীবনের পুষ্প পর্ণ কোনদিন যদি দিয়েছিল
রসায়িত অজস্র সলিল,
তবে সেই ফুটে-যাওয়া ফুল, জানি, নয় সেদিন সুদূর—
তবু সেই অনাঘ্রাত দিন—আজ শুধু কাহিনী অশ্রুর।
স্তূপীকৃত দিনের সুরভি বহে না এ রাত্রির আকাশ,
তবু সেই দিনের সন্ধানে আমার তারারা ফেলে শ্বাস,
ফসলের শূন্য শুষ্ক মাঠ পেতে চায় সোনালি আশ্বাস॥

হে বন্য স্বপ্নেরা মোর ! আজিকার মৃত্যু-নিকেতনে
যে ছায়া পড়িছে নিত্য ছাইচাপা তোমার প্রেক্ষণে,
সে ডুবন্ত ছায়া শুধু দিশাহারা নিরাশা ব্যাকুল
অথই নৈরাশ্য তলে ডোবে নিয়ে আহত মাস্তুল।
অনেক অনেক আগে ছিঁড়ে গেছে পাল, ভাঙা হাল,
ধ্বংসের জোয়ারে ওঠে অগণন প্রমত্ত উত্তাল
কালো জল। ডোবা পাহাড়ের কোন অজ্ঞাত শিখরে
অবেলায় অপঘাতে পাথারের জলে তারা মরে।
তারা মরে, তারা মরে শূন্যতলে মাটিতে, পাথরে
অনেক দিনের পাপ জমা হয়ে যেথা স্তরে স্তরে
পাপের পাহাড় গড়ে, সে তিমির অতল গহ্বরে
তারা মরে তারা মরে আজ শুধু তারা ডুবে মরে।
এখানে শিশুর কান্না—ক্ষুধাতুর আগ্নেয় প্রান্তরে,
মানুষের অপমৃত্যু এ রাত্রির শঙ্কিত প্রহরে।
আজিকে কবন্ধ ওরা ভারবাহী বহে সে খবর :
বাঁকা শিরদাঁড়া, ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।
পথে পথে বাঁধা পড়ে। পলাতক সে ভগ্ন মিছিল
দেখে দ্বার রুধিয়াছে বহুদিন আগে এ নিখিল

www.pathagar.com

তাহাদেরি অত্যাচারে। তারপর অদ্ভুত জন৩।
মুখ গুঁজে পড়ে আছে শুধু ওঠে অশ্রু-আকুলতা
কণ্ঠতট চেপে ধরা শব্দহীন দুর্বোধ্য ভাষাতে
রাত্রি নামে এ প্রান্তরে ক্রমাগত আশঙ্কার সাথে;
দুর্ভেদ্য নিবিড়তার অন্তস্তলে নাহি যায় দেখা,
সূচী-চিহ্নহীন সেই তিমিরের শেষ তটরেখা
শুধু দূরে সরে যায় : অবিরাম হেথা আর্তস্বর :
বাঁকা শিরদাঁড়া, ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।

অন্ধকার ! গূঢ় অন্ধকার—
ভয়ঙ্করী এ রজনী বাহুতে জড়ায় কাল সাপ
মানুষী বিবেকে শুধু পড়িতেছে শয়তানী চাপ
পাশব প্রতাপ।
এই রাত্রি দীর্ণ করি আসিবে কি দীপ্তফলা সূর্যের লাঙল
মাঠে মাঠে কোনদিন দোলাবে কি স্বর্ণশীষ সবুজ ফসল
মনের মহুয়া বনে জাগাবে কি যৌবনের স্বপ্ন নীল হাওয়া,
ফাল্গুন বন্যার দিনে আগুন দিগন্ত ভূমি ছাওয়া
জাগাবে কি জাগাবে কি আর ;
পার হয়ে এই রাত্রি, পার হয়ে এই অন্ধকার ?
গলিত শবের মুখে এই প্রশ্ন এ সংশয় আশঙ্কা-কুটিল
বহু রাত্রি পার হয়ে স্খলিত পথের প্রান্তে শঙ্কিত নিখিল
আজো স্বপ্ন দেখে ;
আজিও শবের পিছে পার হয়ে যাত্রীদল চলেছে অনেকে।
হে বন্য স্বপ্নেরা মোর ! কোনদিন যদি ফুটেছিল
তোমার শাখায় লাল, নীল,
অসংখ্য অশেষ যাত্রা সে পথে আমার। যদিও সে
ক্লিন্নপথে সাপের মিছিল॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাফেলা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাফেলা

ধূলির তুফান তুলি ওরা চলে রাত্রিদিন মরুর হাওয়ায়
ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,
কোথায় চলেছে তারা কোন দূর ওয়েসিস কিংবা সাহারায়;
জানি না কোথায়!

উটের ঘন্টার শব্দে ম্লান মরু–বালু ওড়ে, মুছে যায় বেলা,
ঝড়ের প্রশ্বাসে তার গ'ড়ে ওঠে ভেঙে পড়ে ধরণীর ঢেলা,
ওরা সব দল বেঁধে উটের সারির আগে তবুও একেলা
চ'লেছে কাফেলা!

কোন দূর দেশান্তের জনপদ হ'তে ওরা নিয়াছে বেসাতি,
কোন দিগন্তের ধারে আজ ওরা একমনে খুঁজিতেছে সাথী,
কাশ্মীরী লাবণ্য আর বাগদাদের রূপকথা; ধ্বংস–স্তূপ–পারে
ঊষার দুয়ারে...

সাইমুমের স্রোতাবর্তে, গোবির বালুকা পথে, তারার বিস্ময়
ওড়ায়ে দু'রঙা ধূলি ঘূর্ণাবেগে কাফেলার নব পরিচয়
মুহূর্তে মুহূর্তে এই নার্গিস–ফোটানো দীর্ঘ পথের কিনারে;
মঞ্জিলের দ্বারে...

দু'ঘড়ির অবসর নিয়ে ফের যাত্রা তার দুস্তর আবেগে,
চকিতে জাগায়ে দিয়ে হিঙুলের প্রাণ–বন্যা তীব্র গতিবেগে
কাফেলা চলেছে ছুটে, পিছনে পড়িছে লুটে সাথীরা প্রাচীন,
শেষ হ'ল দিন!

জেরুজালেমের মাঠে তবু ভ্রাম্যমাণ সেই সুবিপুল ঝড়ে
জলপাই–শাখা হ'তে একে একে সবুজের চিহ্ন ঝ'রে পড়ে,
হেরেম বন্দর ফের নতুন ঊষার রাগে হ'য়েছে রঙিন;
শুরু হ'লো দিন।

পাথর–চাপানো ভার, শিকলের ভারী বোঝা নিয়ে এল দিন,
পরিখার পাশ দিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে চ'লে গেল সর্পিল সঙ্গীন;
দিগন্তের চাকা ঘুরে দীর্ঘ পরিক্রমা–শেষে খুঁজে পেল তীর
জয়দৃপ্ত শির।

সূর্যের বল্লম ফের নরম স্বপ্নের খাপে আসে ম্লান হ'য়ে,
গলে বকৌলির নীল সাততলা মহলের শিখা আনে ব'য়ে,

www.pathagar.com

সরন্দ্বীপের মোম ছেড়ে যায় সীমাবদ্ধ বেদুঈন খিমা
সংজ্ঞাহীন সীমা।

পাথরে প্রশান্ত যেথা আতশী–পেয়ালা আর শাহ্ জামশিদ
কাফনের কালো নেশা নেকাব প্রচ্ছায় যার নাহি ভাঙে নিঁদ
দু'পাশে ঘুমায় তার ইরানের শাহ্জাদী; ওঠে হাহাকার
নিঃশব্দ নিসাড়।

কখন সুরার পাত্র আল্ বোরজের প্রান্তে চূর্ণ হ'ল তার
ম্লান হ'য়ে নিভে এল বিলোল কটাক্ষ কত তন্বী জোহরার
আঙুর বনের হাওয়া থেমে যায়, নেমে আসে ধরণীর বেলা;
থামে না কাফেলা।

সরাইখানার সেই ঝড়ের গতিতে ভেঙে মরু–মুসাফির
তন্দ্রামুক্ত সাথীদের বিরাট মিছিল নিয়ে খুঁজেছে শিশির
মৃগ–তৃষ্ণিকার মায়া কাটায়ে কখন তারা ছেড়ে মরুবিষ
খোঁজে ওয়েসিস।

যেথা শবনম–স্বপ্ন শুকায়ে প্রখর তাপে জেগেছে আবার
পাদপিষ্ট ধূলিকণা হাওয়ার সোঁতায় উড়ে জেনেছে আবার
বিষাক্ত জিন্দানখানা পার হ'য়ে তার শুভ্র দিকচক্রবাল
দোলায় হেলাল।

লু' হাওয়ার বেড়া ছিঁড়ে পায়ে পায়ে পিষে ফেলে বাধার শিকল
অনেক মরুভূ পারে তাদের দুর্গম যাত্রা হ'য়েছে সফল,
আজ পঙ্গপাল–মুক্ত সবুজ গমের শীষ, ফুটন্ত নার্গিস
মেলে ওয়েসিস।

উটের সারির আগে মরু–চাঁদ ভেসে চলে আরব আজমে
ধূসর পাতার দেশে আবার মেঘের রঙ হ'য়ে জমে,
সুতুর–বানের দিন ব্যথাতুর, আঁসু ঝরে সিরিয়ার সাঁঝে,
যেন বাঁশী বাজে,

কাফেলার পাশ দিয়ে দিন রাত্রি, রাত্রিদিন স্বপ্ন তন্দ্রাতুর
স্মৃতির অতল হ'তে অবিরাম বেজে চলে সে–বাঁশীর সুর,
গ'ড়ে ওঠে ভেঙে পড়ে অনেক মিনার...আজ জানি না কোথায়
মেশে সাহারায়...

এবার ঘনালে সন্ধ্যা কোথায় ডেরার খুঁটি পাতিবে তাহারা
জানে না, সম্মুখে জাগে আদম–সূরাত, সন্ধ্যাতারার পাহারা
বন্য–বুতীমার দলে, মরু–বিয়াবানে কিংবা সাঁতোয়া আকাশে
তারা যেন ভাসে...

www.pathagar.com

ভেসে চলে সাথে সাথে সেতারার সাদা মালা, মরুভূর ঢেলা,
ভেসে চলে খেলাঘর, ভেসে চলে শ্রান্ত কায়খসরুর খেলা,
নর্তকীর ভাঙা হাট শেষ হ'ল ভেঙে গেল খোশরোজ মেলা...
চলেছে কাফেলা...

উটের পায়ের শব্দে যাযাবর মরুতট হয়েছে বিভোল,
রাত্রিভরা সেতারার আলো আর মালা তার বুকে দেয় দোল,
শারাবন-তহুরার সন্ধানে যাদের দিন হয়েছে নিখোঁজ—
খোঁজে নওরোজ।

তাদের চলার তালে ঘুম ভাঙে, দুই চোখে নেমে আসে ঘুম,
সুবে-সাদেকের শুভ্র পথে এসে তারকারা নীরব নিঝুম...
দীর্ঘ মোরাকাবা শেষে অকস্মাৎ প্রভাতের রঙিন মিনার
চূড়া তোলে তার...

প্রবল গতির ঝড় বুকে নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উড়িছে ঈগল,
দিগন্তে সোনালি বানে খুলে গেছে শর্বরীর তিমির শিকল,
উটের সারির পাশে জমা হ'ল একে একে দৃঢ় অচপল
দূর-যাত্রীদল।

সুতুর-বানের সুরে ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে মরুর জাহাজ.
অনেক মৌসুম পানে তারা সবে দীর্ঘ-যাত্রা করিয়াছে আজ,
চিকন সোনালি বন্যা ধুয়ে যায় তাহাদের তারুণ্য সুঠাম
তাহাদের নাম।

মরু-বালুকার পথে অন্তহীন পদচিহ্ন এঁকে তারা চলে
দুই রঙ শাদা-কালো দিন-রাত্রি তাহাদের সম্মুখে উছলে,
অন্ধকার নীড় হ'তে সূর্য-আলোকিত তনু টেনে আনে পাখী
অন্তরালে থাকি'...

এখনো চলেছে তারা ধূলির তুফান তুলে আকাশের গায়
ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,
কোথায় চ'লেছে তারা কোন দূর ওয়েসিসে কিংবা সাহারায়
জানি না কোথায়...

কাফেলা ও মন্‌জিল

এক
মঞ্জিলের বাঁশী বলে, 'নীড় বাঁধো এখানে তোমার।'
কাফেলার ধ্বনি বলে, 'নয় নয়, নয় আজো নয়।'
মঞ্জিলের বাঁশী বলে, 'আনন্দের এসেছে সময়।'

www.pathagar.com

কাফেলার ধ্বনি বলে, 'র'য়েছে দুঃসহ গুরুভার,
নতুন মঞ্জিল পানে রেখায়িত, দিগন্ত যাত্রার
সংকেত র'য়েছে প'ড়ে।' বাঁশী বলে, 'ভোল সেই কথা,
অন্তহীন বালু পথে মনে করো সেই নিঃসঙ্গতা,
সেই অবিশ্রাম গতি, দুর্বহ পথের গুরুভার—'

কাফেলার ধ্বনি বলে, 'জানি আমি, সেই তো আমার,
জীবনের অশেষ পাথেয়। প্রাণান্ত শ্রমের দিনে
বোঝার সে গুরুভার সেই তো চরম পুরস্কার।'
কাফেলার পদধ্বনি মুছে যায়, নামে অন্ধকার,
মুসাফির দল তবু চলে সেই দীর্ঘ পথ চিনে;
দিগন্তে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে দৃষ্টি সেতারার।

দুই

সেই দুর্গম পাহাড় পথের ডাক
এখনো শুনতে পাই,
কাফেলা সালার! আজ মোর জনপদে
সাথী নাই; সাথী নাই!

শত দুর্গম পাহাড়ের চূড়া বেয়ে
তবু দেখি প্রাণপণে
কারা যেন চলে আয়োজন করি
নিভৃত নির্জনে।

অলস, উদার রাতের মুগ্ধ ক্ষণে
শুনেছি তো বহুবার
পাহাড় পথের ডাক বজ্রের মত
হানা দেয় বারবার।

আমরা তখন রঙিন নেশায় মেতে
সে ডাক এড়াতে চাই,
পাহাড় পথের যাত্রী একাকী চলে,
নাই তার সাথী নাই।

প্রমোদ-বিলাসী সমতল-চারী যারা
শুনতে চায় না পাহাড় পথের ডাক,
ঈগলের সাথী হয় না ঈগল ছাড়া
আস্তকুঁড়ের ছলনাকুশল কাক।

তাই বিস্ময়ে দেখি সারা রাত ধ'রে
পাহাড় পথের যাত্রী একাকী চলে,

www.pathagar.com

অন্ধকারের ব্যূহ ভেদ করি তার
সঙ্গীবিহীন মনের তারকা জ্বলে।
প্রমোদ-বিলাসী আমরা তখন নীচে
আস্তাকুঁড়ের আনন্দ গণি মিছে,
সরাইখানার দুয়ারে আঘাত হেনে
সারা রাত ফেরে পাহাড় পথের ডাক।

তায়েফের পথে

তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল সওদাগর।
মরু-সাইমুম বৈকালী শ্বাসে বালুর ঝড়
এখন কেবল নিথর মৃত্যু ভয়ংকর
এখন কেবল বইছে আকাশে প্রলয় ঝড়,
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল সওদাগর।
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল...

এখন তোমার একাকী রাতের শিলারোহণ,
ঊষর মরুতে একাকী দিনের বীজ বপন।
এখন তোমার সুদূর-যাত্রা সঙ্গীহীন,
রাত্রি ঘনালো তিমির অতলে ডুবছে দিন,
তায়েফের পথে ম্লান সন্ধ্যার শ্রান্তস্বর :
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল সওদাগর।
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল...

হারালো তোমার নিশীথারণ্যে সাথী কাফেলা
আজ পথ চলা সঙ্গীবিহীন শুধু একেলা,
প্রতি পাথরের প্রাকার পারাতে প্রলয়াঘাত
দুর্গম পথে প্রতি পায়ে পায়ে শোণিতপাত,
প্রবল আঘাত বাধায় আহত শুষ্কাধর !
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল সওদাগর।
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল...

ক্ষণ সুযোগের প্রতীক্ষা নয়, পরাণপণ—
দুই পাশে রেখে মৃত্যু, পাহাড়ে অধিরোহণ,
যদিও আঘাত ঝরেছে শিলার অঝোর ধার,
তবু বোঝা নিয়ে হে সওদাগর ! পথ ঊষার
ভুলে যেতে হবে, ভুলে যেতে হবে পথের ডর।
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল সওদাগর।
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল...

www.pathagar.com

এখানে পথের মধ্যে পাহাড় রয়েছে খাড়া
চলবে না আজ নোয়ালে তোমার ও শিরদাঁড়া,
কাঁটা-দুর্গম-শিখরে আনতে ফুলের বান,
রাত্রির তীরে জাগাতে দিনের রাঙা নিশান,
অসংখ্য বাধা : পথে চেয়ে দেখো বালুর স্তর
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল সওদাগর।
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল...

তায়েফের পথে জমা আছে দেখো শোণিত স্নান,
ফসলের আগে জমা আছে দেখো বান, তুফান,
শস্য কীটের মুখে অপঘাত, নির্যাতন,
রুদ্ধ-নিসাস মৃত্যুর পালা, শিলা পেষণ,
আর আছে ঝড় দু'চোখ ধাঁধানো প্রলয় ঝড়,
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল সওদাগর।
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল...

তবুও থেম না, আজ এই পথে নাই বিরতি,
দু'ধারে মৃত্যু পাহাড়ের মাঝে প্রবল গতি,
এখানে থামার নাই অবসর। দিনের মত
আঁধার পর্দা কেটে যেতে হবে অনবরত।
ক্রমাগত বাধা, পাহাড় পারায়ে সূর্যোদয়,
যদিও এ পথে সহস্র ভয় নাই তো ভয়,
যদিও এ পথে মৃত্যুর ডর নাই তো ডর,
এ পথের হাওয়া দিতেছে দিনের শুভ খবর,
নবজীবনের সাক্ষ্য দিতেছে মৃত কবর ;
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল সওদাগর।
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল—
তায়েফের পথে বেলা পড়ে এল...

মদীনার মুসাফির

তোমাকে পৌঁছিতে হবে সুবেহ-সাদেকের আগে মরু-মদীনার
মুক্ত দ্বারে
যেখানে স্বপ্নের মত খোর্মা-বীথিকা শুধু দুলিয়াছে
রাত্রির জোয়ারে
যেখানে বহিয়া বোঝা একমনে চলিয়াছে খলীফা ওমর
যেখানে সত্যের সঙ্গী সিদ্দীক বেঁধেছে তার ঘর
যেখানে সিংহের মত ফিরেছে নির্ভীক আলী হায়দর।

www.pathagar.com

আকাশে উঠেছে ঝড় হে যাত্রিক ! অশ্রান্ত কাফেলা !
তোমার দুর্লঙ্ঘ্য পথে আছে জানি মরণের খেলা
লু' হাওয়ার বিষ মৃত্যু–নীল
দুস্তর তরঙ্গ, স্রোত উদ্দাম ফেনিল।
বিদ্যুৎ বিদীর্ণ কোটি তীব্র পরিহাস
কঠিন জেহাদ বাধা বীভৎস সন্ত্রাস
হে আমার অশ্রান্ত কাফেলা !
নিবিড় নিশিথারণ্যে যাত্রা তবু করো এই বেলা।
তোমাকে খুঁজিয়া ফেরে হেরার সুতীব্র সূর্য নিত্য দীপ্তিমান
তোমার সন্ধানে ফেরে বেলালের বিহ্বল আজান,
কোরআনের ছেঁড়া পাতা জোড়া দেয় জ্ঞানী ওসমান
করণির প্রেম জাগে শর্বরী প্রহর ;
যেখানে নিশীথ স্তব্ধ নবীজীর ঘুমন্ত শহর।

যে মরুর বালুকণা গড়ে গেল অগণন শক্তির মিনার
যার কণা স্পর্শ পেয়ে রাঙিল অসংখ্য মন, সভ্যতার অশেষ কান্তার
যার তীব্র খরতাপে নিমেষে উড়িয়া গেল বৈষম্যের কৃত্রিম পাহাড়
আলীর দরাজ হাতে যে মরুতে চমকালো শাণিত দুর্বার
দীপ্ত তলোয়ার
সে মাটির বুক থেকে ডাক এল, হে কাফেলা ! আজিকে তোমার !

তোমাকে পৌঁছিতে হবে সোনালি ঊষার আগে যেথা স্তব্ধ
ঘুমন্ত শহর।
নবীজীর বাণী–স্পর্শে যেখানে জাগিয়া উঠে নিশীথ প্রহর
যেখানে জীবিত হয় জড়তার বিকৃত কবর
সুবেহ–সাদেকের আগে সে মাটিতে তুলে নিও জীবনের ঘর
সে মাটির পথে আজ দ্রুততর করো গতি টেনে ধরো উটের লাগাম
নিমেষে মুছিয়া যাক পদতল হ'তে হিন্দ, ইরাক ও শাম,
সে মাটির টানে চলো সব কূল দিক হ'তে হিন্দ, ইরাক ও শাম,
সে মাটির টানে চলো সব কূল দিক হ'তে মত্ত পরওয়ানা
সে মাটির রশ্মিজালে দগ্ধ করো ভাবাকুল ডানা
সে মাটির স্তব্ধ নীরবতা
তোমার ঘুমন্ত মনে তুলুক দুঃসহ ঝড়, গতি চঞ্চলতা।
তোমার মসৃণ সুপ্তি মুছে নিক সে মাটির তীব্র খরোত্তাপ
শৃগাল দুর্বল চিত্তে জাগা'ক সে কুণ্ঠাহীন সিংহের প্রতাপ।
তোমার সংকীর্ণ ঘর করুক সে মানুষের উন্মুক্ত বন্দর
তোমার দুর্বল চিত্তে পাঠাক সে বিজয়ের সহস্র খবর।

তোমাকে পৌঁছিতে হবে সুবেহ–সাদেকের আগে সে মাটিতে
শান্ত মুসাফির
তোমাকে ঘোচাতে হবে সে সফেদ রোশনিতে শতাব্দীর
সঞ্চিত তিমির

www.pathagar.com

পশ্চিমের দারুখানা ভেঙে দিতে হবে সেই ঝড়ে
জিন্দিগীর স্পর্শ এনে দিতে হবে নির্জিত পাথরে।

জিন্দানখানার কক্ষে কাফেলার পদধ্বনি শুনিতে কি পাও
জিঞ্জির আবদ্ধ হাত স্বপ্নঘোরে হলো কি উধাও ;
উতলা হলো কি দিল্ ইশকের আতশী শরাবে ;
উন্মত্ত মাতাল মন জাগল কি লু' হাওয়ার খা'বে ?
তবে চলো তবে চলো দেখ আজ মেঘে মেঘে উদ্যত অধীর
বিদ্যুতের দীপ্ত শমশির
দেখ আজ জালিমের গুপ্ত ছুরি তীব্র খরধার
পিছু ধাওয়া করিছে তোমার ;
দেখ আজ পথে পথে কোকা'ফ কঠিন দুর্লঙ্ঘ্যতা
দেখ আজ বৈশাখের বহ্নি ঝড় উচ্চারিছে ভয়াল ব্যর্থতা।

তবু আজ অকুণ্ঠিত উটের লাগাম ধরো মদীনার পথে মুসাফির
ভেঙে চলো জেহাদের তীব্রোল্লাসে বাধা ও প্রাচীর,
ভেঙে চলো সাবধানী কারুণের মুঠি।
ভেঙে চলো উত্তাল ভ্রূকুটি
তোমার মঞ্জিল যেথা বহুদূরে মানুষের ঘর
নবীজীর ঘুমন্ত শহর॥

খলিফাতুল মুস্‌লেমিন

রাত্রি গাঢ়তর হল মদীনার শামাদানে
বাতি নিভে গেছে।
কে তুমি ?
মানো না রাত্রির মানা, চলিয়াছ একান্ত নির্ভয়,
কত চাঁদ জ্বলে জ্বলে খেজুর শাখায় হল ক্ষয় !
কে তুমি, কে তুমি একেলী ?
পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে চলিয়াছো ক্ষুধিতের দ্বারে,
বারেবারে
মুছিয়া নয়ন !
নেভায়ে সেতারা দীপ চলে গেল মরুর পবন
দূর সিন্ধু ডাকে,
কালো কাফনের মত আঁধার দুলিছে দেখ
জয়তুন শাখে
কোথায় তোমার যাত্রা ?
সে কোন্ সুদূরে ?
কার দ্বারে ?
কোন্ প্রান্তরের পারে ?

www.pathagar.com

তোমার বলিষ্ঠ দেহ বহে আজ একি গুরুভার,
আরো ভারী বোঝা নিয়ে চলিয়াছে ও চিত্ত তোমার !
একি মানুষের বোঝা ? একি মানবতা ?
কও কথা ?
কে তুমি ?
আজ বিয়াবানে বহিতেছে যে বোঝা বিপুল
আলোক-প্রদীপ
একদিন সে আলোয় দেখে নেবে পথহারা
নিরাশা ব্যাকুল
যাত্রীদল যাত্রাপথ-পিপাসা-আকুল
পথের প্রদীপ।
একি গুরুভার বোঝা দিন-রাত্রি বয়ে যাও তুমি !
মানো না দুস্তর মরুভূমি,
মানো না ঝড়ের কালোশ্বাস,
চোখে মুখে সুদৃঢ় আশ্বাস !
সুবিশাল বুক ভরি বিপুল বিশ্বাস
তোমার পথের 'পরে কত ঝড় বয়ে গেল,
মুছিল না তব পদরেখা
কোন ধূলি ডোবালো না তোমার পায়ের শুভ্র ধূলি
মানুষের বুকের মর্মরে
রয়ে গেল চিরন্তন লেখা
মহাকাল বাড়ালো অঙ্গুলি
তোমার মুখের পানে অসীম সম্ভ্রমে...
মদীনার দীপশিখা নিভে গেল ক্রমে
তবুও চলেছ পথে ভারী বোঝা টেনে,
উল্কা তীর হেনে
আদম-সুরাত
বলে গেল তার, দীর্ঘ রাত,
খেজুর শাখার 'পরে
তারা ঝরে পড়ে—
বেদনার সুতীব্র দাহন
করিয়াছে তোমারে উন্মাদ,
কোন কণ্টকিত রাত্রি, কোন মরু-বাঁধ
পারে নাই রুধিতে ও গতি
মানুষের দ্বারে দ্বারে অব্যাহত তবু মুক্ত গতি।

জানি নাই তুচ্ছ রাজ্যপাট
তুচ্ছ বালাখানা,
তুচ্ছ প্রলোভন,
যে মানবতার বহ্নি নিত্য তুমি করেছ বহন

www.pathagar.com

তার কাছে অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীর শাহীতাজ
মানুষের প্রেমের আসনে
তুমি বন্ধু, রাজ-অধিরাজ।
তোমার দারাজ দিল হেলায় জিনিয়া গেল
মানুষের ক্ষুদ্রতার পাপ
পায়ে পায়ে পিষে গেল দাম্ভিকের বিকৃত প্রলাপ
হে দরদী, সমুদ্র-উদার !
সব সংকীর্ণতামুক্ত খুলে গেলে বিচিত্র সত্তার কারা-দ্বার
তুমি কার কান্না শোনো হে পথিক ! কোন দুখিনীর
সন্তান কাঁদিছে
তুমি ভারী বোঝা নিয়ে চলিয়াছ একা ছুটে বেগে
যদি আমি যেতে চাই পিছে
তুমি মানা করো, বলো, এ ভার তোমার :
আমীরুল মুমেনিন—মুমিনের খলিফার ভার।

গতি দ্রুততর হয় শিশুর কান্নায়
বিশাল আকাশে বহে ঝড়,
ও বিশাল বুক ভরি' ক্ষুধাতুর মানুষের
কান্নার খবর
তোলে কোন্ সুবিপুল ঝড়?
কে তুমি, উমর?
হে খলিফাতুল মুস্‌লেমিন !
প্রান্তরের অবকাশে ঐ দেখ মানুষের ঘর !
এখানে নামাও বোঝা, এখানে থামাও গতি
হে বিশ্রান্ত ! হে দারাজ-দিল !
তোমার বিপুল বোঝা সাশ্রুনেত্রে হেরিছে নিখিল !
আকাশের নীচে
বিস্ময় মানিছে জিব্রাইল !
হে দারাজ-দিল !
এবার বিশ্রাম নাও,
এবার থামাও গতি,
অন্তহীন পথ-প্রান্তে নাও তুমি মঞ্জিলের ক্ষণিক বিরতি।—
দেখ চেয়ে অস্তমুখী চাঁদ চলে মেঘেদের পিছে,
সুবে-সাদেকের শান্ত প্রশ্বাস বহিছে,
মদীনার শামাদানে সকল চেরাগ নিভে গেছে...।

এজিদের ছুরি

আমার দুঃস্বপ্নে আজ ফেরে ক্রূর এজিদের ছুরি
আজ সীমারের তীক্ষ্ণ খঞ্জরের নীচে কাঁপে সংখ্যাহীন
ভারাক্রান্ত প্রাণ

www.pathagar.com

আবার সম্মুখে মোর ঘনালো এ কোন্ মৃত্যু কারবালা ময়দান?

মানুষের মুক্ত মাঠে আনিয়াছে কা'রা
এজিদের ছুরির পাহারা!
সম্মুখে মৃত্যুর বাধা পশ্চাতে ক্রন্দন অগণন...

হে ইমাম! করো মৃত্যু পণ
পরো আজ শহীদী লেবাস
মা ফাতেমার কান্না ভরায় আকাশ
কোলে তীর-খাওয়া শিশু মৃত আসগর
কাঁদে আজ স্বৈরাচারী তামসিকতায়
মানুষের আজাদীর ঘর।
ঢাকা প'ড়ে গেছে আজ নর্তকীর নূপুর নিক্বণে
কোরানের ধ্বনি
জালিমের বজ্রমুষ্টি ঢাকিয়াছে নবীজীর উন্মুক্ত সরণি।
মদীনার মুক্ত খিলাফত
বালুকায় হারায়েছে পথ...
হারায়েছে ফোরাতের তটপ্রান্তে মানুষ সকল অধিকার
গোলামী জিঞ্জিরে শোনো ক্রমাগত ওঠে হাহাকার
অযুত প্রাণের নাভিশ্বাস!
তোমাকে ডাকিছে আজ হে ইমাম! কারবালা আকাশ
তোমাকে ডাকিছে আজ অবরুদ্ধ ফোরাতের তীর
তোমাকে ডাকিছে আজ মারণাস্ত্র এজিদের দুর্ধর্ষ সাম্রীর।

হে ইমাম! উঠে এসো, উঠে এসো, শোন
এজিদের ষড়যন্ত্র ক্রূর
দেখ আজ নির্লজ্জ দস্যুর
কুটিল চক্রান্তে বাঁধা ফোরাতের তটরেখা মৃত্যু আবেষ্টনে
ছুরির শাসনে
সভয়ে নিশ্চুপ বিশ্ব মৃত্যুমুগ্ধ শিকারের মত
দেখে চেয়ে শিশুকণ্ঠে রুধিরের ধারা
দেখে চেয়ে কূটচক্রী এজিদের ছুরির পাহারা...

হে ইমাম! শোনো উঠে এসো...

মানুষের মুক্ত সূর্য নেভেনি এখনো
আজো শত মুজাহিদ খুঁজে ফেরে তার
সিপাহসালার
মৃত্যুর বন্ধনী মাঝে আজাদীর মাঠের ইশারা
খুঁজে ফেরে তারা

www.pathagar.com

শূন্য-পৃষ্ঠ দুলদুল সওয়ারের প্রতীক্ষায় থাকে
উত্তাল ক'রেছে তার রুদ্ধগতি ঝড়ের সন্ধ্যাকে...
আজো লক্ষ মুজাহিদ এজিদের খঞ্জরের নীচে
রুদ্ধ রোষে দিন গণে মিছে
ব্যর্থ হয় আর্তনাদ লক্ষ কোটি শিশুর, নারীর
শৃঙ্খল-আবদ্ধ হাতে পড়ে আরো কঠিন জিঞ্জির
বাঁধা পড়ে লু' হাওয়ার গতি
বাঁধা পড়ে সাহারার ঝড়ের সংগতি

কারবালা ময়দান প্রান্তে
পাঠায়েছে শৃঙ্খলিত দীর্ণ হাহাকার

ভাঙো এই পাশবিক শিকলের ধারা
ভাঙো এই রক্তচক্ষু ছুরির পাহারা

হে ইমাম ! শোনো উঠে এসো...

বেলাল

তোমার পায়ের আওয়াজ শুনেছি দূর জান্নাতে সব্জা বাগে,
তোমার পায়ের আওয়াজ শুনেছি সকলের আগে, সবার আগে,
কালো চামড়ায় ঢাকা অতুলন এমন দিল তো দেখিনি আর
কাফ্রী বেলাল ! হাবসী বেলাল ! মুত্তাকী খাঁটি ঈমানদার !

দেখেছি ও দেহে চাবুকের মার, পাথরের ভার, শিলাপেষণ
দেখেছি তোমার আহত সিনার রাঙা দাগে কাঁদে ব্যথিত মন,
আল আহাদের অশেষ প্রেমের দাহনে হারালে হুঁশ তোমার
কাফ্রী বেলাল ! হাবসী বেলাল ! মুত্তাকী খাঁটি ঈমানদার !

দেখ বালু হ'তে মানিক কুড়ালো সর্দার ধীর আবুবকর,
দেখ অপরূপ আভায় উজালা আমাদের মরু মাটির ঘর,
কালো আকীকের এমন জলুশ দেখিনি তো আর, দেখিনি আর
কাফ্রী বেলাল ! হাবসী বেলাল ! মুত্তাকী খাঁটি ঈমানদার !
এল আমাদের সর্দার এল, এল জাহানের মুয়াজ্জিন,
সুবে-সাদেকের রোশনিতে রাঙি' শর্বরী হল মধ্যদিন,
দেখ সে জাগালো নিশিভোরে কত নবীন সূর্য পূর্ণতার
আহা আমাদের সর্দার সেই হাবসী বেলাল, ঈমানদার !

হাজার বছর পার হ'য়ে গেল মরুভূমি হ'ল মাটির প্রাণ
আজ নাই সেই জান্নাতী দান, শুনি না বেলালী সেই আজান,

www.pathagar.com

ঘিরেছে কুফরী কালো উই পোকা শাদা হেলালের শেষ মিনার ;
আজ আমাদের সর্দার নাই হাবসী বেলাল ঈমানদার !

কোথায় সুদূরে জান্নাতে কোন্ গুলশান শোনে তার আওয়াজ,
জাহান্নামীর নিশানীতে ঢাকে আমাদের পথ-ভ্রান্তি আজ,
বৃথা ব'য়ে যায় সালাতের ক্ষণ তোমার আজান শুনি না আর ;
কালো চামড়ার সর্দার নাই, নাই সে সাঁচ্চা ঈমানদার ॥

আলমগীর

দেখ নাকি আজ পাপের তুফান ছাড়ায় সকল সীমা ও দিক
বাঘের গুহায় হানা দিতে চায় পাহাড়ী মূষিক মারাঠি শিখ
জাগে না রাতের ঘুমন্ত শের আহত বক্ষে ঝরে রুধির
এ ঘুম ভাঙাতে রক্ত প্রভাতে জেগে ওঠো বীর আলমগীর ॥

আজ ইতরের ঔদ্ধত্যের পুঞ্জিত পাপ মেঘ সমান
ভীরু শৃগালেরা নির্ভীক হ'য়ে করে সিংহকে অসম্মান
করো বিশ্বাসী সিংহকে নিজ শক্তিতে হানি সূর্য তীর
ইস্রাফিলের 'সূর' হাতে নিয়ে নেমে এসো বীর আলমগীর ॥

দুর্বলচেতা আকবর শা'র মুনাফেক যত সঙ্গীদল
বেদা'তী কুহক মন্ত্র ছড়ায়ে ভরায়েছে ফের পৃথ্বিতল
হে সিপা'সালার ! রাত্রি নিসাড় করো অবসান ভাঙো প্রাচীর
জাগাও আকাশে বজ্র আভাসে তৌহিদ শিখা ; আলমগীর ॥
জাহেলিয়াতের কুফরী আবার ঢাকে তাহ্জীব তমদ্দুন
লাগে মানুষের হৃদয়ে আবার মারী ক্ষয়রোগ জরার ঘুণ
নির্যাতিতের বোবা বেদনায় জমলো কৃষ্ণ মেঘ নিবিড়
এ মেঘ সরায়ে পাহাড় নড়ায়ে দেখা দাও এসে আলমগীর ॥

অগণন শের হ'ল মেষপাল দেখেছ কি সেই রূপান্তর
পেয়েছো খবর আজাদীর ঘর হ'য়েছে বদ্ধ পাপ নগর
জড়তার দারু পান করি কারা নিয়েছে আসন জ্ঞানপাপীর
এ নেশা ঘোচাও সাড়া দিয়ে যাও হে জিন্দাপীর আলমগীর ॥

কোন্ বিয়াবানে?

কোন্ সন্ধ্যার বিয়াবানে আজ
থাম্লো কাফেলা সিপা'সালার ?

www.pathagar.com

পেরেশান পথ-যাত্রীরা, ঢুলে
তন্দ্রায় নত উটের সার,
স্খলিত পাথরে ক্লান্ত অশ্ব ;
মরে শ্রান্তিতে ঘোড়-সওয়ার।

কোন্ কারবালা ময়দানে এসে
হল এ কাফেলা স্থবির পদ ?
কোন্ এজিদের খঞ্জর আজ
বহালো এ বুকে শোণিত নদ ?
কোন্ আজাজিল আন্‌লো এখানে
জিঞ্জির-ভীতি কালো বিপদ ?

কোন্ সন্ধ্যার বিয়াবানে আজ
হারালো কাফেলা : যাত্রীদল ?
কোন্ জড়তার মরু জুল্‌মাতে
সূর্য আমার হ'ল অচল ?
হাওয়ায় নাইকো জীবনের লেশ
ভাসে জড়ভূমে মৃতের দল।
এ কোন্ আঁধার ? সিন্ধুপারের
এ কোন্ আঁধার দিয়েছে হানা ?
এ সর্বগ্রাসী আঁধারের চাপে
সী-মোরগ বুঝি গুটায় ডানা !

পথে শঙ্কার ছায়া ফেলে চলে
এ আঁধার আর মানে না মানা।
হাজার বছর পথ চ'লে আজ
দাঁড়াল কোথায় এ মৃতভূমে ?
সফেদ রোশ্‌নি ঢাকা প'ল আজ
কোন্ মৃত্যুর কুয়াশা ধূমে ?
নিমেষে দারাজ-দস্ত কমজোর
লুটালো হেলাল ধরণী চুমে !

শুধু কাহ্‌ফিল-ওয়ারার ডেরায়
দাঁড়াতো যে নিতে বাজুতে বল,
বজ্র-বিভাসে পার হ'য়ে যেত
জলস্থল ;
হারায়ে আজ সে ঝঞ্ঝার গতি
মোছে ক্রমাগত আঁখি সজল।

হাওয়ায় এখানে লাশের গন্ধ,
আকাশ এখানে মৃতাভ ম্লান,

www.pathagar.com

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ তোলে না
এ বিয়াবানের বুকে আজান ;
মুসার পরশ না পেয়ে আমার
কোহিতূর শুধু মৃত-পাষাণ।

ফেরাও আমার কাফেলার মুখ
আবার মদীনা পথের পানে,
চলুক কাফেলা মরু পার হ'য়ে
সেই কাহ্ফিল-ওয়ারার টানে ;
যেথা সঞ্চয় আবে-হায়াতের
চলো পথ আজ সে সন্ধানে।

কাফেলা সালার ! থেমো না আজকে
মরু-সন্ধ্যায় এ বিয়াবানে,
তাকাও অতীত রশ্মির পানে,
তাকাও সমুখ পথের পানে ;
শোনো একমনে রাত্রির কোণে
জাগে পূর্বাশা দিনের গানে।

শোনো মরুভূর আতপ্ত সুর—
উটের পায়ের দ্রুত আওয়াজ,
শোনো বহুদূরে লু' হাওয়ার সুরে
অনাগত মেঘ হানিছে বাজ,
আসে রক্তিণ জেহাদের দিন
আনে বিয়াবানে শোণিত সাজ।

এই বিয়াবানে সূর্যের টানে
রাত্রির বুকে আসে প্লাবন,
এই বিয়াবানে তৃণের উজানে
জয়তুন-বুকে জাগে স্বপন ;
এই বিয়াবানে আবার কাফেলা
ফিরে পাবে তার নব জীবন॥

নতুন সফর

পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও ; সিন্দবাদ !
এল দুস্তর তরঙ্গ বাধা তিমিরময়ী।
কি হবে ব্যর্থ ক্লান্ত রাতের প্রহর গুণে ?
নতুন সফরে হবে এ কিশ্তী দিগ্বিজয়ী।

www.pathagar.com

তরঙ্গ মুখে জাগে কত ভয় ;—কে জানে আজ ?
দ্বিধা সংশয় কত জমা হয় ;—কে মানে আজ ?
কে ছোটে হারানো গীতিকার পিছে মিথ্যাময়ী ?
এ ঝড়-তুফানে জাগো দুর্বার দুঃসাহসী ;
নতুন সফরে হবে এ কিশ্‌তী দিগ্বিজয়ী।

নয়া বুনিয়াদ গ'ড়ে তুলি নব স্বপ্নসাধ,
পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও ; স্নিদবাদ !

পাল তুলে দাও, পাল তুলে দাও, মেনো না মানা ;
দূরান্তচারী স্বপ্ন এ মনে দিয়েছে হানা।
কা'রা বাধা দেয় ? কূপমণ্ডুক কে ভীরু প্রাণী ?
চার দেয়ালের সীমানার ঘের মোরা না জানি !
মুক্ত ভোরের প্রথম সূর্য চির আযাদ !
পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও ; স্নিদবাদ !

ভোলো জীবনের ম্লান অবসাদ—চরম ক্ষতি,
দেখ চেয়ে দেখ মুক্ত প্রাণের অবাধ গতি !
আয়েশী রাতের বাযুতে আত্মসমর্পণ,
ভুলে যাও তুমি সে অপমৃত্যু—কাল মরণ,
শহীদী রক্তে খুঁজে নিতে প্রাণ নাও শপথ ;
উড়ুক পথের প্রহরা—বাধার এ পর্বত।

বন্দী যেখানে বহু শতকের ক্লান্ত শ্বাস,
আবার সেখানে দিয়ে যাও তুমি প্রাণোচ্ছ্বাস,
জ্বালাও যয়ীফ, মুর্দা দিলের আবর্জনা ;
নিত্য-নূতন পুতুল পূজার এ লাঞ্ছনা,
শেষ হ'য়ে যাক, সুদূরে মিলাক ক্লান্ত শ্বাস—
এই অকারণ উৎকণ্ঠার পাশব ত্রাস।
জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দিগানি,
নতুন সফরে শুরু হোক আজ জীবন সেই ;
মুক্ত প্রাণের রোশনিতে ভয়-শঙ্কা নেই।
কা'বা-কেন্দ্রিক জীবনের এই পরিক্রমা !
ক্লান্ত রাতের সংশয় মনে রেখো না জমা,
সব দরিয়াকে বাঁধবে তোমার ইত্তেহাদ ;
সব প্রতিরোধ ভাঙবে তোমার এই জিহাদ।

জিহাদের মাঝে জানি শুধু আছে যিন্দিগানি,
চলো সেই পথে মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী !

www.pathagar.com

পাড়ি দাও স্রোত কঠিন প্রয়াসে অকুতোভয় ;—
এই নিশীথের তীরে হবে ফের সূর্যোদয়।
বাধার পাথারে কিশ্‌তী ভাসানো স্বপ্নসাধ,
পূর্ণ করেন মালিক আল্লাহ্‌—আল্‌ আহাদ্‌।

*

এক আল্লাহ্‌র দাস ছাড়া কারো ভৃত্য নও,
হক্‌ ইনসাফ, সাম্য ন্যায়ের ঝাণ্ডা বও,
বনি আদমের ব্যূহ মাঝে তুমি জানাও আজ
নতুন চেতনা গ'ড়ে নিতে তার নয়া সমাজ।

*

দ্বীপ হ'তে দ্বীপে বিদ্যুৎ ঝড়ে এই খবর
পড়ুক ছড়িয়ে, যাক্‌ সে জ্বালিয়ে মৃত কবর,
মুক্ত প্রাণের ইয়যত্‌ পেতে নিক শপথ
সারা দুনিয়ার বন্দী পাথার, রুদ্ধ পথ
খিযিরের সাথে ঝড়-সংঘাতে অগ্রগামী
নব জীবনের অভিযানে আর যেও না থামি'।

পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও ; সিন্দবাদ !
এল দুস্তর তরঙ্গ বাধা তিমিরময়ী !

কি হবে ব্যর্থ ক্লান্ত রাতের প্রহর গুণে ?
এ ঝড় তুফানে জাগো দুর্বার দুঃসাহসী ;
নতুন সফরে হবে এ কিশ্‌তী দিগ্বিজয়ী।

নতুন মিনার

এস আমরা এক নতুন মিনার গড়ি
সেই সব অমর শহীদানের স্মরণে
যাদের দুর্জয় সংকল্প কোনদিন প্রতিহত হয়নি
সাম্রাজ্যবাদী আর ব্রাহ্মণ্যবাদী কূটচক্রে !

মহান নেতার সংগ্রামী আহ্বান
যে দিন দশ কোটি মজ্‌লুমের মনে
আগুন ধরিয়ে দিল,
সে দিন তা'রা উঠে এসেছিল
সত্য আর ন্যায়ের সংগ্রামে
শঙ্কাহীন
অযুত, লক্ষ মুজাহিদ !

www.pathagar.com

তাদের পরিচিতি ছিল এক,
তাদের লক্ষ্য ছিল এক,
তাদের বিশ্বাসে ছিল
ঐক্যের অমোঘ প্রেরণা !

তা'রা ভয় পায়নি
সংগ্রামের কঠোরতা দেখে,
তা'রা থমকে দাঁড়ায়নি
শাসকের রক্তচক্ষু দেখে,
বিভ্রান্ত হয়নি তা'রা খান্নাসের মিথ্যা মন্ত্রণায়।

আদর্শের সংগ্রামে
তা'রা ছিল নির্ভীক, আপোষহীন,
সর্বস্ব ত্যাগের আহ্বানে
তা'রা ছিল আকাশের মত উদার ;
আজাদীর মুক্ত সূর্য টেনে আনতে
তা'রা দিয়ে গেল অকৃপণ রক্তধারা !
রক্তের সেই বন্যা আমরা দেখেছি
যে বন্যায় ভেসে উঠেছে
অশেষ সম্ভাবনা-দীপ্ত
আমাদের স্বাধীন স্বদেশভূমি।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস
সে-তো অগণিত মুজাহিদের
অনমনীয় সংগ্রামের ইতিহাস !

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস
নিযুত লক্ষ শহীদের রক্ত-বন্যার ইতিহাস।

এস, সেই সব শহীদানের স্মরণে
আমরা এক নতুন মিনার গ'ড়ে তুলি॥

চতুর্দশপদী

[কাফেলার প্রতি]

যাত্রা করো, যাত্রা করো হে কাফেলা ! রাত্রির প্রচ্ছায়
কত চাঁদ ক্ষয়ে গে'ল, চেরাগ নিভিল সেতারার।
দিন কি হয়নি শুরু ? দিন আজও আসেনি তোমার ?
শত ব্যর্থতার কান্না হাওয়ার প্রশ্বাসে শোনা যায় !

www.pathagar.com

তোমার কাফেলা জানি হারাবে না কোন সাহারায়;
তোমার প্রভাত রবি চিরদিন তারুণ্যের রবি
মরু মদীনার নবী চিরদিন মানুষের নবী
চির যাত্রিকের ভীড় দেখিয়াছি তাঁর দরজায়।

তোমার দিগন্তে আজ জাগিয়াছে যদি সে মঞ্জিল,
তোমার পথের প্রান্তে তৃষিত ক'রেছে যদি ভিড়
হাতে হাত রেখে যদি মুসাফির জনের মিছিল
ছিঁড়েছে রাত্রির বাঁধ ভাঙিয়াছে পথের প্রাচীর
তবে পথে নেমে এসো হে কাফেলা ! নাহি শুনো মানা
বিপদের কালো ডানা হোক্ তব পথের নিশানা॥

দুই মৃত্যু

দুই মৃত্যুর মাঝখানে মোরা দাঁড়ায়েছি আজ এসে !
হে মুসা কালীম ! দেখ চেয়ে পিছু কারুণের বেষ্টনী;
জাগে ফেরাউন নির্ভীক সম্মুখে !

পুতুল পূজার রাত শেষে এল
আত্মপূজার রাত,
এল কারুণের আজদাহা লোভ
নেমে এল সংঘাত
আবার নতুন বেশে !

তুমি জানবে না হে মুসা কালীম !
আখেরী এ জামানাতে
দুই মৃত্যুর মাঝখানে মোরা
কেন দাঁড়ায়েছি এসে ?

তুমি ভেবেছিলে হেরার সূর্য
ঘোচাবে যে জুল্‌মাত
সেই প্রভাতের শেষে কোনদিন
আস্‌বে না কালরাত;
তবু সে এসেছে ফিরে
নিজের দু আঁখি বন্ধ করিয়া
অন্ধ নয়ন নীরে।

সাত আসমান পার হ'য়ে তাই
ওড়ে না গানের পাখী
অন্ধ জড়ের আঁস্তাকুড়েই
বিফলে সে মরে ডাকি'...

www.pathagar.com

সে বেদনা নয়—।
তুমি জানবে না,—শুধু এ বেদনা মোর—।
তবুও জানাতে চাই
ফেরাউন আছে, র'য়েছে কারুণ
শুধু যে মুসা-ই নাই॥

হে আত্মবিস্মৃত সূর্য

শর্বরীর মেঘ স্তর অন্ধকারে ফেরে মত্ত দৈত্যের সমান
হে আত্মবিস্মৃত সূর্য! এখনো কি প্রভাতের হয়নি সময়?
এখনো কি সুষুপ্তির অন্তরালে টানি যবনিকা
হে মোর প্রভাত সূর্য! তমিস্রার খুঁজিবে আশ্রয়?
কত যুগান্তের বহ্নি বক্ষতলে হয়েছে সঞ্চিত,
আকাশে বাতাসে কত আর্তস্বর করে হাহাকার
হে সূর্য! বঞ্চিত সেই বিষতিক্ত প্রাণের প্রদাহ
এখনো কি হবে না প্রকাশ?
এখনো কি হয়নি সময়?

অসাম্যের ঘূর্ণাবর্তে যে লুণ্ঠিত জনতা এখনো
তোমাকে ফিরিছে খুঁজে ব্যাকুল শতাব্দী তীরে এসে
তোমার আলোক থেকে হে সূর্য! এখনো তারা রবে কি বঞ্চিত?
তোমার উদার দীপ্তি মুক্তি কি পাবে না আর এ অন্ধ নিশীথে?
দেখ লুব্ধ কারুণের লোভ-হিংস্র দৃষ্টিতলে জনতা উন্মাদ,
দিশাহারা হয়ে ফেরে আঁধার জিন্দান থেকে অন্ধ মৃত্যুকূপে,
তিমির পিপাসু যত শবভুক পিশাচেরা করে আনাগোনা
অন্ধ ক্ষমতায় মত্ত ভাবে তারা প্রভাতের রুধিবে দুয়ার।

কত কাল স'য়ে যাবে এই অপমান?
আত্মঘাতী বঞ্চনার এই অভিশাপ,
এই অর্থহীন কুণ্ঠা দৌর্বল্যের এ ভীরু আড়াল,
কৃত্রিম কুয়াশা ঘেরা শতাব্দীর এই মধ্যক্ষণে
হে আত্মবিস্মৃত সূর্য! মেনে নেবে আর কতদিন?
পদানত জীবনের সীমারেখা দিগন্তে কি যায়নি মিলায়ে?
তবু কেন
তবু কেন দেখা যায় স্খলনের মসীকৃষ্ণ রেখা
কুঞ্চিত ললাটে তবু সংশয় ঘনায়মান!
কেন?
কেন নিশাচর হিংস্র পিশাচেরা করে আনাগোনা?
জীবনের এ ব্যর্থতা (জানি তুমি) পারো মুছে দিতে
পিশাচের জয়ধ্বনি নিমেষে আমারে দিতে পারো;

www.pathagar.com

আকাশ জ্বালাতে পারো প্রলয়ের শিখা দিয়ে তুমি
পৃথিবী গড়িতে পারো মরণের উন্মত্ত পাথারে !
তবু কেন স'য়ে যাও নিয়মের এই ব্যাভিচার ?

কত কাল আর স'য়ে যাবে ?
হে আত্মবিস্মৃত সূর্য ! সংগোপনে রবে কত কাল ?

জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে

আর একবার সূর্য ! জেগে ওঠো প্রদীপ্ত গৌরবে।

এ অন্ধ গুহায় আজি তোমার একান্ত প্রয়োজন,
সংকীর্ণ শতাব্দী কূপে আনো আনো মুক্তির সংবাদ
ক্ষুদ্র এ গণ্ডীর মাঝে আকাশের উদারতা আনো।

আত্মঘাতী বৈষম্যের সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্র জালে
নিজেকে আবদ্ধ রেখে উর্ণনাভ সম হতাশ্বাস।
অকারণে সৃষ্টি আর করিব না পথ স্খলনের
আত্মবঞ্চনার অস্ত্রে, খুঁজিব না প্রাণের পাথেয়
যদি একবার তুমি জ্ব'লে ওঠো পূর্ণ মহিমায়।

তোমার দাহন থেকে প্রবঞ্চিত এ জীবন আজি
হ'য়েছে তুহিন মেরু—ফুলহীন, ফলশস্যহীন।
অতন্দ্র দীঘল রাত্রি জেগে শুনি ঝড়ের প্রশ্বাস,
শ্বাপদের কোলাহল শুনি। জেগে ওঠো, জেগে ওঠো
হে সূর্য ! আবার এই প্রাণহীন শর্বরীর তীরে
সর্ব আবরণমুক্ত, সুপ্রতিষ্ঠ ঐশ্বর্যে প্রাণের।

যে বিপুল প্রাণৈশ্বর্যে একদিন (বহু যুগ আগে)
আকাশ জাগায়েছিলে, পৃথিবী জাগায়েছিলে আর
শূন্য মাঠে এনেছিলে যেমন সম্পূর্ণ মানবতা
তেমনি আবার এসে জাগাও এ মরু পৃথ্বিতল
এ মাটিতে গ'ড়ে যাও স্বপ্নসাধ নিখিল বিশ্বের।
বর্গী এসে হানা দেয় বারবার ঘুমন্ত নগরে
লুটে নিয়ে যায় তারা জীবনের ফুল ও ফসল
শান্তির পশরা তা'রা চূর্ণ ক'রে যায় প্রতি পা'য়।

অথচ অজ্ঞান এরা, শৃঙ্খলিত অভ্যাসের দাস
অন্যায়ের দণ্ডাঘাত স'য়ে যায় অভ্যস্ত জীবনে

www.pathagar.com

যদিও কান্নায়·ভরে আকাশের প্রাচীন খিলান
প্রত্যেক দিগন্ত থেকে শোনা যায় লক্ষ আর্তস্বর
তবু মেনে চলে এরা দ্বিধাহীন বর্গীর শাসন।

এ অন্ধ সমাজে তাই বৃথা আজ আলোর সন্ধান
যদি না জ্বালাতে পারো অগ্নিশিখা প্রত্যেক প্রান্তরে,
প্রত্যেক ঘুমন্ত মনে ঝড় যদি না পারো বহাতে
তা'হ'লে জীবন ব্যর্থ ; স্বপ্ন মোর সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

যে স্বপ্ন র'য়েছে চাপা লক্ষ অপমৃত্যুর গুহায়,
যে স্বপ্ন হ'য়েছে ম্লান ধনিকের কঠিন সঙ্গীনে
যে স্বপ্ন হ'য়েছে ব্যর্থ অসাম্যের নির্মম মরুতে
—সে স্বপ্ন সম্পূর্ণ করো। সে স্বপ্ন জাগায়ে যাও তুমি
মুমূর্ষু নিশীথে আনো প্রাণবন্ত আলোর জোয়ার
আর একবার সূর্য জেগে ওঠো প্রদীপ্ত গৌরবে॥

বৈশাখ

ধ্বংসের নকীব তুমি হে দুর্বার, দুর্ধর্ষ বৈশাখ
সময়ের বালুচরে তোমার কঠোর কণ্ঠে
শুনি আজ অকুণ্ঠিত প্রলয়ের ডাক॥
চৈত্রের বিশীর্ণ পাতা রেখে গেছে শেষ চিহ্ন সালতামামীর,
ফাল্গুনের ফুলদল (কো'কাফের পরী যেন) আজ শুধু কাহিনী স্মৃতির,
খর রৌদ্রে অবসন্ন রাহী মুসাফির যত পথ-প্রান্তে নিঃসাড়, নিশ্চল,
আতশের শিখা হানে সূর্যরশ্মি লেলিহান, ঝিমায় মুমূর্ষু পৃথ্বিতল,
রোজ হাশরের দগ্ধ, তপ্ত তাম্র মাঠ, বন মৃত্যুমুখী, নিস্তব্ধ, নির্বাক ;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে
এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ॥

প্রজ্ঞার বর্তিকা নিয়ে দূর-দূরান্তের পথে চ'লে গেছে দিশারী খিজির,
শস্য-শ্যামলিমাহীন ঊষর প্রান্তর যেন শূন্যতার প্রতীক পৃথ্বীর,
চৈত্রের বিশ্রান্ত শ্বাস মূর্ত হ'য়ে ওঠে শুধু তাপদগ্ধ, উদভ্রান্ত জীবনে,
নিষ্প্রাণ শূন্যতা নিয়ে বিমর্ষ প্রান্তর,—মন গুমরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
খর রৌদ্রে উদ্ঘাটিত ব্যর্থতার এ অধ্যায়, প্রাণহীন এ নদীর বাঁক ;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে নিষ্প্রাণ দিনের তীরে
এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ॥

হারায়ে সাক্বনা, শান্তি চৈত্রের গুমোটে বন্দী ধরা মৃত্যু-ম্লান,
রৌদ্রদগ্ধ পৃথ্বিতল দেখে শুধু অপমৃত্যু—মওতের জিঞ্জির, জিন্দান,

www.pathagar.com

শত বিকৃতির ছাপ, পঙ্গুতার ম্লান ছায়া পৃথিবীতে জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
পুঞ্জীভূত হতাশায় বিষ-বাষ্প জ'মে ওঠে লক্ষ্যহীন বিভ্রান্ত জীবনে,
গতিহীন জড়তায় বিকলাঙ্গ জীবনের পথে জমে ক্লেদ, গ্লানি, পাঁক ;
এ দুঃসহ জীবনেরে নাড়া দিয়ে এস ফিরে
এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ ॥

এস তুমি সাড়া দিয়ে বিজয়ী বীরের মত, এস স্বর্ণ শ্যেন,
বাজায়ে নাকাড়া, কাড়া এস তুমি দিগ্বিজয়ী জুলকার্ণায়েন,
আচ্ছন্ন আকাশ নীলে ওড়ায়ে বিশাল ঝাণ্ডা শক্তিমত্ত প্রাবল্যে প্রাণের
সকল প্রাকার, বাধা চূর্ণ করি মুক্ত কর পৃথিবীতে সরণি ত্রাণের,
সকল দীনতা, ক্লেদ লুপ্ত কর, জড়তার চিহ্ন মুছে যাক ;
বিজয়ী বীরের মত নির্ভীক সেনানী তুমি
এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ ॥

অগণ্য, অসংখ্য বাধা ওড়ায়ে, প্রবল কণ্ঠে তুলি তীব্র পরুষ হুঙ্কার
হে বৈশাখ ! এস ফিরে বজ্রের আগুনে দীপ্ত—আল্লার দু'ধারী তলোয়ার,
ভ্রষ্ট, গুমরাহা যত নির্বোধের অহমিকা, শূন্যগর্ভ দম্ভ, আস্ফালন
চূর্ণ করি এস তুমি শঙ্কাশূন্য রণাঙ্গনে সমুজ্জ্বল সেনানী যেমন
নিঃশঙ্ক আল্লার শের—দীপ্ত আবির্ভাবে যার পলাতক ফেরুপাল, কাক ;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে
এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ ॥

মিথ্যা বাতিলের দুর্গ ধ্বংস করি ; ধ্বংস করি বিভীষিকা সঞ্চিত রাত্রির
তৌহিদী পয়গাম কণ্ঠে যেমন দাঁড়ালো এসে মর্দে খোদা—জালালী ফকীর
মূসা কালীমের মত 'আসা' হাতে তীব্র দৃষ্টি বাংলার প্রান্তরে
চৈত্রের বিভ্রান্তি ভেঙে তেমনি বৈশাখ এস খর রৌদ্রে...এস ঘরে ঘরে,
তোমার সংঘাতে এই পৌত্তলিক জড়তার মৃত্যুম্লান শর্বরী পোহাক ;
কালের কুঠার তুমি নিষ্প্রাণ এ জনারণ্যে
এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ ॥

কিম্বা রোজ আযলের প্রোজ্জ্বল শিখার মত মুক্ত লেলিহান
জ্বালায়ে সকল আঁধি হে সাধক ! দাও এসে মুক্তির আহ্বান,
প্রখর তোমার দাহে মিথ্যা তেলেস্মাত, যাদু,—পুড়ে যাক সত্তা তামসিক
শুনুক সমগ্র বিশ্ব তোমার প্রবল কণ্ঠ হে দুর্জয় সত্যের সৈনিক !
শুনুক সভয়ে যত আত্মরতিমগ্ন প্রাণ জড়তায় নিস্তব্ধ, নির্বাক ;
পদ্মা মেঘনার তীরে এস তুমি এস ফিরে
এ জীবন সংগ্রামের বৈশাখ ॥

ধ্বংসের নকীব তুমি হে বৈশাখ ! এস ফিরে, এস তুমি অপূর্ব সুন্দর,
বৎসরের সূচনায় পিঙ্গল আকাশে দেখি অগ্নি বর্ণে তোমার স্বাক্ষর.

www.pathagar.com

প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে অচ্ছেদ্য, অভিন্ন সত্তা,—ধূলিরুক্ষ এ পাক জমিনে,
জরাগ্রস্ত পৃথিবীতে, অথবা বিক্ষত প্রাণে এস তুমি এস পথ চিনে,
তোমার প্রাণের তাপে ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের ক্লেদ, গ্লানি সব জ্ব'লে যাক ;
পুরাতন বৎসরের প্রান্তর ছাড়ায়ে এস ;
এস চির দুর্জয় বৈশাখ ॥

বিদায় বিগত বর্ষ ! হে বিশীর্ণ পুরাতন আলবিদা জানাই তোমাকে,
নতুনের স্বপ্ন জাগে মৃত্যুম্লান পৃথিবীতে রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের বাঁকে,
নিষ্প্রাণ এ জড়তার বুকে জাগে তীব্র গতি, জাগে ঝঞ্ঝা রব,
দুরন্ত ঝড়ের বেগে অচল স্থাণুর বুকে ওঠে জেগে উদ্দাম বিপ্লব,
সুখ-বিলাসীর স্বপ্ন ভেঙে যায়, ভেঙে পড়ে কারুণের সঞ্চিত মৌচাক ;
সুপ্তির সমুদ্র থেকে জাগ্রত প্রাণের দ্বারে
হানা দেয় প্রমত্ত বৈশাখ ॥

মৃত্যু-ঘন অন্ধকারে জ্বালায়ে বিদ্যুৎ-ক্ষণ দীপ্ত জুল্‌ফিকার
নববর্ষ শুরু হয়, নতুন বৎসর আসে সংগ্রামের পথে দুর্নিবার,
সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাঝে, শ্রম সাধনার পথে অপূর্ব উল্লাসে
'খোশ আমদেদ' ধ্বনি সকল দিগন্ত হ'তে আজ ভেসে আসে,
ব্যর্থতার যত গ্লানি মিশে যায় দূরান্তরে—পলাতক বলাকার ঝাঁক ;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে মুক্ত জনতার মাঝে
আসে আজ প্রমত্ত বৈশাখ ॥

হে বৈশাখ ! এস এস খররৌদ্র-উদ্ভাসিত প্রমুক্ত নীলার শাহ্‌বাজ
ঝড়ের দু'পাখা মেলে হানা দাও কণ্ঠে তুলে দ্বিধাহীন বজ্রের আওয়াজ,
দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, বিশাল অরণ্য আর জনপদ—বিমর্ষ শিকার
মুহূর্তে উঠুক জেগে, উঠুক সভয়ে কেঁপে দু'পাখার ঝাপটে তোমার,
প্রচণ্ড আঘাতে সেই রুদ্ধ গতি জীবনের সব গণ্ডী—সীমানা হারাক ;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে
এস তুমি প্রমত্ত বৈশাখ ॥

হে বৈশাখ ! এস এস ... জিঞ্জির, জিন্দান ভেঙে সুলেমান নবীর উম্মৎ
প্রমত্ত জ্বিনের মত সদ্যমুক্ত এস তুমি তোলপাড় করি' সারা পথ,
উথালপাথাল ঢেউ দরিয়ার বুকে তুলে ক্ষণিকের মৃত্যু মহোৎসবে
ডোবায়ে হাজার কিশ্‌তী লক্ষ ডিঙি চল তুমি হে বৈশাখ, শত বজ্র রবে !
আতঙ্কিত ছাড়ে পথ দুই পাড়ে তরু শ্রেণী নারিকেল, তাল ও গুবাক ;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে
এস ফিরে উন্মত্ত বৈশাখ ॥

হে বৈশাখ ! এস এস পাড়ি দিয়ে অতলান্ত দরিয়া কিনার,
হে দুর্ধর্ষ, উঠে এস বাষ্পীভূত কাল মেঘ—সমুদ্রের তাজীতে সওয়ার,

www.pathagar.com

অমা-অন্ধকার-ঘন, ঝড় গতি সে তাজীর তীব্র হ্রেষা রবে
ভীরুতার অবসানে মহান মৃত্যুর মাঠে জীবনের খেলা শুরু হবে,
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লোভ যত, গণিতের খতিয়ান অসমাপ্ত,—সব বন্ধ থাক ;
সূরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা-মেঘনার তীরে
এস ফিরে প্রমত্ত বৈশাখ ॥

কিংবা তুমি উঠে এস দুরন্ত, দুর্বার গতি শঙ্কাহীন হে ঘোড়-সওয়ার
ওড়ায়ে জড়তা শিলা, ওড়ায়ে সকল বাধা, দ্বন্দ্ব-দ্বিধা সংশয়ের ভার
পিষে ফেলে যাও সব রাজ্য, রাজধানী, গ্রাম, জনপদ, মাঠ ;
আল্লার আলমে তুমি মর্দে মুজাহিদ, বীর, সমুন্নত প্রদীপ্ত ললাট,
তোমার তকবিরে তাই ত্রস্ত কুল মখলুকাত,—জীবনের, এ নদীর বাঁক
সময়ের হাতিয়ার কোষমুক্ত খরধার
এস চির দুর্জয় বৈশাখ ॥

সংগ্রামে, সংঘর্ষে দীপ্ত এস তুমি হে বৈশাখ !—বিপ্লবের প্রতীক অম্লান
স্বাগত জানায় তাই তোমাকে বিপ্লবী বীর আশ্‌রাফুল মখ্‌লুক ইনসান,
তোমার বিধ্বংসী রূপে ভয় পায় ভীরু প্রাণী, অবিশ্বাসী অথবা দুর্বল,
তোমার বিধ্বংসী রূপে মর্দে মুমীনের মন উচ্ছ্বসিত, আনন্দ-চঞ্চল,
পথসঙ্গী সে তোমার জঙ্গী সে নির্ভীক প্রাণ যে শুনেছে জেহাদের ডাক
সর্বশক্তিমান যিনি তাঁর আধিপত্য মানি,
চল জঙ্গী নির্ভীক বৈশাখ ॥

সংগ্রামী তোমার সত্তা অদম্য, অনমনীয়,—বজ্রদৃঢ় প্রত্যয় তোমার,
তীব্র সংঘর্ষের মুখে বিশাল সৃষ্টিকে ভেঙে অনায়াসে কর একাকার,
সম্পূর্ণ আপোষহীন, মধ্যপথে কোন দিন থামো না তো, জানো না বিরতি,
তোমার অস্তিত্ব আনে ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে অবিচ্ছিন্ন, অব্যাহত গতি,
প্রচণ্ড সে গতিবেগ ভাঙে বস্তি, বালাখানা, ভেঙে পড়ে জামশিদের জাঁক,
লাভ-ক্ষতি সংজ্ঞাহীন, নিঃশঙ্ক, নিঃসঙ্গ তুমি
হে দুর্বার, দুর্জয় বৈশাখ ॥

তোমার অবাধ গতি সমুদ্রে, প্রান্তরে কিংবা সুদুর্গম অরণ্যে, পাহাড়ে ;
যত পাও প্রতিরোধ সম্মুখে চলার পথে তোমার উল্লাস তত বাড়ে,
তোমার চলার তালে রুদ্ধদ্বার কক্ষ ভাঙে, ভাঙে দুর্গ, আবদ্ধ প্রাকার,
স্থবির জড়তা, ক্লেদ উড়ে যায় শুষ্ক তৃণ হে বৈশাখ ! সংঘর্ষে তোমার,
ধ্বংসের নেশায় মেতে উড়ায়ে গুঁড়ায়ে চল প্রতিরোধ, বাধা, দুর্বিপাক,
জাগায়ে ধ্বংসের সুরে খণ্ড কেয়ামত যেন
প্রমত্ত ধ্বংসের সুরে ধাও তুমি চির দিন
হে নির্মম, নির্ভীক বৈশাখ ॥

হে বৈশাখ ! এস, এস... স্রষ্টা যিনি লা-শরিক জব্বার, কাহ্‌হার
তাঁর আজ্ঞাবহ তুমি নিয়ে যাও দেশে দেশে প্রলয় ধ্বংসের সমাচার,

www.pathagar.com

বিধূনিত তুলা সম উড়ে যাবে এ পৃথিবী, যে দিন পাহাড় ;
তোমার চলার তালে হে বৈশাখ ! পাই আমি নিশানা যে তার
ধ্বংসের কঠোর দূত জানো না তো কোমলতা, দাও এসে প্রলয়ের হাঁক ;
প্রমত্ত ধ্বংসের সুরে ধাও তুমি চির দিন
হে নির্মম, নির্ভীক বৈশাখ ॥

বৈশাখ ! তোমার স্রষ্টা জব্বার, কাহ্হার যিনি রহীম, রহমান ;
তাঁর ইশারায় জানি ফুলের পাপড়ি মেলে অগ্নিকুণ্ডে শিখা লেলিহান,
অশেষ রহমত যাঁর বৃষ্টিধারা নিয়ে আসে জীবনের নব রূপায়ণ,
ধ্বংসের সমাধি স্তূপে সবুজ ঘাসের শীষে দেখা দেয় জান্নাত্ নূতন,
শহীদী লহুর স্পর্শে প্রাণবন্ত হয় ফের এ জমিন—কারবালার খাক ;
তোমার ধ্বংসের সুরে অনাগত সৃষ্টি স্বপ্নে
মন তাই উধাও বৈশাখ ॥

ঝড়

এক

হে বন্য বৈশাখী ঝড় !—হে দুর্দম ! জীবন-মৃত্যুর
হিংস্র পটভূমিকায় ভ্রাম্যমাণ, তুমি যাযাবর,
পাড়ি দিয়ে যেতে চাও মহা বিশ্ব, দূরান্ত সুদূর !...

জন্মের মুহূর্ত থেকে ছেড়ে তাই পরিচিত ঘর
দৈত্যের তাঞ্জামে চল শঙ্কাহীন তুমি দুর্নিবার,
ছড়ায়ে দক্ষিণে বামে উল্লসিত মেঘের কেশর

ঘূর্ণাছন্দে টেনে তোল সিন্ধু-বক্ষে প্রবল জোয়ার
(পৃথিবীর দূর প্রান্তে উচ্চারিত হয় তাই নাম) !
প্রবল গতির মুখে খুলে ফেলে দিগন্তের দ্বার

প্রমত্ত প্রাণের বেগে চল তুমি, চাও না বিশ্রাম !
তোমার উন্নত শির স্পর্শ করে আকাশ খিলান,
ক্রুদ্ধ, ভয়ংকর রূপ,—জানি তবু নয়নাভিরাম !

তোমার চলার তালে ওঠে ঘূর্ণি—প্রমত্ত তুফান ;
হে বন্য বৈশাখী ঝড় চল নিয়ে ধ্বংসের আহ্বান ॥

দুই

হে বন্য বৈশাখী ঝড় ! গতিস্রোত প্রমত্ত ভয়াল
ধ্বংসের নেশায় মাতি, যৌবনের উল্লাসে নির্মম
পাড়ি দাও অনায়াসে ফেন-ক্ষুব্ধ সমুদ্র উত্তাল,

www.pathagar.com

ডোবায়ে হাজার কিশ্‌তী, লক্ষ ডিঙি,—অরণ্যে দুর্গম
অতর্কিতে এসে তুমি হানা দাও দস্যু দুর্নিবার,
দুর্ভেদ্য প্রাকার যেন ঘন বন করি অতিক্রম

মুহূর্তের মাঝে তুমি আদিগন্ত মাঠ হও পার !
দীপ্ত বিদ্যুতের ফণা চম্‌কায় দিগন্তে সর্পিল ;
তবু তুমি শঙ্কাহীন মৃত্যু মেঘে নির্ভীক সওয়ার

চলার নেশায় মত্ত ধ্বংস রসে আকণ্ঠ ফেনিল
দিক-চক্র পাড়ি দিয়ে কর নব দিগন্ত সন্ধান !
আকাশের ঝরোকায় সবিস্ময়ে দেখে জিব্রাইল

জাগায়ে প্রবল কণ্ঠে মৃত্যু আর মুক্তির আহ্বান
বজ্রের আগুনে দীপ্ত, ভয়ংকর চ'লেছে অম্লান ॥

তিন

হে বন্য বৈশাখী ঝড় ! হে উদ্দাম, নৃশংস, নিষ্ঠুর
বিশাল, বলিষ্ঠ সত্তা, আজীবন অভ্যস্ত সংগ্রামে
তোমাকে ঘিরিয়া জাগে জীবন-মৃত্যুর দুই সুর !

সাড়া জাগে যে মুহূর্তে চাও তুমি দক্ষিণে ও বামে,
সচকিত হয় মৃত্যু ধাও তুমি সম্মুখে যখন,
তোমার চলার তালে জীবনের ছন্দ ওঠে নামে

কিংবা সংঘর্ষের মুখে হয় তার নব রূপায়ণ
(শ্রান্তিহীন গতিবেগে জিন্দেগানী হয় না মলিন)।
গণ্ডীর বন্ধন-মুক্ত, শক্তিমান, প্রোজ্জ্বল জীবন

উন্মুক্ত সড়কে দেখে প্রতিরোধ—সংঘাতের দিন
দ্রুত হ'তে দ্রুততর, দ্রুততম গতিতে প্রবল,
প্রচণ্ড আঘাত হানি দুর্নিবার শক্তিতে শাহীন

উড়ে যাও দূরান্তরে কাঁপায়ে আকাশ, জলস্থল ;
হে বন্য বৈশাখী ঝড় ! মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ প্রোজ্জ্বল ॥

চার

হে বন্য বৈশাখী ঝড় ! ধাবমান,—আল্লার আলমে
ক্ষুধিত বাঘের মত অতিক্রম ক'রে যাও পথ,
শংকিত প্রান্তর কাঁপে হে দুর্ধর্ষ তোমার বিক্রমে !

www.pathagar.com

তোমার গর্জনে জাগে জনপদ, অরণ্য, পর্বত ;
সুবিশাল বনস্পতি প'ড়ে যায় পথে মুখ গুঁজে,
সুদূরের পথযাত্রী মুসাফির হারায় হিম্মৎ ;

বিধ্বস্ত বাসনা যত ঝরা পাতা মরে পথ খুঁজে !
উৎক্ষিপ্ত ধূলায়, মেঘে মালেকুল মৌত আজরাইল
বিদ্যৎ চাবুক হানে মুহুর্মুহু নীলার গম্বুজে !

কম্পমান এ পৃথিবী, লুপ্ত হয় তারার মিছিল
অচেনা জগৎ প্রান্তে হানা দাও সন্ধ্যায় যখন,
তোমার প্রবল কণ্ঠ গর্জে যেন সূরে ইস্রাফিল,

শংকিত এ পৃথিবীতে কাঁপে যত সংশয়িত মন ;
মৃত্যুর সম্মুখে কাঁপে কলুষিত, কদর্য জীবন ॥

পাঁচ

রুদ্ধ গতি যে জীবন ক্লেদলিপ্ত জড়তায়, পাপে,
কলঙ্কিত যে জীবন আত্মরতিমগ্ন—পাঁকে ডোবে,
অবিশ্বাসী যে জীবন স্বস্তিহীন সংশয়ের তাপে,

হতাশ্বাস যে জীবন আত্মঘাতী ব্যর্থতার ক্ষোভে,
লক্ষ্যভ্রষ্ট যে জীবন পৈশাচিক বিকৃতিক নীড়ে,
অভিশপ্ত যে জীবন সর্বগ্রাসী পাশবিক লোভে,

কলুষিত সে জীবনে হে দুর্বার আস তুমি ফিরে,
হানা দাও সে জীবনে হে বৈশাখী ঝড় বজ্রবেগে,
প্রবল ধ্বংসের রোল তোল সেই জিন্দেগানী ঘিরে,

জাগায়ে মৃত্যুর সাড়া অন্ধকার প্রলয়ের মেঘে
চকিতে জাগায়ে বিশ্ব—মৃত্যুভীত দুনিয়া জাহান
উন্মত্ত নেশায় তুমি দেখা দাও উদ্দাম আবেগে,

আত্মবঞ্চনার কিংবা বিকৃতির করি অবসান
হে বন্য বৈশাখী ঝড় ! দাও তুমি সংগ্রামী আহ্বান ॥

ছয়

তুমি বিপ্লবের দূত,—জীর্ণ প্রথা গতানুগতিক
ধ্বংস করি পৃথিবীকে জানাও সৃষ্টির সমাচার,
মুহূর্তের মাঝে আনো জীবনের ধারা বৈপ্লবিক ;
তোমার চলার তালে শেষ হয় রুগ্ন জড়তার !

www.pathagar.com

পরমুখাপেক্ষী, ভীরু, গলগ্রহ, অনুকারী প্রাণ
সংগ্রামী, স্বাধীনচেতা হয় বজ্র-নির্ঘোষে তোমার,

ব্যাধিগ্রস্ত মানসের ঘটায়ে নির্মম অবসান
বিপ্লবী সে শুরু করে জীবনের অধ্যায় নূতন,
ঊষর মরুর বক্ষে জাগায়ে ঝর্ণার কলতান

প্রাণৈশ্বর্যে গ'ড়ে তোলে দুনিয়ার জান্নাত কানন।
মুক্ত জীবনের খেলা মরণের পটভূমিকায়
ঘুমন্ত শক্তির উৎসে ঘটায় সুতীব্র বিস্ফোরণ,

কালের আর্শিতে আমি ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুৎ ছটায়
বিপ্লবের সেই রূপ দেখি চেয়ে উদ্দাম ঝঞ্ঝায়॥

সাত

মুমূর্ষু এ জিন্দেগানী করে তাই প্রতীক্ষা তোমার,
চৈত্রের ফাটল ধরা মাঠ চায় মেঘের আভাস,
তাইতো ঝড়ের পথে পৃথিবীর এই ইন্তেজার,

তাপদগ্ধ দিনে স'য়ে ব্যর্থতার তিক্ত পরিহাস
হাভিয়ার জ্বালা বুকে এ পৃথিবী-আঁখি নিষ্পলক
তপ্ত বক্ষে চায় ফের সবুজের কোমল আশ্বাস।

যত ওঠে তীব্র ঝড়, জাগে যত বিদ্যুৎ ঝলক
একান্তে প্রতীক্ষমাণা পৃথ্বি তত মুখ তুলে চায়,
ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে তার খুঁজে ফেরে মেঘের অলক !

প্রতীক্ষিত ক্ষণে আসে শিলাবৃষ্টি দুরন্ত ঝঞ্ঝায়,
বৈশাখীর ধ্বংসলীলা তারপর হয় অবসান,
প্রশান্তির বার্তা আনে মিকাইল অঝোর বর্ষায়...

চরম ধ্বংসের শেষে আসে নব সৃষ্টির আহ্বান,
তাইতো পরম কাম্য এ বিপ্লব ;—এ ঝড়ের গান॥

বর্ষায়

এক

বঙ্গোপসাগর থেকে এল ভেসে মেঘের কাফেলা
জীবনের বার্তা নিয়ে স্নিগ্ধ, শ্যাম মমতা-মেদুর,
পাড়ি দিয়ে বহু পথ, বালু-বক্ষ সমুদ্রের বেলা

www.pathagar.com

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত প্রাণে দল এনে বর্ষণের সুর
(মত্ত ময়ূরের মন বনপ্রান্তে গেয়ে ওঠে "কে-কা") !
চৈত্রের ফাটল ধরা মাঠ, বন তৃষিত, বিধূর

দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে দেখে চেয়ে মসীবর্ণে লেখা
নিবিড় মেঘের পটে চম্‌কায় বিদ্যুৎ সর্পিল
(জান্নাতের হূর যেন অকস্মাৎ দিয়ে যায় দেখা,

শুধু মুহূর্তের তরে আকাশের খুলি ঝিলমিল
পলকে মিলায়ে যায়) ! চকিতে জাগায়ে চারিধার
অঝোর বর্ষার ধারা শুভ্র, স্বচ্ছ ঢালে মিকাইল ;

ধরণীর তপ্ত গণ্ডে নেমে আসে স্নিগ্ধ বারিধার ;
জীবনের বার্তা নিয়ে এল বর্ষা-বিহ্বল আষাঢ়॥

দুই

প্রখর গ্রীষ্মের শেষে এল বর্ষা, বাদল হাওয়ায়
দিক-প্রান্তে অপরূপ ছায়া দেখে কাজল মেঘের
একাকী প্রতীক্ষমানা কাননে কেতকী শিহরায়।

তপ্ত যৌবনের সাকী, দিন শেষ গুলমোহরের,
বর্ণের প্রাচুর্য নিয়ে যায় সে দৃষ্টির অন্তরালে ;
কিংবা কো'কাফের পরী—পলাতকা—সুদুর দেশের।

ক্ষণিকের প্রগল্‌ভতা ওঠে জেগে কদম্বের ডালে ;
সবুজে শ্যামলে হয় বিনিময় বিমুগ্ধ দৃষ্টির,
প্রাণের ইশারা জাগে বনপ্রান্তে নিভৃত তমালে।

মত্ত বর্ষণের দিনে দেখি তাই অজস্র বৃষ্টির
অফুরন্ত সমারোহে জেগে ওঠে নদী, মাঠ, বন ;
সমস্ত প্রকৃতি যেন গায় গান নতুন সৃষ্টির,

রৌদ্রদগ্ধ এ পৃথিবী পায় খুঁজে নতুন জীবন ;
অঝোর বর্ষার সুরে পৃথিবীর হয় উজ্জীবন॥

তিন

বর্ষায় জীবন্ত নদী মধুমতী মুক্ত কলোল্লাসে
ব'য়ে যায় অবিশ্রাম, থামে না সে মুহূর্তের তরে,
বুকে তার পাল তুলে জেলে ডিঙি—শঙ্খচিল ভাসে,

ছড়ায়ে প্রাণের স্পর্শ দুই পাশে সবুজ প্রান্তরে
প্রমত্ত সে গতিবেগে ধায় নদী,—উদ্দাম আবেগে
আবে হায়াতের ধারা যায় যেন উন্মুখ সাগরে।

www.pathagar.com

সে প্রবল গতিস্রোতে আনন্দের বন্যা ওঠে জেগে,
প্রান্তরের ধমনীতে ওঠে জেগে উদ্দাম যৌবন,
প্রাণের বিদ্যুৎ যেন চম্‌কায় মৃত্যুম্লান মেঘে !

সবুজে শ্যামলে তাই উচ্ছ্বসিত মাঠ, ঘন বন
নদীর প্রবাহ থেকে পায় পূর্ণ প্রাণের জোয়ার,
অথবা এ জিন্দেগানি পেয়ে তার মুক্তির স্পন্দন

সকল জড়তা ভুলে হয় তীব্র গতিতে দুর্বার,
মুহূর্তে এ নদী হয় সময়ের স্রোত খরধার।।

চার

দুরন্ত, চঞ্চল নদী প্রাণবন্ত, পাহাড়ের ঢলে
কূলে কূলে পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ কানায় কানায়
অবাধ, উদ্দাম গতি দূর দিগন্তের পথে চলে ;
নিশান্তের তীরে এসে বিহঙ্গম উন্মুক্ত ডানায়
জীবনের আমন্ত্রণে ভেসে যায় আকাশে যেমন
এ জীবন্ত নদী চলে তেমনি সিন্ধুর ঠিকানায়।

প্রদীপ্ত উল্লাসে তার অতিক্রম করি' মাঠ, বন,
ভাসায়ে জড়তা, ক্লেদ ;—পুঞ্জীভূত কদর্য, কলুষ,
প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে সব বাধা, সকল বন্ধন

জাগ্রত নদীর সত্তা ব'য়ে চলে গতি নিরঙ্কুশ ;
কিংবা সমুদ্রের ডাকে পরিপূর্ণ, জীবন্ত এ নদী
প্রাণের ঐশ্বর্যে পূর্ণ চলে মুক্ত, চলে নিষ্কলুষ !

দুর্নিবার গতিস্রোতে যাত্রাপথে নেমে আসে যদি
বন্যা বিপ্লবের রূপে দেখা দেবে দিগন্ত অবধি।।

পাঁচ

যদি পথে বাধা পায় প্রমত্ত এ নদী দুর্নিবার
প্রলয়ের রূপ নিয়ে দেখা দেবে জানি সে নিমেষে,
ধ্বংসের আহ্বান শুধু উচ্চারিত হবে কণ্ঠে তার,

ধ্বংস করি' জনপদ ;—মাঠ, বন ডোবায়ে নিঃশেষে
সর্বনাশা রূপ নেবে পাবে না সে মুক্তি যত দিন
(কেননা রহস্য গাথা জীবনের মূর্ত হয় শেষে

অবিচ্ছিন্ন গতি ছন্দে—কালের আর্শিতে অমলিন !
হারালে সে গতিবেগ ছায়াচ্ছন্ন কিংবা মৃত্যুম্লান
মরণের বালুচরে লুপ্ত হয় ; হয় সে বিলীন)।

www.pathagar.com

রুদ্ধগতি জীবনের দিয়ে তাই নতুন আহ্বান
ভোলায়ে মৃত্যু বা সুপ্তি,—স্বপ্নালস রাত্রির আরাম,
বিশ্রান্ত যাত্রীর প্রাণে তুলে তাই সমুদ্রের গান

এ বর্ষার নদী চলে (জিন্দেগানি পায় তার দাম
মঞ্জিলের মধ্যপথে চায় না যে নিষ্ক্রিয় বিশ্রাম) ॥

পদ্মা

এক

হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী ! হিমাদ্রির দুরন্ত সন্তান
কাটায়ে শৈশব তুমি সুদুর্গম পার্বত্য উপলে
উত্তপ্ত নিদাঘে কবে শুনেছ প্রাণের কলতান,

তোমাকে ডেকেছে সাথে শত ঝর্ণাধারা, খেলাচ্ছলে
শত কণ্ঠে গান গেয়ে এক সাথে নির্ঝরের গীতে
পর্বত শিখর ছেড়ে নেমেছ একদা সমতলে !

অপূর্ব নৃত্যের ছন্দে লীলায়িত মধুর ভঙ্গীতে
শৈশবের দিন শেষে মিশে গেছে বিমুগ্ধ কৈশোরে !
তরঙ্গ দোলায় দুলে প্রাণোচ্ছল পথের সঙ্গীতে

নিজেকে চিনেছ তুমি (পৃথিবী যখন ঘুমঘোরে)
চিনেছ নিজের সত্তা, জেনেছ কোথায় সংগোপন
প্রাণের রহস্য গাথা যৌবনের পরিপূর্ণ ভোরে,

জেনেছ সে দিন কেন বিশ্বে এই গতির স্পন্দন
হে পদ্মা,—প্রমত্ত নদী ! স্রষ্টার শক্তির নিদর্শন ॥

দুই

হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী !—তোমার যৌবন খরধার
পথের সকল বাধা গেছে কেটে আদিম উল্লাসে,
উজ্জ্বল, কঠোর দীপ্তি (সময়ের তীক্ষ্ণ তলোয়ার
আশ্চর্য বিভায় দীপ্ত, কিংবা পূর্ণ আরণ্য উচ্ছ্বাসে

অপরূপ মৃত্যু যেন), তবু তার প্রাণের আহ্বান
দেখি এই রুক্ষ মাঠে পৃথিবীর প্রান্তরে ও ঘাসে

(উচ্ছল যৌবন দিনে কোথায় ঝর্ণার কলতান) !
উজ্জ্বল আলোকে দিয়ে জীবনের বিপুল আঞ্জাম
উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে গেয়ে দূর সমুদ্রের গান

www.pathagar.com

ভাসায়ে সকল বাধা গতিস্রোত উদ্ধত, উদ্দাম
বর্ষায় দু'কূল প্লাবি' নেমেছে যখন সমতলে ;
দুরন্ত চলার তালে মধ্যপথে চাওনি বিশ্রাম,

এনেছ জীবন বন্যা সংকীর্ণ এ আবদ্ধ পল্বলে ;
নয়া জিন্দেগীর সাড়া জাগায়েছ তুমি জলেস্থলে॥

তিন

হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী !—মানুষের কীর্তি ক্ষণিকের
তোমার পথের বাধা গেছে মিটে স্রোতের দাপটে,
স্মৃতিচিহ্ন, রংমহল গেছে মিশে দর্পী ধনিকের

(বর্ণ বা রেখার চিহ্ন নাই আর শূন্য চিত্রপটে) !
অকস্মাৎ মনে হয় তরঙ্গিত মৃত্যু এ ধূসর
যখন উন্মত্ত ধারা ওঠে জেগে ঝড়ের ঝাপটে

কিংবা এ প্রবাহ তীব্র যেন এক হিংস্র অজগর
অন্ধ রোষে ধাবমান, স্রোতাবর্তে বিক্ষুব্ধ, ফেনিল
উপাড়িয়া তীর তরু, ইমারত কৃষাণের ঘর

প্রচণ্ড আক্রোশে আর ভয়াবহ গতিতে সর্পিল
চ'লেছে নিঃশেষে মুছে মানুষের উদ্ধত দুরাশা
(নির্বাক বিস্ময়ে শুধু দেখেছে তা আকাশের নীল

অথবা ভোরের পাখী আতঙ্কে যে ছেড়ে গেছে বাসা) !
তাইতো সন্ত্রস্ত প্রাণ রেখেছে এ নাম 'কীর্তিনাশা'॥

চার

হে পদ্মা, প্রমত্ত নদী ! এই ভাবে কত যুগান্তর
চ'লেছ বর্ষায় তুমি বন্যাবেগে প্রান্তর ভাসায়ে
সে কথা জানে না কেউ, কেউ তার রাখে না খবর।

কত মাঠ, জনপদ লুপ্ত হ'ল মৃত্যু হিমছায়ে
কিংবা কত নারী নর গেল ভেসে দুস্তর পাথারে
হে পদ্মা ! তোমার তীরে ক্ষণিকের বাসর সাজায়ে

সে কথা জানে না কেউ জীবনের বিস্তৃত কান্তারে
(অথবা সে খোঁজ নিতে হয় নাই কারো প্রয়োজন)।
প্রমত্ত এ গতিস্রোতে মনে হয় তাই বারেবারে

www.pathagar.com

সন্ধ্যার পাখীর মত স্নিগ্ধ নীড় চায় যে জীবন
বিড়ম্বিত হয় শুধু সংখ্যাহীন তরঙ্গ সংঘাতে,
সংগ্রামের ঝুঁকি নিয়ে যেতে হয় তাকে আমরণ

উচ্ছল আলোকে কিংবা ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে
মৃত্যু ও মুক্তির পথে আনন্দে অথবা আশঙ্কাতে॥

পাঁচ

অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ,
জীবনের পথে পথে অভিজ্ঞতা কুড়ায়ে প্রচুর
কেঁপেছে তোমাকে দেখে জলদস্যু—দুরন্ত হার্মাদ,

তোমার তরঙ্গভঙ্গে বর্ণ তার হ'য়েছে পাণ্ডুর !
সংগ্রামী মানুষ তবু দুই তীরে চালায়ে লাঙল
কঠিন শ্রমের ফল—শস্য দানা পেয়েছে প্রচুর ;

উর্বর তোমার চরে ফলায়েছে পর্যাপ্ত ফসল !
জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে নিঃসংশয়, নির্ভীক জওয়ান
সবুজের সমারোহে জীবনের পেয়েছে সম্বল।

বর্ষায় তোমার স্রোতে গেছে ভেসে সাজানো বাগান,
অসংখ্য জীবন, আর জীবনের অজস্র সম্ভার,
হে নদী ! জেগেছে তবু পরিপূর্ণ প্রাণের আহ্বান,

মৃত জড়তার বুকে খুলেছে মুক্তির স্বর্ণদ্বার
তোমার সুতীব্র গতি ;—তোমার প্রদীপ্ত স্রোতোধার॥

ছয়

তোমার অস্তিত্ব নদী ! অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবল,
তরঙ্গিত জীবনের খরস্রোতে অস্তিত্ব তোমার,
তোমার অস্তিত্ব শুধু গতিমান প্রবাহে উচ্ছল,

তোমার অস্তিত্ব শুধু যতক্ষণ গতি দুর্নিবার,
জীবনের অভিযানে অগ্রগামী সত্তা যত দিন,
যত দিন দিয়ে যাও বন্যা বারি দুরন্ত, দুর্বার

তোমার জীবন্ত সত্তা তত দিন, জানি তত দিন
কালের পৃষ্ঠায় দীপ্ত, সমুজ্জ্বল তোমার স্বাক্ষর
হে পদ্মা ; প্রমত্ত নদী প্রাণবন্ত, থাকে অমলিন।

www.pathagar.com

যত দিন জড়তায় জাগে না মৃত্যুর বালুচর,
যত দিন গতিপথে যাও মুছে স্থিতি বা বিরাম,
যত দিন চল শুনে অন্তহীন সমুদ্রের স্বর

দিগন্তের পথে দেখি তত দিন লেখা তব নাম !
অবিশ্রান্ত চল তাই মুহূর্তের জানো না বিশ্রাম ॥

সাত

তোমার স্রষ্টার কাছে (কুল মখ্‌লুকের যিনি রব)
হে নদী ! তোমার মত আমারো প্রার্থনা রাত্রি দিন
সকল প্রান্তরে, পথে পাই যেন গতির বৈভব।

জীবন্ত প্রবাহ সেই দুর্নিবার,—বাধাবন্ধহীন
ভাসায়ে সকল ক্লেদ, পুঞ্জীভূত কদর্য কলুষ
মঞ্জিলের পথে যেন চলে স্বচ্ছ শুভ্র, অমলিন ;

অথবা সে প্রাণধারা তীব্র গতিবেগে নিরঙ্কুশ
ভারগ্রস্ত জীবনের, জড়তার করি অবসান
জিন্দেগীর বিয়াবানে এনে দেয় মুক্তি নিষ্কলুষ

অচল ; স্থাণুর বুকে গতিমান জীবনের গান
রিক্ত প্রাণ পৃথিবীতে দেয় যেন পুষ্পের সম্ভার ;
আবদ্ধ জিন্দানে দিয়ে প্রাণোচ্ছল গতির আহ্বান

অস্তিত্বের আদি কথা খোলে যেন রহস্যের দ্বার
(হে পদ্মা, তোমার মত গতিবেগ দুরন্ত, দুর্বার) ॥

আরিচা-পারঘাটে

এক

বর্ষার মেঘের নীচে ছায়াচ্ছন্ন আরিচায় এসে
মনে হ'ল পারঘাট যেন এক নিষ্প্রাণ কবর
(জীবনের সব চিহ্ন মুছে গেছে এখানে নিঃশেষে) !

প্রতীক্ষার ক্ষণ তাই মনে হয় তিক্ত, ক্লান্তিকর,
পারে না জাগাতে আর কারো বুকে প্রাণের স্পন্দন,
বিমর্ষ, প্রকৃতি, মেঘ গতিহীন ; সময় মন্থর !

চিত্রিত পটের মত ব'সে আছে যাত্রী কয় জন
সন্ধ্যার খেয়ার পথে অবসন্ন—দেহ পারঘাটে,
আনন্দের সাড়া নাই, নাই হাসি, কথোপকথন,

www.pathagar.com

অসহ্য ক্লান্তির ভারে এই ভাবে দীর্ঘ দিন কাটে?
অকস্মাৎ দেখি চেয়ে খরস্রোতা নদী বহমান
আরিচার তীর ছেড়ে ব'য়ে যায় জীবনের নাটে

কী দুরন্ত গতিবেগ! কী উদ্দাম আনন্দ-অম্লান
যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে গেয়ে যায় জীবনের গান॥

দুই

বাধাবন্ধহীন নদী,—গতিবেগ উন্মুক্ত, অবাধ
মুক্ত জীবনের কিংবা আজাদীর যেন সে প্রতীক
(জিঞ্জির, জিন্দান ভেঙে যে পেয়েছে পূর্ণতার স্বাদ

কিংবা মঞ্জিলের দিশা,—যে পেয়েছে ঠিকানা সঠিক)
ভাসায়ে পথের বাধা সমুদ্রের ডাকে সে দীউয়ানা
চলে দুর্নিবার গতি স্থির লক্ষ্যে—দৃষ্টি নির্নিমিখ!

প্রলয়ের কাল মেঘ রুদ্ধ রোষে ঝাপ্‌টায় ডানা,
সুবিশাল বনস্পতি দাঁড়ায় রুধিয়া তার পথ,
দুরন্ত তুফান, ঝড় মধ্য পথে দেয় তা'কে হানা

তবু সে উদ্দাম গতি লুপ্ত করি বাধার পর্বত
ধ্বংসের ভ্রূকুটি আর ভয়ংকর প্রলয়, তুফান
হেলায় ভাসায়ে যত প্রলোভন, মিথ্যা দাস যত

দুর্গম, দুস্তর পথে ভারমুক্ত শঙ্কাহীন প্রাণ
গেয়ে যায় কলোল্লাসে মুক্ত জীবনের জয়গান॥

তিন

এ নদী প্রবহমান জীবনের নব জাগরণে
ভাসায়ে তরঙ্গভঙ্গে জড়তা, জরার আক্রমণ
চলে সে উদ্দাম গতি (শঙ্কা নাই সংঘাতের ক্ষণে),—

মুখাপেক্ষী নয় কারো; মানে না সে শৃঙ্খল বন্ধন।
অবরুদ্ধ হয় যদি যাত্রাপথে কভু অতর্কিতে
প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙে সব বাধা; সমস্ত বারণ

বন্যাবেগে মুছে ফেলে নেয় খুঁজে মুক্তি পৃথিবীতে
(অথবা সে যায় মুছে যত বাধা দৃঢ় বা ভঙ্গুর)।
গতিমান এ জীবনে অন্তহীন পথের সঙ্গীতে

তীর-তীব্র বেগে চলে নিয়ে তার বাধামুক্ত সুর,
গেয়ে যায় মুক্ত কণ্ঠে পরিপূর্ণ জীবনের গান

www.pathagar.com

(সম্মুখে চলার পথে নাই তার ব্যর্থতা অশুর),
খিজিরের কাছে পেয়ে মঞ্জিলের, পথের সন্ধান
জীবন্ত প্রবাহ চলে অসংশয়—ভারমুক্ত প্রাণ।।

চার

খরস্রোতা এ নদীর তীরে ব'সে স্তব্ধ পারঘাটে
মনে হ'ল সে মুহূর্তে দিকে দিকে প্রাণের মর্মর,
উন্মুখ আগ্রহে চলে পরিপূর্ণ জীবনের নাটে,

গতিচ্ছন্দে পিষে যায় অপমৃত্যু,—মিথ্যা, অসুন্দর !
মুমূর্ষু এ জিন্দেগানি ছায়াচ্ছন্ন থেকে দীর্ঘকাল
মুক্ত আকাশের নীচে শোনে তার মুক্তির খবর !

শতাব্দীর প্রান্তে সেই প্রাণধারা তরঙ্গ উত্তাল
জাগায়ে শহর, গ্রাম হানা দেয় নিভৃত কুটিরে ;
পরিবর্তনের ধারা ওঠে জেগে বিক্ষুব্ধ, বিশাল !

নতুন উষার বহ্নি দেখা দেয় প্রাচ্যের তিমিরে,
শীর্ণ জনতার প্রাণে জীবনের দিতে আমন্ত্রণ
প্রমত্ত নদীর মত সেই বার্তা আসে আজ ফিরে,

শিরায় শিরায় জাগে জীবনের নতুন স্পন্দন ;
আবে হায়াতের স্পর্শে জিন্দেগীর হয় উজ্জীবন।।

পাঁচ

প্রতীচীর হিংস্র ছায়া—কাল রাত্রি হয় অবসান,
প্রাচ্যের আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে সুপ্তি শতাব্দীর,
দীর্ঘ সংগ্রামের পথে ওঠে জেগে নতুন জাহান !

ভোরের শিকারী উষা নিশীথের বক্ষে হানি' তীর
উজ্জ্বল আলোকরশ্মি আনে আজ প্রাচ্যের আকাশে,
অসংখ্য জিন্দান থেকে ঝ'রে পড়ে জুল্‌মাত রাত্রির,

অসংখ্য জিঞ্জির থেকে সদ্যমুক্ত জীবন উল্লাসে
নতুন বিপ্লবে পায় জীবনের চিহ্ন অমলিন।
সংশয়-বন্ধন মুক্ত আজাদীর বার্তা নেমে আসে

তরঙ্গিত জীবনের গতিস্রোতে রক্তিম, রঙ্গিন।
দীর্ণ করি বিভীষিকা অন্ধকার রাত্রির কবর
পরিপূর্ণতার ডাকে এ জীবনে আসে মুক্ত দিন,

www.pathagar.com

কাফেলার যাত্রাপথে আসে নেমে নতুন খবর ;
শুরু হয় দরিয়ায় জিন্দেগীর নতুন সফর।।

দ্বীপ নির্মাণ

প্রবাল দ্বীপের গোড়া পত্তন হবে,
কি ক'রে সে কথা হ'য়ে গেল জানাজানি !
দল বেঁধে এল অযুত প্রবাল কীট
কাঁপায়ে দু'পাশে দরিয়ার লোনা পানি।

রেখে এল তা'রা জীবনের সব সাধ,
ফেলে এল তা'রা জীবনের সব গান,
নব সৃষ্টির পথে চলে উন্মাদ ;
ভিত্তিমূলেই জীবন করিতে দান।

অযুত, লক্ষ, কোটি প্রবালের দেহে
শত যুগ ধরি' সেই দ্বীপ গ'ড়ে ওঠে,
কোটি প্রবালের তনুতে না হয় যদি
আরো বহু কোটি প্রবাল কীটেরা জোটে।

কবে দূরচারী পথিক পাখীরা এসে
কাকলি-মুখর সে দ্বীপে বাঁধবে ঘর,
জাগবে কখন প্রবাল দ্বীপের বুকে
নারিকেল শাখে স্বপ্নের মর্মর।
প্রবাল কীটেরা জানে না সে কথা, তবু
দল বেঁধে তারা করে গোড়া পত্তন।
বৎসর কাটে...শতাব্দী কেটে যায়...
তবু কোন দিন হয় না তো উন্মন।

আকাশে, মাটিতে আসে বদলের পালা,
কত তারা নেভে, জ্বলে কত শশী রবি ;
প্রবাল কীটের দ্বীপেরা ভিত্তি গড়ে
ধৈর্য, ত্যাগের সহিষ্ণুতার ছবি।

রাখে না খবর, খোঁজ রাখে না তো কেউ,
কেউ কোন দিন সন্ধান নাহি করে,
প্রবাল কীটেরা নিভৃতে গড়ে দ্বীপ
সকল আঁখির ; সকলের অগোচরে।

www.pathagar.com

প্রবাল দ্বীপের গোড়া পত্তন হবে
কি ক'রে পেয়েছে তা'রা সেই হাতছানি।
মৃত্যু যাদের ত্যাগের মহান ছবি
মওতেই তা'রা পায় যে জিন্দেগানি॥

সৃষ্টির গান

নব সৃষ্টির বুনিয়াদ হ'ল শুরু...
আমরা ক'জন কারিগর এক সাথে
গড়ি বুনিয়াদ একাগ্র সাধনাতে॥

এ বুনিয়াদের প্রতি ইটে আর
প্রতিটি পাথরে লেখা
সৃষ্টি-মুখর সজীব মনের
তপ্ত রক্ত রেখা,
নতুন মিনার, রঙিন খিলান
উঠ্‌বে ভিত্তি পরে
আমাদেরি বিশ্বাসে॥

নাই বিশ্রাম, নাই যে বিরতি নাই,
সকল সড়কে সব দিগন্তে
কাজের ইশারা পাই।
এই ভিত্তির বাঁধা হ'লে তীর
আরো কাজ থাকে বাকি
এক বসন্ত শেষ হ'লে আসে
সহস্র বৈশাখী!

সকল হাওয়ায়, সব ঝড়-সংঘাতে
নতুন আশার বুনিয়াদ গড়ি
আমরা ক'জন কারিগর একসাথে॥

বর্ষা, শরৎ পার হয়ে যায়
সুদূর দিগন্তরে,
হিমেল হাওয়ায় হেমন্তিকার
হিম প্রশ্বাস ঝরে,
পউষের মাঠ মুখ তুলে চায়
চ'লে যায় মাঘ, ফাল্গুন ফিরে আসে;
নব সৃষ্টির বুনিয়াদ গড়ি
আমরা ক'জন কারিগর এক সাথে॥

www.pathagar.com

ধ'রেছে ফাটল যুগ–বিশীর্ণ
যে রুগ্ন বুনিয়াদে,
যার ভিত্তির অতলে তিমির
বনি আদমের শত ব্যর্থতা কাঁদে,
টানি না তো জের সে মৃত পাপের
টানি না সে মৃত মন,
আমরা ক'জন করি এক সাথে
নব সৃষ্টির নয়া ভিত পত্তন॥
শেষ হবে কাজ জানি না কখন
মেলে না তো আর জানিবার অবসর,
বাজুর কুয়তে নির্ভয়, করি
আল্লাতে নির্ভর;
এই বুনিয়াদে গড়া হবে ফের
সব মানুষের ঘর...

তাইতো কখনো হই না অন্যমনা,
জানি র'য়ে যাবো মহৎ সৃষ্টিমূলে
এই আমাদের শান্তি ও সান্ত্বনা॥

স্বর্ণ–ঈগল

১

আমার বিপুল ক্ষুধা আজ তুমি পুরাবে কী দিয়ে,
আমার বিশাল তৃষ্ণা যে আর মানে না মানা!
জাগ্রত মোর স্বর্ণ–ঈগল মেলেছে ডানা
দুই বহ্নির প্রলোভন তার ভোলাবে কী নিয়ে॥

ছিল এতকাল ঘুমন্ত মোর বিহঙ্গম,
সুপ্তোত্থিত যদি সে তাকালো দিগন্তরে
সব প্রলোভন, সব বন্ধন সুনির্মম
ওড়ায়ে যাবে সে মুক্ত পাখার বিশাল ঝড়ে,
দুই বহ্নির ভ্রূকুটি পারেনি; পারবে না আর
মুছে দিতে তার অশেষ তৃষার মুক্ত পাথার॥

এবার তা'হ'লে শুরু হোক ফের ঊর্ধ্বগতি।
নিমগ্ন এই পাশবিকতার আত্মরতি
খুঁজে নিক তার মুক্তির পথ
প্রাণ প্রবাহের পূর্ণগতি,
নিশান্ত–নীলে আনুক দিনের পূর্বাভাস

www.pathagar.com

(বিপুল ক্ষুধায়, বিশাল তৃষায় অকুতোভয়
খুঁজুক সে তার তনু আত্মার সমন্বয়)॥

এবার তা'হ'লে নতুন পথের গান,
এই হাভিয়ার বক্ষে আবার
নতুন আলোর পাখা
মেলুক আবার জয়তুন তার
নতুন সবুজ শাখা ;
সুবিপুল ক্ষুধা অশেষ তৃষার মরু মাঠ পাড়ি দিয়ে
উড়ুক আমার স্বর্ণ-ঈগল নতুন ইশারা নিয়ে॥

২
প্রহর কেটেছে বন্য রাতের অন্ধ নিষ্পেষণে
এবার নতুন আলোর ইশারা জাগাও রুদ্ধ মনে
আবলুস-ঘন এই শর্বরী চিরে
মুক্ত ভোরের আলোর ইশারা
আনো বনানীর শিরে॥

অনেক রাত্রি এসেছে, আসবে আরো
অনেক অন্ধ রাত্রি তিমিরাহত ;
অনেক তুফান এসেছে, আসবে আরো
বৈশাখী বাধা মৃত্যু শিখার মত।
লাখো বালিয়াড়ি হয় যদি দুর্জয়
ঝড় সংঘাতে তুমি পেয়ো নাকো ভয়॥
কো'কাফ আঁধারে সুবে-সাদিকের শুভ্রতা ভেসে আসে
নতুন দিনের ইশারা আমার সুদূর পূর্বাকাশে !
এখানে হাভিয়া কালো
ভয়ে শঙ্কায় বৃথা চমকায় দেখি সে ভোরের আলো
সে আলোকে চমকায়
সে আলোয় ভয় পায়
শত নিষেধের বেড়া তোলে ওর বিষাক্ত তমসায়।
তবুও মেনো না মানা
নতুন দিনের স্বর্ণ-ঈগল নির্ভয়ে মেলো ডানা !
এ বিপুল ক্ষুধা, এ বিশাল তৃষা যার
তোমার চোখের দৃষ্টিতে আজ হোক সমাধান তার॥

ইন্‌কিলাব

মরু-ঝঞ্ঝার মত উড়ে আসে আসে ইসলামী ইনকিলাব
এ ঝড়ের মুখে মরণ নিদালি কুয়াশা চাদর টানি কি লাভ
আয় ইন্‌কিলাব !
আয় ইন্‌কিলাব !

www.pathagar.com

আয় !
হেজাজের ঝড় হেরা গহ্বর হ'তে বিমুক্ত প্রাণোচ্ছল
জাগায়ে যা রে এ মৃত জনপদ জনতার মন—পৃথ্বীতল
জ্বালায়ে যা রে এ যুগ-সঞ্চিত অত্যাচারের শিলা অটল
জ্বালায়ে যা রে এ হতাশার শ্বাস নিরাশা বিলাস অজ-বিলাপ
আয় ইন্‌কিলাব !
আয় ইন্‌কিলাব !

আয় !
নির্যাতিতের মৃত্যু শীতের শিয়রে রক্ত দিন-ফাগুন
জালিম দলের পাষাণ ভিতের প্রান্তে বজ্র আয় আগুন
খর তরবার হান্‌রে দুধার ক'রে যা উজাড় বিষের তূণ
কঠিন আঘাতে পিষে যারে সব মিথ্যাবাদীর ভীরু প্রলাপ
আয় ইন্‌কিলাব !
আয় ইন্‌কিলাব !

আয় !
আল্ হেলালের পূর্ণ শান্তি উৎপীড়িতের স্বপ্নসাধ
ভাঙ নিরাশার নিবিড় ভ্রান্তি আলেয়া শিখার রাত অগাধ
নিরাশা শিখরে তুলে ধ'রে ফের নতুন আশার দিশারী-চাঁদ
ঘুচায়ে যারে এ অমা আঁধারের মরণ-খাদের জমানো পাপ
আয় ইন্‌কিলাব !
আয় ইন্‌কিলাব !

কিস্‌সাখানির বাজার

[কিস্‌সাখানির বাজার ! শুধু নামটাই নয়, এই বাজারের দীর্ঘ ইতিহাসও আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়েছে। এই ইতিহাস এক দিনের নয় দীর্ঘ দিনের।
শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে, কিস্‌সাখানির বাজার দেশ-দেশান্তরের সওদাগর বিচিত্র পণ্য নিয়ে জমায়েৎ হ'য়েছে। সারাদিন চলেছে তাদের বেচা-কেনা, বিভিন্ন সওদার লেন-দেন। দিনান্তে শুরু হয়েছে কিস্‌সার আসর। মানুষের জীবন-মৃত্যুর মতই সে সব কাহিনী আশ্চর্য, রহস্যময়।
শতাব্দীর পর শতাব্দী কিস্‌সাখানি বাজার বাঁচিয়ে রেখেছে তার এই ঐতিহ্য। কিস্‌সাখানির বাজারের এটাই বৈশিষ্ট্য।]

এ পৃথিবী পণ্যশালা,...এই কিস্‌সাখানির বাজার
এ-ও এক পণ্যশালা।...শেষহীন আলিফ লায়লার
অশেষ কাহিনী নিয়ে প'ড়ে আছে যুগ যুগান্তর,
মরু গিরি পাড়ি দিয়ে এসেছিল যত সওদাগর
চিত্রল, সোয়াত থেকে, তাতার বা খোরাসান থেকে
উটের সারির মত উপত্যকা পথে এঁকেবেঁকে
হিমেল হাওয়ার স্পর্শে কঠিন শীতের সাঁঝে যে ধারা মন্থর
তাদের কাহিনী যত জমে আছে এ-মাটির মাঠের উপর।

www.pathagar.com

এখানে এনেছে সওদা—আঙুর, বেদানা, সেব, খোবানি, কিশ্‌মিশ্‌,
হিরার ধারের মত খঞ্জর, গালিচা আর ফুটন্ত নার্গিস !
কিন্তু যা বিস্ময়কর সে কেবল মানুষের বিচিত্র মিছিল
(পাহাড়ের পথ বেয়ে উঠে এল যারা খুলে রহস্যের নীল) !
শীতের হিমেল ভোরে বহু দলে, বহু দেশ থেকে
পাখীর ঝাঁকের মত এল ওরা, এল একে একে
চিত্রল, সোয়াত থেকে ; খোরাসান, বাদকশান থেকে
বরফ-জমানো পথে ক্ষণিকের পদচিহ্ন এঁকে
(যে নিশানা মুছে যাবে কঠিন তুষার ঝড়ে রাত্রির কিনারে)
তবু এল, তবু এল—এই কিস্‌সাখানির বাজারে।

এখন সুদীর্ঘ দিন দূর দেশী সওদাগর পথের দু'পাশে
ক্ষণিকের ডেরা তুলে করে যাবে লেন-দেন বিশ্বাসে অথবা অবিশ্বাসে,
তাকাবে সন্দিগ্ধ চোখে বেদুঈন তন্বী কোন নির্মম ; সুন্দর !
পরিপাটি করে তবু সাজাবে পশরা দিয়ে দু'দিনের এই খেলাঘর।
শেষ হলে বেচা-কেনা দিনশেষে শুরু হবে কিস্‌সার আসর ;
জোব্বা-পোশ বৃদ্ধ কোন ব'লে যাবে রহস্যের অজানা খবর !
আশ্চর্য কাহিনী সেই, শেষহীন সে কাহিনী যার
কথক হারায়ে যায় কিন্তু কথা চলে বেশুমার।
অনেক শতাব্দী আর যুগান্তর পাড়ি দিয়ে চলে সে কাহিনী,
মিলনে, বিরহে, দ্বন্দ্বে, কামনায় কখনো বা বাজায়ে কিঙ্কিণী
মানুষের সে কাহিনী পাহাড়ী নদীর মত চলে অবিরত
আসে যায় যাত্রীদল ; শুধু কথা জাগে অব্যাহত।
দূর-দূরান্তের কথা, দেশ-দেশান্তের কথা, সংখ্যাহীন হৃদয়ের কথা,
কথার কপোত ওড়ে পাখায় ছড়ায়ে তার রহস্যের নির্মম শুভ্রতা !
অনেক রাত্রির পর্দা খুলে যায় সেই সাথে বহু রহস্যের ;
নেকাব তুলিয়া ধরে দূর দেশী সওদাগর অচেনা পথের।

(এখন যাবে না চেনা তাকে আর,—সারাদিনমান
যে ক'রেছে তেজারত খঞ্জর গালিচা নিয়ে ক্লান্ত বেমানান।
কিস্‌সার আসরে সেই প্রৌঢ় সওদাগর এক আশ্চর্য বিস্ময়,
দূরান্তের মুসাফির,—কাহিনীতে ফোটে যার স্বপ্ন বা সংশয়
যেন সে উন্মুক্ত আত্মা ডেকে যায় সারাক্ষণ অজানা কথাতে,
জীবনের অভিজ্ঞতা রহস্যের চাবিকাঠি যেন তার হাতে) !
ডেরা তাম্বু ছেড়ে এসে অবাক বিস্ময়ে শোনে শ্রোতারা নির্বাক,
মধ্য এশিয়ার পথে কখন হারানো যুগে উড়েছিলো পরী এক ঝাঁক,
কিংবা ইরানের পথে দিয়েছিল দেখা কবে মৃত্যু হানাদার !
নিপুণ জহুরী যেন গেঁথে যায় একে একে সেইসব কাহিনী মুক্তার।
চলে যায় এই ভাবে যুগ-যুগান্তর, বহু সওদাগর
ব'লে যায় এই একে লেন-দেন শেষ হ'লে পথের খবর,

www.pathagar.com

অভিজ্ঞ সঞ্চয়ী কোন ব'লে যায় জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা ;
রাত্রি শেষ হ'য়ে গেলে বিস্মিত শ্রোতার প্রাণে জাগে স্বপ্ন অথবা ব্যর্থতা।
তারপর একদিন এ বাজার ভেঙে গেলে মৌসুমের শেষে
কাহিনী থামায়ে তার চলে যায় সওদাগর অচেনা বিদেশে !
আগামী মৌসুমে ফের হয়তো সে দেখা দেবে, হয়তো দেবে না
শেষ হ'লে জীবনের, বাজারের লেন-দেন কিংবা বেচা-কেনা।
হ'য়েছে এমন ঢের...এ বাজার কাহিনী বলার
শুনেছে অনেক কণ্ঠ, দেখেছে সে অনেক শ্রোতার
বিস্মিত মুখের দীপ্তি ; কিন্তু বহু মৌসুমের শেষে
সেই সব চেনা মুখ হারালো কোথায় কোন্ অচেনা বিদেশে।
নতুন অচেনা মুখে ভরে ওঠে তবু এই প্রাচীন প্রান্তর,
আবার অচেনা কণ্ঠে জমে ওঠে দিন শেষে কিস্‌সার আসর।

এ পৃথিবী পণ্যশালা,...এই কিস্‌সাখানির আসর।
এ পৃথিবী পণ্যশালা,...এই কিস্‌সাখানির বাজার
এ-ও এক পণ্যশালা,...শেষহীন আলিফ লায়লার
অশেষ কাহিনী নিয়ে প'ড়ে আছে যুগ-যুগান্তর !

মরু গিরি পাড়ি দিয়ে আসে যায় যত সওদাগর
তারাই সাজায়ে রাখে এ বাজার...দু'দিনের ঘর,
বলে যায় একে একে সেই সব সওদাগর অন্তহীন জীবনের কথা ;
কথক হারায়ে গেলে নতুন কথক টানে কাহিনীর ধারাবাহিকতা॥

পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে

[শাহ্ আযাদ বখ্‌তের স্বগতোক্তি]

'আন্ধার ঘরেতে মোর নাহিক চেরাগ,
যে বাগানে মেওয়া নাই মিছা সেই বাগ॥
ছেতারা হইতে দেখ আছমানের খুবি,
পুত্র নাই যার তার মিছা ধান্দা সবি॥'

'আজব দুনিয়া, দেশ...কুস্তনতুনিয়া ; আর আমি
বাদশা এ দেশের ; তাঁবেদার আছে আজও বেশুমার
দূর দেশী রাজা, খাজাঞ্চি-খানায় জমে রাজ্যকর,
জয়ের খবর আনে লোক লশকর...শাহী ফৌজ।
পথে নাই রাহাজানি, অনাবাদী মেলে না জমিন,
সকলে ইনসাফ পায়...শান্তি আছে প্রতি ঘরে ঘরে
ঈদুল ফিতর যেন বার মাস রয়েছে এখানে ;
প্রতি রাত্রি এ দেশের রাত যেন শবে-বরাতের।

www.pathagar.com

তবু শান্তিহীন প্রাণ, নিরানন্দ জীবন আমার
বর্ষ মাস, আমার আঁধার ঘরে জ্বলেনি চিরাগ ;
অথবা সিতারাহীন অন্ধকার আকাশের মত
এ জীবন বঞ্চিত আলোকে। দেখি নাই পুত্র-মুখ
শোনেনি তৃষিত কান শিশুর কাকলি ; পাই নাই
অনাস্বাদিত শান্তি কোন দিন ব্যর্থ জিন্দেগীতে।

মওতের পয়গাম এসে গেছে, দেখেছি সন্ধ্যায়
আর্শির মহলে কাল ক্ষণ-দীপ্ত বিদ্যুতের মত
কেশ-গুচ্ছ মাঝে এক শুভ্রকেশ তুষার-সফেদ
...বিজুলি চমক যেন ঘন কৃষ্ণ আবরের মাঝে
...মৃত্যুর স্বাক্ষর স্পষ্ট

সময় ফুরায়ে আসে ; দিন
শেষ হয়ে আসে দ্রুত অস্পষ্ট ছায়ায়...অন্ধকারে।
চল্লিশ বসন্ত, বর্ষা মিশে গেছে দ্রুত পদক্ষেপে
বিস্মৃতির মাঝে ; সম্মুখে এখন পথ অবরুদ্ধ
রাত্রির কিনারে। দিন শেষ হ'য়ে যাবে, অকস্মাৎ
হারাবে গোধূলি-স্বপ্ন এ প্রৌঢ় আকাশে। তারপর
জানি না কি ভাবে কবে শেষ হবে খেলা দু'দিনের।

কিন্তু তা দুঃখের নয়, জীবনের শেষ আছে জানি,
মৃত্যু যে অপরিহার্য এ কথা জেনেছি বহু আগে,
শুধু এক বেদনায় ব্যথা-দীর্ণ কাহিনী আমার
...জাগাবে না যে কখনো জীবনের নতুন অধ্যায়
শেষ প্রশ্বাসের সাথে শেষ হবে আশা ফসলের
কোন সম্ভাবনা আর রবে না এ শস্য-রিক্ত মাঠে।

অথচ দেখেছি আমি সুবিশাল পৃথিবীর বুকে
রেখে যায় সব প্রাণী জীবনের উত্তরাধিকার
সন্ততির মাঝে, রাখে জীবনের বীজ শস্যে, ফলে
মৌসুমের ফুল, রেখে যায় জীবনের গতিবেগ
সকল প্রবহমান নদী-স্রোত অফুরন্ত পথে।
কে যায় নিঃশেষে মুছে তার চেয়ে দুঃখী প্রাণী আর
কে রয়েছে দুনিয়া জাহানে? কে এমন দুঃখী প্রাণী
যে জানে অস্তিত্ব তার মুছে যাবে অচিরে নিঃশেষে?
আমি সে আযাদ বখ্ত বদ্‌নসীব স্বর্ণসিংহাসনে।

বুঝিনি কখনো আমি—কি লাভ এ নিষ্ফল জীবনে!
কি লাভ সে মরুমাঠে শস্যহীন পরিণতি যার?

www.pathagar.com

কি লাভ সে জিন্দেগীতে পেল না যে তার ওয়ারিশান ?
শস্য-রিক্ত মাঠ আর পুত্রহীন জীবন আমার
রেখেছে সাদৃশ্য এক পৃথিবীর বুকে শান্তিহীন।

কত সুখী সে কৃষাণ কর্মক্লান্ত প্রহরের শেষে
ভুলে যায় পেরেশানি যে সহজে পুত্র বুকে নিয়ে !
কত সুখী সে মজুর তুলে দেয় যে নিজের গ্রাস
ক্ষুধিত পুত্রের মুখে ! কত সুখী সে রিক্ত ভিখারী
যে দেখে পুত্রের মুখ জান্নাতের শান্তি পায় মনে
পাতার কুটিরে সুখী দরখ্তের তলে !

আর আমি
দৌলৎ হাশমৎ ঘেরা তখ্তে কিংবা এ বালাখানায়
দুঃখ-ভারাক্রান্ত প্রাণ ফলহীন শূন্যতার তীরে।
সবচেয়ে দুর্ভাগা যে, যে মিসকিন সে-ও কোনদিন
নামেনি এ দীনতায় ব্যর্থতার সর্বনিম্ন স্তরে।

কত তন্দ্রাহারা রাত্রি জেগে আমি মসল্লার পরে
মুনাজাত করেছি তো বারিতা'লা আল্লার দরবারে
: দাও খোদা ! ফরজন্দ...পুত্র দাও নিষ্ফল জীবনে—
অস্তিত্বের আলো দাও নৈরাশ্যের এ শূন্য প্রান্তরে,
রক্ষা করো বিলুপ্তির নিশ্চিত কঠিন ধ্বংস থেকে।
হয়নি মঞ্জুর দো'আ,...পরিপূর্ণ হয়নি প্রার্থনা।
জিন্দেগীর সুবে শাম মুছে যাবে এখন আমার
নাম ও নিশানাহীন অস্তপারে। পেয়েছি ইশারা
আর্শির মহলে কাল ক্ষণ-দীপ্ত বিদ্যুতের মত
মৃত্যুর স্বাক্ষর দেখেছি তো শুভ্র কেশদামে !
আর বুঝি আশা নাই স্বপ্নশেষ দিগন্তের তীরে।

যে ঘরে চিরাগ নাই অন্ধকার সেই রংমহল,
যে বাগানে ফল নাই মিথ্যা সেই বাগিচার মায়া,
সিতারার দ্যুতি নিয়ে আসমান হয়েছে উজ্জ্বল,
পুত্রহীন এ জীবন হ'ল তাই ব্যর্থতার ছায়া।
সব ছেড়ে যাব আজ শাহী তাজ কিংবা বালাখানা,
কি হবে সে জিন্দেগীতে কাল যার রবে না নিশানা॥

ঈদের স্বপ্ন

আকাশের বাঁক ঘুরে চাঁদ এল ছবির মতন,
নতুন কিশ্তী বুঝি এল ঘুরে অজানা সাগর ;

www.pathagar.com

নাবিকের শ্রান্ত মনে পৃথিবী কি পাঠালো খবর
আজ এ স্বপ্নের মাঠে রাঙা মেঘ হ'ল ঘন বন !
নিবিড় সন্ধ্যার পথে শাহ্‌জাদী উতলা উন্মন
কার প্রতীক্ষায় যেন পাঠায়েছে আলোর ইশারা,
পুষ্পিত গোলাবশাখে বুলবুল ডেকে হ'ল সারা ;
আতরের ঘন গন্ধে মাটি চায় হাওয়ার বাঁধন।

ঈদের আনন্দ, স্বপ্ন রেখায়িত গোধূলি আকাশে,
চাঁদের ইঙ্গিত মাঝে আবছায়া জাগে স্বপ্ন ঘোর,
মনে পড়ে বহু আগে এক দিন এসেছিল কাছে ;
এখনো সে স্বপ্নালোকে ফেরে এক অতৃপ্ত চকোর —
কাবার মিনার ঘিরে আনন্দের সফেদ আভাসে
নিমেষে ভাঙিয়া যায় শতাব্দীর বঞ্চিত পাথর॥

ঈদের কবিতা

চাঁদ রাতে কাল সুদূর দিগন্তরে
জেগেছিল বাঁকা খঞ্জরে আঁকা
রূপালি স্বপ্ন মোর,
খুশীর মউজে নীল আকাশের নীড়ে
সিতারার তারে ছিঁড়েছিল কাল
হতাশার আঁধি ঘোর,
মোরাকাবা ছেড়ে সেহেলি আকাশ
আবেগে শিহরি উঠি'
ব'লেছিল বুঝি : আলবিদা রমজান ;
রিদওয়ান জেগে দেখেছিল জান্নাতে
খুশীর অফোট কুঁড়ি তুলে মালা
গাঁথে হুর গেলমান।

ফিরদৌসের সব্‌জা বাগের মাঝে
ফুটেছে সে ফুল বিচিত্র রংগিন,
তারি ছোঁওয়া লেগে আজ এ মাটির বুকে
এসেছে অচেনা আরেক নতুন দিন।

আজ ঈদগাহে নেমেছে নতুন দিন,
চিত্তের ধনে সকলে বিত্তবান,
বড় ছোট নাই, ভেদাভেদ নাই কোন ;
সকলে সমান—সকলেই মহীয়ান !

www.pathagar.com

জরিন জরির খোলস হ'ল যে
হার মেনে পলাতক !
সে-ই আশরাফ—সেরা যার ইবাদত !
আতরাফ যারা এই ঈদগারে ছেড়ে
জাহান্নামের আগুনে খুঁজুক কল্পিত শরাফত।

আজ ঈদগাহে নেমেছে সে দিন
প্রশান্ত অম্লান,
ভ্রাতৃত্বের তারে সুর বেঁধে নিয়ে
কা'বার খাদিম ধ'রেছে নতুন গান

আলো-ঝলমল সফেদ ঊষার তীরে
জেগেছে মানুষ ;—জেগেছে সারা জাহান।

এই দিন মোরা ভাগ ক'রে নেব সকলেই এক সাথে,
এ দিনেরে মোরা ভাগ ক'রে নেব সকলেই অকৃপণ
ফিরদৌসের স্বপ্নের সওগাত
আজ কোনখানে মানবে না বন্ধন।

এ দিনের আলো মানবে না বাধা কোন মৃত প্রান্তরে,
স্বার্থান্ধের অন্ধ প্রাচীরে হারাবে না গতিবেগ,
মুঠি মুঠি আলো ঝ'রবে খুশীর সকল ঝরোকা থেকে
মুর্দা দিলেও আনবে আবার প্রাণের বন্যাবেগ,
দুর্গম পথে দিয়ে যাবে তার প্রাচুর্য অফুরান
আবে-কওসরে শতদল সম এই দিন অম্লান।
দেখ সিয়ামের সাধনার দাহে উঠেছে এ ফুল ফুটে
প্রতি পাপড়িতে আঁকা আছে এর আশিকের আঁখিজল,
খোশবুতে যার মৌমাছি মন লুটায় পক্ষপুটে,
অপরূপ রূপে মখলুকাতের বুক হয় উচ্ছল।

জান্নাত এর রঙ দেখে লোভাতুর,
সাত আসমানে ফেরেশতা উন্মন,
এই ঈদগাহে যে মিলাবে হাতে হাত
পাবে সে হৃদয়ে অখুয়াত-বন্ধন।

মরক্কো থেকে ম্যানিলা অবধি পাবে সে বুকের মাঝে
কুল মুমীনের জামা'ত সে মহীয়ান,
নীহারিকালোকে লক্ষ তারার মাঝে
উঠবে আবার আল আহাদের গান ;
মিস্‌মার ক'রে জামানার বিষ নিঁদ

www.pathagar.com

জাগবে আবার প্রোজ্জ্বল তওহিদ।
মহান প্রেমের আশ্বাসে দেখ উজ্জ্বল এই দিন
জাগে বিচিত্র শতদল সম উল্লাস রংগিন।

গৃধ্নু কারুণ, হিসাবের খাতা ভোল,
এই ঈদগাহে সকলের সাথে খুশীর ঝাণ্ডা তোল ;
তিরিশ রাতের সাধনা যে মনে রেখে গেছে স্বাক্ষর
তার সাথে এসে গুলজার কর এ খুশীর বন্দর।

সব অসাম্য-পাহাড়চূড়ায়
এই প্রাণ অভিযান
সাম্য-ন্যায়ের, ভ্রাতৃত্বের
দিক নয়া ফরমান॥

নয়া সড়ক

এক

দু'শো বছরের শেষে শুরু হ'ল নতুন সড়ক।
পিছনের ফেলে আসা পথে শুধু ছিল বিভীষিকা,
রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে ছিল শুধু মৃত্যুর পরিখা,
ছিল না মুক্তির আলো—ঝরোকায় তারার চমক,
উজ্জ্বল নীলাভ কোন পদচ্যুত তারার চমক
(শিশুর, নারীর হাসি ফুল আর পাখীদের গান)
ছিল না রাত্রির মেঘে প্রভাতের বহ্নি দীপ্তিমান
বন্দী বিহঙ্গের কণ্ঠে জাগে নাই আগ্নেয় দীপক।

দুই

দু'শো বছরের সেই শৃঙ্খলিত প্রাচীন সড়ক
বিগত দুঃস্বপ্ন—আজ দিগ্বলয়ে নতুন তর্জনী
(সূর্যের সান্নিধ্যে বুঝি নিশান্তের সীমানা পৃথক)
নতুন প্রাণের সাড়া যে ইঙ্গিতে ওঠে রণরণি ;
মুক্ত ঝরোকায় জাগে প্রাণবন্ত তারার চমক ;
নতুন সড়কে ওঠে নতুন যাত্রীর জয়ধ্বনি॥

শেরে বাঙ্‌লার মাজারে

এক

ঊন-নব্বুই গ্রীষ্মের প্রদাহে
তাপ-দগ্ধ যার জীবন,

www.pathagar.com

সেই বিরাট পুরুষ
ঘুমিয়ে প'ড়েছে এখানে !
এখানে এই শ্যামল মাটির নীচে
সে নিয়েছে তার দিনান্তের শেষ শয্যা।

চৈত্রের আগুন–ঝরানো আকাশের নীচে,
বৈশাখের প্রচণ্ড ঝড়ে,
শ্রাবণের অঝোর বর্ষণে
সে ছিল মাটি আর মাঠের মানুষের
সবচেয়ে আপনজন,
শ্রমিক ছাত্র আর দুর্গত জাতির
সবচেয়ে দরদীজন !
আজ আর কেউ তোমরা তার সাড়া পাবে না,
সাড়া পাবে না তোমরা সেই বিরাট পুরুষের
সারা জীবন যে সংগ্রাম ক'রেছে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে,
আর অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে
নিজে হ'য়েছে ক্ষত–বিক্ষত
(কো'কাফের রক্তলোলুপ দৈত্যের সামনে
রূপকথার নায়কের মত সে ছিল দুর্জয় ; দুঃসাহসী)।
যত চেষ্টাই করি না কেন
ভুলতে পারি না শেরোয়ানী, তুর্কী টুপী–পরা
সেই বিরাট পুরুষকে !
দুর্বল, ক্লীব, অনুকারী মানুষের মাঝখানে
সে ছিল পাহাড়ের মত দৃঢ়
পাহাড়ের মতই উন্নত শীর্ষ...
যুগান্তের কোন ঘূর্ণি তুফান
নোয়াতে পারেনি তার উন্নত শিরদাঁড়া
কোন দিন আত্মবিক্রয়ের প্রান্তরে !

একমাত্র আল্লার কাছে ছাড়া
নত হয়নি যে কারু কাছে
সে ছিল সমস্ত জাতির জাত্যাভিমান
আর সহৃদয়তার প্রতীক...
জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে
নিঃস্ব হ'য়েছিল সে নিজে
সমস্ত ফসল বিলিয়ে দিয়ে
শস্যরিক্ত মাঠ যেমন নিঃস্ব...উদার...

শতাব্দীর স্রোত চেয়েছিল
তা'কে নিঃশেষে ঝড় নিশ্চিহ্ন করে দিতে,

www.pathagar.com

পাহাড়তলীর যেমন উড়িয়ে নিয়ে যায়
ঝরা পাতার চিহ্ন,
কর্ণফুলীর বন্যা যেমন ভাসিয়ে নিয়ে যায়
খড়কুটোর অস্তিত্ব
বিস্মৃতির নিতল সমুদ্রে...

কিন্তু পারলো না সে...
মৃত্যু এসে থমকে দাঁড়ালো
তার জানাজায় শরিক
শোক-দীর্ণ লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখ দেখে ;
আর নিজের হাতে তাকে পরিয়ে দিল
অমরত্বের অদৃশ্য শাহী তাজ॥

দুই

বিরাট ব্যক্তিত্বের যুগ শেষ হ'ল,
শেষ হ'ল যুগ বহুমুখী প্রতিভার ;
এখন দেখি চার পাশে
ক্ষুদ্র আর ইতর সত্তার আনাগোনা !...
বাঘের পরিত্যক্ত অরণ্যে
ঘুরে বেড়াচ্ছে সংখ্যাহীন শৃগাল
ধূর্তামির সকল অপকৌশল নিয়ে ;
কিন্তু পূর্ণ হ'চ্ছে না কিছুতেই
বিরাট ব্যক্তিত্বের শূন্যাসন।

আদর্শবাদী পুরুষের
বহুমুখী প্রতিভার সেই বিরল দীপ্তি
(সূর্যের আলোয় ঝ'লসে-ওঠা
মুজাহিদের নাঙ্গা তলোয়ারের মত
ধাঁধিয়ে দিত যা দুশমন ফৌজের দৃষ্টি,
আর আশ্বাস দিত মজলুম জনতাকে,
পথভ্রান্ত রাহী মুসাফিরকে
অন্ধকারে বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎফলার মত
জীবনের সংকট-সঙ্কুল সড়কে) ;
আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনখানে।
দিগন্ত-বিস্তৃত সেই প্রসারিত হৃদয়
যা টেনে নিত সকল দুর্গত মানুষকে
নিজের বিশাল বক্ষে,
আশ্রয় দিত তরঙ্গ-বিধ্বস্ত সকল আশ্রয়প্রার্থীকে
পদ্মার প্রশস্ত বালুচরের মত
প্রশান্ত ; উদার

www.pathagar.com

কেউ আর খুঁজে পাবে না সে হৃদয়
এই স্বার্থপর সংকীর্ণ মানুষের দঙ্গলে !

সেই নিরলস, নিঃস্বার্থ, মহাপ্রাণ কর্মী
(যে গ'ড়ে তুলেছিল জাতির দৃঢ় বুনিয়াদ
যুগযুগান্তের কঠোর প্রয়াসে,
জ্বেলেছিল অজ্ঞতার অন্ধকার শামাদানে
নিযুত আলোক–বর্তিকা
সঞ্চার ক'রেছিল কালবৈশাখীর দুর্বার গতিবেগ
প্রাণহীন মৃত জনপদে),
উত্থানে–পতনে, সাফল্যে–ব্যর্থতায়, অভিমানে–আত্মত্যাগে
মহাকাব্যের নায়কের মতই যার মহত্ত্ব ;
সেই মহাপ্রাণ কর্মীকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এখানে !

এখন আর ভাবতেও পারি না আমরা
কিভাবে এক নিঃসঙ্গ পুরুষ
এগিয়ে যেতে পারে একটা জাতিকে বুকে তুলে নিয়ে
মৃত্যু–মুখর, হিংস্র, প্রতিকূল পরিবেশে,...
দুঃখ, দৈন্য, হতাশা আর অধঃপতনের
সর্বনিম্ন স্তরে থেকে
উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে কিভাবে একটা জাতিকে
রূপকথার রক পাখীর মত
মুক্তির সবচেয়ে উঁচু শিখরে...

কিন্তু এ তো রূপকথা নয়,
এ–তো বাস্তব সত্য...

শিকল

শিকল যদিও শিথিল হ'য়েছে বণিক রাজার
পুঁজিবাদ তবু শতমুখে তার বিষ ছড়ায়,
বর্গীরা লোটে দুই হাতে ধান, শূন্য খামার
বিরান বাগের বুলবুল হ'ল শকুনি হায়,
মজলুমানের রক্তে এখনো পৃথ্বি লাল ;
কোথায় ওড়াবো শান্তি প্রতীক আল–হেলাল ?

কোথায় ওড়াবো হেলাল ? সামনে মৃত্যু–প্রাকার !
কোথায় আমার মুক্তির দিশা—পথ রঙিন ?
হানে বিশ্বাসে ইব্‌লিস্ তার খঞ্জর ধার,

www.pathagar.com

হায় পলাতক এখনো তোমার আসেনি দিন,
খোলেনি অন্ধ আজো কবন্ধ রাতের খিল
আঁধারের চেয়ে আরো বিষাক্ত, ক্রূর, জটিল।
আবার তোমার তূর্য বাজাও নবীন নকীব,
তিমিরাবর্তে এখনো রাতের হয়নি শেষ,
পদতলে প'ড়ে আছে জনগণ বিশীর্ণ ক্লীব
অনাবিষ্কৃত আমার স্বাধীন স্বপ্নদেশ !
বাজাও তোমার তূর্য নকীব ! জ্বালো আগুন,
দেখো হানা দেয় এখনো দু'পাশে দস্যু হুন।

এখনো আঁধারে হানা দিয়ে ফেরে পুঁজিবাদী পাপ,
এখনো আকাশ ভরে মানুষের আর্তরোলে,
এখনো ছড়ায় পথে-প্রান্তরে কোটি অভিশাপ,
ধনতন্ত্রের প্রেত ঘোরে আজো চতুর্দোলে,
ঘোরে বুভুক্ষু জনগণ পথে পাংশু মুখে ;
দ্বার থেকে দ্বারে ফেরে তার দাবী ক্লান্ত বুকে।

হে নকীব ! জাগো, জাগাও সুপ্ত দিগন্ত নীল,
সব বন্ধন মুক্তির সুর বাজাও আজ,
ইস্রাফিলের 'সূরে' ভেঙে দাও বিশ্ব নিখিল,
ইস্রাফিলের 'সূরে' পৃথিবীকে জাগাও আজ !
চির পলাতক শিকার সে হোক দৃপ্ত আজ ;
মানবতা হোক নির্যাতিতের মাথার তাজ ॥

বিরান শড়কের গান

এইসব শড়ক এখনো
মাঝ রাতে জাগে কার শঙ্কিত স্পন্দনে,
কার যেন পদধ্বনি দুঃস্বপ্নের মত ঘিরে আসে
কোন মুমূর্ষুর শ্বাস পথ খোঁজে রাত্রির বাতাসে...

মনে পড়ে পঞ্চাশের মৃত্যু, মন্বন্তর...

কারা যেন ছেড়েছিল ঘর,
কারা যেন দেখেছিল বহুদূরে স্বপ্নের শহর,
কারা যেন পেয়েছিল দূরাগত অন্নের খবর,
এইসব শড়কে এখনো
রয়েছে তাদের স্মৃতি, তাহাদের জীবন্ত কবর।

www.pathagar.com

এইসব পথ বেয়ে চলেছিল তারা দূরদেশে
যেমন বিমর্ষ প্রাণী পথ চলে মৃত্যু-নিরাশ্বাসে
তাদের হতাশা এই শড়কের নিশ্চল বাতাসে
জ'মেছে বিষের মত—স্বপ্ন নাহি আজ তার পাশে।

এখানে রয়েছে জমা লোভের লোলুপ হাতছানি,
এখানে রয়েছে জমা ক্ষুধাতুর শিশুর গোঙানি।
এখানে রয়েছে জমা মানুষের লক্ষ কাতরানি...
এ সব পথের বুকে মাঝ রাতে জেগে কারা
করে কানাকানি...

এইসব শড়কে এখনো
মরা মানুষের ঘ্রাণ
সংখ্যাহীন করোটি অম্লান,
পশুর মতন মৃত্যু সে খবর রয়েছে এখানে...
এসব পথেরা আজ কি আশায় তাকায় কে জানে?
: হয়তো যুগান্ত বার্তা বাহুতে বহন করি' লক্ষ আগন্তুক
আসিবে তাদের বুকে যে স্বপ্ন দেখতে আজও পথেরা উৎসুক
: হয়তো রক্তের বন্যা, জেহাদের দৃঢ় ঝাণ্ডা খুনের তুফানে...
বিরান শ্রান্তির মাঝে কী স্বপ্ন দেখিছে তারা আজ কেবা জানে?
এই সব শড়কের সুপ্তি ভেঙে কোনো
মুক্তিফৌজ আসেনি এখনো।।

ইব্‌লিস ও বনি আদম

স্থান...মানুষের বস্তি
কাল...গভীর রাত্রি

(ইব্‌লিসের প্রবেশ)

বনি আদম

কি আশ্চয ! আজকেও তুমি?

ইব্‌লিস

আজো আমি এই রাত্রে
এসেছি উত্তপ্ত স্নায়ু, জেনে যেতে সর্বশেষ কথা।

বনি আদম

কি কথা?

ইব্‌লিস

যে কথা তুমি কোনদিন করোনি স্বীকার।

www.pathagar.com

তোমার ঔদ্ধত্য যাকে বক্রোক্তির শাণিত খঞ্জরে
ক্রমাগত কেটে গেছে।

বনি আদম
অর্থাৎ বিজয়ী তুমি কিনা,
সে কথাই আজ ফের জেনে যেতে চাও! কিন্তু আমি
আমার বক্তব্য যত সহজেই বলেছি বুঝিয়ে,
আশা করি বুঝেছো তা; প্রতি রাত্রে তবু কেন ফিরে
আমার দুর্লভ ঘুম ভাঙানোর এ দুষ্ট প্রয়াস?

ইব্‌লিস
শেষ কথা বলে দাও, চলে যাই আমি নির্বিবাদে,
আর কোন দীর্ঘ রাত্রে জ্বালাবো না।

বনি আদম
বলেছি সে কথা
বহুবার, বহুভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়...জীবনে
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংগ্রামে।

ইব্‌লিস
প্রশ্নের উত্তর তাতে
মেলে নাই। চূড়ান্ত জয়ের বার্তা...কাম্য যা আমার
পাইনি তা কোনদিন সংঘর্ষের মুখে। তাই আমি
আবার এসেছি ঘুরে জেনে যেতে সর্বশেষ কথা।

বনি আদম
ফিরে যাও পূর্ববৎ। দুরাকাঙ্ক্ষা অহেতু বাড়িয়ে
চূড়ান্ত জয়ের বার্তা পাবে না জীবনে।

ইব্‌লিস
এ ধৃষ্টতা
বনি আদমের।

বনি আদম
মহান প্রকৃতি এই মানুষের।
আল্লাহ ছাড়া কারু কাছে হয় না যে আনত, অথবা
জিন্দেগীতে নতশির;—মাটি, পানি, আগুন, হাওয়ার
বিশাল, বিচিত্র, বিশ্বে, অফুরন্ত কর্মের প্রবাহে
প্রতিনিধি জেনো সে আল্লার। আত্মসচেতন, দৃঢ়
সংগ্রাম-সংঘাতে তিক্ত চিরদিন সে অপরাজেয়

www.pathagar.com

বিরাট দায়িত্বভার নিয়ে চলে পূর্ণতার পথে ;
মানে না সে পরাজয় জীবনে কখনো। হতোদ্যম
হয় না সে কোনদিন দ্বন্দ্বে ইবলিসের।

ইব্‌লিস

বহুবার
সে তীব্র দ্বন্দ্বের মুখে উড়ে গেছো ; তবু অন্তহীন
ঔদ্ধত্য গেলো না।

বনি আদম

তবু অন্তহীন প্রস্তুতি আমার
এ মাটিতে,...জেহাদের মাঠ বলে চিনি আমি যাকে।
দুর্গম অরণ্যচারী মুক্ত সিংহ সন্ধ্যায় যেমন
হানা দেয় শঙ্কাহীন, সুকৌশলী শিকারের 'পরে ;
নিঃশঙ্ক আমার প্রাণ তেমনি জঙ্গের ময়দানে
জানে না, মানে না, ভীরু সমর্পণ—পলায়নী রীতি।
যত আসে হিংস্র বাধা, প্রতিরোধ ; জাগে তত প্রাণে
সত্যের বিশাল দাবী ; সংগ্রামের প্রয়াস অশেষ।
তুমি ক্লান্ত হ'তে পারো, ক্লান্ত আমি নই কোন দিন ;
বংশপরম্পরা চলে এ মহান সংগ্রামের ধারা।

ইব্‌লিস

এখনো কি—স্বপ্ন দেখো ?

বনি আদম

এখনো যে স্বপ্ন দেখি আমি
সে স্বপ্ন অজ্ঞাত নয় আলমে আল্লার।

ইব্‌লিস

বাতুলতা
নয় কি তোমার ? দুনিয়া কারবালা মাঠে মিশে গেছে
যে স্বপ্ন বালুতে, সে স্বপ্ন জাগাতে চাও শতাব্দীর
ঘূর্ণাবর্তে এই ? আদমের আউলাদ, কী উদগ্র
আকাঙ্ক্ষা তোমার ?

বনি আদম

যে আকাঙ্ক্ষা টেনে আনে প্রতি রাত্রে
তোমাকে,...আমার পদপ্রান্তে।

ইব্‌লিস

পরাজিত শক্তি তুমি,...
এ কথা ভুলো না কোনদিন।

www.pathagar.com

বনি আদম
পরাজিত নই আমি।
তোমার সুতীব্র দ্বন্দ্ব,—বলেছি তো জোগায় প্রেরণা
নবতর।

ইবলিস
অস্বীকার কর কেন, পরাজিত নও!
পূর্ণ মানবতা আজ দুঃসাহসী তোমার মনের
উন্মত্ত কল্পনা শুধু! দেখনি কি ইঙ্গিতে আমার
কপট মুখোশে আজ শবগন্ধী এ পাশবিকতা
অপমৃত্যু খোঁজে কোন্ জড়বাদী পিশাচের কাছে?
লক্ষ, কোটি ভ্রূণ হত্যা কেন আজ নরহত্যা নয়?
ক্লেদাক্ত, বিকৃত কেন অর্ধনগ্ন এ চিত্র-সভ্যতা?
মুক্তি স্বপ্ন নয় সে কি স্বকপোল-কল্পিত তোমার?
যৌন বিকৃতির পঙ্কে করিনি কি জ্ঞানীর জগৎ
পূতিগন্ধময়? বিকৃত সভ্যতা আর মৃত্যুমুখী
কৃষ্টির পঙ্কিল স্রোতে শ্বাসরুদ্ধ করিনি কি আমি
বন্দী জনতাকে? ঘৃণ্য সেই পাশবতা আনিনি কি
শ্রান্ত এ শোষণ-রিক্ত, প্রবঞ্চিত, পৃথিবীর বুকে?
দেখনি কি দুনিয়ার প্রতি পথে, প্রত্যেক শড়কে
দানবিক স্বৈরাচারে অপমৃত্যু মানবিকতার?
শোষিত, লুণ্ঠিত কিম্বা ছাঁচে-ঢালা আড়ষ্ট, বিবশ,
বিকলাঙ্গ এ জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রেতাত্মার মত
মরে না কি শান্তিহীন ব্যক্তি আর ইন্দ্রিয়পূজায়?
শতাব্দীর অন্ধকারে উজ্জীবিত নয়া ফেরাউন
ছিঁড়ে কি ফেলেনি তার হিংস্র নখে মূক জনতার
বিমূঢ় জিজ্ঞাসা? আর লৌহ যবনিকা অন্তরালে
মানুষের মুক্তবুদ্ধি আত্মঘাতী হয়নি কি আজও?
শোষণের লুব্ধগ্রাসে সব আশা, আশ্বাস হারিয়ে
আদমের আউলাদ লক্ষ, কোটি মানুষ এদিকে
ত্রস্ত কি হয়নি? শুধু একমুষ্টি অন্ন প্রত্যাশায়
আমার চক্রান্তজালে লক্ষ নারী দেয়নি কি দাম
সতীত্বের? লক্ষ শিশু কারুণের জিন্দানখানায়
হয়নি কি জন্মদাস? লক্ষ কোটি বন্দী তরুণের
রক্তে তৃপ্ত করিনি কি পুঁজিবাদী পাশবিকতার
বীভৎস পিপাসা? তবু কি ধৃষ্টতা আদম-সন্তান,
আমার চক্রান্তে ঘেরা মৃত্যু-তিক্ত পৃথিবীর বুকে,
কারুণের বেষ্টনীতে হতাশ্বাস পৃথিবীর বুকে,
ফেরাউনী অত্যাচারে দীর্ণ এই পৃথিবীর বুকে,
কল্পিত জান্নাতে আজ পেতে চাও তৌহিদী আলোয়

www.pathagar.com

শোষণ-সন্ত্রাস-মুক্ত, প্রাণদীপ্ত, পূর্ণাঙ্গ সমাজ?
শৃঙ্খলিত করেছি যে পথভ্রান্ত মূক জনতাকে
পেতে চাও তাকে তুমি মুক্তির জেহাদে? কী বিশ্বাস
তোমাকে করেছে দৃঢ় পাহাড়ের মত? কোন্ আলো
তোমাকে দেখায় পথ রাত্রির সন্ত্রাসে? কোন্ স্বপ্নে
গড়ে যেতে চাও তুমি পৃথিবী নূতন? শকুনির
যে স্বভাব, যে স্বভাব পিশাচের,—সে স্বভাব আমি
সঞ্চারিত করিনি কি তোমাদের মাঝে? দুনিয়াকে
দু'ভাগে দ্বিখণ্ড ক'রে মারিনি কি খোদার শান্তিকে?
শেষ করিনি কি আমি মানুষের শেষ সম্ভাবনা?
তবু বলো পরাজিত নও!

বনি আদম

পরাজিত নই তবু।
তবু বলি নিঃসংশয়ে,—ফেরাউন, কারুণের ব্যূহ
যেখানে দ্বিখণ্ড হ'য়ে জাগে আজ দীর্ণ মানবতা,
সেই চক্রান্তের বুকে প্রশান্তির নবীন নকীব
তুলেছে নতুন ধ্বনি তৃতীয় শক্তির। সে মাটিতে
দেখি বিশ্ব মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনা। জানি আমি
সূলনের এ অধ্যায় তিক্ত, তিক্ততম; জানি আমি
মুষ্টিমেয় নারী নর নিম্নস্তরে পাশবিকতার
মানুষের সত্তা ভুলে জীবনের খোঁজে সার্থকতা
স্বার্থপরতার চক্রে, ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির পর্দায়
ইব্‌লিসের অনুগামী চলে আজও বিচিত্র মুখোশে
নর-রক্তপায়ী কিংবা রক্ত-লোভাতুর। তবু জানি
বিকৃতির এ অধ্যায় বিভ্রান্তির প্রতিচ্ছায়া শুধু।
বিকৃত 'সভ্যতা' আর মৃত্যুমুখী পঙ্কিল কৃষ্টির
ঘূর্ণাবর্তে তবু আমি নই হতাশ্বাস। এ বিকৃতি
অতিক্রম ক'রে যাব আমি। প্রাণস্পর্শ দেব আমি
প্রাণহীন জনপদে। নব কৃষ্টি, সভ্যতা নূতন;
নূতন পৃথিবী আমি গ'ড়ে যাব রসূলের রাহে।

ইব্‌লিস

সে দীপ্ত প্রাণের কথা কেন বলো? কারবালা ময়দানে
দীর্ণ যার স্বপ্নসাধ রাজতন্ত্রী এজিদী খঞ্জরে,
বিলুপ্ত করেছি তাকে আমার অসংখ্য মতবাদে
শতাব্দীর অন্ধকূপে।

বনি আদম

তোমার অসংখ্য মতবাদ
ব্যক্তিপূজা, রাষ্ট্রপূজা, আত্মপূজা, স্বার্থপূজা নিয়ে

www.pathagar.com

প্রতীক পূজার সাথে। ধরা পড়ে গেছে এ জাহানে
অন্তঃসারশূন্য ; ম্লান। ফাঁকা আওয়াজের কারসাজি
ঝাণ্ডা তুলে বহুবিধ দিতে কোন পারেনি সুরাহা
সংখ্যাহীন সমস্যায়। সাম্য, মৈত্রী, শান্তি, স্বাধীনতা
আত্মার আলোকচ্যুত জড়বাদী এই পৃথিবীতে
পায়নি সাফল্য খুঁজে। প্রশান্তির দিকচক্র শুধু
সরে গেছে দূরে, দূরান্তরে। তোমার বীভৎস মতবাদ
রঙিন খোলসে শুধু বিভ্রান্ত ক'রেছে জনতাকে,
বর্ণ-গোত্র-অঞ্চলের প্রশ্নে শুধু ক'রেছে বিক্ষত
মানুষের শান্তি, আশা ;—শাণিত নখরে। আজ তাই
মৃত্যু-তিক্ত অবিশ্বাস 'প্রগতির' পথে।

ইব্‌লিস

মানুষের
মস্তিষ্কে, হৃদয়ে, প্রাণে, অন্ধকার—সংশয়ের বীজ
বপন ক'রেছি আমি কত যত্নে, জানো না সে কথা
ক্ষণজীবী পৃথিবীতে অনভিজ্ঞ তুমি। জানো না তা
দীর্ঘ যুগ-যুগান্তের সেই শ্রম, প্রয়াস আমার
ফুলে ফলে সুশোভিত শতাব্দীর বিষ-বৃক্ষ সেই
অপমৃত্যু এনেছে কিভাবে। জিব্রাইল, মিকাইল
জান্নাতী ফেরেশ্‌তা যত দেখেছে তা শঙ্কিত বিস্ময়ে
সময়ের তীরে ! মানুষের ইতিহাস—কলঙ্কিত
সে কাল কাহিনী, কলঙ্কিত দেখে আরও ভ্রাতৃরক্তে,
হত্যায়, লুণ্ঠনে, পাপে, ব্যভিচারে, শোষণে, ঈর্ষায়,
ফিরে গেছে বেদনার্ত তারা। মানুষের পৃথিবীতে
আমি জাগি শবের প্রহরী। প্রত্যয়ের এক বিন্দু
পাবে না এ পঙ্কিল ধরায়। সংশয়িত মানুষের
ব্যক্তি বা সমাজসত্তা দিশাহারা তিক্ত অবিশ্বাসে
হারায়েছে মূল লক্ষ্য ইব্‌লিসের অভিজ্ঞ কৌশলে।

বনি আদম

তোমার ফাঁকির চক্র, তোমার কৌশলী মতবাদ
রাত্রির আলেয়া যেন মিথ্যাময়ী,—নিষ্প্রভ, এখন
স্পষ্ট দিবালোকে। হিংসা-হিংস্রতার ছুরি ঢেকে রেখে
শান্তির খোলস মুখে প্রতারক, প্রভুত্ব পিয়াসী
প্রচার করেছ যত মিথ্যা বুলি, ধরা পড়ে গেছে
সম্পূর্ণ স্বরূপ তার এ বিশ্ব জগতে !—ঘূর্ণমান
মানুষের এ মিছিলে রসুল এসেছে বারেবারে।
অগণ্য যাত্রীকে তারা নিয়ে গেছে সত্যের মঞ্জিলে,
পথের দিশারী—পৃথিবীতে। মানুষের ইতিহাস

www.pathagar.com

কলঙ্কিত নয় তাই শুধু পাপ-পঙ্কিল প্রবাহে।
সেখানে ঔজ্জ্বল্য আছে, আছে দীপ্ত পূর্ণ পরিচয়
আশরাফুল মখলুকাত ইনসানের। বনি আদমের
মহান ভ্রাতৃত্বে, ত্যাগে, সততায়, সংগ্রামে, শান্তিতে
প্রেমে ও প্রজ্ঞায় দীপ্ত সমুজ্জ্বল সে পুণ্য কাহিনী ;
নতমুখ ইব্‌লিস যেখানে।—জমানার ঘূর্ণাবর্তে
সব আলো নিভে গেলে অন্ধকারে জ্ব'লেছে আবার
সিরাজাম মুনীরার দীপ্ত শিখা অনির্বাণ তেজে
বহু বর্ষ আগে ; তবু প্রোজ্জ্বল ভাস্বর দু'জাহানে।
পেয়েছে বিভ্রান্ত যাত্রী মঞ্জিলের দিশা তারা খুঁজে
সে সত্য আলোকে ! দিকে দিকে আজ তাই উঠে আসে
নয়া জিন্দেগীর খোঁজে নারী-নর তৌহিদী আলোকে ;
আখেরী নবীর পন্থা একমাত্র কাম্য যে তাদের।

ইব্‌লিস

বিলুপ্ত যে ইতিহাস টেনে এনে চাপা দিতে চাও
ব্যর্থতা নিজের, তাতে সুফল কি পেয়েছ এখানে
স্মৃতি রোমন্থনে মুগ্ধ... অথবা ঐতিহ্যসচেতন
কল্পলোকাচারী, অর্বাচীন ! বলেছি তো আমি আগে
সে স্বপ্ন বিলীন আজ কারবালায়,—এজিদী খঞ্জরে।

বনি আদম

কে বলে বিলুপ্ত সেই ইতিহাস আদর্শবাদের
দশতে কারবালায় ? মৃত্যু নাই আদর্শের। মৃত্যুহীন
শহীদের অনুসারী যে মুমিন, পায় সে প্রেরণা
মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের প্রাণবন্ত সে আদর্শ থেকে
চিরদিন। এজিদী খঞ্জরে তার শঙ্কা নাই কোন।
ফেরাউনী অত্যাচারে সে দাঁড়ায় কালীমের সাথে
ভয়শূন্য নীল নদী তীরে। নমরুদের জিন্দানে সে
নির্ভীক সংগ্রামী সত্তা ইব্রাহিম খলিলের মত
চায় শুধু মদদ খোদার। তাই বিশ্ব মানুষের
নব সম্ভাবনা দেখি দুনিয়া জাহানে। দেখি আমি
খিলাফতে রাশেদার পূর্ণ সম্ভাবনা।

ইব্‌লিস

কী অলীক

সে কল্পনা !

বনি আদম

সকল দিগন্ত জুড়ে যে পারে জ্বালাতে
সকল ঘুমন্ত সূর্য, দিতে পারে পূর্ণতার আলো
—ব্যক্তির, ব্যষ্টির কিংবা পৃথিবীর সব মানুষের

www.pathagar.com

সমস্যা-সঙ্কুল পথে, ঘূর্ণাবর্তে, তরঙ্গে, তুফানে,
—সে মানবতার রশ্মি যদি আজ থাকে অন্তরালে
মনে রেখো সুপ্ত শক্তি মিথ্যা নয় তার।

ইব্‌লিস

আশাবাদী

তুমি কিন্তু যে আশার পটভূমি অবাস্তব আজও,
সেখানে দুরাশা এই নৈরাশ্যের কাল ছায়া শুধু।
নিষ্ক্রিয়, হতাশাগ্রস্ত নারী-নর অবসন্ন, আর
স্তব্ধগতি যেখানে সমাজ, কিভাবে সেখানে তুমি
আশা করো মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনা,—সেই
খিলাফতে রাশেদার পরিপূর্ণ জীবনপ্রবাহ?

বনি আদম

কেন বলো অসম্ভব প্রতীক্ষিত সে জীবন, আর
সেই সত্য খিলাফত এ পটভূমিতে? প্রভাতের
দুয়ারে সঞ্চিত যত হোক্ না সে কুহেলি নিবিড়
দীর্ণ করে তবু তাকে শক্তিমান ভোরের শিকারী
আফতাব। নিঃশঙ্ক সূর্যের রশ্মি রাত্রির মিনারে
তীব্র সংঘর্ষের শেষে জ্বালে তবু সুবে উম্মীদের
স্বর্ণশিখা অমলিন,—সাময়িক অবসাদ শেষে।
আঁধারে ছিল যে সুপ্ত, সংগোপনে,—সে আত্মবিস্মৃত
আকাশের শামাদানে অনুভব করে সে তখন
সুসম্পূর্ণ জীবনের ভূমিকা বিশাল। জেহাদের
অগণ্য সংঘর্ষ মাঝে দেখে সেই পূর্ণ কামিয়াবি
সত্যের দুর্গম পথে চলে আজ এ বনি আদম;
অসম্ভব নয় তাই মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনা।

ইব্‌লিস

কেন অসম্ভব নয়? অচেতন যেখানে সমাজ
কিভাবে সেখানে তুমি এনে দেবে বহ্নি চেতনার?
কি অস্ত্রে ভাঙাবে তুমি শতাব্দীর নেশাগ্রস্ত ঘুম?
উজ্জ্বল উল্কার মত মানুষের মুক্ত পথ থেকে
স্খলিত যে মিশে গেছে দুর্নীতির ঘূর্ণি ও তুফানে
সহস্র পঙ্কিল পাপে—আজ তার আশা নাই, ভাষা
অর্থহীন—উন্মত্ত প্রলাপ। সহানুভূতির স্পর্শ
দেখে না সে কোনখানে, প্রাণহীন স্বার্থবুদ্ধি তার
জ্বেলেছে হাবিয়া তীব্র নীতিভ্রষ্ট পৃথিবীর বুকে
স্বস্তিহারা;—শান্তিহীন। অন্ধ অনুকরণের দাস
বিকায়ে নিজের সত্তা হারায়েছে স্বকীয়তা : আর
মিশে গেছে চক্রে ইব্‌লিসের।

www.pathagar.com

বনি আদম

এ কথা আংশিক সত্য।

ইব্‌লিস

পূর্ণ সত্য এই। আত্মপ্রবঞ্চিত, ধূর্ত, জ্ঞানপাপী
বুঝেও বোঝ না তুমি ! দেখ না কি চক্রান্তে আমার
মুসলিম মিল্লাত আজ দিশাহারা, কী কূট কৌশলে
হারায়ে জীবনাদর্শ চলে কোন মৃত্যুর প্রান্তরে,
শতধা বিচ্ছিন্ন ; দেখ না কি কূটচক্রে ইব্‌লিসের
সে আত্মবিস্মৃত মরে পথভ্রান্ত, পরানুকরণে !
ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্লেদ, ক্লেদ যত ফিরিঙ্গিয়ানার
নির্লজ্জ নগ্নতা নিয়ে জমে তার নিষ্ক্রিয়, নিঃসাড়
জিন্দেগীতে,—প্রতিহত তার গতি ইহুদীর চালে !
হারায়ে শক্তির উৎস শিকার সে সাম্রাজ্যবাদের !
আখেরী নবীর পথ-বিচ্যুত সে করে আমদানী
বিজাতীয় মূল্যবোধ আপ্রাণ প্রয়াসে ! আনে ভ্রান্ত
মিথ্যা আর মারী বিষ সঠিক দ্বীনের বিনিময়ে !
আমার সাফল্য এই।—দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিন্ন, সংশয়িত
মুসলিম জাহানে ঐক্য অবশিষ্ট রাখি নাই কোন,
রাখি নাই মুক্তির সরণি। নৈরাশ্যের অন্ধকারে
মিটায়েছি তার শেষ আশা।...লক্ষ্যহীন মিল্লাতের
এ ভূমিকা ভুলে ফের মুক্তি চাও, কেন্ তরিকায়,
কার পথে ? দিবাস্বপ্ন রচনার এ স্বভাব তুমি
ভোলো মূর্খ ; ভুলে যাও আজ।

বনি আদম

এ স্বভাব মানুষের।
নবীর তরিকা চিনে যে স্বভাব চায় অগ্রগতি
মুক্ত শাহীনের মত, গোলামীর জিঞ্জির ছাড়িয়ে
যে চায় প্রদীপ্ত গতি ঊর্ধ্ব হ'তে আরো ঊর্ধ্ব স্তরে ;
ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ছেড়ে বর্ণ-গোত্র-ভাষা-অঞ্চলের
তামাম আলমে চায় গ'ড়ে নিতে মুক্ত জাতীয়তা
মুজাহিদ—যে মর্দে মোমিন ;—বিশ্বভ্রাতৃত্বের ডাকে
পরিপূর্ণ ইনসাফ, সত্য আর ন্যায়ের দাবীতে
আল্লার প্রভুত্ব মেনে অস্বীকার করে যে বাতিল
ইব্‌লিসের ভ্রান্ত মত, কূটচক্র, কর্তৃত্ব অলীক ;—
ঝঞ্ঝা, ঝড়ে, ঘূর্ণাবর্তে বিদ্যুতের চেয়ে দীপ্যমান
এ স্বভাব সেই মোমিনের। এ স্বভাব বিপ্লবীর
বিপ্লবে মহান।...সত্যাশ্রয়ী মানুষের এ স্বভাব
আগ্নেয় প্রেরণা দেয় অসত্যের বিপক্ষে দাঁড়াতে,

www.pathagar.com

অন্যায়ের টুটি টিপে মারে যে, অসাম্য পিষে পায়ে
মানুষের যে স্বভাব জেহাদের ঝাণ্ডা ব'য়ে চলে
নতুন দিগন্ত পানে অভিযাত্রী সেই !—দেখ চেয়ে
মরক্কোর তীর থেকে দ্বীপপুঞ্জে ইন্দোনেশিয়ার
ঘুমের অরণ্য জ্বলে চেতনার সে তীব্র আগুনে
লেলিহান। দেখ চেয়ে সংখ্যাহীন সিংহ শাবকেরা
জেহাদী আগুনে সেই নিতে চায় সব প্রাপ্য খুঁজে !
বিক্ষোভ মিছিলে কিংবা শব্দহীন মূক জনপদে
দেখ সেই ইনসাফ, ঐক্য, শান্তি, সত্যের অন্বেষা !

ইব্‌লিস

বহু রাত্রি, বহু বাধা পথে আছে তার।

বনি আদম

জানি আমি
মুক্ত প্রভাতের পথে জানি আমি, জানি আমি আরো
বহু শ্রম, বহু রক্ত, জেহাদের সংখ্যাহীন মাঠ
পড়ে আছে। তবু শ্রান্ত নই আমি, সঙ্গী জেহাদের
ক্লান্তি সে মানে না ; তার কোন দিন পরাজয় নেই।

ইব্‌লিস

ক্লান্ত আমি। তবু আজ এই প্রশ্ন তোমাকে শুধাই
: সংগ্রামী তোমার সত্তা দেখে না কি ছায়া ব্যর্থতার ?

বনি আদম

ঝড়ের বিপক্ষে ওড়ে যে ঈগল,—সে বিহঙ্গ আমি !
সমুদ্রের প্রতিরোধ চূর্ণ করে যার উন্মাদনা
সে তিমির প্রাণোচ্ছ্বাস মর্মমূলে সঞ্চিত আমার
নিরন্ধ্র রাত্রির বক্ষ দীন করে সুতীব্র রশ্মিতে
যে তারা, আমি সে দীপ্ত নক্ষত্র ;—সঘন অন্ধকারে
চিন্তার জটিল বিশ্বে করি তীক্ষ্ণ আলোকসম্পাত।
সূচীভেদ্য অন্ধকারে, নিষ্প্রাণ প্রান্তরে জনহীন
আবে-হায়াতের খোঁজে যে খিজির সঙ্গীহীন একা
নির্ভয়ে আল্লার নামে পাড়ি দেয় বিজন প্রান্তর,
সংকটে যে ধৈর্যশীল, জেহাদে যে দুর্জয় নির্ভীক,
আমি তার অনুবর্তী। সংগ্রামের আগুন আমার
প্রাণকেন্দ্রে ; ধমনীতে জ্বলে তার শিখা লেলিহান।
মৃত্যুকে করি না ভয়, অগ্রগামী জীবনের পথে
নিষ্কম্প আমার প্রাণ করে নিত্য সংগ্রাম সূচনা,
অসত্যের অন্ধকূপে কিংবা তিক্ত অন্যায়ের মুখে
শক্তিমান করে বাহু আঘাতে ; সুতীব্র প্রতিঘাতে।
যত পথে বাধা পড়ে, দৃঢ় হয় শত্রু ব্যূহ যত,

www.pathagar.com

সংকটের মৃত্যু মে. হ'য়ে আসে যত ঘনতর,
যত আসে হিংস্র ঝড় বার্তা নিয়ে বজ্র বিদ্যুতের
আমার সংগ্রামী সত্তা তত তাকে স্বাগত জানায়।
যতবার বাধা পাই ততবার জাগে এই প্রাণে
নয়া জেহাদের মাঠে নবতর সংগ্রামী চেতনা ;
যত দেখি বিফলতা পাই তত সাফল্য-আশ্বাস।
যে পৃথিবী কাঁদে আজ কারুণের লুব্ধ বেষ্টনীতে,
যে সমাজ বিকলাঙ্গ শাদ্দাদের চক্রান্তে,—যেখানে
নমরুদের ব্যভিচারে শ্বাস রুদ্ধ হয় প্রতিক্ষণে,
জাগে দর্পী ফেরাউন ক্ষমতা-লোলুপ অন্ধকারে ;
সেখানে বিভ্রান্ত সেই মানুষের পৃথিবীতে আজ
আমি চলি জালিমের মৃত্যু-বার্তা নিয়ে। সে মাটিতে,
সব শৃঙ্খলিত মাঠে করি মুক্ত আলোক-সম্পাত,
ব্যক্তি আর সমাজের পূর্ণতার বাণী ব'য়ে চলি
নবীর উম্মত আমি ;...ইনসানের উত্তরাধিকারে।
আমি চলি ইনসানের শেষহীন সম্ভাবনা নিয়ে।
তোমার সুতিক্ত দ্বন্দ্ব তীব্রতম হোক, তবু জেনো
এখানে মাটির বুকে সর্বশেষ জয় মানুষেরি।

ইব্‌লিস

যারা যুদ্ধ চায়, যারা বিপর্যয় আনে পৃথিবীতে
তুমি যে তাদের ;—তবে এ কথা কোরো না অস্বীকার।

বনি আদম

অস্বীকার করি আমি। পৃথিবীতে শান্তির পশরা
চূর্ণ ক'রে যায় যারা, জনপদে অবিশ্বাস আনে,
—আমি যে তাদের নই, এ কথাও তুমি ভালো জানো,
তবু ধূর্ত বিতর্কের অবসরে স'রে যাওয়া জানি
পলায়নী স্বভাব তোমার। যে সরণি জেহাদের,
যে সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী প্রশান্তির খোঁজে,—জালিমের,
জড়বাদী প্রেতাত্মার অত্যাচার সমূলে জ্বালিয়ে
চায় যে প্রশান্তি ; পূর্ণ মানবতা ; অজানা সে নয়
অন্তত তোমার কাছে—ইব্‌লিস ! কূটবুদ্ধি তুমি

ইব্‌লিস

রাত্রি শেষ হ'য়ে আসে প্রভাতের তীরে। সংকটের
হিংস্র অন্ধকারে ফের দেখা হবে।

বনি আদম

সব অন্ধকারে,
সকল সংকটে পাবে—ইব্‌লিস ! প্রস্তুত আমাকে।

(ভোরের আজানে ইব্‌লিসের অন্তর্ধান)

www.pathagar.com

হাবেদা মরুর কাহিনী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

জুল্‌মাতের হিংস্র ছায়ায়
মিশে গেছে কাহিনী শোনার সন্ধ্যা...
কিন্তু এখানে,
এখানে এই অমিল ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে,
কাঁকর-বিছানো মাঠে,
বালু-রুক্ষ বিয়াবানে
আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরু মাঠের
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে...

যে বাতাসে মিশে আছে
অসংখ্য বঞ্চিত প্রাণের আকুতি,
যে বাতাসে মিশে আছে
বেশুমার ইন্‌সানের আহাজারি ;
যে বাতাসে মিশে আছে
সেই বৃদ্ধ জয়ীফের কণ্ঠ
আর অভিযাত্রী কাফেলার
বহু ব্যর্থতার কাহিনী
(যা শুধু আমরা কানেই শুনেছি
দেখিনি কখনো দু'চোখে)।

দুই

কাফেলা এসে দাঁড়ালো
হাওয়ার মাঠ দশ্‌তে হাবেদায়...
জিন্দেগীর সবুজ নিশানা হারিয়ে
খাঁ খাঁ করছে যেখানে দিগন্ত-ছোঁওয়া ময়দান,
যেখানে পোড়া-মাটি-রঙ ফসলের শূন্য মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গুম্‌রে উঠ্‌ছে রাত্রি দিন...
কাফেলা এসে দাঁড়ালো সেই রুক্ষ বিয়াবানে,
সবচেয়ে প্রাণবন্ত চারাগাছ
যে মাটিতে মাথা তুলে
কুঁকড়ে শুকিয়ে মারা গেছে
(যে মরা গাছের শুকনো ডালে দেখেছি
ঝড়ো সন্ধ্যায় হিংস্র জ্বীনের নর্তন...)

www.pathagar.com

সবচেয়ে বলিষ্ঠ বুক
আর জোরালো ডানার পাখী
যে প্রান্তর পার হওয়ার পথে
ডানা গুটিয়ে হঠাৎ পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে
আজ্‌দাহার তীব্র দৃষ্টিতে সম্মোহিত শিকারের মত
(তারপর কোন দিন–ই যার সাড়া পাওয়া যায়নি)।

কাফেলা এসে দাঁড়ালো
হাবেদার সেই মৃত্যু–হিংস্র প্রান্তরে
(একদিকে যার ক্ষুব্ধ কহর দরিয়া
অন্যদিকে লুব্ধ বাদগর্দ হাম্মাম,
জেগে আছে দুই ধ্বংসের
দুই অপমৃত্যুর ইশারা নিয়ে)...
এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলো সবার মন
আসন্ন মৃত্যুর আভাসে,
কেঁপে উঠলো কাফেলা–সালার
সেই দীর্ঘশ্বাসের প্রান্তরে,
হাওয়ার মাঠ দশ্‌তে হাবেদার তপ্ত
তামার মত ময়দানে...

তিন

এ এক কঠিন পরিস্থিতি...
জওয়াব দিতে না পারলে
জিন্দেগীর সাত সওয়ালের
এখানে নাই মুক্তির কোন সম্ভাবনা।

এই লক্ষ্যহীন জীবন,
এই পাওয়া না–পাওয়ার দ্বন্দ্ব,
এই দীর্ঘশ্বাসের প্রান্তর ;
এ সব–ই এক বিস্বাদ ব্যর্থতার পটভূমি !
এর পর আসবে
আতশী দরিয়া,
কহর দরিয়া,
কহর দরিয়া,
রক্ত সমুদ্র
আর কোকাফের কাল পাথরের মত
ঘন অন্ধকার রাত্রি...

www.pathagar.com

অতিক্রম করতে না পারলে
সকল বাধা—সব প্রতিবন্ধক,
উত্তর দিতে না পারলে
জীবনের সকল প্রশ্নের,
ব্যর্থতার ক্লান্ত শ্বাস
শুধু ব'য়ে আনবে এখানে
এক মৃত্যু-ঝড়ের ইশারা।

চার

এ কথা আমি ভেবেছি
কহ্‌রমা দরিয়া-যাত্রী মুসাফিরের মত
রাত্রির হিংস্র সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে
(যখন দিগন্তচারী আদম সুরাত
আস্‌মানের বাঁকা পথ পাড়ি দিয়ে
মিশে গেছে দূরান্তে,
আর মুশতারি, সুরাইয়া ডুবে গেছে আমার অলক্ষ্যে)।
কাহিনীর অস্পষ্ট অন্ধকার থেকে
তারপর আমার দৃষ্টি নেমে এসেছে
এক অচেনা দিনের ময়দানে,
আর সেখানেও আমি শুনেছি
বাতাসের একটানা দীর্ঘশ্বাসে
দুনিয়ার সকল কান্নার মিলিত আওয়াজ।

ছুটে এসেছি আমি তখন তিক্ত বেদনায়,
ঘুরেছি দিশাহারা মানুষের সঙ্গে
পথ ছেড়ে প্রান্তরে
(অনেক কাঁকর বিছানো মাঠে
অনেক বালু-রুক্ষ বিয়াবানে)
কিন্তু শূন্যতাই দেখেছি সম্মুখে ;
ব্যর্থতার বোঝা-ই শুধু বাড়িয়েছি সকলে।

সাত সওয়ালের মত
যে করতে পারবে
এ মাঠের সাত সমস্যার সমাধান,
জাগাতে পারবে যে এই মরা মাঠে
জিন্দেগীর নতুন আশা,
সে-ই শুধু পারবে থামাতে এই দীর্ঘশ্বাস ;

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিপুল বোঝার ভারে।
অস্পষ্ট আলো অন্ধকারে
যতবার আমি শুনেছি
গৃহ-হারা নারীর সাহায্য ভিক্ষা
ততবার আমি তাকিয়েছি ম্লান, অসহায় দৃষ্টিতে,
কিন্তু আমার ধূসর দিগন্তে
কোন দিন-ই পড়েনি
সেই মহীয়সী মহিলায় ছায়া
দুর্গত মানবতার সেবায়
এগিয়ে এসেছে যাঁর দু'খানা হাত
অনাড়ম্বর, অকৃপণ মমতায়।

সূচীভেদ্য রাত্রির অন্ধকারে
যতবার আমি দেখেছি
পাপ-লুব্ধ পিশাচের নির্লজ্জ পৈশাচিকতা,
ততবার আমি তাকিয়েছি শঙ্কিত, ব্যথাতুর দৃষ্টিতে,
কিন্তু কোন দিন-ই আমার নজরে পড়েনি
দোররা-ধারী সেই শক্তিমান খলিফার চেহারা
প্রাণ-প্রিয় পুত্রের রক্তাক্ত দেহ
যাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি
পক্ষপাতহীন বিচার
মৃত্যু-কঠিন শাস্তি থেকে।

নয়

স্বস্তিহীন,
শান্তিহীন,
এই দুর্ভিক্ষ মড়কের দেশে
অসংখ্য, অগণিত প্রাণ
সঁপে দিয়ে অকাল মৃত্যুর মুখে
খুঁজে বেড়াচ্ছি নিকষ অন্ধকারে
মূল কারণ সেই অপমৃত্যুর।
দূরদর্শীর ভান করছি আমরা সকলেই,
শুধু দেখছি না কাছের পাপগুলোকে,
দেখছি না দুর্নীতির কত পুঁতিগন্ধময় অন্ধকার
ছেয়ে ফেলেছে আমাদের নির্জীব সমাজ সত্তা...

যে দুর্নীতির অভিশাপ
জেগে আছে কদর্য পিশাচের মত

www.pathagar.com

আদর্শহীন জীবনের সহস্র ফাটলে !
যে দুর্নীতির বিষ
পড়েছে ছড়িয়ে
দুরারোগ্য যক্ষ্মা বীজাণুর মত
সমাজদেহের শিরায় ধমনীতে,
যে দুর্নীতির বিষাক্ত দহনে
এ দেশের মাটিতে, হাওয়ায়
জেগেছে এক অপরিমাণ শূন্যতা...

বুঝেও আমরা কিছুই পারছি না বুঝতে
জেনেও শুধু করছি না-জানার ভান,
আর অন্ধের মত নিকষ রাত্রির চোরাগলিতে
ঘুরে মরছি মুক্ত আলোর
পূর্ণ জীবনের সন্ধানে...

দশ

বিষণ্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে
কাল জেগে উঠেছিল
এক মজা নদীর কাহিনী
(উচ্ছল পারার মত আকাশের সেই আরশি—
মুখ দেখতো যাতে
সংখ্যাহীন তারা আর চাঁদ,
পাল তুলে যেতো দূরের নৌকা
উদ্দাম স্রোতে ভাসমান রাজহাঁসের মত ;
সে নদী এখন গেছে শুকিয়ে !
তার বালু-বক্ষে এখন ঘুরে বেড়ায়
তপ্ত হাওয়ার শ্বাসে
বহু যুগ আগের এক বিগত দিনের কান্না)

আর মনে হয়েছিল
এখনো সে নদী পারে বাঁচতে
এখনো সে পারে ফিরে পেতে
তার বহমান তরঙ্গ
উদ্দাম গতিবেগ,
প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস ;
যদি সে খুঁজে পায়
শুধু তার মূলের ঠিকানা।

www.pathagar.com

এগারো

তখন আমার স্বপ্ন মনে হয়নি
যখন ভেসে উঠেছিল আমার চোখের সামনে
এক শান্তি-সেনার বাহিনী,
এক নির্ভীক মাল্লার দল ;
এক দল আদর্শবাদী সমাজ-কর্মী
আর একদল সর্বত্যাগী সুফী দরবেশ।

আমি দেখতে পেলাম
সারা দুনিয়ার মানুষ
খোশ আমদেদ জানাচ্ছে
মুক্তির সনদ পাওয়া
খিলাফতের সেই সব আদর্শ নাগরিককে।

আমি দেখতে পেলাম
সারা দুনিয়ার জন-সমর্থনেই
তাদের সেনাবাহিনী পার হয়ে গেল
অশান্তির সকল প্রান্তর,
তাদের ঘোড়ার খুরে জাগলো
মরুভূমির সকল ঘুমন্ত হলকা,
তাদের প্রশ্বাসে আগুন রঙে রাঙলো
রাত্রিশেষে জড়তার আসমান,
তারা শেষ করে দিল জালিমের, জুলুমের
অসত্যের, অশান্তির দিন।

তাদের মাঝিমাল্লা পাড়ি দিল সকল দরিয়া,
তাদের দাঁড়ের মুখে জাগলো
নোনা পানির অশ্রু সমুদ্রে
আশার স্ফুলিঙ্গ,
তারা নিয়ে গেল মেশ্‌ক, আম্বর,
—শান্তি, মৈত্রী, মুহব্বতের সওগাত
সকল অনাবিষ্কৃত দ্বীপে ;
সকল অনাবাদী দেশে।

তাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক
আহরণ করল বিশ্বের জ্ঞান,
আর ছড়িয়ে দিল
সেই ভাণ্ডারের ইয়াকুত, পোখরাজ, লাল, জওয়াহের
সারা দুনিয়ার বুকে।

www.pathagar.com

তাদের সর্বত্যাগী সূফী, দরবেশ
প্রচার করল সারা দুনিয়ায়
এক সত্য ধর্মের মহিমা,
জুলমাতের ঘন অন্ধকারে
তারা আনলো তৌহিদী আলোর দীপ্ত মশাল,
আর প্রতিষ্ঠা করল
অন্যায়—অবিচার—শোষণ—ত্রাসন-মুক্ত
আদম সন্তানের এক বিশ্ব ভ্রাতৃ-সমাজ।
এ সব-ই আমার কাছে সত্য ব'লে মনে হয়েছিল
যখন একের পর এক খুলে যাচ্ছিল দৃশ্যের পর দৃশ্য !
কিন্তু যখন আমার ঘুম ভেঙে গেল
তখন আমার মনে হ'ল
: যা দেখেছি তার সব কিছুই স্বপ্ন,
বহুদিন আগেকার
এক বিস্মৃত যুগের হারানো কাহিনী।

বারো

যে দিন থেকে আমরা নিয়েছি
ঈমানের পরিবর্তে বে-ঈমানী,
একতার পরিবর্তে অনৈক্য,
আর শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা (কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা)
শুরু হয়েছে সে-দিন থেকেই
আমাদের চূড়ান্ত দুর্গতি,
সে দিন থেকেই আমাদের অগ্রগতি
হয়েছে পরিপূর্ণভাবে ব্যাহত,
আর
কলহ-দ্বন্দ্ব-সংশয়-স্বার্থপরতার ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে
নেমে গিয়েছি আমরা
হীনতার, দৈন্যের, অপমৃত্যুর।
নিকষ কালো অন্ধকারে।

যে হাত বিলিয়ে দিত সারা দুনিয়ার বুকে
বেশুমার চুনি, পান্না, জমরুদ, জওয়াহেরাত
সে হাত এখন অন্যের দরজায় কৃপা-প্রার্থী,
দুনিয়ার বুকে যে ছিল শ্রেষ্ঠ বন্টনকারী দাতা
সে আজ ভিক্ষা চায় কান্না-করুণ কণ্ঠে
একটি সামান্য তামার পয়সা !

www.pathagar.com

তেরো

মুক্ত জীবনের ময়দানে,
মহৎ আদর্শের মন্‌জিলে
তুলে নিতে হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে
সকলের আগে প্রয়োজন আদর্শবাদী কর্মীর,
আদর্শকে যে গ্রহণ করেছে নিজের জীবনে পরিপূর্ণভাবে
(পূর্ণাঙ্গ আদর্শের শক্তিতে শক্তিমান
সে-ই শুধু পারে
কাহিনীর বিশালপক্ষ রক পাখীর মত
তুলে নিতে অধঃপতিত জাতিকে
পতনের গভীর খন্দক থেকে
মুক্ত আলোর নীল আসমানে)।

চৌদ্দ

যতবার চেয়েছি মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করতে
ততবার-ই আমি হয়েছি প্রতারিত,
এ যুগের 'সাজাহ্' 'মুসায়লেমা' আর 'তোলায়হা'
ততবার-ই ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাকে
মিথ্যা নবুয়তের দাবী নিয়ে।

একটি সত্যাশ্রয়ী প্রাণ
উদ্ধার করেছে আমাকে বারেবারে
এই অন্ধকার ঘূর্ণি থেকে
তার আদর্শের অনির্বাণ আলোকে
(মিথ্যার বিরুদ্ধে,
অন্ধকারের বিরুদ্ধে
যার সংগ্রাম আপোষহীন,
যার নেতৃত্ব
সকল নেতার অনুসরণ-যোগ্য
পরবর্তী সকল যুগে)।
অসংখ্য জ্যোতিষ্কের মধ্যে কুতুব তারার মত
নিষ্কম্প, অবিচল সেই নক্ষত্র,
মানুষের পূর্ণতার ইতিহাসে
আবুবকর সিদ্দিক নামেই পরিচিত
আখেরী নবীর সেই শ্রেষ্ঠ উম্মৎ;
—সেই শ্রেষ্ঠ মানব।

www.pathagar.com

পনেরো

ইসলামের তৃতীয় খলিফা
হজরত ওসমান গনি
(নবীজী যাকে সম্মানিত করেছিলেন
জিন্নুরাইন বলে)
শুধু জাগতিক ঐশ্বর্যেই ছিলেন না বিত্তবান,
চিত্তের ঐশ্বর্যেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনী।

অপূর্ব দানশীলতা,
অতুলনীয় ভ্রাতৃত্ব আর শালীনতাবোধ
তাঁকে উন্নীত করেছে
ফেরেশতাদেরও ঊর্ধ্বস্তরে।

নবীজী তাঁর দিকে তাকাতেন সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে,
নবীর অনুগামী যাঁরা
তাঁরাও তাকান সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে।

ষোল

আল্লার রহ্‌মতে যিনি হয়েছেন সম্মানিত
তাঁকে অসম্মান দেখিয়ে
কেউ পারে না লাভবান হতে।
ষড়যন্ত্র-নিপুণ এজিদ চেয়েছিল
একচ্ছত্র আধিপত্য আর সম্মান;
কারবালার হত্যাকাণ্ডে
সে হয়েছে সবচেয়ে ঘৃণিত
(কুণ্ঠা বোধ করে—মানুষ
যে অত্যাচারীর সঙ্গে তুলনা করতে
হিংসুক সাপ অথবা হিংস্র পশুর)।

সতেরো

প্রাকৃতিক নিয়মে
যেমন সহজ স্বাভাবিক গতিতে
ফিরে আসে রাত্রির পর দিন,
শীতের পর বসন্ত

www.pathagar.com

(রাত্রিশেষের আস্‌মানে
যখন দেখা দেয় ভোরের রোশ্‌নি,
শীর্ণ শাখায় জাগে
যখন সবুজের প্রাচুর্য
নওবাহারের রঙের বৈচিত্র্য)...

পতনের পর উত্থান
আসে না সে-ভাবে,
অতটা সহজে ; অতটা নির্বিঘ্ন গতিতে।
কওমের তক্‌দির পরিবর্তিত হয় না তত দিন
অধঃপতিত জাতি যতদিন না হয় সজাগ
কঠিন প্রয়াসের পথে
একাগ্র সাধনার পথে।

আঠারো

বিশ্বমানবের যে মুক্তি-স্বপ্ন দেখেছেন
এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি
(কা'বা-কে কেন্দ্র ক'রে
মুসলিম জাহানের ঐক্যের বুনিয়াদে)
সে কি নিছক কল্পনাবিলাস?
না,
তোমরা তাকে বলো না কল্পনাবিলাস।
বস্তুত এটাই একমাত্র পথ
শান্তি, সমৃদ্ধি আর পরিপূর্ণ জিন্দেগানীর।
এটাই নির্বাচিত পন্থা
হক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার
(সকল জালিমের জুলুমশাহী শেষ ক'রে)।

ঐক্যবদ্ধ না হ'লে
বিশ্ব মুসলিমের অস্তিত্ব থাকতে পারে না কোন দিন,
আর ঐক্যের বুনিয়াদেই মুসলিম সত্তা হয় পূর্ণাঙ্গ,
অবলীলাক্রমে তখন সে ভেঙে চলে
স্বার্থের সকল ক্ষুদ্র গণ্ডী,
জীবনের সকল সংকীর্ণ প্রাচীর।

গণ্ডীবদ্ধ কূপের পানি,
পুকুরের পানি,
এমনকি একটা বিরাট এলাকায় বিস্তৃত

www.pathagar.com

পাহাড়ে ঘেরা হ্রদের পানির সঙ্গেও
তুলনা চলে না মুসলিম প্রাণ-প্রবাহের ;
শুধু মহাসমুদ্রের পানির সঙ্গেই
চলতে পারে যার তুলনা
(গণ্ডীর বাঁধন থেকে চির দিনের জন্য যে মুক্ত
সার্বজনীন কল্যাণ-ই যার একমাত্র লক্ষ্য)।

গণ্ডীবদ্ধ হলে
ঘনিয়ে আসে তার অপমৃত্যু
(যেমন হয়েছে এ যুগে)।
বিভেদের প্রাচীরে সমুদ্র হয়েছে বন্দী
সংকীর্ণ হ্রদের মত,
সামান্য জেলে ডিঙিও
ভয় পায় না এখন তাকে অতিক্রম করতে,
সামান্য খরগোশও এখন হানা দেয় তার সীমান্তে
গণ্ডীবদ্ধ সমুদ্রকে পুকুরের মত নিস্তরঙ্গ দেখেই।

এখন আর আমাদের দেখে
কেউ চিনতে পারবে না
সেই তৌহিদবাদী বিশ্ব মুসলিম সত্তাকে,
ভূগোলের সীমানা ভেঙে
সারা দুনিয়ায় যারা করেছিল
সাম্য, ভ্রাতৃত্ব আর শান্তির আবাদ,
মরুভূমিতে যারা ফলিয়েছিল জ্ঞানের ফসল,
বিরাট দ্বীপে যারা গড়েছিল সবুজ প্রাণের বসতি ;
হিংস্র নরখাদককে করেছিল মার্জিত, সভ্য, শান্তিপ্রিয়।

ভুল হয়ে গেছে সে কথা
আজ আমাদের সকলেরি,
নিকষ রাত্রির অন্ধকারে
কোথায় মিশে গেছে
হারানো দিনের উজ্জ্বল সেই সোনালি রেখা
কেউ আজ রাখে না তার সন্ধান।
মর্সিয়ায়, ভাটিয়ালী সুরে
শুধু ব্যর্থতার কান্নাই ঝরছে এখানে
শতাব্দীর পর শতাব্দী।

তবু যখন দেখি
শ্রান্ত সাম্পান মাঝির চোখে
হঠাৎ ঝল্‌সে ওঠা

www.pathagar.com

সিন্দাবাদের চোখের বিস্মৃত দ্যুতি
তখন আমি আশ্বস্ত হই,
আমি বিশ্বাস করি
ইসলামের প্রাণ-প্রবাহ আবার যাবে ছড়িয়ে
দুনিয়ার এই প্রান্ত থেকেই সারা জাহানে।

ঊনিশ

সামান্য বিন্দুর আকারে
দেখা দেয় যে বৈশাখী ঝড়ের মেঘ
সারা আসমানে সে ছড়িয়ে পড়ে
অবলীলাক্রমে,
ইসরাফিলের শিঙ্গার ধ্বনি
যখন আমরা শুনতে পাই মেঘের বজ্রকণ্ঠে,
আর অনুভব করি
ভাঙা-গড়া,
ঝড়-ঝাপট,
বৃষ্টিবাদলের এক নতুন অধ্যায়।

অনুভব করি
অনাগত ফসলের
এক নতুন ইঙ্গিত।

বিশ

গভীর অনুভূতি
আর অবাধ কল্পনার রঙে রঙে
জীবনের অভিজ্ঞতার উপাদান
যখন ফুটে ওঠে ভোরের রক্তগোলাবের মত,
তখনি আমরা বলি : সুন্দর সার্থক কবিতা।

কিন্তু কল্পনা-প্রবণ কবির সঙ্গে
সত্যদ্রষ্টা নবীর তুলনা চলে না কোন দিন।
কবিকে তোমরা ভেবো না নবী।
কবি যেখানে নবীর অনুসারী
শুধু সেখানেই তোমরা গ্রহণ করতে পারো তাকে
সত্যাশ্রয়ী লেখকের জল্‌সায়
(ইসলামী সাহিত্যের মহফিলে)।

www.pathagar.com

একুশ

ইসলামী সাহিত্যকে হতে হবে
একাধারে ইসলামী ভাবাদর্শে
আর সাহিত্যের গুণে সমৃদ্ধ।
কোরআন সুন্নার রোশনিতে যা হয়নি রওশন
তাকে কিছুতেই বলা চলে না ইসলামী,
আর শিল্পবিচারে যা হয়নি উত্তীর্ণ
তাকেও কোনমতে বলা চলে না সাহিত্য।

আর এজন্যেই
ইসলামী সাহিত্যের নামে
এমন জিনিস আমরা দেখতে পাই অনেক সময়
যা ইসলামীও নয় সাহিত্য–ও নয়।

বাইশ

অসংলগ্ন চিন্তার অধিকারী
কোন লেখকের লেখা পড়ে
আমার মনে জেগেছিল
সেই অপরিপক্ব মাঝির কাহিনী,
দুই বনের মাঝে নৌকা ঠেলে দিয়ে যে বলেছিল
যার প্রয়োজন আছে নেমে যেতে পারে সে এখানে।

তেইশ

অস্তি বা নাস্তির প্রশ্নে এক পা এগিয়ে
বিজ্ঞান হয়েছিল দ্বিধাশূন্য,
দু' পা এগিয়ে হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত,
নবী সুলায়মানের দরবারে
শেবার রানী বিলকিসের অজ্ঞতা
যেমন হয়েছিল মুক্ত জ্ঞানের সম্মুখে বিপর্যস্ত।

চব্বিশ

এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাবে বলে,
টেনে নিয়ে চলেছে গহীন বনের অন্ধকারে

www.pathagar.com

যেখানে অপমৃত্যুর খাদের মত
গভীর গড়খাই; আর কাঁটাতারের পাহারা।
বিভিন্ন মতবাদ অধ্যুষিত দুনিয়ায়
এই তো বিভ্রান্ত মানুষের চেহারা!

পঁচিশ

আসমান-ছোঁওয়া মিনার গড়তে যেয়ে
মানুষ যখন অহঙ্কারে হারিয়ে ফেলে কাণ্ডজ্ঞান
তখন সে সব কিছুই বুঝতে পারে
নিজের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া
(যখন সে মনে করে নিজকে
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বা সেরা দানেশমন্দ)।

ছাব্বিশ

শক্তি অর্জন বা ক্ষমতা দখল
যখন শুধু স্বার্থপরতা
আর আত্মপূজার জন্যে
তখন সেটা সবচেয়ে ক্ষতিকর, সবচেয়ে আত্মঘাতী
(ব্যক্তি আর সমাজসত্তাকে যা ধ্বংস করে এক সঙ্গে
মরুভূমির মরীচিকার চাইতেও তীব্র সম্মোহনে—বিধ্বংসী গতিতে)।

সাতাশ

নেতৃত্বের গদি দখল করার জন্যে
সেজেগুজে তৈরী থাকেন যাঁরা
(কৌশলী অভিনেতার মত দহ্লিজে আর বক্তৃতামঞ্চে),
তাঁদের সঙ্গে আদর্শবাদী নেতৃবৃন্দের
প্রভেদ শুধু এইটুকু:
আদর্শবাদীরা যেখানে ছিলেন খিদমতগার
ইস্লামের এবং ইনসানের;
আদর্শহীনেরা সেখানে খিদমত-প্রার্থী
ইস্লামের এবং ইনসানের।

www.pathagar.com

আটাশ

নতুন কিছুই নয়
দুনিয়ায় যোগ্যাযোগ্য বিচার
কেননা সঠিক মূল্যবোধ নাই যেখানে
সেখানে মুড়ি পায় মিছরির দাম
(যদিও মিছরির স্বাদ কেউ পায় না তা থেকে)...
যেমন এক বুজর্গ ব'লেছেন
: ঈসা আলায়হেস-সালামের গাধাও
যদি মক্কায় যায়
হাজী হয় না সে ; গাধাই থাকে।

উনত্রিশ

জ্ঞান আর সৌন্দর্যের
সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন যিনি
(দুনিয়ার বহু মৌসুমের ফুল ফলল
সঞ্চিত ছিল
যে ভ্রাম্যমাণ মুসাফিরের মহৎ জীবনে)
যাঁর রচনারীতির অনুসরণ ক'রেছেন
অনেক কবি, মহাকবি আর প্রতিভাবান লেখক,
শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ইরানের সেই দরবেশ কবি
শেখ সাদীর অমর সংগীতে আমরাও বিমুগ্ধ।

আমরাও তাঁকে অনুসরণ করি
(পূর্বগামীদের মত)
মৃত্যু-তিক্ত জীবনের কাঁটাঝোপ
যেন রূপায়িত হয় সুন্দর গুলিস্তানে,
আর নগণ্য মৃত্তিকাখণ্ড
রূপায়িত হয় সুরভিত মেশ্‌ক্-এ।

ত্রিশ

শুধু শান্ত শিশিরবিন্দুই নয়,
উত্তাল বন্যা আর অশান্ত ঘূর্ণি তুফানও দেখেছি
এ দেশের মাটিতে ;...এ দেশের স্নেহাদী-জীবনে।

www.pathagar.com

শুধু রাত্রির নিথর নৈঃশব্দ্যই নয়,
শব্দমুখর দিনের উদ্দামতাও দেখেছি
এ দেশের মাটিতে ;...এ দেশের জেহাদী-জীবনে।

যদি বন্ধ ক'রে না রাখো তোমার দৃষ্টি
তুমিও তা পাবে দেখতে,
তুমিও পারবে বুঝতে
এ জাতির স্বকীয়তা আর স্বাতন্ত্র্য।

একত্রিশ

বীরের মত বাঁচতে যারা জানে
বীরের মত মরতেও তারা জানে !
বীরের মত যারা মরতে শেখেনি
তাদের বেঁচে থাকাটা মানুষের জন্যে কলঙ্ক
তাদের মরে যাওয়াটাও মানুষের জন্যে কলঙ্ক।

বত্রিশ

জেহাদের প্রথম কথা হ'ল
স্থির লক্ষ্য,—আল্লাহ্‌র রেজামন্দির দিকে ;
আর বিশুদ্ধ সংকল্প—(সংগ্রামের সকল পর্যায়ে)।
সংকল্পের পরিবর্তন ঘটলে
মানুষ হ'য়ে পড়ে
খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তিকামী
স্বার্থসর্বস্ব দ্বিপদ প্রাণী।
মুজাহিদের মর্যাদা
সে তখন আর পেতে পারে না কিছুতেই।

লড়াই ক'রে
এক ময়দানে, এক সঙ্গে
একজন হয় মুনাফেক
আর একজন মর্দে মুমীন।
যেমন এক বুজর্গ বলেছেন
: এক-ই আসমানে ওড়ে শকুন আর শাহীন,
কিন্তু এর দৃষ্টি যখন আঁস্তাকুড়ে
ওর দৃষ্টি তখন দীর্ণ করে যায়
সাত আস্‌মানের নীল শামিয়ানা।

www.pathagar.com

তেত্রিশ

তোমরা যদি শোন বাঘের নদী পার হওয়ার কাহিনী
বিস্মিত হবে তাহলে,
যেমন আমিও হ'য়েছিলাম একদিন...

যেদিন শুনেছিলাম
অপরিমেয় শক্তির অধিকারী
জ্বলন্ত আগুন-রঙ বাঘ
যখন পার হয় সুন্দর বনের জোয়ার-উচ্ছ্বসিত
আবর্ত-মুখর বিরাট নদী
(মৃত্যুর মত যা ফেনিল, ক্ষুব্ধ আর ভয়াবহ)
তখন সে স্থির করে নেয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য।

তীব্র স্রোত অতিক্রম ক'রে
যদি সে দেখতে পায় কিনারায় এসে
পৌঁছতে পারেনি সে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিন্দুতে
তাহ'লে সে উজ্জ্বল আগুন-রঙ প্রাণী
কিছুতেই ওঠে না কিনারায়,
ফিরে যায়
যেখানে থেকে সে করেছিল প্রথম যাত্রা শুরু...

আবার সে শুরু করে নতুন উদ্যমে
নতুন অভিযান...
ফুলে, ফেঁপে ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে
ছুটে চলেছে তীর বেগে ক্ষিপ্ত অজগরের মত
জোয়ার-উচ্ছ্বসিত যে ভয়ঙ্কর মৃত্যু-প্রবাহ
শুরু হয় সেই নদী পার হওয়ার পথে
প্রাণান্তকর প্রয়াস,
প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে
কঠিনতম সংগ্রাম
(যতক্ষণ সে না উঠতে পারে
তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিন্দুতে)।
বিপরীত কাহিনী পাবে শিয়ালের সাঁতারে,
চলতি স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে
সহজ পন্থায় মতলব হাসিল করাই
যার একমাত্র উদ্দেশ্য
(মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গেলেও
বিচলিত হয় না যে বিন্দুমাত্র) !

www.pathagar.com

চৌত্রিশ

দুর্বল সত্তার যে অধিকারী
তার সঙ্গে বলিষ্ঠ সংগ্রামী সত্তার
মূলগত পার্থক্য এখানেই।
অপূর্ণ সত্তা আর দুর্বল মনোবৃত্তি নিয়ে
যখন দুর্বল প্রাণী হয় সুবিধাবাদী
অথবা কৃপাপ্রার্থী,
তখন বলিষ্ঠ সংগ্রামী সত্তা
ছিনিয়ে আনে তার কাম্য বস্তু
নিজের বাযুর কুঅতে।

কিন্তু ন্যায়-নীতির প্রশ্ন ওঠে এ ব্যাপারে,
আর
প্রকৃত মুজাহিদের সম্মান
শুধু সে-ই পেতে পারে,—
দ্বীনী আদর্শকে রূপায়িত করেছে
পরিপূর্ণভাবে
যে তার নিজের বাস্তব জীবনে।

পঁয়ত্রিশ

জ্ঞান-নগরীর তোরণদ্বার
আল্লার সিংহ হজরত আলী
সর্বকালের, সকল মুজাহিদের আদর্শ।
জেহাদ করেছেন তিনি
একমাত্র আল্লার রেজামন্দির উদ্দেশ্যে।
দুশমন মুখে থুথু দিলেও
তিনি সহ্য করেছেন স্থিরভাবে
আর অম্লান মুখে উঠে দাঁড়িয়েছেন
ভূপাতিত শত্রুকে হাতের মুঠিতে পেয়েও।

কারণ, প্রবৃত্তির উপর
ছিল তাঁর পূর্ণ আধিপত্য।
নবীর খলিফা হওয়ার
পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি,
যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন
সব মানুষের পথ-প্রদর্শক হওয়ার।

www.pathagar.com

ছত্রিশ

সূর্যাস্তের পর জেগে থাকে দীর্ঘ সময়
আসমানে শহীদী খুনের লালিমা,
পথ চিনে নিতে পারে সে আলোকে
নীড়-প্রত্যাশী পাখীরা।
কিন্তু যখন অন্ধকারে ঢেকে যায়
শহীদী খুনের সেই রক্তাভা
তখন ছেয়ে যায় দুনিয়া জাহান
নৈরাশ্যের চাপ চাপ কাল অন্ধকারে,
মৃত্যুর চেয়েও যা তিক্ত, বিবর্ণ, বিস্বাদ।

আমাদের সেই সব আদর্শবাদী আর মহান নেতা
যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন যাঁরা
নবীর আদর্শ উম্মৎ হওয়ার,
তাঁদের অন্তর্ধানে আমরা পেয়েছি
এই ক্লান্তিকর রাত্রির হতাশা!
জোনাকির ক্ষীণ আলোক আর পারছে না
সরিয়ে দিতে এই কো'কাফ-কালো অন্ধকার।

সাঁইত্রিশ

জোনাকি-জ্বলা বিজন বনের মধ্যে
ক্ষণিক আলো ছায়ার মত
জ্ব'লে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে
আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা!

যে আলোয় পথ চিনে নেওয়া যায় না,
যে অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যায় না পথের নিশানা,
সেই অস্বস্তিকর আলো-আঁধারিতেই
শেষ হ'য়ে যাচ্ছে
আমাদের মৃত্যু-তিক্ত দিন...
আমাদের মৃত্যু-তিক্ত রাত্রি...

আটত্রিশ

এ এক কুৎসিত কদর্য
অবিশ্বাসের যুগ
(কুষ্ঠরোগীর আলিঙ্গনের মত,

www.pathagar.com

কাল আজদাহার কুণ্ডলীর মত
মরণ-পাকে জড়িয়ে ধরেছে মানবগোষ্ঠীকে,
আর সৃষ্টি করছে দুনিয়ার বুকে
এক নৈরাশ্য হতাশার ক্লেদাক্ত জাহান্নাম)...

এখানে প্রত্যেকে করছে
প্রত্যেককে অবিশ্বাস,
আর তাকাচ্ছে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে
একে অন্যের দিকে
দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় লুটতরাজের ভয়ে
প্রত্যেক পথচারী যেমন তাকায়
তার পার্শ্ববর্তীর দিকে
(যখন ঘৃণা বিদ্বেষ আর অসূয়া
বিষাক্ত করে তোলে সমস্ত পরিবেশ,
আর প্রত্যেকে থাকে উদ্যত
প্রত্যেককে ছোবল হানার জন্যে
কালো কেউটে সাপের মত...

সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা আর মুনাফেকীর
যত রকম অপকৌশল
তার সবগুলোই বুঝি পূর্ণতা পেয়েছে এখানে...

কেননা,
ধর্ম, নীতি আর আদর্শের কথা
এখানে মুখে মুখে চালু থাকলেও
কার্যত রয়েছে অধর্ম, দুর্নীতি আর আদর্শহীনতা,
আল্লার প্রভুত্ব বাচনিকভাবে স্বীকার করলেও
কার্যত আমরা মেনে নিয়েছি
শয়তানের পূর্ণ আধিপত্য।

ঊনচল্লিশ

বাইরে স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের আবরণ
আর সোনালি ফসলের আস্তরণ দেখে
কে বুঝবে পৃথিবীর তিক্ত অন্তর্জ্বালা?

এই স্থির, শান্ত, নির্জীব জাতিকে দেখে
কে বুঝবে তার অন্তরের অসহ্য প্রদাহ?
কে বুঝবে তার না-পাওয়ার,
ব্যর্থতার বেদনা?

www.pathagar.com

কোন মঞ্জিলের দিকে তার যাত্রা হয়েছিল শুরু
আর কোথায় তাকে এনে ফেলেছে হীন স্বার্থান্ধেরা
(যখন শবভুক শয়তান ছিঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে তাকে
মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে তার নাম নিশানা,
যখন তার শিরায়, ধমনীতে, কলিজায়, জিগরের খুনে
অসংখ্য মারী কীট করছে আসা-যাওয়া) !

চল্লিশ

আমার স্বপ্নে দেখা দেশ,
যে দেশ এখনো পড়েনি আমার নজরে
(কিন্তু যে দেশের দিকে জেগে আছে আমার দৃষ্টি
নীড়-প্রত্যাশী ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মত
গৃহ-প্রত্যাশী মাল্লার আগ্রহী দৃষ্টির মত)।

কবে সে দেশের দেখা পাব,—আমি জানি না।
কিন্তু সে দেশের খোঁজে আমার ভ্রাম্যমাণ মন
ঘুরছে দিন রাত্রির আলো ছায়ায় ঘেরা
সময়ের সমুদ্র জরিপ ক'রে
ব্যাকুল সিন্ধু-কপোতের মত...

কেননা যে দেশ আমি চেয়েছিলাম
(সুস্থ, সবল নিরলস কর্মীর দেশ ;
সততা, সভ্যতা আর শালীনতাপ্রিয়
শান্তির দেশ)
সে দেশ আমি খুঁজে পাইনি
সে দেশ আমার স্বপ্নেই আছে।
আদর্শে বা লক্ষ্যে অবিচল দেশের বাসিন্দা
(একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধানকেই গ্রহণ করেছে যারা
ঈমানে আর আমলে
যাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনে
নাই শয়তানের আধিপত্য
নাই অন্যায়-অসত্যের প্রতিপত্তি,
নাই অশান্তির কোন প্রতিচ্ছায়া)
সকল পুরুষ যেখানে চরিত্রবান,
সকল নারী যেখানে চরিত্রবতী
সেই দেশ-ই আমার স্বপ্নের দেশ...

যে দেশে অভাব নাই সহৃদয় মনুষ্যত্বের
যে দেশে অভাব নাই অকৃত্রিম আদব-লেহাজের

www.pathagar.com

যে দেশে অভাব নাই গঠনমূলক কাজে সহযোগিতার,
সকল পুরুষ যেখানে কর্তব্যপরায়ণ
সকল নারী যেখানে কর্তব্যপরায়ণা।
সেই দেশ–ই আমার স্বপ্নের দেশ...

যে দেশে দুর্নীতির নাই কোন নিশানা,
যে দেশের সকল বাশিসদাই জানে
দুর্নীতিকে উপড়ে ফেলার পন্থা
(দুর্নীতিবাজ শয়তানকে শায়েস্তা করার পন্থা)...

যে দেশের সকল নাগরিকের মনে
জাতিকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার প্রতিজ্ঞা,
যে দেশের সকল নাগরিকের মনে
নীতিকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার প্রতিজ্ঞা,
যে দেশের 'বিজ্ঞ পণ্ডিতের' মনে
নাই নীতিকে খণ্ডিত করার প্রবণতা !
যে দেশের নেতা নয় ভূরি–ভোজী,
যে দেশের জনতা নয় অনাহার–ক্লিষ্ট ;
যে দেশের ব্যবসায়ী নয় অতি–লোভী,
যে দেশের ক্রেতা নয় কলহপ্রিয় ;
যে দেশে সততা কেনা যায় না সোনা চাঁদির বদলে ;
যে দেশে সতীত্ব কেনা যায় না সোনা চাঁদির বদলে।

যে দেশে নাই অত্যাচারী—জালিম,
যে দেশে নাই উৎপীড়িত—মজলুম ;
যে দেশে নাই অত্যাচার করার মানসিকতা,
যে দেশে নাই অত্যাচার সওয়ার মানসিকতা ;
মানুষের মর্যাদা যে দেশে হালাল কাজের ভিত্তিতে
নেতার নেতৃত্ব যে দেশে মহৎ খিদমতের ভিত্তিতে।

একচল্লিশ

একটা স্থির লক্ষ্য নিয়েই ছুটেছিল আমাদের কিশ্‌তী
(প্রতিকূল আবহাওয়ায়
উন্মত্ত তরঙ্গ তুফানে
যখন স্থির ছিল সকল সংগ্রামী মাল্লা...)

আর
জাহাজের দৃঢ় মাস্তুলের মত
দাঁড়িয়েছিল স্থির, নিষ্কম্প মাঝি
দু'চোখে তার মুক্ত ভোরের রোশ্‌নি...

www.pathagar.com

অনেক রাত্রির তাঁবু দীর্ণ হয়েছিল
সে মাঝির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে,
অনেক তরঙ্গের মাঠ আমরা পাড়ি দিয়েছিলাম
সে মাঝির অভিজ্ঞ পরিচালনায়...

কিন্তু যখন আমরা দেখলাম বন্দরের ছবি
শয়তান এসে দিল কুমন্ত্রণা
বন্ধুর ছদ্মবেশে,
আর ঘুরিয়ে দিল জাহাজের হাল
আমাদের লক্ষ্যের ঠিক বিপরীত পথে
(কাহিনীর সেই মৃত্যু-পাহাড়ের দিকে)।

এখন যতই আমরা চলছি এগিয়ে
সেই অপমৃত্যুর পথে
ততই আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি দলে উপদলে
অবাঞ্ছিত বিতর্কে, আত্মঘাতী কলহে।
এখন শুধু আমরা দেখছি একে অন্যের ত্রুটি
আর প্রচার করছি সেটা অত্যন্ত জোর গলায়,
শুধু বন্দরের কথা ভুল হ'য়ে গেছে আমাদের
মূল লক্ষ্যের কথা জাগছে না কারু মনে।

বিয়াল্লিশ

ইস্পাহানের এক বুজর্গ আমাকে শুনিয়েছিলেন
এই কাহিনী :
পাখায় পুরো শক্তি পাওয়ার আগেই
স্থির করল এক জোড়া কবুতরের বাচ্চা
সম্পূর্ণ নতুন সাফল্যের সন্ধানে
দূরান্ত সফরে যাবে তারা
কেননা,
'সফরের মাঝেই জিন্দেগী
আর
সফরেই সত্তার পূর্ণতা।'

শুভ সংকল্প নিয়ে
পাখা মেলে দিল তারা রাত্রিশেষে
আর দেখতে পেল
নববধূর মত অপূর্ব সুন্দর পৃথিবী
ডাকছে তাদের সকল মুক্ত দিগন্তে।...

www.pathagar.com

কিন্তু সম্ভব হ'ল না কোন দিগন্তেই পাড়ি জমানো
কারণ দুটো কৌশলী দাঁড়কাক
নিভৃত গুহার অন্ধকারের মত কালো পাখা মেলে
পিছু নিয়েছিল তাদের অজান্তে।
প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও
তারা অতিক্রম করতে পারলো না
সেই দুটো শক্তিশালী হিংস্র দাঁড়কাককে।
বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই
দুর্বল-পক্ষ কবুতরের বাচ্চা
শিকার হ'ল সে দাঁড়কাকের।
এই কাহিনীর সারাংশ এই যে,
যে কাজের যোগ্যতা নেই তোমার
সে কাজে যোগ্যতা অর্জন করার আগে
ময়দানে নামার অর্থ
কাজটাকে বরবাদ করা
আর নিজেরাও বরবাদ হওয়া।

তেতাল্লিশ

ইস্পাহানের সেই বুজর্গ
বলেছিলেন বিদায় নেওয়ার আগে :
যাচাই করে নিও সকল ভুঁইফোড়কে,
আর হুঁশিয়ার থেকো
পীরের আউলাদ গদ্দীনশীন পীরের কব্জা থেকে
অথবা মশহুর নেতার অপদার্থ বংশধর
নেতৃত্বকামী লোভীর চক্র থেকে।
কারণ, মাটি থেকে গজালেই
সেটা হয় না শালগাছ,
আর ঈগল বাজের সকল বাচ্চা
উড়ে বেড়ানোর উত্তরাধিকার পেলেও
সত্যিকার মানুষের ওয়ারিশ হয় খুব কম লোক।

কেননা
কঠিন শ্রম আর প্রয়াসের পথেই
অর্জিত হয় মানবিক যোগ্যতা,
সুবিধাবাদের সুযোগ নাই এতে,
এ ব্যাপারে নাই কোন সহজ পন্থা।

www.pathagar.com

চুয়াল্লিশ

যারা চেয়েছিল তাদের প্রসারিত হৃদয়
যারা চেয়েছিল তাদের সুরভিত মস্তিষ্ক
তারা শুধু আনলো সংকীর্ণতা,
তারা শুধু আনলো আবিলতা
অপ্রেম, অবিশ্বাস
আর পদস্খলনের জন্যেই।

যারা চেয়েছিল তাদের নির্ভুল লক্ষ্য
যারা চেয়েছিল তাদের নির্ভুল মঞ্জিল
তারা হারিয়ে ফেললো সেই মঞ্জিল
শুধু স্বার্থের খেলায়
শুধু সাময়িক প্রলোভনে।

পঁয়তাল্লিশ

যত ঘোরালো হোক আশাভঙ্গের অন্ধকার,
যত জটিল হোক সমস্যার গ্রন্থি,
আদর্শবাদী-ঈমানদারের কাফেলা
তবু মুষড়ে পড়ে না কোন দিন,
সাচ্চা মুজাহিদ
কোন দিন-ই ভেঙে পড়ে না সে আঘাতে,
অন্ধকার জুলমাতের এলাকাতেই,
সে খুঁজে পায় আবে-হায়াতের সন্ধান
আল্লার রহমতপ্রাপ্ত বান্দা খিজিরের মত।
সমস্যা-কুটিল শতাব্দীর ঘূর্ণাবর্তে
আজ তাই কিছুতেই চলবে না
থমকে দাঁড়ানো,
কা'বার আলোকরশ্মিতেই
আজ আমাদের করতে হবে
সকল সমস্যার সমাধান;
দিতে হবে সব সওয়ালের জওয়াব
যদিও কৌশলী চক্রে
কাফেলার অগ্রগতি হয়েছে ব্যাহত,
যদিও শয়তানী চক্রান্তে
আমরা হয়েছি ছিন্নভিন্ন,
তবু সুবহে উম্মীদের পথে
আমাদের এগিয়ে যেতে হবেই,
বাইরের মত
এ সব ভিতরের বাধাকেও অতিক্রম ক'রে।

www.pathagar.com

ছেচল্লিশ

সমস্ত ঘুমন্ত শিশুকে বুকে নিয়ে
যখন ঘুমিয়ে পড়ে পৃথিবী
শূন্যে ভাসমান এক বিশাল দোলনার মত,
তখন জেগে থাকে শুধু ধ্যানীর দৃষ্টি
অতন্দ্র তারাদের সাথে
রাতজাগা পাখীদের সঙ্গে...

স্বপ্ন দেখে সে হাবেদার মরু প্রান্তরে
এক নতুন ভোরের,
স্বপ্ন দেখে এক নতুন যুগের...
দু'চোখ বেয়ে যখন নেমে আসে
দু'ফোঁটা শিশিরবিন্দু
দুনিয়ার সব দৌলতের চেয়ে কিম্মতী
সকলের চেয়ে দামী।

সাতচল্লিশ

এবার বিধ্বস্ত পৃথিবী গড়ে তোলার পালা
(খিজিরের সঙ্গে মুসা কালীম
যেমন গ'ড়ে তুলেছিলেন
আদম-সন্তানের জন্য এক ধ্বংসমুখী প্রাচীর
যখন ক্ষুধার অন্ন ছিল না কাছে,
ছিল না শব্দিত দিনের আনন্দ কোলাহল,
ছিল শুধু এক হিংস্র প্রতিকূল পরিবেশ
আর, আল্লার রেজামন্দির উদ্দেশ্যে
কাজ করার একাগ্র বাসনা) !

আটচল্লিশ

যে মরু মাঠ পাড়ি দিতে যেয়ে
ঘূর্ণির মুখে ঝরে পড়েছে অসংখ্য প্রাণী
বৈশাখী ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত,
সেই প্রান্তর পাড়ি দিতে এসেছিল
একদিন এক নির্ভীক মুসাফির
স্থির তার লক্ষ্য
অবিচল তার সংকল্প...

www.pathagar.com

ক্ষিপ্ত আজদাহার ফণার মত
আসমান-ছোঁওয়া তরঙ্গ দেখে ক্ষুব্ধ কহর দরিয়ার
(যেখান থেকে ফিরে গেছে সকল মাঝি-মাল্লা),
সেই দরিয়া পাড়ি দিতে এসেছিল
একদিন এক নির্ভীক মুসাফির
স্থির তার লক্ষ্য
অবিচল তার সংকল্প...

মিথ্যা কুহক আর যাদু তেলেস্মাতের ডেরা
জ্বিন শয়তানের আস্তানা বাদগর্দ হাম্মাম
(যেখানে সকল মানুষ ভুলে যায়
সত্তার পূর্ণ বিকাশের কথা,
আর ঝিমিয়ে পড়ে আচ্ছন্ন, অচেতন অবস্থায়
ইবলিসের জিঞ্জিরে)
সেখানে এসেছিল এক নির্ভীক মুসাফির
স্থির তার লক্ষ্য
অবিচল তার সংকল্প...
পার হয়ে গেছে সে এক আশ্চর্য শক্তিতে
হাবেদার বিশাল মরু-প্রান্তর,
পাড়ি দিয়েছে সে ক্ষুব্ধ কহর দরিয়া,
ভেঙে গেছে বাদগর্দ হাম্মামের সকল যাদু-তেলেসমাত।
আর রেখে গেছে
সকল পাহাড়,
সকল সমুদ্র,
সকল মরুভূমি অতিক্রম করার
এক নির্ভুল ইশারা।

ঊনপঞ্চাশ

আমার কথা শেষ করতে হবে এখানেই,
কারণ, সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত
আর মন্‌জিল এখনো বহু দূরে।

যে রুক্ষ, কঠিন পৃথিবীতে,
শান্তিহীন, সান্ত্বনাহীন যে বিয়াবানে
কাফেলা হয়েছে লক্ষ্যহারা,
ছন্দহীন, মিলহীন, সুরহারা
হাবেদার সেই মরু-প্রান্তর
(একদিকে যার ক্ষুব্ধ কহর দরিয়া

www.pathagar.com

অন্যদিকে লুব্ধ বাদগর্দ হাম্মাম)
শুধু অকল্যাণ আর অশান্তির বাসা।...

জীবনের পূর্ণ বিকাশের পথে,
প্রতি পায়ে
এখানে বাধার জগদ্দল পাথর,
এখানে বীজের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে
কৌশলী শয়তান,
প্রাণবন্ত সবুজ চারাগাছ
(বৃক্ষে পরিণত হওয়ার আগেই)
এখানে ধ্বংস হয়ে যায়
ইব্‌লিসের কূট চক্রান্তে !
সত্তার পূর্ণ বিকাশ এখানে অসম্ভব,
অসম্ভব এখানে পূর্ণ শান্তির প্রত্যাশা।

কাজেই আল্লার নামে শুরু হোক সেই সফর
আল্লার পথে শুরু হোক সেই জেহাদ,
সত্তার সকল অপূর্ণতা
যাতে হয় সম্পূর্ণরূপে অপসারিত,
অশান্তির সকল কাঁটাঝোপ
যাতে হয় সমূলে উৎপাটিত,
শোষণ-ত্রাসনের সকল আজদাহা
যাতে হয় সবংশে নিহত...

যেন বঞ্চিত বনি আদমের এই দীর্ঘশ্বাস
রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে,
যেন এই তৃষ্ণাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ
আবার হতে পারে
সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত
দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে
দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে॥

www.pathagar.com

দিলরুবা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম স্তবক

এক.

হাজার রাত্রির কোন এক রাতে যদি ভুলে থাকি
প্রতিজ্ঞা আমার, কিংবা অসতর্ক যদি ভুলে থাকো
তোমার প্রতিজ্ঞা—তবে সঙ্কল্পের দোষ দিয়োনাকো ;
সে রাত্রির তীরে এসে বহুদূরে গিয়েছিল ডাকি'
আকাশের বাঁকা রেখা (স্বপ্নাচ্ছন্ন চাঁদ কিংবা পাখী)
সমুদ্রে অথবা মনে এনেছিল দুরন্ত জোয়ার !
সংশয়ের দাহ মুছে, ভেঙে দিয়ে গ্রন্থি এ মিথ্যার
মুহূর্তের মূর্ছনায় তনু মন ফেলেছিল ঢাকি'।

সৃষ্টি–সম্ভাবনা–দীপ্ত সে নিশীথে প্রোজ্জ্বল উৎসাহে
প্রেম এসেছিল কাছে, শতাব্দীর যে বন্ধ্যা মৃত্তিকা
জ্বলিয়াছে এতকাল তৃষিত মনের অন্তর্দাহে—
সে–ও চেয়েছিল তার মৃত স্বপ্নে তারকার শিখা ;
আ–দিগন্ত জীবনের স্পর্শলুব্ধ সুপ্ত নীহারিকা
নিজেরে বিলায়ে দিতে চেয়েছিল উত্তাল প্রবাহে॥

দুই.

যে স্বপ্ন ভাঙিয়া পড়ে সেই স্বপ্ন গড়ে তুলি আমি,
মাটির মাঠের বুকে দিয়ে যাই নতুন আশ্বাস।
মৃত্যুর জিঞ্জির খুলে যে হয় প্রাণের অনুগামী।
সেই জীবনের গানে রক্তক্ষরা এ মোর প্রয়াস।
রুধিরাক্ত এই পথে যে স্বপ্ন নিঃশেষে মুছে যায়
গড়ে তুলি সেই স্বপ্ন, রক্তে করি রক্ত–ঋণ–শোধ
শুধু মুক্ত জীবনের, শুধু এক মুক্তির নেশায়
কখনো ছড়ায়ে পড়ি ; জাগাই কখনো প্রতিরোধ।

উত্তাল প্রবাহ বেগে জেগে থাকে আকাঙ্ক্ষা আমার ;
নিঃসীম সুপ্তির মাঝে বেঁচে থাকে আমার বাসনা
যদি স্বপ্ন ভেঙে যায় গড়ে নেয় স্বপ্ন সে আবার ;
যদি ঝড় আসে পথে হয় না কখনো অন্যমনা।
মৃত্যুর পরিখা মাঝে জীবনের অশ্রান্ত আশ্বাস
যে গাথা শোনায়ে যায় পূর্ণ সে প্রাণের ইতিহাস॥

www.pathagar.com

তিন.

মৌসুমী ফুলের দিন শেষ হ'ল, দেখ পৃথিবীতে
মৃত্যুর তুহিন শ্বাস পুষ্পগন্ধ চলেছে ঝরায়ে।
শঙ্কিত কানন পথে, আসন্ন রাত্রির কৃষ্ণচ্ছায়ে
ফুল-ঝরা বনে চলো ফুল ফোটানোর ভার নিতে।
এরো আগে বহুবার এমনি মৃত্যুর সরণিতে
শত সংঘাতের মাঝে নেভে নাই যে আরক্ত শিখা
সে শিখা বাঁচায়ে চলো, নিয়ে চলো প্রেমের লিপিকা
মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন এই পৃথিবীর নিভৃত পল্লীতে।

অথবা নিশীথ স্বপ্নে মুহ্যমান শহরতলীর
কোন রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে ! মোমের শিখার অনুভূতি
নিজেকে নিঃশেষ ক'রে বিলানোর সুতীব্র আকুতি
নিয়ে যাবো সেখানেই—যেখানে বিবর্ণ ধরিত্রীর
অরণ্যে ফোটে না ফুল, পাখী যেথা নাহি বাঁধে নীড়,
সেখানেই আমাদের—এ প্রেমের নিভৃত প্রস্তুতি।।

চার.

বিভ্রান্ত সন্ধ্যার চক্রে—অন্ধকার প্লাবনে, ঝড়ের
বর্বর নখরাঘাতে ভেঙে গেছে বহু স্বপ্ন নীড় ;
শেষ হ'য়ে গেছে দিন ফাল্গুনের আরণ্য বহ্নির
শুধু শেষ হয় নাই এ অধ্যায় প্রেমের।
বিভ্রান্ত পৃথিবী তাই টেনে তুলি, বিক্ষত মাঠের
সীমান্তে জাগায়ে তুলি ফুল ফসলের সমারোহ।
সুতিক্ত দিন যেথা একান্ত দুঃসহ
সেখানে ফেরায়ে আনি তারা ঘেরা প্রশান্তি মনের।
নূহের প্লাবনে আজ ডুবে যদি যায় তবে যাক
জরাজীর্ণ এ পৃথিবী, পথ শেষ হবে না যাত্রীর,
প্রেমের বর্তিকা নিয়ে পাড়ি দিল যে ঝড় বৈশাখ
বিশ্বাসের শিখা নিয়ে পাড়ি দেবে সে যুগ তিমির—
সংশয়িত বাঁকা পথ ;—যেখানে মৃত্যুর কালো ডাক
নেভাতে পারে না শুধু ক্ষণদ্যুতি প্রেমের বহ্নির।।

পাঁচ.

কালবৈশাখীর দেশে চলো তবে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে
বাসা বাঁধি। অনাবাদী সন্দ্বীপের অথবা পদ্মার
কোন এক বালুচরে—বৈশাখের ঝড় বারবার

www.pathagar.com

কৃষাণ কুটিরে যেথা হানা দিয়ে ক্ষুব্ধ পরাজয়ে
ফিরে যায় হতাশ্বাস, মৃত্যু ফেলে বিমূঢ় বিস্ময়ে
যেখানে সম্পূর্ণ দেখে প্রেমের তরঙ্গ শতধার
সেখানে মাটির বুকে বেধে নেব তোমার আমার
বহু আকাঙ্ক্ষিত নীড় —পূর্ণতার পথে অসংশয়ে।

পলায়নী গানে নয়, যে সংগীতে মাঠের সৈনিক
কৃষাণ বধূকে তার জানায় স্বাগত সম্ভাষণ,
নাবিক—রাত্রির স্রোতে অনায়াসে খুঁজে নেয় দিক
বিধ্বস্ত পৃথ্বির ; সেই সংগীতের নিবিড় বন্ধন
আকাশের সূত্র জেনে, মেনে নিয়ে মাটির ক্রন্দন
আবার রাঙায়ে যাবে এ দিনের শ্রান্তি তামসিক॥

ছয়.

তবে তুমি কাছে এসো ; কোরো না কোরো না অস্বীকার
ভার নিতে এ পথের, এ প্রান্তর ফুলে ও ফসলে
ভরাতে শিশির স্বপ্নে ফিরিয়া যেও না আঁখিজলে
অস্বীকার করিও না দুর্গম পথের অঙ্গীকার।
কাছে এসো, কথা বলো নিয়ে চলো এই গুরুভার।
—প্রেমের পশরা এই প্রেমরিক্ত ম্লান পৃথ্বিতলে
বন্ধ্যা ধরণীর মাঠে সংশয়ের আবদ্ধ পল্বলে
প্রাণের পাথেয় নিতে কোরো না ; কোরো না অস্বীকার।

দীর্ঘ পথশ্রমে যেন প্রকাশিত না হয় দীনতা
শতাব্দীর, মৃত্যুবিষ যেন আর না ভাসে পরাগে।
আমরা নতুন যাত্রী, চলে গেছে যারা বহু আগে
পথ চিনে তারার আগুনে—দেখে নাই বিফলতা
তরঙ্গে, তুফানে, ঝড়ে ;—চলো আজ নব অনুরাগে
তাহাদের চলা পথে, বলো আজ তাহাদেরি কথা॥

দ্বিতীয় স্তবক

এক.

একদা অলক্ষ্যে থেকে (নিজে তুমি জানো না যে কথা)
স্থপতি নিজের মূর্তি গড়িয়াছো এ শিলা হৃদয়ে,
নিজের প্রাণাগ্নি দিয়ে সঞ্চার করেছ আকুলতা ;
বহ্নিমান শিলাস্তূপ জ্বলে তাই অপূর্ব বিস্ময়ে !

www.pathagar.com

তবু তা জানো না তুমি ! সে আগুন, সে তীব্র দাহিকা
প্রতিটি মুহূর্ত মোর ঘিরে আছে কোন্ বেদনায়
যদি নিভাইতে চাই তীব্র হ'য়ে জ্বলে আরো শিখা ;
সে দীপ্ত সংঘাত সহি আমি আজ ক্লান্ত অসহায়।

আগ্নেয়গিরির মত দিন রাত্রি তোমার আগুনে
জ্বালি তীব্র যন্ত্রণায়, তবু চাই, তবু আরো চাই
নিজের অন্তর থেকে অন্তহীন আর্তস্বর শুনে
বিশ্রান্ত—তথাপি আমি তোমাকেই স্বাগত জানাই।
এ ধূম্রজালের কেন্দ্রে যে দাহিকা জ্বলিছে তোমার
সে মৃত্যু যন্ত্রণা তবু দিয়ে যায় অচিন্ত্য সম্ভার॥

দুই.

প্রেমের বেদনা যদি কোনদিন করে অন্যমনা,
ব্যর্থ রাত্রি জাগরণ যদি নাহি দেয় সমাধান,
মনের দিগন্তে যদি হানা দেয় নিরন্ধ্র অজ্ঞান,
অন্তহীন হাহাকার, যদি খুঁজে না পাও সান্ত্বনা
তা'হ'লে বুঝিবে তুমি কেন এক অতৃপ্ত কামনা
দূর পর্যটন শ্রান্ত নিয়ে তার তৃষাতপ্ত প্রাণ
তোমার হৃদয় প্রান্তে ক'রেছিল আশ্রয় সন্ধান
কোন্ ব্যথা বুকে সহি' মরিতেছে প্রেমের মূর্ছনা।

তখন বুঝিবে তুমি, আজো তার আসেনি সময়,
আজ তুমি থাকো নিয়ে তোমার কঠিন নিষ্ঠুরতা,
আজ তুমি থাকো নিয়ে অহেতুক জিজ্ঞাসা সংশয়
অক্ষত অটুট থাক তোমার নির্মম নীরবতা।
যদি কোনদিন প্রেম কেড়ে নেয় সব লজ্জা, ভয়
সেদিন বুঝিবে তুমি তৃষিত এ হৃদয়ের কথা॥

তিন.

তোমার দু'চোখে যদি থাকে মোর অতৃপ্ত তৃষ্ণার
পানীয়, চিবুক টোলে থাকে যদি স্বপ্নের আভাস,
তোমার চলার তালে যদি বয় এ বক্ষে দুর্বার
তপ্ত রক্তধারা—তবে মনে তুমি আনিও না ত্রাস।
আমার অশান্ত দৃষ্টি খুঁজে ফেরে কেন তোমাকেই
প্রতিবার পথ মোর কেন থামে দুয়ারে তোমার,—
স্থৈর্য হয় বানচাল কেন এক নদীর বাঁকেই ;
বুঝিবে না। তবু বলি প্রয়োজন নাই এ শঙ্কার।

www.pathagar.com

যদি ঘুম-ভাঙা রাতে সব কিছু শূন্য মনে হয় ;
পৃথিবী, আকাশ ঘিরে যদি শুধু নামে ব্যর্থতার
কালো ছায়া, যদি জাগে অন্তহীন বেদনা; সংশয়
তবে ভেবে দেখো তুমি এ জীবনে শুধু একবার
দুর্লভ সময় আসে—তৃষাদীর্ণ দু'চোখে রঙিন
প্রাণবন্ত বন্যাবেগে ;—প্রথম প্রেমের সেই দিন।।

চার.

যদি এ সুদূর প্রেমে থেকে যায় অজ্ঞাত সংশয়,
যদি মনে করো এ-কে ক্ষণিকের খেয়াল ভঙ্গুর,
তবু সত্য জেনো এই মুহূর্তের চিরন্তন সুর—
অগ্নিপরীক্ষায় জানি পেয়েছে সে তার পরিচয়।
দ্বিধা যদি জাগে মনে : এই প্রেম চিরন্তন নয়,
শোণিতের পরিচিতি পেল না যে, যে পেল অশ্রুর
আত্মীয়তা, মনের সীমান্তে পেল অন্তহীন দূর
বিচ্ছেদের ব্যবধান ;—তবু আমি আজ নিঃসংশয়।

যে কামনা বেঁচে থাকে শুধু তপ্ত রক্তের আঘ্রাণে
(মুহূর্তের ঘূর্ণাবর্তে চিরদিন সংশয়িত হায়) !
সে কামনা—বিভীষিকা। ছুটি নাই আমি তার পানে।
মাংসপিণ্ড চাহিনিতো তোমাকে চেয়েছি পিপাসায়।
অকম্পিত দীপশিখা তাই তুমি মোর তমিস্রায়
অকলঙ্ক মহিমায় জেগে আছো পূর্বাশার গানে।।

পাঁচ.

সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে—তারাঘেরা আকাশ অথবা
দিগন্ত বিস্তৃত এই পুষ্পাস্তৃণ পৃথিবীর চেয়ে
(প্রতি ফাল্গুনের বর্ণে যে পৃথিবী সাজে পুনর্নবা
ফুলের জোয়ার আসে প্রতি বর্ষে যার কূল ছেয়ে
—অভিনব সে পৃথিবী, অন্তহীন আকর্ষণ যার,
জীবনের বিস্ফোরণে প্রতিদিন তার পরিচিতি ;
শ্যামলী, যৌবনবতী অনায়াসে জ্বালায়ে অঙ্গার
প্রতি রক্তকণিকায় তোলে নিত্য কামনার গীতি)।

অথবা এ তারাঘেরা আকাশের রহস্য বিপুল
রাত্রির অরণ্য পথে খুলে দেয় অন্তহীন সুর,
অপরিচয়ের নীড়ে খুলে দেয় সুপ্ত মর্মমূল

www.pathagar.com

প্রতি নীহারিকা লোকে আছে তার সমৃদ্ধি প্রচুর।
তবু যা অপরিমেয় এর চেয়ে—দীপ্তি বিভাময়
অজস্র ঐশ্বর্যে ভরা সে কেবল তোমার হৃদয়॥

ছয়.

সে হৃদয় জেগে ওঠে প্রেমের প্রথম আবির্ভাবে,
সে হৃদয় দোলা দেয় হাসি, অশ্রু, আলোকসম্পাতে,
প্রতি মুহূর্তের রঙে চেতনার বিচিত্র প্রভাবে
কখনো সে বহ্নিশিখা ; অশ্রুকণা কভু আঁখিপাতে।
অধীর তরঙ্গ ক্ষুব্ধ কখনো সে তীব্র প্রত্যাশায় ;
কখনো সে ধ্যানমৌনী আকাশের অন্তহীন নীল,
প্রশান্ত তারার দীপ জ্বেলে স্নিগ্ধ মন্থর হাওয়ায়
সম্বরিয়া নিতে চায় যৌবনের কামনা ফেনিল।

সসাগরা ধরণীর সব সুর, সব গান ভুলে
দুর্লভ সমৃদ্ধি নিয়ে সে হৃদয় উঠিয়াছে গ'ড়ে
অচিন্ত্য সংগীত যার উঠে যায় নীলাভ্রের কূলে
বক্ষ রক্তধারে ফুল প্রতিদিন ফোটায়ে পাথরে ;
প্রেমের রহস্যে কেন কোনদিন কেহ নাহি জানে
সে হৃদয় জ্ব'লে মরে বেদনার দীপ্ত শামাদানে॥

সাত.

প্রেম তবু বেঁচে আছে, বেঁচে থাকে প্রেম যুগে যুগে,
প্রেম তবু বেঁচে থাকে সময়ের বেড়া পার হ'য়ে,
ক্ষুদ্র লালসার শিখা নিভে যায় ; জ্বলে ওঠে বুকে
দিশারি তারার মত প্রেম তার অশেষ বিস্ময়ে।
রাত্রির ললাটে দীপ্ত সে তারকা জানায় ইশারা।
লালসা ম্লানিমা ছেড়ে অন্তহীন আলোর জগতে,
যে আলো হয় না ম্লান নিভে গেলে লক্ষ সূর্য তারা ;
হয় না বিভ্রান্ত যদি আলেয়ার শিখা জ্বলে পথে।
দেহ দীপাধারে তার বাঁধমুক্ত আলোর মহিমা
তনুর সীমানা ছেড়ে হয় না কখনো অন্যমনা,
দিন রাত্রি জেগে ওঠে দীর্ণ করি হৃদয়ের সীমা
প্রিয়াকে সুন্দরতর করিবার অকুণ্ঠ প্রার্থনা,—
বিভ্রান্ত এ জীবনের প্রতি পথে নির্ভয়, নির্ভর ;
আমার প্রেমের রঙে তুমি তাই অপূর্ব সুন্দর॥

www.pathagar.com

তৃতীয় স্তবক

এক.

আমি প্রতীক্ষায় আছি—যেমন গ্রীষ্মের বনভূমি
বৈশাখের তীব্র জ্বালা সহি জাগে দিগন্ত সীমায়
যেমন সংঘাত-ক্লিষ্ট দিনান্তের তটপ্রান্ত চুমি'
নিঃসঙ্গ শাল্মলী জাগে শ্রাবণী মেঘের প্রত্যাশায়।
সুতীব্র ঝটিকা তাকে নাড়া দিয়ে যায় বারবার
বারবার দোলা দেয় আগ্নেয় মৃত্যুর অনুভূতি,
পাতা ঝরা দিনে তবু অরণ্যের অভিব্যক্তি তার
দূরান্তর থেকে একা শোনে জেগে প্রাণের আকুতি !

সহিয়া সহস্র বজ্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্লিষ্ট হতাশায়
জেগে থাকে রাত্রিদিন তবু তার দৃষ্টি নির্নিমিখ,
নিঃসঙ্গ শাল্মলী জাগে তৃষাদীর্ণ নীল নভ ছায়
ক্লান্ত অবসন্ন তবু স্বপ্ন তার দিগন্ত যাত্রিক,
সেই শাল্মলীর স্বপ্নে মন মোর জেগে আছে হায়
মুমূর্ষু দিনের তীরে একান্তে তোমারি প্রতীক্ষায়॥

দুই.

শুনিতে চেও না তুমি আমি যাকে ভালোবাসি তার
গজমোতি শুভ্র বর্ণ মেঘ-রঙ ঘন চুল কিনা,
কণ্ঠস্বরে পরাজয় মানে কী মুখর-তন্ত্রী বীণা,
অথবা লাবণ্যে তার পূর্ণিমা হয়েছে একাকার !
শুধু এইটুকু জেনো সৌন্দর্যের নয় সে আধার,
তবু নিত্য নব রূপে ভেসে ওঠে আমার মানসে,
সঞ্জীবিত করি মোর চেতনাকে তার প্রাণরসে
আমার সম্পূর্ণ সত্তা নিঃশেষে ক'রেছে অধিকার।

সুদূরিকা দূরে থাকি ভ'রে রাখে আমার হৃদয়
কাছে এলে টানে তার দূরত্বের ক্রূর ব্যবধান,
দেখেছি সহস্রবার তবু মোর কাটেনি বিস্ময় ;
তিক্ত যন্ত্রণায় জ্বলি দেখি তারে নিয়ত অম্লান,
প্রত্যহ সুন্দরতর অপরূপ সৌন্দর্যে অক্ষয়
তার গতিভঙ্গে জাগে প্রেমের গীতিকা অফুরান॥

তিন.

যদি শিশিরের বক্ষে প্রতিভাত না হয় আকাশ ;
প্রিয়ার সমগ্র সত্তা যদি না জাগিয়া ওঠে বুকে

www.pathagar.com

তবে সেই প্রেম মিথ্যা, সেথা যেতে চেও না সম্মুখে
লালসার ধূম্রজাল খোঁজে যেথা গুধু অবকাশ,
যে প্রেমে দেহের তীরে চায় শুধু বিশ্রান্ত বিলাস
কৃত্রিম ছলনা দিয়ে জানাতে চায় যে বিহ্বলতা,
অনায়সে ধরা পড়ে প্রেমহীন তার সে রিক্ততা
অকারণ ছলনায় তাই তার প্রাণান্ত প্রয়াস।

প্রেমের সম্পূর্ণ মূর্তি সেথা ফুটে ওঠে না কখনো,
দ্বিধাগ্রস্ত মন তাই ছায়াচ্ছন্ন সংশয়ের জালে
এক পথ রুদ্ধ হ'লে খুঁজে ফেরে অন্য পথ কোনো
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখে যায় বিভ্রান্ত বৈকালে
যে প্রেম ছলনামুক্ত যদি তার পদধ্বনি শোনো
দেখিবে অদম্য তার গতি রুদ্ধ হয়নি শৈবালে॥

চার.

যে প্রেম বিলাস শুধু, নাই যাতে বেদনার দাহ,
যে প্রেম আনে না তার ব্যথাক্লিষ্ট রাত্রি তন্দ্রাহারা,
শ্যামল মাটির বুকে আনে না যে আগ্নেয় সাহারা,
তনু ও মনের মিলে কভু যার হয়নি উদ্বাহ;
পারে না আনিতে কভু সেই প্রেম মেঘ বারিবাহ
প্রশান্তির স্বপ্নালোকে। কখনো সে দেখে নাই তারা
কামনার মরুপথে ম'রে গেছে তার প্রাণধারা
ক্ষণিকের মিল চেয়ে খোঁজেনি যে মনের বিবাহ।

সে প্রেম চেও না তুমি, চেয়ে নিও ঘুম ভাঙা রাত,
দুঃসহ যন্ত্রণা আর দুর্নিবার বেদনা বিপুল,
চেয়ে নিও জীবনের খরস্রোত অসংখ্য সংঘাত
—সময়ের ঘূর্ণাবর্তে তরঙ্গ প্রহত উপকূল,
যদি না বিলাস হয় একদিন ফোটাবে সে ফুল
রাত্রির তিমিরপ্রান্তে এনে দেবে একদা প্রভাত॥

পাঁচ

মুছে দিতে পারি আমি হৃদয়ের সব অনুভূতি
পারি না মুছিতে শুধু নিষ্ঠুর তোমাকে কোনমতে,
আমার সকল শক্তি কেড়ে নিয়ে বসায়েছ পথে
তবু তুমি একাধারে বেদনা ও আনন্দের দূতী।
তোমার স্মরণালোকে ক্ষণদীপ্ত এ মন সেজুঁতি

www.pathagar.com

নিমেষে নিভিয়া যায় না পাওয়া ব্যথার অন্ধকারে,
আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে ছায়াচ্ছন্ন তিমির প্রাকারে
তোমার চলার পথে প'ড়ে থাকে আমার আকূতি।

তোমাকে মুছিয়া দিতে সব চেষ্টা, সকল সাধনা
ব্যর্থ অপচেষ্টা মাত্র, জানি শক্তি নিঃশেষিত মোর ;
তোমাকে মুছিতে যাওয়া তাই আজ আত্মপ্রতারণা
(মুছিয়া চোখের আলো, কে পেয়েছে নিতে আঁধি ঘোর)
নিজেকে বঞ্চিত রেখে প্রতিদিন কেন এ ছলনা
প্রেম অনুভূতিহীন তুমি তার রাখো না খবর॥

পাঁচ-ক.

আমার বিক্ষত মন চেয়েছিল তোমার হৃদয়ে
নিবিড় আশ্রয় পেতে, চেয়েছিল তরী পোতাশ্রয়,
রক্ত ক্ষরা চোখ তুলে দেখি আমি ব্যথিত বিস্ময়ে
আমার মনের মত রুধিরাক্ত তোমারো হৃদয়।
সেখানেও তিক্ত জ্বালা, তীব্র বহ্নি, সংশয়ের ঝড়।
আশ্রয়-প্রার্থীর মত আশ্রয়দাতা যে অসহায় !
রাখিনি খবর আগে, বুঝি নাই প্রশান্তির ঘর
কোন্ ঘূর্ণাবর্তে আজ দুলিতেছে সুতীব্র ঝঞ্ঝায়।

তাই আমি ক্ষমা চাই, বিব্রত করিতে এ জীবনে
চাহিনি তো কোনদিন...চাহি নাই করিতে বিলোপ।
হে ক্রন্দসী দিলরুবা আজিকার বিদায়লগনে।
রাখিও না মনে আর যদি থাকে মুহূর্তের ক্ষোভ।
বিজয়িনী তুমি, তব গীতোচ্ছ্বাস জাগুক নির্ভয়
তোমাকে তুলিবে উর্ধ্বে মোর প্রেম মানি পরাজয়॥

ছয়.

শব্দ মুখরিত দিন আর রাত্রি স্তব্ধ নৈঃশব্দ্যের
আমাকে রেখেছে ঘিরে তোমার স্মরণ ক্ষণগুলি,
আমাকে করিয়া বন্দী দিকে দিকে তাদেরি অঙ্গুলি
কঠিন নির্দেশ দেয়, মুক্তি নাই তোমার প্রেমের
সুদৃঢ় বন্ধন থেকে ; যদি খুঁজি সরণি ত্রাণের
আমাকে শাসন করে আকাশ তারকা আঁখি তুলি,
গানের পাখীরা মোর উড়ে যায় বাতায়ন খুলি
পিঞ্জর ধুলায় রেখে (মূল্য যেথা নাই এ প্রাণের)।

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাবন্দী আমি তব স্বৈরাচারী প্রেমের নিকটে,
তোমাকে বুঝি না তবু অন্তহীন দিগন্ত বিস্তার
তোমার রহস্য গাথা ওঠে ফুটি' মোর চিত্তপটে
আনন্দ উচ্ছল কভু, কখনো বা মূক বেদনায়
অব্যক্ত তরঙ্গহীন ক্লান্তিকীর্ণ সময়ের তটে
প্রতিটি মূহূর্ত যেথা ঘিরে তুমি রেখেছো আমায়॥

সাত.

তোমাকে বাসিয়া ভালো পৃথিবীকে ভালোবাসিয়াছি,
ভালোবাসিয়াছি আমি প্রতি অণু সৌরজগতের,
আমার হৃদয় তাই প্রতিচ্ছায়া মুগ্ধ হৃদয়ের
অনায়াসে আসিয়াছে সব মানুষের কাছাকাছি।
জাগিয়া তোমার প্রেমে লুব্ধ মোর মানস-মৌমাছি
সঞ্চয় ক'রেছে মধু তৃপ্তিহীন মাধুর্যে প্রাণের ;
যে মাধুর্যে ঘেরা মন ছেড়ে দিয়ে তারকালোকের
ঐশ্বর্য,—শুক্তির বুকে খোঁজে প্রেম গৃহাঙ্গন যাচি।

প্রেমের মাধুর্যে তাই অফুরান অস্তিত্ব আমার
নিজেকে বিলাতে চায় শতধারে, বহুমুখী স্রোতে।
সে মুক্ত প্রবাহ বাধা নাহি মানে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতে,
পারে না রুধিতে তাকে সময়ের তীব্র স্রোত ধার,
পতঙ্গের মৃত্যু চায়—সে প্রদীপ্ত প্রাণের আলোতে
—সে প্রাণ তোমার প্রাণ ; সেই আলো দীপ্তি সে তোমার॥

চতুর্থ স্তবক

এক.

সে কখনো বুঝিবে না কেন এক পতঙ্গের প্রাণ
তার অগ্নিশিখা ঘিরে কাঁদিতেছে অতৃপ্ত তৃষ্ণায়
যত সে নেকাব টানে তত আরো তৃষ্ণা বেড়ে যায়,
শিরীর ঝরোকা খুঁজে অধীর ফরহাদ ভ্রাম্যমাণ।
যে শিখা ডাকিছে তারে অবিশ্রান্ত অপসৃয়মান
দূর হ'তে দূরান্তরে কঠিন মৃত্যুর ইশারায়
তার দিকে কেন জানি পতঙ্গের মন ভেসে যায়,
মানিতে চাহে না মানা—মানিতে চাহে না ব্যবধান।
আশ্চর্য নিয়তি এই—পতঙ্গের ললাট লেখন
ডাকে শুধু মৃত্যু পানে। মরিয়া সে হ'য়েছে অমর।

www.pathagar.com

স্বয়ম্বরা হয় নাই বধূ তার, বাঁধে নাই ঘর ;
ক্ষণদীপ্ত শিখা জ্বেলে মেটায়েছে নিজ প্রয়োজন,
আমার পতঙ্গ প্রাণ ভুলে যেয়ে জ্ঞানীর ভাষণ
কেবলি দেখিতে চায় বক্ষে তব বহ্নির স্বাক্ষর॥

দুই.

প্রেমের স্ফুলিঙ্গ মোর যতদিন পড়েনি তোমার
কোমল হৃদয়ে—তুমি ততদিনই ছিলে কমনীয়,
প্রভাতী লাবণি ঘেরা চিত্ত তব ছিল নমনীয়
করুণায়, স্নিগ্ধ স্নেহে। সেদিন নিকটে নাই আর।
যখনি ক'রছে স্পর্শ মোর প্রেম দীপ্ত শতধার ;
যখনি হ'য়েছ তুমি মোর কাছে সবচেয়ে প্রিয়
বিস্মৃতির অন্ধকারে যখনি হ'য়েছ স্মরণীয়,
শিশির হ'য়েছে সূর্য ! সে কী আজ দুর্ভাগ্য আমার ?

অথবা সৌভাগ্য লেখা ? উগ্রতার নেকাব প্রচ্ছায়
গোলাব ফোটে কি বুকে ? দুর্ভেদ্য কাঁটার অন্তরালে
আমার অজ্ঞাতে কেয়া আজিও কি সুরভি বিলায় ?
পাই না উত্তর আমি। হৃদয়ের নিকটে দাঁড়ালে
ডাকিয়া তোমাকে কাছে তৃষাতপ্ত দু'বাহু বাড়ালে
অজানিতা স'রে যাও অপরিচয়ের তমিস্রায়।

তিন.

নীরবে স'য়েছি আমি অবিমিশ্র তোমার আঘাত
কারণ সহজলভ্য তুমি নও, মর্যাদা তোমার
প্রেমের আসনে বসি জিনিয়াছে সন্ধ্যাতারকার
ঔজ্জ্বল্য ;—তোমাকে তাই চায় মোর ব্যথা কৃষ্ণ রাত !
তোমার ইঙ্গিতে জাগে এ জীবনে আসন্ন প্রভাত,
যবনিকা অন্তরালে মিশে যায় না-পাওয়া ব্যথার
ব্যর্থতা (তমসা-ম্লান বেলাভূমে নিঃসঙ্গ আত্মার
ক্লান্তিতে রয়েছে যেথা অন্তহীন সুতীব্র সংঘাত)।

পারি না হারাতে তাই, ছাড়িতে পারি না কোন মতে
তোমাকে (তোমার চিন্তা প্রতিচ্ছায়া সেই তো তোমার
ঘিরিয়া রেখেছে মোর এ জীবন ক্লান্তি, ব্যর্থতার
তিক্ত সমস্যায় ঘেরা সংশয়িত প্রান্তরে পর্বতে)।
তুমি তো সুলভ নও। তোমার সমুচ্চ মর্যাদার
রাখিনি সম্মান ; তবু আলো তুমি দিয়েছ এ পথে॥

www.pathagar.com

চার.

দেখেছি বিদ্যুৎশিখা। শান্ত নীলে জ্বালিয়া অশনি
সৌন্দর্যপিপাসু পক্ষ দগ্ধ করে হেসে অকারণে
—অবিচল আর্তস্বরে, না কাঁপিয়া করুণ ক্রন্দনে
নিশ্চিত মৃত্যুর পানে ক্রমাগত বাড়ায় তর্জনী।
দেখেছি তোমার রূপ। —চিত্তের সৌন্দর্যে তুমি ধনী,
কখনো সদয় আর কখনো বা নির্মম কঠিন !
বহ্নিশিখা নও শুধু, সত্তা তব অশ্রুতে বিলীন
এক চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি ; অন্য চোখে সুতীব্র অশনি।

দুর্বোধ্য অজানা তুমি চিরদিন, হায় অজানিতা !
বহিরাবরণে তব রহস্যের সেই নীলাম্বরী—
পারেনি খুলিতে যার মর্মগ্রন্থি দিনের সবিতা,
যার বেদনার গান জানে শুধু অতন্দ্র শর্বরী,
যে অজ্ঞাত অন্তঃপুরে অশ্রু ঝরে, কখনো বাঁশরী
উজাড় করিয়া বক্ষ হয় তব জীবনের মিতা॥

পাঁচ.

যে কথা বলোনি তুমি সে কথা ব'লেছে তব আঁখি,
বলিতে যা চাও নাই সে কথা হ'য়েছে কানাকানি,
যে গান গাওনি তুমি সে গান হ'য়েছে জানাজানি ;
লুকাতে যা চেয়েছিলে রাখিতে পারোনি তাহা ঢাকি'।
তোমার জীবন মাঝে এসেছিল যে কাল-বৈশাখী
গোপন কামনা তব খুলেছে সে তীব্র কশা হানি,
যে গুণ্ঠন টেনেছিলে রাখিতে পারোনি তাহা টানি,
প্রসাধনময়ি ! তুমি আজ নব-বসন্তের সাকী।

গোপন বেদনা তব খুলিয়াছে মুখ মোর কাছে
অশেষ ক্রন্দনে, তাই দিন-রাত্রি রাখিয়াছো ঘিরে
আমাকে। বিক্ষত মন বেদনায় নিরন্ধ্র তিমিরে
তবু জেগে ওঠে এক অন্তহীন তমিস্রার মাঝে।
স্বাতী নক্ষত্রের মত প্রতিচ্ছায়া ফেলিয়া শিশিরে
তিমির তন্ত্রীতে মোর তব স্থির সত্তা জেগে আছে।

পঞ্চম স্তবক

এক.

রাত্রির অরণ্যতলে হে বিচিত্রা ! দ্বার খুলে দাও,
মুখর দৃষ্টিতে তব, গ্রীবাভঙ্গে রহস্য অশেষ !

www.pathagar.com

অজ্ঞাত জগতে মোর আবিষ্কৃত হয়নি যে দেশ
সুকঠিন রহস্যের বক্ষবাস সেথা তুলে নাও।
যদি কোন ভুল থাকে তবে আজ সব ভুলে যাও।
যে অনাবিষ্কৃত লোকে রাখিয়াছো স্বপ্নের আবেশ,
দু'চোখে, চিবুকে, বক্ষে সৃজিয়া বিচিত্র পরিবেশ
গানের পাখীরা মোর বহু দিন সেখানে উধাও।

যার অন্তহীন যাত্রা থেমে গেছে তোমার দুয়ারে
আড়াল করিতে চাও যাকে তুমি বক্ষের সুষমা
অকারণ ঔদাসীন্যে স'রে যাও দূরে নিরুপমা ;
অপরিচয়ের তীরে—সেথা মিশে যেও না আঁধারে।
রাখিতে পারোনি ঢেকে যে সুষমা রেখেছিল জমা ;
তোমার অজ্ঞাতে দেখ ঘিরিয়া সে রেখেছে আমারে॥

দুই.

যখনি দেখেছি তব গ্রীবাভঙ্গে পদ্ম-প্রভ মুখ
অসম্মতি জানায়েছে দুলিয়া কোমল বৃন্ত 'পরে
তখনি মনের আলো প'ড়েছে ফাটিয়া স্তরে স্তরে,
পারেনি ঢাকিতে কিছু ও হৃদয় একাগ্র উন্মুখ।
তিক্ত ঔদাসীন্য ভেবে যতবার হ'য়েছে বিমুখ
মোর অনাদৃত প্রেম মুহ্যমান রিক্ত হতাশায়
ততবার তুলিয়াছো (রাত্রির বিশ্রান্ত তমসায়)
অশেষ ইঙ্গিতে ঘেরা অপরূপ তোমার চিবুক।

নিরুদ্ধ স্বপ্নের পদ্ম ! তোমাকে ঘিরিয়া অবিশ্রাম
আমার মৌমাছি ফেরে নিয়ে তার তৃষ্ণার বর্তিকা,
অপরিচয়ের দূর অন্তরালে থাকি প্রহেলিকা
মৃগতৃষ্ণিকার মত পিপাসা বাড়াও শুধু তার।
দেখেছি অসংখ্যবার, দেখা তবু হয়নি আমার ;
সম্মোহিত করি মোরে রেখেছে তোমার প্রিয় নাম॥

তিন.

যে স্বপ্নে ঘুমায়ে পড়ি সেই স্বপ্ন দেখে উঠি জেগে ;
যে স্বপ্ন হতাশা আনে সে দেয় আশ্বাস স্বপ্নালোকে,
বাঁধা প'ড়ে আছি আমি সে স্বপ্নের সর্পিল আবেগে ;
খুঁজে পাই সরণি সে ক্ষণ-দীপ্ত স্বপ্নের ঝলকে।
অন্তহীন অন্ধকারে যদিও সে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা
বারবার নিভে যায়, তবু জানি ক্লিষ্ট তমিস্রায়

www.pathagar.com

একমাত্র সত্য হ'য়ে সেই প্রেম—পথের বর্তিকা
জ্বলিতেছে জীবনের দিগন্তরে তিমির প্রচ্ছায়।

অনির্বাণ সেই শিখা ! প্রতি শিরা, স্নায়ু ধমনীতে
অনুভব করি আমি সে আলোর বিচিত্র প্রকাশ,
কবোষ্ণ উত্তাপ তার হৃদয়ের নিরুদ্ধ সংগীতে
রাত্রির বিস্ময়ে আনে স্বপ্ন-সৃজনের অবকাশ।
আকাশের সব তারা নিভে যেতো, ম'রে যেতো নদী
ক্ষুদ্র মোর খদ্যোতিকা শিখা হ'য়ে না জ্বলিত যদি।।

চার.

যে দৃষ্টি-সংকেত মোর স্বপ্নেরে জাগালো এত কাল
নিমেষে চিনিবে যদি দেখ সেই আঁখি আরণ্যক,
চঞ্চল বন্য সে চোখ, কখনো বা স্থির নিষ্পলক ;
নিমেষে ছিঁড়িতে পারে মনের কৃত্রিম উর্ণাজাল।
উগ্র শালীনতা দীপ্ত যে কন্যার ঐশ্বর্য বিশাল
আশ্চর্য বিস্ময়ে দেখি চোখ তার বিশ্বাসঘাতক ;
আদিম স্বভাব নিয়ে প্রতিক্ষণে হানে সে শায়ক
বাঁকা ভ্রূ ধনুর নীচে রশ্মি তার আনন্দ উত্তাল।

সে দৃষ্টি দেখনি তুমি, দেখিয়াছো দৃঢ় শালীনতা,
দেখেছো রাণীর মত সে কন্যার শাসন ভঙ্গিমা,
সর্ব অবয়ব ঘিরে শর্বরীর স্থির নীরবতা
(দেখনি গোপন দ্যুতি)। পার হ'লে দৃঢ়তার সীমা
দেখিবে সাজানো আছে পুঞ্জীভূত তারকার কথা
দু'চোখে ; চিবুকে তার আরক্তিম ঊষার রঙ্গিমা।।

পাঁচ.

শুনিতে চেয়েছি আমি—তোমার ক্ষণিক অদর্শন
এ মনের অধিরাজ্যে এনেছে কী অন্তহীন কাল
সুকঠিন প্রতীক্ষার ! —উত্তর দিয়াছে দু'নয়ন
তব পথ-প্রান্তে জাগি' শ্রান্তিহীন প্রদোষ সকাল।
শুনিতে চেয়েছি আমি—অরণ্যের সকল ভাষণ
মেটাতে কি পারিয়াছে তব কণ্ঠ-ধ্বনির পিপাসা
অনির্বাণ মোহময় !—বলিয়াছে আমার শ্রবণ
উৎকর্ণ তোমার স্বরে আজো মোর মেটে নাই আশা।
শুনিতে চেয়েছি আমি—পল্লবিত পদ্মের মধুর

www.pathagar.com

পাপড়ি কি দিতে পারে তনুস্পর্শ নিত্য কমনীয়
তোমার স্পর্শের চেয়ে !—বলিয়াছে বক্ষ লোভাতুর
অতৃপ্ত জীবনে আর কোন স্পর্শ নহে স্মরণীয়।
শুনিতে চেয়েছি আমি সবচেয়ে কাম্য কোন ক্ষণ
উত্তর দেয়নি আর, তব সঙ্গ-লিপ্সু মোর মন॥

ছয়.

দিও না নতুন তথ্য, বলিও না তত্ত্বকথা কোন
(পণ্ডিতজনের মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়াছি ঢের
পাইনি প্রশান্তি আমি, পাই নাই সান্ত্বনা কখনো
তৃষ্ণার সঞ্চয় তা'তে মেলেনি অতৃপ্ত হৃদয়ের)
তার চেয়ে কাছে এসো, আরো কাছে, একাগ্র উন্মুখ
উত্তপ্ত ঊষর এক প্রাণহীন জীবনের তীরে,
আমার কঠিন বক্ষে রাখি স্বপ্ন-সুরভিত বুক
সুরের মুহূর্ত মোর সুষমায় দাও তুমি ঘিরে।

আকাশের রহস্য বা সামুদ্রিক ঐশ্বর্যের কথা
নতুন নহে তো আর (পৃথিবী হ'য়েছে পুরাতন) ;
তোমার না-বলা কথা, চাঞ্চল্য অথবা নীরবতা
অজ্ঞাত রহস্যে ঘেরা চিরদিন রহিবে নূতন।
কথা বলিও না কোন, রাখো বক্ষ এ বুকে আমার
স্পর্শে, গন্ধে, বর্ণে মিশে দুই সত্তা হোক একাকার॥

ষষ্ঠ স্তবক

এক.

মনে হয় জীবনের সবগুলি জটিল গ্রন্থিকে
জটিল ক'রেছে আরো তোমার চিন্তার উর্ণাজাল !
খুলিতে পারি না আমি। শত শাখা মেলিয়া প্রবাল
(মোর মননের তরু) তোমাকেই খোঁজে দিকে দিকে।
চাঁদ সিতারার কক্ষে আমন্ত্রণ করো যে যাত্রীকে
সে র'য়েছে বহু নিম্নে প্রশাখায় জড়ায়ে সত্তারে,
সহস্র বন্ধনে বদ্ধ ছাড়িয়া সে যেতে নাহি পারে
পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত করে সে রাত্রিকে।

অশেষ ক্রন্দনে তার শত শাখা বুঝি ভেঙে পড়ে,
তুমি তা শোন না, তুমি অন্যমনা স্বপ্নে আপনার
অবসর পাও না তো কোনদিকে ফিরিয়া দেখার !

www.pathagar.com

মনের কামনা তব গুঞ্জরিত হয় যে মর্মরে
প্রবালদ্বীপের তরু অর্থ জানে সে স্বপ্ন গাথার ;
জানে না দ্বীপের ভিত্তিমূল তার তমিস্রা গহ্বরে॥

দুই.

আমার দিনের সূর্য রূঢ় তীব্র আলোক ছড়ায়ে
সুপ্তির সমিধে জ্বালি' বহ্নিশিখা সুতীব্র-দহন
মুছে নেয় তৃণের শিশির, খুলে দেয় আলিঙ্গন
তৃষাতপ্ত মিলনের। ব্যস্ততার প্রাঙ্গণে গুঁড়ায়ে
বৈশাখের অট্টহাস্য নিয়ে যায় হেলায় উড়ায়ে
কর্মব্যস্ততার বাণী বজ্র-সুরে করি উচ্চারণ।
প'ড়ে থাকে ধূলিম্লান অন্তরের কোমল ক্রন্দন
বিসর্পিল রাজপথে বক্ষে নিতে পারি না কুড়ায়ে।

স্বপ্ন ও সুষমা-মুক্ত সেই সূর্য, সে নিরাভরণ
উলঙ্গ প্রখর সত্য রাখে না যে স্বপ্ন অবশেষ,
শাণিত রশ্মিতে যার ফুল ঝরে, ম'রে যায় রেশ
সংগীতের ; পথে যার দিবসের ব্যূহ সংরচন
দেখেছি জীবনে তার পরিক্রমা অনন্ত অশেষ,
রাত্রির তারাকে তবু পারেনি ছাড়িতে মোর মন॥

তিন.

আমার রাত্রির তারা শর্বরীর তিমির প্রচ্ছায়
রজনীগন্ধার বৃন্তে বুলাইয়া সুরভি অঙ্গুলি
মনের সকল পর্দা সব সুর একে একে খুলি
অস্পষ্ট স্মৃতির ছবি জাগায়ে তোলে সে পুনরায়।
যে ছায়া মিশিয়াছিল বহ্নি-তপ্ত তপন প্রভায়
সে ছায়া—হারানো সুর আবার সে বক্ষে নেয় তুলি,
রজনীগন্ধার শীর্ষে হেনার সুরভি ঝড়ে দুলি'
ব্যথা-কৃষ্ণ শর্বরীতে সুষমার প্রশান্তি বিলায়।

তোমাকে তখন পাই স্বপ্নের গহীন দেহলিতে
কিংবা আরো কাছে মোর মনের নিভৃত অন্তঃপুরে,
অশ্রুজলে—ভাবনার সদ্যস্ফুট গানের কলিতে—
তোমার গানের সুর বহু পথ, বহু মাঠ ঘুরে
জেগে উঠে মিশে যায় নৈঃশব্দ্যের দিগন্তে সুদূরে
অনন্ত আকাশ পথে—জ্যোতিষ্কের শহরতলিতে॥

www.pathagar.com

চার.
যে তারা উজ্জ্বল হয় অন্ধকার অন্তহীন হ'লে
পারে না মুছিতে তা'রে শর্বরীর ঘন-কৃষ্ণ ছায়া।
বিস্মৃতির অন্তরালে অবলুপ্ত হয় না যে কায়া
সে নিত্য ঘিরিয়া রাখে সময়ের প্রশান্ত কল্লোলে।
তোমাকে পেয়েছি বক্ষে তৃষাতপ্ত রুধিরের দোলে,
—অনির্বাণ পিপাসায়। সে পিপাসা শ্রান্ত হয় যদি
জাগিবে নতুন তৃষ্ণা হৃদয়ের সীমান্ত অবধি;
সে পিপাসা অন্তহীন মুছিবে না নিভৃত নিচোলে।

তোমাকে ডাকিয়া তাই মেটে না এ পিপাসা অশেষ,
তোমাকে ধরিয়া বক্ষে অর্থহীন তৃপ্তির দুরাশা
রাত্রির কোমল স্বপ্নে রেখে যায় রুধিরাক্ত ভাষা
—অগণ্য তারার চক্রে অতৃপ্ত কামনা নির্নিমেষ
(যেখানে অতন্দ্র আঁখি চাহিয়াছে মেটাতে পিপাসা
ধূসর স্বপ্নের মত অচিন্ত্য সে প্রেমের স্বদেশ)॥

পাঁচ.
তোমার পথের 'পরে আমার হৃদয় রাখিলাম।
যদি দ'লে যেতে চাও, যেও তুমি, করিব না মানা
জানি সে আঘাতে পাবো তনুস্পর্শ ছিল যা অজানা
—যার স্বপ্ন দেখিয়াছি এতদিন আমি অবিশ্রাম।
তোমার পথের 'পরে আমার হৃদয় রাখিলাম।
এ প্রাণ-বিহঙ্গ মোর সেখানেই গুটায়েছে ডানা,
যদি তুলে নাও বক্ষে তবে আমি করিব না মানা
দেখে যাবো—এতদিন স্মরণ ক'রেছি যার নাম।

সাত তারা ডুবে যাবে যখন রাত্রির অন্ধকারে,
রজনীগন্ধার বৃন্তে ফুটিবে কোমল, নমনীয়
স্মৃতির বিশুভ্র কুঁড়ি, নৈঃশব্দ্যের বিপুল পাথারে
স্তিমিত আলোর মাঠে তমিস্রার অজস্র সম্ভারে
হৃদয় আসিবে ফিরে নিয়ে তার সবচেয়ে প্রিয়
স্মরণীয় ক্ষণদ্যুতি আনন্দে অথবা অশ্রুধারে॥

ছয়.
যখন শিশিরকণা গোলাবের রক্তিম অধরে
ঝ'রে গেল বেদনায়—বুঝি নাই আমি অন্যমনা
পর্ণের রক্তিম বিভা চেয়ে নিলো বুকে সমাদরে

www.pathagar.com

যে প্রেম—নিল সে চেয়ে প্রকাশের বিচিত্র বেদনা।
ক্রমাগত জ্বলি তাই দিবসের খর সূর্য তাপে।
বক্ষের সুরভি ঢালি পেলব পাপড়ি সুকোমল
সারা রাত্রি জেগে একা বাতাসের বিশ্রম্ভ প্রলাপে
ঊষার প্রত্যন্তে দেখে আতপ্ত নয়নে অশ্রুজল।
দীর্ঘ দিন জ্বলিয়াছি আমি যার ক্লান্ত প্রত্যাশায়
আজো দেখি তার তরে ঝরে মোর বক্ষের রুধির
বিশ্রান্ত নয়ন-প্রান্তে শুনি আজো অশান্ত হাওয়ায়
অবিশ্রান্ত পদক্ষেপ হৃৎপিণ্ড দূরবর্তিনীর,
দিন-রাত্রি, রাত্রি-দিন প্রতীক্ষার ক্লান্ত ক্ষণ গণি
শুনি সেই অন্তহীন প্রেমের বিচিত্র পদধ্বনি॥

সাত.

তাই এ বিশ্রান্তি নয়, যত খুঁজি অন্ত রহস্যের
আমার শ্রান্তিকে তত মুছে দেয় প্রাণের ব্যঞ্জনা,
সংগীতশেষেও শূন্যে জেগে থাকে সুরের মূর্ছনা;
নবীন প্রেরণা-দীপ্ত শুরু হয় সরণি প্রেমের।
যে দেয় তৃষ্ণার বার্তা সেই আনে মাধুর্য মেঘের
অজস্র বর্ষণে, স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়ে, নব বৃষ্টিধারে
ইংগিতে জানায়ে তার জীবনের নিরুদ্ধ প্রাকারে
বিশ্রান্তি ভোলায়ে দেয় অসমাপ্ত পাঠ এ প্রেমের।

তাই ক্লান্তি ক্লান্তি নয়, শূন্যতার নিথর হাওয়ায়
সামগ্রিক চেতনায় যাকে আমি করি আবিষ্কার
নতুন সংকেতে খুলে অপরিচিতার রুদ্ধ দ্বার
আবার সাজাতে চাই নবতম বাণীর সংজ্ঞায়
—সে চির অচেনা। তবু চিনে নিতে তাকে শেষবার
ছায়া হ'য়ে মোর মন মিশে যায় তারি সে ছায়ায়॥

সপ্তম স্তবক

এক.

প্রেমের দুর্গম পথে ফিরিলাম যুগ হ'তে যুগে
দেশ হ'তে দেশান্তরে যাযাবর পান্থ অন্যমনা
—অতৃপ্ত; উদগ্র! তবু মরুর পিপাসা মিটিলো না,
তৃপ্তিহীন তৃষা তার ছুটে চলে লু' হাওয়া সম্মুখে।
প্রশান্তি নামে না সেই সঙ্গীহীন সাহারার বুকে,

www.pathagar.com

চঞ্চলা নদীকে তাই বাঁধিতে চায় সে বাহুপাশে,
পারে না বাঁধিতে তাকে ; ক্লান্তিকীর্ণ হতাশা প্রশ্বাসে
মৃত্যু-তিক্ত পানপাত্র মরুভূ তুলিয়া নেয় মুখে।

একক নিঃসঙ্গ প্রাণ অসুন্দর ভারসাম্যহীন
জাগে দিন রজনীর তৃপ্তিহীন পটভূমিকায়,
সাথী খুঁজে পেলে স্বপ্ন রচনা করে সে সাহারায় ;
অসুন্দর প্রাণ হয় সৌন্দর্যের পাথারে বিলীন।
প্রভাত সূর্যের স্পর্শে সুপ্তিমগ্ন রাত্রির তুহিন
নিমেষে রাঙিয়া ওঠে সপ্তবর্ণে আশ্চর্য বিভায়॥

দুই

তুমি আছো তাই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নীলার পটভূমি
এ আকাশ, তাই দীপ্ত অন্তহীন সৌর দিগ্বলয়
তমিস্রা-সংঘাত শেষে আলোকের দিকপ্রান্ত চুমি
মনের মাধুর্যে মোর জাগায়েছে অশেষ বিস্ময়।
হেনার সুরভি মূলে, শেফালির বর্ণে আরক্তিম
দিয়াছে স্বপ্নের স্পর্শ মুছিয়া প্রাণের বিবর্ণতা,
মরু সাহারার প্রান্তে আনিয়াছে অনন্ত নিঃসীম
স্বপ্নের কুহেলি ঘেরা মাধুর্যের ম্লান বিষণ্নতা।

তুমি না থাকিতে যদি এ মাধুর্য হ'ত তিক্ত বিষ
ফুলের কোরকে, নিমেষে নিঃশেষ হ'ত মধুকণা,
মর্মগ্রন্থি দীর্ণ করি' দিগ্বলয়ে খুঁজিত আশীষ
প্রভাতশেষের গান, সায়াহ্নের সংগীত মূর্ছনা,
গোধূলি পাণ্ডুর পথে বিরতির সন্ধ্যা-স্বপ্নে ঘেরা
নীড়ে ফিরিত না পাখী ; যাযাবর চাহিত না ডেরা॥

তিন

যে-ভাবে নিঃশেষে আমি দিয়াছি জীবন প্রতি পলে
তেমনি ফেরায়ে দাও, আর কিছু রাখিও না বাকি
(ক্ষমা ক'রো নিষ্ঠুরতা) হে আমার দূরাশ্রয়ী সাকি !
যদি পারো অশ্রু এনো করুণায় নয়ন কজ্জলে।
মনে কোরো : দিন রাত্রি সংশয়ের নিরন্ধ্র অতলে
কেন রেখে দেবে তা'রে আনিয়াছে নিজে যারে ডাকি' ;
ফুল ফসলের দিনে বঞ্চনার এ কাল-বৈশাখী
কেন দেবে ? কেন প্রেম ক্লিষ্ট হবে ক্রূর জগদ্দলে ?

www.pathagar.com

দয়া করো, দয়া করো নিজেরে কঠিন ক'রে যদি
স্থির নাহি হ'তে পারি, যদি প্রেম (পারদ-চঞ্চল)
সমস্ত জীবন ঘিরে টানে কৃষ্ণ মরণ অবধি
তবে শুধু দয়া কোরো ; বেদনার নিভৃত কোমল
সুগোপন ফল্গুধারা যদি না বহাতে পারে নদী
তবু তুমি এনো চোখে করুণার বিন্দু অশ্রুজল॥

চার.

আরো যা বলার ছিল (ঘুমন্ত মনের বহু কথা),
আরো যা দেখার ছিল (রাত্রির অচেনা বহু তারা),
সে সব জানার আগে প্রদীপ্ত প্রাণের চঞ্চলতা
নিভে গেছে অসময়ে পথে দেখি মৃত্যুর পাহারা।
যা দিয়েছো—সামান্য সে। যা পেয়েছো—মূল্য তার কম।
ষা দিতে পারিতে আর যাহা নিতে পারিতে প্রচুর
দাওনি তা ; নাওনি তা। যা দিয়েছ, নিয়েছ প্রথম
তারি মাঝে শুনিয়াছো অসময়ে সমাপ্তির সুর।
আরো বহু বাকি ছিল, ছিল আরো দিগন্ত সম্মুখে।
অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত যে দিগন্ত অজানা তোমার
হয়তো আমারো,—সেই দিগন্তের পথে পূর্ণ বুকে
পারোনি সম্মুখে যেতে ; প্রশ্ন সেথা ছিল নিরুত্তর।
ক্ষুদ্র কামনার মাঝে ছিল যত জটিল সংশয়
জড়ায়ে প'ড়েছ তাতে করিতে পারোনি তুমি জয়॥

পাঁচ.

তোমার বঞ্চনা কত তিক্ত যদি তুমি তা জানিতে
চমকি' উঠিত তবে শতদল-শুভ্র তব মন
অনির্বাণ রূপে, রসে পান্থজনে করি আকর্ষণ
অনায়াসে ছেড়ে যায় সে সংশয় মরণ গ্লানিতে
(সহস্র মৃত্যুর চেয়ে তিক্ততর সেই সরণিতে
যেখানে মৃণালে বিষ গোখুরার কুণ্ডলী বন্ধন,
বিষাক্ত বাঁধনে ফেলে ক্রমাগত করে যে দংশন)
তোমার কোমল বক্ষ পারিত না কভু তা মানিতে।

সে বঞ্চনা কত তিক্ত কত তীব্র শুধু সেই জানে
সে প'ড়েছে কোনদিন তোমার ছলনা কুণ্ডলীতে,
আপ্রাণ প্রয়াস যার ব্যর্থ হ'ল সম্মুখে চলিতে
প্রলুব্ধ পদ্মের রূপে মরিল যে সম্মোহিত জ্ঞানে
সাপের ফণার নীচে ; যে কখনো পারেনি বলিতে
তার ব্যর্থতার জ্বালা ভাষাহীন বাণীর সন্ধানে॥

www.pathagar.com

ছয়.
তবু চাহি আমি হৃদয়ের এ রক্ত-ক্ষরণ
বন্ধ হয়ে যাক, রুদ্ধ হোক ক্ষতমুখ বেদনার।
হৃৎপিণ্ড দীর্ণ করি বহিছে যে রক্ত শতধার
ব'য়ে যেতে দেবে তাকে আমার মমতা অকৃপণ।
মেনে নেবে সেই সাথে যন্ত্রণার সংশয়-বন্ধন
ললাট লিপির মত। বৃথা গ্লানি মানি না তো আর,
আমার হৃদয় রক্তে রাঙায়ে তোমাকে দুর্নিবার
অনায়াসে চেয়ে নেব পথ-প্রান্তে শহীদী মরণ।

প্রেমের দুর্গম পথে সেই মৃত্যু, সে মোর জীবন
অপূর্ণ সংগীতে তব দিয়ে যাবে পূর্ণতায় দান,
লালসার অন্ধকারে জাগাবে সে প্রভাত অম্লান
অমাকৃষ্ণ তমিস্রায় দিয়ে যাবে আলোর স্পন্দন
আমার মরণে হবে তোমার প্রাণের উদ্বোধন
আমার প্রেমের স্পর্শে প্রেম তব হবে মহীয়ান।।

সাত.
মনে কোরো সেই দিন সংশয়ের মেঘ কেটে গেলে
বিশ্বাসের মহিমায় দীপ্যমান যখন তোমার
ফুটিবে চিত্তের কুঁড়ি রক্তাভ সহস্র দল মেলে
অসংশয় বৃন্ত 'পরে, যে মুহূর্তে কাঁদাবে না আর
দ্বিধাগ্রস্ত মৃণালের অপূর্ণতা—কণ্টক আঘাত
(যার যন্ত্রণায় তুমি অন্যকেও ক'রেছ আহত
সে আঘাত শেষ হ'লে, শেষ হ'লে সংশয়ের রাত)
মনে কোরো একবার সদ্যস্ফুট কোরকের মত।

নদীর তারুণ্য নিয়ে, অরণ্যের সজীবতা নিয়ে
আকাশের দীপ্তি নিয়ে মনে কোরো শুধু একবার
তোমাকে জাগায়ে গেল যে পথিক হৃদি-রক্ত দিয়ে
এখনো অলক্ষে থেকে মেলে আছি স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার
তোমার পথের 'পরে যদি নামে অন্ধ ঘন ছায়া
বিস্মৃত ইঙ্গিত তার কেটে যাবে শর্বরীর কায়া।।

আট.
সৃষ্টির প্রথম থেকে মানুষের নর্ম সহচরী
ভালবেসে তুমি মোরে শক্তি দিলে ভালবাসিবার,
বিমুগ্ধ তোমার প্রেমে বন্দী গৃহ-প্রাঙ্গণে কান্তার ;
রূপে রসে স্বপ্নময় হ'ল মোর সুদীর্ঘ শর্বরী।
রাত্রির বিশ্রান্ত ক্ষণে দিগন্তের বাঁকা পথ ধরি'
ক্ষীণ চন্দ্রলেখা যবে প্রতিকৃতি নিল পূর্ণিমার
অরণ্যের প্রতি প্রান্তে আধিপত্য করিল বিস্তার
রৌপ্য-রশ্মি জালে মোর মনের তমসা শ্রান্তি হরি'।

www.pathagar.com

তোমাকে হারালে তাই অন্ধকার তমিস্রা প্রচ্ছায়
পূর্ণিমা–পিপাসু মন কেঁদে মরে ক্লান্ত দুর্বিপাকে।
বিচ্ছেদ–শঙ্কার জাগি মন মোর রাত্রির ছায়ায়
খুঁজে ফেরে সেই প্রেম সমুন্নত করে যে সত্তাকে !
তোমাকে ধরিয়া বক্ষে প্রত্যাসন্ন বিচ্ছেদ শঙ্কায়
স্মরণ ক'রেছি তাই প্রতি রাত্রে তোমার স্রষ্টাকে।।

নয়.

চিরন্তন সত্তা থেকে বিচ্ছুরিত যে প্রেম আকাশে
জ্বালালো তারার দীপ, পৃথিবীকে অরণ্যে সাজালো,
যার প্রতিচ্ছায়া মোর মনে, মেঘে জ্বালিয়াছে আলো,
সে বিদ্যুৎশিখা নিয়ে অস্পষ্ট রাত্রির প্রতিভাসে
দেখেছি তারার দলে লক্ষ স্মৃতি ভিড় ক'রে আসে
(উজ্জ্বল হীরার মত জীবনের সেই ক্ষণগুলি
দীর্ণ করি তমিস্রার পটভূমি বাড়ায় অঙ্গুলি
নতুন দিগন্ত পানে নবতম প্রাণের আশ্বাসে)।

তৃষাতপ্ত পানপাত্রে আজো আমি পাই নাই যারে
পাই নাই পূর্ণভাবে তারে আজ মেনে যাই প্রেয়,
শূন্য আধারের বুকে একদিন হবে যে আধেয়
ধূসর দিগন্ত মোর সাজাবে যে দীপ্ত দীপাধারে
খুঁজে পাবো তারে কভু একদিন পূর্বাশার দ্বারে
—অন্তহীন পথে মোর অফুরন্ত প্রাণের পাথেয়।।

দশ.

সে পাথেয় নিয়ে চলে ভাবনার নীহারিকালোকে
ভ্রাম্যমাণ মন মোর—সহযাত্রী লক্ষ তারকার,
অস্ফুট গোধূলি থেকে অগণন তারার ঝলকে
বিস্ময়ের অধিত্যকা পার হয়ে পাখা মেলে তার
নতুন বিস্ময় পানে। জীবনের সৌর দিগ্বলয়ে
আলোর পাপড়ি যতো খুলে যায় তত অজানায়
দূরত্ব বাড়িয়া চলে। চলি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে
প্রিয়ার মঞ্জিল পানে আলো নিয়ে অশেষ চেনায়।

পরিপূর্ণ রূপে তাই তোমাকে যে হয় নাই জানা
তাতে মোর নাই ক্ষোভ, শুধু আমি আশা ক'রে আছি
যে মধু–পিপাসু চিত্ত একদিন মেলিয়াছে ডানা
তোমার রাত্রির স্বপ্নে ঠাঁই পাবে কভু সে মৌমাছি—
জাগ্রত চেতনা মাঝে অথবা বিশ্রান্ত ঘুমঘোরে
আত্মার স্মরণলোকে—প্রেমের প্রোজ্জ্বল স্মৃতিডোরে।।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মীর-জাফরের কৈফিয়ত

মীর-জাফরের সাথে দেখা হল একদা নিশীথে
আশ্চর্য স্বপ্নের মত (অহিফেন ছিল যা শিশিতে
যথারীতি সন্ধ্যারাত্রে করেছিনু নিঃশেষে সাবাড়,
মধুর আমেজ তার পৃথিবীর সীমা করে পার
নিয়েছিল একেবারে মীর-জাফরের দেহলিতে) !
কিছুটা অচেনা আর কিছু চেনা শহরতলীতে
দেখে তারে সারা মন পূর্ণ হল খুশীর মউজে !
জানি না ক'ঘণ্টা ঠিক সে রাত্রে ছিলাম চোখ বুজে
পুরাপুরি ধ্যানমগ্ন (ছিল না হিসাব সময়ের),
শুনেছি যখন দীর্ঘ কৈফিয়ত মীর-জাফরের !
বলিল সে,

"অদ্ভুত পৃথিবী, যার হাল হকিকত
মূর্খ বা দানেশমন্দ বোঝে নাই কেউ এ যাবৎ ;
বোঝে নাই মর প্রাণী ; এমনকি ফেরেশ্‌তা গোরের
বোঝেনি রহস্য এই দুনিয়ার রাত্রি ও ভোরের !
নির্বাক বিস্ময়ে তাই পরিক্রমা দেখে পৃথিবীর,
বিস্ময়ে দেখে সে চেয়ে ওঠা-নামা বিভিন্ন জাতির,
চরিত্র, চাতুর্য, চুক্তি, চক্রান্ত, বিচিত্র ব্যবহার !

"হায়াত দারাজ খান ! এসেছো কি দিতে সমাচার
অবোধ্য সে দুনিয়ার কোন এক চক্রব্যূহ থেকে ?
অথবা দুর্বুদ্ধি নিয়ে এলে শুধু, যেমন অনেকে
অনর্থক নিয়ে আসে অপযশ বিগত সন্ধ্যার,
এবং আমার কথা কেউ ফিরে করে না প্রচার
পৃথিবীতে ! নিতান্ত কদর্থে মীর জাফরের নাম
পরচর্চাকারীদের রসনার বাড়ায় আরাম,
অথচ কখনো জানি প্রতিবাদ হয় নাই এর
কোন দিন !

"সংক্ষেপে বক্তব্য আমি বলে যাই ফের,
জেনে নিয়ে জানাবে তা পরিচিত মহলে তোমার,
কারণ রচিত পুঁথি রয়েছে যা সম্মুখে সবার
অনেক প্রকৃত তথ্য কিংবা সত্য পাবে না সেখানে
জাফরের দরবারে জেনে যাবে তুমি যা এখানে।
"পার্থিব লোভের ঊর্ধ্বে বহু দূরে র'য়েছি যদিও

www.pathagar.com

তবু মানুষের কাছে উল্টাভাবে আমি স্মরণীয়,
কেননা আমার ত্রুটি কারু আর নাই তো অজানা !
ঐতিহাসিকেরা মিলে এক সাথে খুঁড়েছে বিছানা,
সমাধির শান্তি ভেঙে কোলাহল করেছে সকলে ;
সহজে যা চাপা যেতো বলেছে সে কথা দলে দলে।

"ঐতিহাসিকের সাথে যাবতীয় পরচর্চাবিদ
এ ক্ষেত্রে পেয়েছে জানি অন্তরের বিশেষ তাকিদ,
আমার কলঙ্ক ঢাক পেটায়ে খুশীতে নির্বিবাদে
দিয়েছে কলঙ্ক আরো, বলে গেছে দাসত্বের ফাঁদে
আমিই ফেলেছি নাকি লুপ্ত ক'রে জাতির স্বাধীন
অস্তিত্ব বা মুক্ত সত্তা ; একা আমি এনেছি দুর্দিন
পূর্ণ সৌভাগ্যের পথে ! আজাদী বা আজাদ রাষ্ট্রকে
বিকায়েছি আমি নাকি স্বার্থান্বেষী মতলবের ঝোঁকে !
'বে-ঈমান', 'মুনাফেক' গালাগালি দিয়ে ইত্যাকার
বলেছে আমাকে ওরা 'স্বার্থান্ধ শয়তান', 'কুলাঙ্গার'
কওমের শত্রু নাকি আমি !

"কিছু সত্য বলে মানি
স্বীকৃতা আংশিকভাবে, কিন্তু এ-ও ভালোভাবে জানি,
সর্বনাশের দোষ পুরাপুরি চাপাও এ ঘাড়ে
সে ভীষণ সর্বনাশা এসেছিল আগেই দুয়ারে,
উপলক্ষ এ গরীব। ভিত্তি ছিল আগেই দুর্বল,
সমাজের বুনিয়াদে ধরেছিল আগেই ফাটল
পতনের শেষ চিহ্ন। ভাবেনি যা কেউ কোন দিন
বোঝে নাই ঘুণ-ধরা সমাজের অবস্থা সঙ্গিন
সুদুর্লভ ব্যতিক্রম মুষ্টিমেয় জ্ঞানীগুণী ছাড়া
মৌতাতে মগ্ন এ জাতি বোঝেনি সে মৃত্যুর ইশারা।

"বিচ্ছিন্ন জনতা হল যে শক্তিতে অচ্ছেদ্য মিল্লাত
যে শক্তিতে কেটে গেল অন্ধকার জুলমাতের রাত,
দ্বীনের সে প্রাণ-শক্তি বোঝে নাই সর্বসাধারণ।
কৌশলী আমীর বাদশা ছিল এর নিগূঢ় কারণ
ব্যক্তিস্বার্থে মগ্ন যারা চায় নাই ইসলামী জামাত,
ক্রমাগত টেনে শুধু নামায়েছে জাতির বরাত।
নিঃসঙ্গ প্রয়াস যত যে কারণে হয়ে গেল শেষ
প্রকৃত আদর্শবাদী অন্ধকারে হ'ল নিরুদ্দেশ !

"হায়াত দারাজ খান ! তুমি আমি যাদের ওয়ারিশ,
অন্তত যে দাবী তুলে চাই আজো কিঞ্চিৎ বখশিশ,
কি কারণে নিল তারা জিন্দেগীতে লাঞ্ছনা অশেষ ?

www.pathagar.com

কি কারণে এসেছিল আউলিয়া, আলেম, দরবেশ
হেজাজের মাটি থেকে বিজাতীয় হিংস্র পরিবেশে?
তৌহিদের আলো নিয়ে কেন এল অচেনা এ দেশে?
সর্বত্যাগী, সেবাব্রতী চেয়ে কোন্ রোশনি দ্বীনের
বিগত অধ্যায় হল ইতিহাসে? ...হৃদয়হীনের
চক্রান্তে সে সিলসিলা শেষ হ'ল কিভাবে, কখন
বৈশাখী ঝড়ের রাতে ছায়াপথ মিলায় যেমন
জানো তো সে সব কথা।

"জানো আরো হালুয়া মালাই
চেয়ে কারা দুনিয়ায় আদর্শকে ভেবেছে বালাই,
ভাড়াটিয়া মোল্লা, পীর, পাঠান বা মোগল সরকার
আদর্শের পথে কেন করে নাই যা কিছু দরকার,
বরং প্রশ্রয় দিয়ে বাড়ায়েছে নতুন জঞ্জাল!
জেনে রাখো ব্যঙ্গবিদ দিয়ে গেছে সেই তালে তাল
মীর-জাফরের যুগ। কোরানের মানেনি নির্দেশ,
মিথ্যা ও মৃত্যুর দিকে ছিল জেগে আঁখি নির্নিমেষ
ইবলিসের অনুগত।

"অতি ধূর্ত আকবর বাদশার
ভাবশিষ্য, চেলা যত ছিল নিয়ে লা-দ্বীনি ব্যাপার।
সমন্বয়-পন্থীদের চিন্তাধারা অথবা বেদাত
বিকায়ে মৌলিক সত্তা এনেছিল আত্মঘাতী রাত।
না মেনে মহান শিক্ষা মুজাদ্দিদ আলফেসানীর
ব্যতিব্যস্ত তরুণেরা ছিল নিয়ে অবৈধ ফিকির।

"বিজাতীয় রমণীর রঙ্গরস হৃদয়ে, মগজে
বিজাতীয় ভাবধারা দিয়েছিল অত্যন্ত সহজে,
বিশেষ রিপুর চক্রে স্থান-ভ্রষ্ট পৌরুষের শিলা
চেয়েছিল রাত্রি দিন অনির্বাণ বৃন্দাবনলীলা,
এবং তা পেয়েছিল সুপ্রচুর স্বর্ণ বিনিময়ে।
মিশ্রণ কাহিনী সেই ভাবি আমি নির্বাক বিস্ময়ে।

"মুক্তপক্ষ শাহবাজ সে নেশায় চড়ুই যেমন
তৌহিদী কালাম ভুলে গেয়েছিল কীর্তন, ভজন।
'কৃষ্টি সমন্বয়ে' ফের জন্মেছিল যে রুগ্ন সন্তান
স্বভাবত ছিল তার কাশী কিংবা কিষ্কিন্ধার টান,
মক্কা মদীনার কথা যে কারণে হ'ল তার ভুল;
বিজাতীয় পরিবেশে পেয়েছিল প্রাধান্য মাতুল।
"বহু পৌত্তলিক প্রথা, দুর্নীতি, শোষণ, অবিচার

www.pathagar.com

পালটিয়ে ভোল শুধু ঢুকেছিল ঘরে নির্বিকার
অথবা ধরায়েছিল ঈমানে বা বিশ্বাসে ফাটল,
দিয়েছিল শুধু এনে সংশয়ের আঁধার অতল
ভোলায়ে তৌহিদ জ্ঞান দিয়েছিল দেবতা নূতন
দ্বীনের প্রকৃত তথ্য বোঝে নাই সমাজ তখন।

"সে দিন ভাবের ঘরে করেছিল যারা লেনদেন
তাদের অনেকে জানি এনেছিল মৃত্যু অহিফেন,
বেদান্তের সাথে কেউ খুঁজেছিল পূর্ণ সমন্বয়,
সূফীর খোলসে কেউ এনেছিল মিথ্যা ও সংশয়।
বানপ্রস্থ মেনে নিয়ে জিন্দেগানি কাটায়ে হুজরায়
অনেকে পীরের গদী চেয়েছিল অন্যের মুজরায়,
বংশগত সূত্রে কেউ চেয়েছিল 'নজর নিয়াজ';
মালিকানা সূত্রে কেউ খুঁজেছিল শিষ্য, লাখেরাজ।
রাজনীতিকের মতে সর্ব ক্ষেত্রে দিয়ে মাথা ঝাঁকি
পুরা তেজারতি চালে করেছিল মোল্লারা মোল্লাকি।

"ঐশ্বর্য-বিলাস লুব্ধ মেদপুষ্ট অসংখ্য আলেম
শাসকের ইশারায় সেজেছিল তখন জালেম!
তাদের ক্ষমার দ্বার মুক্ত ছিল রইসের তরে,
ক্ষমাহীন ছিল তারা মিসকিন বা দুঃস্থের উপরে,
বৃহৎ ব্যাপার ছেড়ে অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ নিয়ে
ব্যতিব্যস্ত ছিল তারা মূল সত্যে কদলী দেখিয়ে।

"সে দিন কা'বার পথ ছিল জুড়ে অসংখ্য মাজার,
নৃত্য গীত করেছিল কোরানের স্থান অধিকার,
উজ্জ্বল সূর্যের মত ইসলামের মুক্ত মানবতা
বর্ণাশ্রম মেঘে শুধু দেখেছিল বিষম ব্যর্থতা।
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, বহু ক্ষেত্রে বৈষম্য রক্তের
দিয়েছিল ব্যথা প্রাণে মুষ্টিমেয় ইসলাম ভক্তের।
নামত ইসলামী সাম্য মেনে নিয়ে দেখেছি তখন
কার্যক্ষেত্রে ছিল চালু 'মুসলমান শূদ্র বা ব্রাহ্মণ'।

"জীবনের পূর্ণাদর্শ—মূল নীতি ছেড়ে কোরানের
সুবিধাবাদীর পন্থা নেমেছিল অতলে পাপের,
এত্তেবায়ে সুন্নাতের পরিবর্তে শয়তান সেবা
প্রচলিত হয়েছিল বহু কাল ধ'রে। এ দেশে বা
অন্য কোন দূর দেশে রাষ্ট্রাদর্শ ছিল না সে দিন,
খিলাফতে রাশেদার শেষ চিহ্ন তখন বিলীন
দুনিয়া কারবালা মাঠে শত এজিদের অত্যাচারে।

www.pathagar.com

মুজ্‌লুমের লোহু ধারা অগণন ফোরাত কিনারে
জমে উঠেছিল, আর সংখ্যাহীন ভুলের পাহাড়
মুস্‌লিম রাষ্ট্রের নামে ছিল জেগে ক্রূর নির্বিকার।

"যদিচ আনন্দ ছিল শাহ্‌জাদা, নবাবজাদার
যেমন এখনো আছে, সর্বদাই কিছু অংশ যার
সুনির্দিষ্টভাবে থাকে মোসাহেব ভাগ্যে চিরকাল
সহস্র সুন্দরী মাঝে বে-সামাল সন্ধ্যা ও সকাল।
যৌন আবেদনে ঘেরা নৃত্যলীলা, শিল্প, অভিনয়
আদর্শ শিক্ষার চেয়ে গ্রহণীয় ছিল সে সময়।
উৎকট লালসা লোভে, ব্যভিচারে উদ্দাম উল্লাসে
সে দিনের অভিজাত মত্ত ছিল সর্পিল উচ্ছ্বাসে।
বলগা-হারা সেই ফূর্তি, নীতিহীন সেই অনাচার
দুনিয়ার বুকে শুধু ক'রেছিল দোজখ গুলজার।

"ঐশ্বর্য অপরিমাণ, বিলাসের সাজ-সরঞ্জাম
যুগিয়েছে সেই যুগে অফুরন্ত খুশীর আঞ্জাম।
অকল্পিত মিহি বস্ত্রে তন্বীদল প্রিয় নগ্ন তনু
দেখিয়েছে অপরূপ সজ্জার বিচিত্র বর্ণধনু
অনুরূপ লেবাসেই নর-রূপী বিলাসী বানর
সদরে, অন্দরে, ঘরে দিয়ে গেছে খুশীর খবর।
অকথ্য, অবর্ণনীয় বিলাসে বা সে রূপ-সজ্জায়
আদ্যোপান্ত এই জাতি মেতেছিল ফূর্তির হাওয়ায়।
ভাবেনি তখন কেউ দেখা দেবে চরম সংঘাত
আনন্দের মধ্যপথে অকস্মাৎ হবে কিশ্‌তী মাত।

"আজাদীর যে ভূমিকা—কার্যধারা গঠনমূলক
সে ভূমিকা ছেড়ে কর্মী নিয়েছিল পন্থা রসাত্মক।
হালুয়ার ভাণ্ড পেয়ে যেমন উদভ্রান্ত কানামাছি
সমগ্র পৃথিবী ভুলে সারাক্ষণ ঘোরে কাছাকাছি,
তেমনি মৌতাতে মগ্ন সে দিনের সব ভাগ্যবান
সকল কর্তব্য ভুলে খুঁজেছিল আনন্দ বিতান।
ছিল যে অবৈধ পাপ গুলিস্তাঁয় সাপের মতন
মারাত্মক বিষ তার কেউ আর বোঝেনি তখন।

"পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের বর্ধমান গতি
তখন মহল-প্রান্তে জাগায়েছে দীপ্ত 'শরাফতি'।
অসংখ্য তরুণী বাঁদী মিটায়েছে ধনীর লালসা
জারজ বেড়েছে যাতে 'অভিজাত' গোত্র হতে খসা।
কদর্য সে পঙ্কিলতা গেছে মিশে সমাজ সত্তায়,

www.pathagar.com

পাপের জীবাণু যত গেছে ঘুরে রাত্রির ছায়ায়
বলগা-হারা ; উচ্ছৃঙ্খল। ভাবে নাই কেউ পরিণাম
প্রতি বালাখানা ঘিরে জেগেছে যখন জাহান্নাম।

"উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবেশ ছিল যা আমার
ছিল না সেখানে রোজা, ছিল শুধু অঢেল ইফ্‌তার,
ছিল না মৌলিক নীতি ইসলামের—সালাত, জাকাত ;
ছিল না জেহাদী শক্তি, উখুয়াত, সুদৃঢ় জামাত ;
সামাজিক ঐক্যসূত্র শৃঙ্খলার সাথে ছিল দূরে
প্রবৃত্তির পাশবতা ছিল জেগে উচ্ছৃঙ্খল সুরে।
উপরন্তু সমাজের ঊর্ধ্বস্তরে ছিল মুনাফেকী
কৃত্রিম মুখোশে ঢাকা ছিল শুধু অকৃত্রিম মেকী।

"অপদার্থ অযোগ্যের ছড়াছড়ি খান্দানী সুবাদে
কওমের অগ্রগতি রুখেছিল অতি নির্বিবাদে,
চাপা পড়েছিল যাতে পূর্ববর্তী শ্রম ও সাধনা ;
নিরুদ্ধ গতির মুখে জমেছিল বহু আবর্জনা।
চরিত্র-বর্জিত জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট কিংবা লক্ষ্যহীন।
খোঁজেনি তখন আর কর্মময় আজাদীর দিন।
সময়ের অপচয়ে কারু প্রাণ হয়নি উদ্বেল,
ঘরে ঘরে ছিল চালু কবুতর, তিতিরের খেল।

"জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা অথবা সন্ধান
দীর্ঘ যুগযুগান্তর পায় নাই কুত্রাপি সম্মান,
মৌলিক মনন শক্তি বাদ দিয়ে বাঁধা বুলি শিখে
কাটায়েছে কাল শুধু পণ্ডিতেরা পাদটিকা লিখে,
যে কারণে দীর্ঘ দিন আবিষ্কার হয়নি নূতন
আলস্য দিয়েছে শুধু আজদাহার কঠিন বাঁধন।
তখন কায়িক শ্রম অভিজাত, শরীফ মহলে
পায়নি প্রশ্রয় কোন, ঘৃণা শুধু পেয়েছে বদলে।

"সে দিন সমাজে শুধু বহুবিধ দুর্নীতির ফাঁদ
মালুম বা বেমালুম ছড়িয়েছে আনন্দ আস্বাদ,
পারেনি যা মুছে দিতে জিন্দা পীর বাদশা আলমগীর,
যে ফাঁদের গ্রন্থি চিনে দেখিয়েছে ফিরিঙ্গি ফিকির,
নৈলে তার সাধ্য কোথা অর্ধ নগ্ন ধূর্ত সে বেনিয়া
কিভাবে সে নিয়ে গেল খাঁচা সুদ্ধ আজাদীর টিয়া?

"মোগলের যে ঐশ্বর্য আড়ম্বর দু'চোখ ধাঁধানো
দু'দিন পরেই সেটা কেন হল মানুষ কাঁদানো
প্রতিচ্ছায়া ব্যর্থতার? পাকিস্তানী হায়াত দারাজ

www.pathagar.com

পারো যদি ভেবে দেখো ব্যঙ্গোক্তির ছেড়ে কারুকাজ।
ভেবে দেখো অপমৃত্যু কি ফাটলে, কোন পথ দিয়ে
অত্যন্ত সহজে আসে সভ্যতার আলোক নিভিয়ে
অতিশয় দ্রুত গতি।

"অকারণে হয় না পতন,
রহস্য–বিলাসী ছাড়ো অযৌক্তিক কথোকপথন
জেনে নিতে পরিস্থিতি সর্বশেষ অথবা সঠিক ;
অন্ধ আবেগের চক্রে বুদ্ধিহীন সেজো না বেল্লিক।
উত্থানের মত জেনো পতনেরও রয়েছে কারণ
পাণ্ডিত্যের কথা নয়, বস্তুত এ জ্ঞান সাধারণ।

"আদর্শের পথ–যাত্রী ও জাতির উত্থান যেমন
আদর্শ হারানো পথে পতনের কাহিনী তেমন
সমান বিস্ময়কর। প্রাণহীন প্রাণীর মতই
আদর্শ হারায়ে জাতি দেখে গেছে শূন্যতা অথৈ !
অথবা নিষ্প্রাণ সেই জড়পিণ্ড মুর্দার শামিল
বিকায়ে নিজের সত্তা হয়ে গেছে তাল থেকে তিল।

"নিছক 'মুসলিম' নাম শুনে যদি হও বে–চঈন
অনেকের মত হবে অবস্থাটা তোমারো সঙ্গিন
কেননা কঠিন ঠাঁই দুনিয়ার পথে মুনাফেকী
নামের আড়াল টেনে যত্রতত্র চালু রাখে মেকী।
ইসলামবর্জিত সেই ভূমিকাটা দেখ মুসলিমের
বাড়ায়েছে সংখ্যা আর সংজ্ঞা শুধু তথাকথিতের।
যদিচ অনেক মিঞা তৃপ্তি পান মোগ্‌লাই বিলাসে
জানেন না এইটুকু মৃত্যু এল সে বিষাক্ত শ্বাসে।

"আড়ম্বর–প্রিয় জাত অন্তঃসারশূন্য সে বেভুল
হারায়ে বিবেকবুদ্ধি বোঝে নাই এ কথা বিলকুল।
জীবনের পূর্ণাদর্শ বন্ধ রেখে কিতাবে, মসজিদে
বহু আত্মপ্রবঞ্চিত ছিল তৃপ্ত সম্মোহিত নিদে।
জড়তা ও ক্লীবত্বের পরিণতি দেখেছি তখন
জাতির মগজে মনে জগদ্দল পাথর যেমন।

"এ কথা স্বীকৃত সত্য, যে শক্তিতে হ'ল অভ্যুত্থান
সেই শক্তি ছেড়ে ফের মারা গেল 'মুসলিম–সন্তান'।
যে দিন সে ভুলে গেল তৌহিদের প্রদীপ্ত প্রেরণা,
যে দিন প্রবৃত্তি পূজা দিল এনে মিথ্যা আবর্জনা,
যে দিন সে ভুলে গেল ন্যায়, নীতি, সাম্য, সুবিচার।

www.pathagar.com

শ্রমের মর্যাদা, শিক্ষা, অফুরন্ত মূল্য সততার,
সে দিন অলক্ষ্যে তার খুলে গেল মৃত্যুর দুয়ার ;
ধ্বংসের জিন্দান–খানা দেখা দিল সম্মুখে সবার।

"সে দিন চলার পথে ক্রমে তার থেমে গেল গতি,
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেউ আর বোঝেনি সে ক্ষতি,
দেখেছে নিজের স্বার্থ সকলেই, নিজের কিস্‌মত
চেয়েছে বাড়াতে শুধু কার্যকালে ছাড়েনি বিঘত
তরক্কীর মূলে শুধু হীন স্বার্থ করেছে সন্ধান ;
কার্যত সে মুনাফেক পিতা যার ছিল মুসলমান।
যে যার কর্তব্য কাজে ফাঁকি দিয়ে সম্মিলিতভাবে
এনেছিল তারা শুধু অপমৃত্যু ইবলিসি প্রভাবে।

"সে দিন অন্তিম শ্বাস দেখা দিল মোগল শক্তির
সে দিন প্রকাশ পেলো নখ দন্ত স্বার্থান্ধ চক্রীর
কাড়াকাড়ি, হানাহানি তাজ তখ্‌ত নিয়ে প্রতি দিন
করে গেলো দুশমনের কব্‌জা দৃঢ়, বাসনা রঙ্গিন।
ফিত্‌না ফসাদের রাজ্য পুরাপুরি দুর্নীতির বাসা
মেটাতে পারেনি আর সংখ্যাহীন লোভীর পিপাসা
স্বার্থশিকারীর চক্র গুপ্ত পাপ অথবা অশেষ
ষড়যন্ত্র রক্তপাত করেছিল কলঙ্কিত দেশ।

"গদী দখলের দ্বন্দ্ব আত্মঘাতী কলহ, সংঘাত
টেনে এনেছিল শুধু দুর্ভাগ্যের কাল সিয়া রাত।
তৈলহীন শামাদানে ক্ষীয়মাণ সৌভাগ্যের আলো
হারায়ে জীবনীশক্তি যে কারণে আঁধারে মিলালো,
হায়াত দারাজ খান ! শতাব্দীর আড়াল এখন
হয়তো অস্পষ্ট বলে মনে হবে সুষ্ঠু সে কারণ
কিন্তু তা অস্পষ্ট নয়।

"স্বার্থের বিষম কদর্যতা
যুগে যুগে এভাবেই টেনে শুধু এনেছে ব্যর্থতা।
খান্নাসের কূট চক্র, ভোজবাজি কিংবা তেলেসমাত
বারেবারে এভাবেই পোড়ায়েছে জাতির বরাত,
সমৃদ্ধির মর্মমূলে অনায়াসে হেনেছে ছোবল
ভ্রাতৃত্ব, আদর্শহীন শেষ হল যে পথে মোগল।

"সে দিন মাতুল বংশ কিংবা যত বিদেশী বণিক
সুযোগ–সন্ধানে যারা ছিল জেগে দৃষ্টি নির্নিমিখ,
সর্বত্র সুবিধা পেয়ে লুব্ধ আরো শিকার সন্ধানে
প্রতি ঝোপে ঝাড়ে তারা ছিল জেগে স্বার্থান্বেষী প্রাণে

www.pathagar.com

লুব্ধ শকুনির মত কিংবা ধূর্ত শৃগালের মত
পতনের শেষ ক্ষণে করেছিল চক্রান্ত সতত।

"আত্মকলহের মাঝে পেয়ে তারা সুবর্ণ সুযোগ
করেনি কসুর কোন দিতে এনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ।
ভ্রাতৃ-সমাজের বুকে ক্রমাগত ধরিয়ে ভাঙন
অথবা কলহ কালে দিয়ে কিছু 'বুদ্ধির' ফোড়ন
বহু ক্ষেত্রে জানি তারা হয়েছিল সম্পূর্ণ সফল
পেয়েছিল এই জাতি সরীসৃপ পোষণের ফল।

"সে দিন লোভীর চক্রে ছায়াবাজি রাজ্যে ও মস্‌নদে
সুযোগ-শিকারী যত ক'রেছিল লক্ষ্য প্রতি পদে।
উদ্ধত শাসকগোষ্ঠী সর্বদাই অভ্যস্ত শোষণে
আজাদীর সার্থকতা খুঁজেছিল রক্তপায়ী মনে,
সুবর্ণ সুযোগ তাই এসেছিল অসংখ্য আমলার
হয়েছিল জনগণ সম্মুখীন কদর্য হামলার।
আমীর, শরীফ যত অকর্মণ্য হেনে বাঁকা ছুরি
শোষণ-পন্থায় শুধু তুলেছিল সে দিন দস্তুরি।
অভ্যস্ত বিলাসে যারা শ্রমকুণ্ঠ, তাদের সন্তান
তৃপ্তিহীন রাত্রি দিন ক'রে গেছে শিকার সন্ধান।

"গরীবের হাড়ে তৈরী হয়েছে তখন ইমারত,
শাহী বালাখানা আর বেশুমার হেরেমের পথ।
কওমের অগ্রগতি হয়েছে তখন চক্র গতি,
অভিনব অর্থ নিয়ে জেগেছে বিকৃত শরাফতি!
ধর্মব্যবসায়ী, পাপী কিংবা ধর্মবহির্ভূত মন
জামাতের পুরোভাগে ইমামতি করেছে তখন
অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ঢের ধূর্ত সুচতুর
প্রচুর মুনাফা লুটে ধর্মকেই করেছে ফতুর!
কৌশলী শিকারী যত খেলোয়াড়ী চালে অপরূপ
সিঁদকাঠি না নিয়েও করে গেছে তবিল তসরূপ।
নিতান্ত বেহুঁশ বলে জাতি আর পায়নি সম্বিৎ!
এভাবে কোথায় থাকে চিরস্থায়ী আজাদীর ভিত?

"সর্বশেষ হুঁশিয়ারি মুহাদ্দেস অলীউল্লা শা'র
শোনেনি তখন কেউ বে-খেয়াল কিংবা বে-কারার!
উদ্দাম উল্লাসে মগ্ন, সংজ্ঞাহারা নেশার মউজে
কেউ ছিল মদমত্ত, কেউ ফের ছিল চোখ বুজে!
আদর্শ ভ্রাতৃত্ববাদ, সুমহান মর্যাদা শ্রমের
রাজতন্ত্রে যথারীতি পেয়েছিল ইশারা যমের!

www.pathagar.com

ভূয়া কৌলিন্যের প্রথা হারামের যত আবর্জনা
সমাজ সত্তাকে শুধু হেনেছিল চরম লাঞ্ছনা
যে কারণে এই জাতি হয়েছিল নির্বীর্য দুর্বল ;
দুর্ভাগ্যের সাথে তার ক'রেছিল পশরা বদল।

"সমাজ শতধাচ্ছিন্ন, দৈনন্দিন কদর্যতা নিয়ে
তখন বিব্রত ছিল সর্ববিধ দায়িত্ব এড়িয়ে,
আজাদী রক্ষার তরে প্রয়োজন হয় যে প্রহরা
তন্দ্রাহীন রাত্রি দিন ; করেনি সে পথে কেউ ত্বরা।
বরং আচ্ছন্ন কেউ স্বপ্নঘোরে কেউ বা আয়েশে
চেয়েছে কাটাতে দিন, মুগ্ধ রাত্রি অলস আবেশে।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা ধামাচাপা দিয়ে
অগ্রগতিহীন জাতি সহজেই গিয়েছে তলিয়ে।
শতাব্দীর অন্তরালে সে কাহিনী জানো বা না জানো
ব্যর্থতার ইতিকথা এভাবেই রয়েছে সাজানো।

"অযাচিতে খাজনা এসে জমা হত খাজাঞ্চীখানায়
আজাদীর বাজনা শুনে বুদ্ধিজীবী ছিল দো-টানায়
বিবি, বাঁদী, বিরিয়ানি কিংবা নিয়ে কিংখাব মসলিন
আমীর ওমরা যত বোঝে নাই অবস্থা সঙ্গিন।
কাফিয়া, রাদীফ খুঁজে স্বপ্নমুগ্ধ শিল্পী ও শায়ের
শারাবী গজলে মগ্ন পরিস্থিতি পায় নাই টের।
কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে সে দিনের বহু কৃষ্টিসেবী
প্রবৃত্তির তৃপ্তি দিয়ে করেছে প্রচুর মোসাহেবী।
বাঈজীর বাজুবন্দে বন্দী সেই যুগের তরুণ
নেয়নি দায়িত্ব কোন অতিরিক্ত ঈশকের দরুন।
নর্তকীর লাস্য-লীলা তৃপ্তি তাকে দিয়েছিল, আর
বংশ গৌরবের তৃপ্তি ছিল প্রাণে শরীফজাদার।

"কৃত্রিম সৌজন্যে ঢাকা সে দিনের সব প্রবঞ্চক
স্বার্থ সুবাদেই শুধু হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক।
উন্নত আদর্শ মুখে কিন্তু ছুরি বগলতলায়
এ ছবি সুলভ ছিল সে যুগের উঁচু মহলায়।
নেকড়ে, চিতা ছিল যত খুঁজেছিল সে দিন সুযোগ
ত্বরান্বিত হয়েছিল খান্নাসের কুমন্ত্রে দুর্ভোগ।

"সুযোগ-সন্ধানকারী ছিলাম যে, নাই তাতে ভুল,
এ কথা বোলো না শুধু কুল আমি করেছি নির্মূল।
এ জাতি পোড়ায়েছিল নিজ হাতে নিজের তকদির,
নীতি ও সততা ছেড়ে ধরেছিল রাহা দুর্নীতির,

www.pathagar.com

সাম্য ভ্রাতৃত্বের পথে যেতে কেউ চায়নি সহজে ;
ইবলিসের কারখানা ছিল চালু অসংখ্য মগজে।

"মরণের মুখোমুখি অথবা চরম দুর্বিপাকে
যে শক্তি বাঁচাতে পারে ঘূর্ণমান মুসলিম সত্তাকে
পরিপূর্ণ সে আদর্শ, ছেড়ে সেই শাশ্বত ইসলাম
সে দিন বিভ্রান্ত প্রাণ ছিল নিয়ে স্বার্থ বা আরাম।
নিশ্চিত সাফল্য ছেড়ে, আদর্শের প্রাণশক্তি ভুলে
এসেছিল পথভ্রষ্ট দুর্নীতির মৃত্যু উপকূলে।

"রুগ্ন ঈমানের সাথে জেগেছিল তিক্ত অবিশ্বাস
হীন স্বার্থে আজাদীর উঠেছিল ক্লান্ত নাভিশ্বাস
অনিবার্য পতনের শেষ চিহ্ন ফুটেছে যখন
কিভাবে সে রোগী নিয়ে পাড়ি দেবে জাফর তখন?
প্রাণহীন সভ্যতার বহিরঙ্গ করে কোন দিন
কাটাতে পেরেছে তার সর্বনাশা ধ্বংসের সঙ্গিন?

"আদতে যে যক্ষ্মারোগী, বহু মূল্য তার বহির্বাস
দিতে পারে কতটুকু প্রাণ–দীপ্ত বলিষ্ঠ আশ্বাস?
প্রাচীন স্থাপত্য, শিল্প কতটুকু লাগে তার কাজে?
হয় না কি হাস্যকর প্রতি মনে পরিত্যক্ত সাজে
সেই ব্যাধিগ্রস্ত সত্তা? পায় না কি সে মৃত্যু লিপিকা?
এ ক্ষেত্রে ধ্বংসের দূত জাগে না কি ভ্রান্ত অহমিকা?
কিসসা কাহিনীতে লেখা স্ফীত সেই ব্যাঙের মতন
হয়না কি অহঙ্কার শুধু অপমৃত্যুর কারণ?
তবুও বিভ্রান্ত সত্তা বাঁচাতে সে প্রাণহীন ঠাট
পঙ্কিল পাপের পথে করে যায় ত'বিল লোপাট।

"ধ্বংসের সম্মুখে এসে সে যুগের শাসকপ্রধান
চেয়েছিল এ পন্থায় ফিরে পেতে ঐশ্বর্য সম্মান!
দুঃস্থ রায়তের পরে চাপিয়ে রাজস্ব গুরুভার
গদীনশীনেরা যত চেয়েছিল আনন্দ অপার,
প্রজার সর্বস্ব কেড়ে চেয়েছিল বাড়াতে সম্বল ;
প্রতিদানে পেয়েছিল রায়তের অনাস্থা কেবল
ইসলামের মূল নীতি যথারীতি ছিল বহু দূরে
পায়নি সান্ত্বনা কেউ দুর্নীতির আত্মঘাতী সুরে।

–"আদর্শের প্রাণশক্তি নিয়ে জাতি হয় অগ্রসর
অথবা আদর্শ ছেড়ে পৌঁছে যায় যেখানে কবর,
মীর–জাফরের দিনে এসেছিল শেষের অধ্যায়,
সত্য বা ন্যায়ের পথে জেগেছিল অসত্য, অন্যায়,

www.pathagar.com

দুর্নীতি ও মুনাফেকী মুক্ত গতি পেল যে কারণে
জবানে ঘোষিত নীতি কার্যক্ষেত্রে এল না জীবনে
আদর্শের কথা ছিল সেই যুগে নিছক কেতাবী,
জাতির পতন তাই হলো জানি কিঞ্চিৎ সেতাবী।

"প্রখ্যাত গাল্পিক রূপে পরিচিত যারা চতুর্দিকে
মূল সত্য বাদ দিয়ে কাহিনীটা করে দেয় ফিকে
কার্যটাই খোঁজে তারা বাদ দিয়ে নিগূঢ় কারণ
অতঃপর সে মতেই সায় দেয় সর্বসাধারণ
নিরীহ সে মেষপাল চালকের ইঙ্গিতে নির্বোধ
পরিতৃপ্ত অজ্ঞতায় পায় খুঁজে চিন্তার রসদ।
অথবা সরলমতি মক্তবের পড়ুয়া যেমন
বুদ্ধিহীন, গ্রাস করে শিক্ষকের কথোপকথন
তেমনি নির্বোধ ওরা ; শক্তি নাই মৌলিক চিন্তার !
মিথ্যা প্রচারণা শুধু খুলে দেয় ভ্রান্তির দুয়ার।
অথচ সঠিক তথ্য চিরদিন থাকে ধামাচাপা,
সুযোগে চোরের মাল চুরি ক'রে মাপে আলিবাবা,
কল্পিত কাহিনী বাড়ে এ ভাবেই আলিফ লায়লার
প্রকৃত ব্যাপারে যেটা কার্যকালে পায় না সে পার।

"বাঘ বা সিংহের বাচ্চা বাঘ সিংহ হয় সর্বকালে
অসংখ্য নমুনা পাবে খোলা চোখে দু পাশে তাকালে,
আকৃতি, প্রকৃতি গুণে হয় না কখনো বিপরীত,
কিন্তু মানুষের ঘরে এ ঘটনা ঘটে কদাচিত ;
সামঞ্জস্য থাকে বটে পুরাপুরি বাহ্যিক আকারে
বৈপরীত্য ধরা পড়ে চরিত্র বা গুণের বিচারে।
মর্দে মুজাহিদ পিতা কিন্তু পুত্র খাঁটি মুনাফেক
অত্যন্ত সহজে পাবে এবম্বিধ নমুনা অনেক।

"ঝাণ্ডা খাড়া রেখেছিল দীর্ঘ কাল যারা আজাদীর
যাদের চরিত্র, নীতি এখনো বিস্ময় ধরণীর
সভ্যতার মূলে দান সবচেয়ে উন্নত যাদের,
আজাদী বিকালো জেনো অপদার্থ সন্ততি তাদের।
কেননা ওয়ারিশী সূত্রে পরিত্যক্ত তৈজসের মত
শিক্ষা বা চরিত্রগুণ করায়ত্ত হয় না অন্তত।
নিষ্ফল প্রবাদবাক্য প্রতারণা করে আগাগোড়া
পুরো না পেলেও নাকি পায় কিছু সিপাহীর ঘোড়া,
কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই কোন প্রাপ্তিযোগ
দুর্নীতির খেলা শুধু দিল এনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ।
"জেহাদী তরিকা ছেড়ে দীক্ষা নিয়ে 'সহজিয়' পথে

www.pathagar.com

প্রাপ্য যা পেল এ জাতি এক দিন নিজের কিসমতে।
নৈতিক স্বপন আর চারিত্রিক দীনতা অশেষ
ফিরিঙ্গী ডাকুর হাতে তুলে দিল স্বাধীন স্বদেশ
তারপর ডুবে গেল নৈরাশ্যের পাথারে অকূলে।
সে পাপ অথবা দোষ নয় এক জাফরের ভুলে
বহু গুণে যোগ্যতর কিংবা যদি আরো শক্তিমান
সেদিন নেতৃত্ব নিত হত না সে মুশকিল আসান।

"মীর-জাফরের যারা সহযোগী সহকর্মী আর
আজাদীর ফলভোগী নারী বা পুরুষ নির্বিকার,
রাষ্ট্রের বাসিন্দা যত জ্ঞানপ্রাপ্ত কিন্তু উদাসীন
আজাদী রক্ষার পথে ; এনেছিল একত্রে দুর্দিন।
নৈলে এক জাফরের এই শক্তি ছিল না অন্তত
সকলের স্বাধীনতা মুছে ফেলে শয়তানের মত।
হারায়ে চরিত্রশক্তি ডোবে জাতি উদভ্রান্ত যখন
বাঁচানো অসাধ্য জেনো সেই মৃগীরোগীরে তখন।

"কি থাকে চরিত্র গেলে ? চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারালে
কি থাকে এ পৃথিবীতে ? সর্ব ক্ষেত্রে তাল দিয়ে তালে
স্বকীয় স্বভাব ভুলে প্রতিক্ষণে বিবর্তিত রূপে
অপমান, অপমৃত্যু আনে না কি ডেকে চুপে চুপে
মেরুদণ্ডহীন সেই রুগ্ন জাতি অথর্ব, দুর্বল ?
সর্বহারা হয় না কি যে হারায় চরিত্রের বল ?
মীর-জাফরের দোষ হতে পারে এ ক্ষেত্রে ততটা
ব্যক্তিগত অপরাধে অপরাধী ছিল সে যতটা।

"সর্বাংশে আমাকে টেনে দোষী করা, ভুল বাস্তবিক,
ঐতিহাসিকেরা শুধু করে কাজ অনৈতিহাসিক,
হামেশা দশের বোঝা চাপা দিয়ে একের গর্দানে
দীর্ঘ শতাব্দীর শেষে কর্ণমূল ধরে ফের টানে !
অন্যের সুলভ কানে পেয়ে পূর্ণ আনন্দ নিষ্কাম
কর্ণমর্দনের খেলা পণ্ডিতেরা খেলে অবিশ্রাম !
এবং অসহ্য যেটা সে কথাই বলি আমি আজ
বহু পরচর্চাবিদ অকারণে করে উক্ত কাজ,
প্রদীপ্ত উৎসাহে ধরে বে-ঈমানী মীর-জাফরের
এ যুগের কীর্তিমান কণ্ডুয়ন মেটায় মনের।

"তাজ্জব ব্যাপার বটে !...বক্রগতি এই পৃথিবীর
চক্রান্তে জাহির হয় গুপ্ত পাপ অথবা ফিকির !
যেখানে ঘটনা শেষ কিসসা শুরু হয় সেখানেই

www.pathagar.com

আতিশয্য ছাড়া আর যে গাথায় নূতনত্ব নেই,
তবু তার জের টেনে অকারণে ছড়িয়ে জঞ্জাল
মূর্খ বা দানেশমন্দ কুৎসা গায় সকাল বিকাল।"

হায়াত দারাজের নসিহত

উপরোক্ত কথা ব'লে দম নিতে থামিল তখন
সে বাক–নিপুণ ধূর্ত (ঊর্ণনাভ নিশ্চিন্ত যেমন
সুবিস্তীর্ণ জাল ফেলে বৃক্ষশাখে নেয় সে বিশ্রাম)
তখন ফুসরত পেয়ে আমার বক্তব্য বলিলাম,

"বিশ্বাসের সাথে যার আড়াআড়ি, পায় সে যদিও
ষড়যন্ত্রে কাম্য গদী, রবে হয়ে চিরস্মরণীয়
কাল কেতাবের পিঠে কলঙ্কের রঙে বা হরফে,
যাবে না কুখ্যাতি ঝড়ে কিংবা চাপা রবে না বরফে ;
কুকীর্তি যাবে না মুছে বর্ষায় বা মাঘের শিশিরে।
কলঙ্ক কাহিনী সেই বর্ষে বর্ষে দেখা দেবে ফিরে
হুঁশিয়ারী পাঠ্য রূপে সংখ্যাহীন পড়ুয়ায় দ্বারে
বিশ্বাসহন্তার বীজ যেন নল ছড়ায় চারধারে,
বিষক্রিয়া তার যেন ঠাঁই আর না পায় অস্থিতে
আজাদীর পথে জাতি থাকে যাতে কিছুটা স্বস্তিতে।

"গদী কিংবা পদপ্রার্থী যে চেয়েছে প্রভুত্ব কেবল
অথবা খুঁজেছে লুণ্ঠন বা শোষণের ছল,
যার ষড়যন্ত্রে গতি রুদ্ধ হল জাতি ও ধর্মের
অন্যের বাহন সেই বেছে নিল পন্থা কুকর্মের।

"ঐতিহাসিকের সাথে এ ব্যাপারে পদ্যলেখকের
হয়নি বিরোধ কোন, কেননা যা বাস্তব সত্যের
অবিকল প্রতিচ্ছায়া গোঁজামিল পাবে না সেখানে ;
যদিচ বিস্বাদ সেটা ধূর্ত রাষ্ট্র বিরোধীর প্রাণে।

"মতলবী যে স্বার্থবাদে সে যুগের 'চাহার দরবেশ'
সম্মিলিতভাবে বিক্রি করেছিল স্বাধীন এ দেশ
পড়েনি তা চাপা আর পলাশীর মূক অভিনয়ে

www.pathagar.com

বাধ্য হয়ে সে ইঙ্গিত করি আমি আজ সবিনয়ে।
যেহেতু নিশ্চিত জানি, ঘটনার যে মূল নায়ক
প্রচারের চক্রে আজ হতে চায় সে মূল গায়ক।

"যদিচ চাতুর্য তার সর্বত্র অনন্যসাধারণ
বিশিষ্ট ভূমিকা তার রাখেনি এ জাতি সংগোপন
কারণ আদর্শপন্থী যে কওম কিংবা যে সমাজ
আদর্শের পথ-যাত্রী ; সর্বদাই চায় হক কাজ।

"এক্ষেত্রে ওজর কিংবা কৈফিয়ত দাও যতভাবে
কুকীর্তির কাহিনীটা যথারীতি হাওয়ায় ছড়াবে।"

মীর-জাফরের শিকায়েত

আমার বক্তব্য শুনে ভাবিল সে ধূর্ত কিছুক্ষণ
(প্রতিশোধ-স্পৃহা তার দুই চোখে ফুটেছে তখন),
যেমন শিকারী বিল্লি সূচীতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তার
দেখে নেয় কি পন্থায় আছে জেগে সম্মুখে শিকার
তেমনি সে জ্ঞান-পাপী একবার তাকিয়ে সম্মুখে
সওয়াল করিল শুরু তীক্ষ্ণ চোখে নির্বিকার মুখে।
আফিমের মাদকতা স্বপ্নশেষে বিঘ্নিত যেমন
তেমনি বিরস কণ্ঠে সেই পাপী বলিল তখন,

"হায়াত দারাজ খান ! সুকৌশলী কূৎসা রটনায়
চিন্তার দাওয়াই পাবে আশা করি লুপ্ত ঘটনায়।
মিশ্র অভিজ্ঞতা কিংবা সংক্ষিপ্ত এ কাহিনী আমার
লাগে যদি প্রয়োজনে নাই তাতে বিস্ময় অপার,
কিন্তু যা বিস্ময়কর শুরু করি সেই প্রশ্ন দিয়ে
নিজেদের শত ছিদ্র কেন আজ দেখ না খতিয়ে ?

"স্খলন, পতন, ত্রুটি, বেঈমানী মীর-জাফরের
যেভাবে সাজিয়ে রাখো সর্বদাই সম্মুখে নাকের,
যেভাবে প্রচার করো শত মুখে বিস্মৃত কুকথা,
রাষ্ট্র বা জাতির প্রতি জাফরের হীন কৃতঘ্নতা ;
নিজেদের ত্রুটি কেন সেই ভাবে করো না স্মরণ ?

www.pathagar.com

আজব দস্তুর বটে ! বিচারের আশ্চর্য ধরন !

"মীর-জাফরের চেয়ে গুণে যদি হও শ্রেষ্ঠতর
খতিয়ান ক'রে তবে যথারীতি সুবিচার করো
অন্যথায় বন্ধ করো গীবতের সাজানো মজলিস,
দিতে পারে প্রতিপক্ষ এই ক্ষেত্রে নিজস্ব নালিশ
কারণ, নিশ্চিত জেনো তোমাদের রাখে সে খবর
প্রতি জুমা রাতে যার দুনিয়ায় রুহানী সফর।
প্রত্যক্ষদর্শীর সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি আজ
তোমাদের কিছু কীর্তি ব'লে যাব হায়াত দারাজ
অতঃপর অবশিষ্ট থাকে যদি প্রচুর পুলক
তাহ'লে বিচার কোরো চুল-চেরা তুলনামূলক।

"বহু ঘাটে পানি খেয়ে তোমরা হয়েছ হুঁশিয়ার।
প্রকৃত জ্ঞানীর চিহ্ন কোনখানে দেখি না তো আর !
যখন সপ্তাহশেষে ছাড়া পায় রুহু জুমা'রাতে
তোমাদের হাল দেখে দৃষ্টি আর পারি না ফেরাতে।
বে-আমল, বে-লেহাজ, অপদার্থ কিংবা দাগাবাজ
তোমাদের মুখে শুনে আদর্শের বুলন্দ আওয়াজ
গোর-প্রত্যাগত প্রাণ বুঝে ফেলে অবস্থা সঙ্গিন !
ছড়িয়ে আমার কুৎসা খুঁজে পাবে কোন স্বর্ণ দিন ?
সর্বগ্রাসী গর্ত ঢের তোমরা কি খোঁড়োনি আপোষে ?
ঈমানের রাহা ভুলে উঁচু মাথা ঘষোনি পা-পোষে ?

"ভ্রাতৃসমাজের কথা।—সে কি শুধু নয় প্রগলভতা
নীতি, আদর্শের পথে আনোনি কি চরম ব্যর্থতা ?
আজাদী হাসিল ক'রে উল্টা কথা কেন বলো আজ ?
কোন তন্ত্রে, কার মন্ত্রে চাপা পড়ে ইসলামী সমাজ ?
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব দূরে থাক, মানবিকতার
সামান্য নিশানা, নাম মোছে না কি ধোঁকার সর্দার ?

"সমুন্নত পাক রাষ্ট্র, —নজরানা শহীদী খুনের,
কিন্তু যারা 'উপ-নেতা' অধিকারী তারা কি গুণের ?
কতটুকু নিল তারা আদর্শের উত্তরাধিকার ?
দ্বীনী রিয়াসত তারা গ'ড়ে যাবে কিভাবে এবার ?
আজাদী সংগ্রামে যারা পূর্বসূরী অথবা শহীদ
বঞ্চনায় পূর্ণ হবে কতটুকু তাদের উম্মীদ ?
অথবা নির্জীব যারা পর্যুদস্ত জনসাধারণ
আজাদীর ফল পাবে কতটুকু ? কি ভাবে ? কখন ?
অন্যের বাহন আমি কিন্তু ভেবে কও তো এবার

www.pathagar.com

দুর্বুদ্ধির কে বাহন? কার ঘাড়ে শয়তান সওয়ার?

"বুনিয়াদ দৃঢ় হয় যে পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের
জানো তো সে বড় কথা, খোঁজ কেন মেলে না কাজের?
উপরন্তু কার্যভার ছেড়ে দিয়ে নীতিবিরোধীকে
অতিশয় দ্রুত গতি কেন নামো বিলুপ্তির দিকে?
কি কারণে জেগে ওঠে বেঈমানী? নীতিহীনতার
অস্ত্র কেন খোঁড়ে গোর ঈমান, একতা, শৃঙ্খলার?
পথে ঘাটে দেখে নিত্য কৌশলের খেলা সুপ্রচুর
খাট্টা ব'লে কেন আজ মনে হয় ঝুলন্ত আঙ্গুর?

"পাকিস্তান গড়েছো তো, কিন্তু কেন ভিত্তিমূলে এর
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি সুকৌশলী চক্র ইবলিসের?
কওমের মূল দাবি করে আজ কৌশলে বাতিল
নীতি–নিরপেক্ষ ধাঁচে কারা তোলে স্বার্থের পাঁচিল?
জাফরের সাথে রাখো কতটুকু ব্যবধান আজ?
পশ্চিমের তন্ত্র মেনে চাপা দেয় কে ভ্রাতৃ–সমাজ?
অত্যন্ত কৌশলে ফের আমানত করে খেয়ানত
নির্বিকার ঔদাসীন্যে কে ডোবায় জাতির কিসমত?
সম্পূর্ণ আদর্শহীন, মানুষের সমস্যা এড়িয়ে
রসাল প্রাপ্তির পথে দু'কদম যায় কে বেড়িয়ে?
নবীর তরিকা চিনে পলাতক কেন কুয়াশায়?
আদর্শ রাষ্ট্রের সব প্রতিশ্রুতি হারালো কোথায়?

"রক্ষণশীলেরা আজো প্রাণহীন বহিরঙ্গ নিয়ে
ভুয়া শরাফতি গাথা গায় নাকি ইনিয়েবিনিয়ে?
বাঁদী গোলামের স্বপ্নে আজও তারা নয় কি মশগুল?
'প্রগতিবাদীরা' ফের হয়নি কি অন্যের পুতুল?
অন্তঃসারশূন্য, তবু অহঙ্কারী মাকালের মত
আগাছার বনে আজ দেয় না কি ভাঁওতা অবিরত?
অদ্ভুত ব্যাঙের ছাতা, ভুঁইফোঁড়, নকল–নবীশ
শোষণ সুবাদে আজ খোঁজে না কি চোরাই কিশমিশ?

"ইবলিসের পুরা ভক্ত মুখে নিয়ে কোরানের বাণী
ফটকাবাজারের পথে করে না কি আজও রাহাজানি?
ধরা পড়ে মধ্যপথে গোঁজামিল দিয়ে সমস্যায়
রাখে না কি সে কপট ঝাণ্ডা খাড়া ধর্মব্যবসায়?
কাজের নমুনা দেখে তবু তার মতলবের ঝুলি
ভরিয়ে কি দাও নাই ক'রে ব্যর্থ আকুলিবিকুলি?
"বলো আজ খোলাখুলি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ফেরাউন

www.pathagar.com

দেয় না কি ইচ্ছামত সমাজের সর্বাঙ্গে আগুন?
নবতর বর্ণাশ্রম নাওনি কি তোমরা সকলে?
ইসলামী জামাত আজ পড়েনি কি চাপা সে ধকলে
নিতান্ত নির্লজ্জভাবে বেশুমার হিসাবের মুদী
সমাজের রক্ত শুষে সাজেনি কি 'মুসলিম ইহুদী'?
কারুণের পন্থা চিনে সর্ব ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী পুঁজ
ছড়িয়ে সমাজে ওরা সহজে কি সাজে না অবুঝ?

"রাজতন্ত্র ওঠায়েছো? কিন্তু আজ কি তন্ত্রে পৃথক
অনায়াসে চেপে দাও বেশুমার ইনসানের হক?
সরিয়ে বাদশা এক বহু বাদশা বসিয়ে গদীতে
ভেবেছো ইসলামী রাষ্ট্র ভাসমান এ মরা নদীতে।
অতটা সহজ নয় খিলাফত, মূল্য তার ঢের,
ঈমানে আমলে শুধু পাওয়া যায় সে রাষ্ট্র সত্যের
ব্যক্তি বা সমাজ সত্তা ধামাচাপা পড়ে না সেখানে
বিকাশের পথ পায় পূর্ণাঙ্গ যা; আমলে ঈমানে।

"তোমরা ঈমানদার কি দরের জানে তা জাহান,
বচন-সর্বস্ব শুধু কর্মটাই করে অন্তর্ধান।
ফরজের চিহ্ন নাই, প্রতি কাজে সুন্নার খেলাপ
অপিচ যায় না শোনা কোন দিন কারু মনস্তাপ,
যদিও সর্বত্র আজ দেখা যায় বহু চামচিকা
ঈমান আমল ছাড়া দিতে চায় ইসলামী তরিকা!
আহা কি অপূর্ব চিন্তা, নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিকভাবে
এ যুগের বাক্যবিদ দুনিয়ার সমস্যা ঘুচাবে!

"আজব তামাশা তাই প্রতি ক্ষণে দেখি চেয়ে আজ
ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে অনেকেই করে উল্টা কাজ!
হালুয়া রুটিতে খাসা পরিতৃপ্ত মরদ, মর্দানা
সহজ সত্যের পথ ছেড়ে শুধু করেন বাহানা
রাষ্ট্রের আদর্শ আজ বোঝে না না যত স্নেহাস্পদ
ভাতিজা,—কেননা আছে সেখানেই সমূহ 'আপদ'।
না বোঝার ভানটাই চালু রেখে বৈজ্ঞানিক চালে,
বিজাতীয় অপকর্ম প্রতি দিন করেন আড়ালে।

"বহু কেল্লা জিতে এসে যেমন হানিফ পাহ্‌লোয়ান
দুর্বুদ্ধিবশত শুধু সোনাভান বিবিকে হারান
তেমনি 'আদর্শবাদী' এ যুগের বাক্যবীর যত
কথার মহড়া দিয়ে অর্ধচন্দ্র পান অবিরত।
নগদ বিদায়ে ফের অভ্যস্ত অনেক জাহাঁবাজ

www.pathagar.com

নতুন মহল্লা খুঁজে নবোদ্যমে তোলেন আওয়াজ।

"চোরাগোপ্তা পথ যিনি নেন বেছে হাটে ও বাজারে
সন্ধ্যায় তাঁকেই দেখি সুফীবেশে পীরের মাজারে!
শ্রমসাধ্য কাজে যিনি বারবার দিয়ে যান ফাঁকি
পীরের খলিফা সেজে গ্রামে তিনি করেন মোল্লাকি
বিবিধ কুকাণ্ড ক'রে বহু বক্তা বক্তৃতা ম'ফিলে
সর্বদা দারাজ দস্ত নেন কিছু নিজস্ব তবিলে।

"অকর্মা সুবাদে সৎ দুনিয়ার অপদার্থ যত
বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত প্রশংসা কুড়াতে অন্তত,
যদ্যপি এ দুনিয়ায় নাই কারো কানাকড়ি দাম
সর্বদা খোঁজেন তাঁরা কর্মহীন 'ভালোর' ঈনাম!
কম্প দিয়ে আসে জ্বর কর্মক্ষেত্রে, সংকট সন্ধ্যায়
সংখ্যাহীন 'ভালো লোক' পলাতক ভাবের বন্যায়।

"বীরত্বের ভূমিকায় নামে যা'রা বচনে হিম্মত
গালগল্প শোনায়েই প্রতি দিন বাড়ায় কিম্মত!
যদিচ অন্যায়ে নাই প্রতিবাদ করার সাহস
গো-মূর্খের বদৌলতে পায় তারা সম্মান সরস।
অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, পরিচিত মুখ চিরচেনা;
মনিবের মর্জিমত মরজিয়ানা নাচে বা নাচে না।

"এ দিকে শৃঙ্গার রসে মগ্ন থেকে বহু ভাগ্যবান
তুড়ি দিয়ে পেতে চায় কার্যক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান।
ইসলামের রূপায়ণ দূরবর্তী ভবিষ্যের ঘাড়ে
চাপিয়ে বিশ্বাসী কর্মী আপাতত উধাও পাহাড়ে
ব্যক্তি বা দলের কথা গেয়ে যায় নিপুণ কৌশলে,
অপূর্ব, অক্ষয় কীর্তি যে কারণে জাগে ধরাতলে।

"আকণ্ঠ বিলাসে ডুবে 'মুক্ত প্রাণ' অভ্যস্ত ভঙ্গীতে
তরক্কী বা কামিয়াবি চায় শুধু 'ইসলামী সঙ্গীতে'!
কঠিন কর্তব্য যত এড়িয়ে সহজে সবিনয়ে
চাতুর্য দেখাতে ফের অংশ কেউ নেয় অভিনয়ে
দেখাতে কৃষ্টির খেল অনাসৃষ্টি ঘটিয়ে পাপের
নবোদ্যমে টানে জের নওরোজ, মীনাবাজারের!
মীর-জাফরের যুগে ভাবেনি যা কেউ কোন দিন
এ যুগের বাচ্চা বুড়া সে পথেও হয় যে রঙ্গিন!

"আনন্দে নিয়ম নাই, অতঃপর দেখি চেয়ে ফের

www.pathagar.com

তোমাদের যাত্রাপথে ভিড় শুধু রঙ্গ ও রসের
আদর্শসম্মত বটে নগ্ন নৃত্য,—কি বলো ইয়ার?
অবরোধ গেছে, যাক; বাপান্ত কি হয়নি পর্দার?
হায়া শরমের সাথে শালীনতা লুকালো কোথায়?
হাওয়াই শাড়ির অর্থ ওড়ে নাকি যুগের হাওয়ায়?
অর্ধনগ্ন বেহায়ার আধিপত্য নয় কি এখানে?
যৌনবিকৃতির দামে খোঁজ না কি যৌবনের মানে?
আদিরসাত্মক ক্রিয়া পায় না কি প্রাধান্য জীবনে
কুটির প্রাঙ্গণ থেকে সুবিস্তৃত কৃষ্টির অঙ্গনে?

"হায়াত দারাজ খান! সুপ্রসন্ন ভাগ্য তোমাদের
অত্যন্ত সহজে তাই পেলে দেখা মরণ ফাঁদের
এ দিনের ভুঁইফোড় আগামীতে হবে অভিজাত
এবং ঘুচিয়ে দেবে পাকেচক্রে জাতির বরাত
অতঃপর নয়া কৃষ্টি দিয়ে যাবে তাদের আউলাদ
পাওনি কি পূর্বাভাস,—অনাগত সভ্যতার স্বাদ?

"উদার আনন্দলোক বসতি এখন তোমাদের,
প্রয়োজন হয় না তো তাই কোন নীতি ও বাঁধের
নির্বাধ আনন্দস্রোতে রসায়িত রাত্রির মউজে
ভেসে চলো নির্বিকার রসাতল যাত্রী চোখ বুঁজে।
উদ্দাম ফুর্তিতে বৈধাবৈধ, ন্যায় বা অন্যায়
বুদ্ধি ও বিবেক ভাসে—খড়কুটো আনন্দবন্যায়।

"সুদৃঢ় সংকল্প নয়, উচ্ছ্বাস অথবা উত্তেজনা
অকর্মে কুকর্মে শুধু তোমাদের জোগায় প্রেরণা।
যদিও ভাণ্ডার শূন্য, তবু দেখি তামাশার ঘর
চলচ্চিত্র কেন্দ্র রূপে ছেয়ে ফেলে পল্লী ও শহর!
লভ্যাংশ সহজে মেলে নগ্ন চিত্র পরিবেশনেই
নীতির ব্যাপারে তবু এই কর্মে কারু চিন্তা নেই।
আদবের মহফিলে হামেশাই ক'রে বেয়াদবী
এ যুগের কীর্তিমান চায় মুক্ত 'প্রগতির' ছবি।
উচ্ছৃঙ্খল ভাবধারা ছিল যা দূরের আস্তাবলে
উত্তরাধিকারী তার এক সাথে চলে দলে দলে।

"নিতান্ত 'প্রগতিশীল' হল তাই নির্লজ্জ মাতাল।
'প্রগতিবাদিনী' যাঁরা নন তাঁরা গৃহের কাঙাল,
মাতৃত্বে সম্পূর্ণ ফাঁকা নারীত্বেও পুরাপুরি মেকী
কাজে বা কথায় তবু কোনখানে নাই মুনাফেকী!
বিশ্বরূপে প্রকাশিত সারাক্ষণ, প্রেমে অচেতন,

www.pathagar.com

জোড়াতালি দিতে ব্যস্ত ঘুণ-ধরা ঘূর্ণিগ্রস্ত মন।
সংসার-বন্ধন-মুক্ত নির্বিচার আনন্দে আছেন,
প্রতিটি মুহূর্তে শুধু নবতর সঙ্গীরে যাচেন,
যদ্যপি সেয়ানা ঘুঘু পুরাপুরি না প'ড়ে খপ্পরে
ছড়ায় ব্যাধির বীজ প্রতি দিন শহরে, বন্দরে।

"বহু মজাদার দৃশ্য অতঃপর দেখি পথে ঘাটে
'নয়া-প্রগতির' নামে নিরুদ্ধ যা থাকে না কপাটে।
'বিজ্ঞান-সম্মত' পথে গুরুভার হয় লঘুভার,
যে কারণে সমাধান সকল জটিল সমস্যার
হয় অতি সহজেই। বিচ্ছেদ, মিলন সমতুল
নট নটী রঙ্গমঞ্চে শয়তানের হাতের পুতুল,
জোড় বাঁধে জোড় খোলে, যত্রতত্র মেলে বা হারায়
ভাবেনি যতটা কেউ মীর জাফরের জামানায়।
অন্তত তখনো ছিল চক্ষুলজ্জা, কিছুটা শরম,
নির্লজ্জ পশুর বৃত্তি হয় নাই এতটা চরম।

"নর্দমা দর্শনে তাই পরিপূর্ণ কৃষ্টির ময়দান
তর্কে ও বিতর্কে তোলে পেয়ালায় প্রচণ্ড তুফান !
নির্জলা বেহায়াপনা পথে ঘাটে দেখি হামেশাই
তবু দেয় লজ্জাহীন মননের বিশুদ্ধ দোহাই।
নির্ঘাত কুব্জের পক্ষে চিৎ হয়ে শোওয়ার শামিল
বিকলাঙ্গ সে মনন দেখে শুধু ঘূর্ণিত নিখিল।
যদ্যপি বিদ্রোহ তার মানবিক ঐতিহ্যবিরোধী
লেহন সুবাদে থাকে আঁকড়িয়ে বিজাতীয় গদী !
জীবনের সার্থকতা চায় কেউ নিঃশেষ মরণে
সমস্যার সমাধান পায় কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে।

"যেমন বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো, তেমনি এ সব
'মহাত্মা' 'মনীষী' 'গুণী' সদা আত্মপ্রচারে সরব
প্রতিষ্ঠার পথে ব্যস্ত ব্যক্তিস্বার্থে আত্মপূজা নিয়ে
মতলবের বাঁকা পথে যায় 'প্রতিদ্বন্দ্বীকে' সরিয়ে
এবং ফাঁক চক্রে পায় খুঁজে সাফল্যের পথ,
হিক্‌মত না পেয়ে তাই পায় জাতি হামেশা হুজ্জৎ।

"অনুগ্রহপ্রাপ্ত যাঁরা দূরান্তরে করেন সফর
তাঁদের অনেকে জানি ব-কলমে করেন স্বাক্ষর,
জ্ঞানে গুণে সমতুল্য, চারিত্রিক শক্তিতে অটল
দূর দেশে যথারীতি করেন জাতির মুখোজ্জ্বল
চালিয়াতি ক'রে কেউ 'কীর্তি' ফের ছড়ান হাওয়ায় !

www.pathagar.com

'পায় না হাজীর খ্যাতি গাধা যায় যদিও মক্কায়।'

"আলোকপ্রাপ্তেরা যত, কারু আর নয় অগোচর ;
অভিনেতৃ জীবনের ছোটখাট প্রতিটি খবর।
আদর্শ কর্মীর কথা শুধু আজ হয় বিস্মরণ,
বৎসরান্তে একবার যে ভুলের দেখি সংশোধন।
স্মরণবার্ষিকী আসে শানদার উৎসবের মত
পরবর্তী কার্যক্রমে আদর্শটা থাকে না অন্তত।
গঠিত চরিত্র দেখে প্রাণে আর জাগে না সংশয়,
শিক্ষার উদ্দেশ্য যেটা পেয়েছে তা পূর্ণতা নিশ্চয় !
যে কারণে সমাজের আশাস্থল অসংখ্য বর্তিকা
কখনো নির্লিপ্ত সত্তা কখনো বা খাঁটি গড্ডলিকা,
মিশে যায় কখনো বা লক্ষ্যহারা হুজুগে ;—হাওয়ায়
কৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ চর্চা চলে খাসা অন্যের খর্চায়।

"আদর্শ চরিত্র বটে !...তাই দেখি অগণ্য বেকার
ভিক্ষাবৃত্তি মেনে চায় সমাধান সব সমস্যার !
গোলামী যুগের শিক্ষা মেনে নিয়ে তাই আপাতত
কেরানীকুলের লক্ষ্যে বুদ্ধিমান চলে ক্রমাগত।
উন্নত কৃষি ও শিল্প কার্যক্ষেত্রে পরিত্যক্ত, তাই
মূর্খের আসরে জমে পরিপক্ব ভরসা হাওয়াই !
অন্তিমে সুদূর জেনে নিরুপম পরিচর্য্যাগার
মড়কের বধ্য জীব নারী নর মরে বেশুমার।

"দিগন্তবিস্তৃত মাঠ প'ড়ে থাকে অসংখ্য কাজের,
মেলে না সঠিক কর্মী মেলে ঠাট সজ্জা বা সাজের !
দলে উপদলে ছিন্ন এ যুগের মহৎ কর্মীরা
প্রকৃত কাজের চেয়ে চায় বেশী ক্ষীর কিংবা ক্ষীরা,
আদর্শের চেয়ে বেশী হয় ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আশিক ;
নগণ্য সঞ্চয় নিয়ে কেউ ফের হয় উন্নাসিক !
কাহিনীর ক্ষুদ্র ভেক দিরহামের মালিক যেমন।
বেকুবের অহমিকা সর্বস্তরে দেখি যে তেমন।

"যদিচ বড়াই শুনি বহু ক্ষেত্রে জ্ঞানবিজ্ঞানের
কার্যকালে ভূমিকাটা দেখি তবু 'চিচিং ফাঁকের'।
গোটা দুনিয়ার বুকে কেউ আর দেখে না যেমন—
এখানে বিজ্ঞানবিদ, গবেষক আদ্‌ত তেমন !
কাজেই যখন বিশ্ব ছুটে চলে বিজ্ঞানের পথে
এখানে আঁধার জমে অজ্ঞতার নিকষ পর্বতে।
অন্যত্র যখন দেখি মরু মাঠে ফলে সোনাদানা

www.pathagar.com

তখন উর্বর দেশে শুনি খাদ্য ঘাটতির বাহানা !
অধিকন্তু দেখি চেয়ে পথ খুঁজে চোরাচালানের
'সৎ ব্যক্তি' নেন ভার কাঁচা মাল সরবরাহের।

"বাজারে বা তেজারতে দেখি শুধু ধোঁকার কারবার,
মেলে না কুত্রাপি ধলো, সকলি তো 'কালোর' ব্যাপার,
'কালো বিদ্যাবিশারদ' সকলেই অবৈধ চালানে
অতিরিক্ত মুনাফায় চায় কেউ বসতি দালানে।
মৌজুদে অভ্যস্ত যারা এ ব্যাপারে পুরা সহায়ক
সুযোগ সুবিধা মত হেনে যায় সর্বত্র শায়ক,
সর্বদা বহাল রেখে একভাবে কৃত্রিম আকাল
সম্মিলিতভাবে করে সঞ্চয়ের তিলটাকে তাল ;
অথবা অতলস্পর্শী উদরের বিরাট গহ্বরে
কওমের রস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা নেয় সব ভ'রে !
মুনাফার মাঠে সেই 'একচক্ষু' অতৃপ্ত রাক্ষস
সর্বদা সযত্নে মুখে টেনে রাখে 'জাতীয়' খোলস !

• "নেতৃত্ব ব্যাপারে পাই সবচেয়ে জবর খবর,
বাহ্যত নিঃস্বার্থ কেউ, কেউ কৃপা ভিক্ষায় তৎপর,
তর্জনে বিপ্লবী কেউ—কেঁদো বাঘ তেঁতুলতলার,
সুফীর খোলসে কেউ মিহিকণ্ঠ বিল্লি চৌকিদার,
সুদূর পল্লীতে কেউ, কেউ ফের পুরানা পল্টনে
আলোর বদলে ধোঁয়া দিয়ে যায় রঙিন লণ্ঠনে।
তাল-বিশারদ কেউ স্বদেশে বা সুদূর বিদেশে
গদীর খাতিরে শুধু নীতিটাকে করে এক-পেশে।
সে গদীভিত্তিক ধারা আদর্শের জানিয়ে দোহাই
গদীটা দখল মাত্র ক'রে যায় আদর্শ কামাই।
মোটায় মুরুব্বীয়ানা চালে কেউ আজন্মের সখ
এবং সুযোগ পেলে সহজেই সাজে সে ভক্ষক ;
তবু তার চার পাশে 'সজ্জনেরা' করে ছুটোছুটি
রুই কাতলা বেঁচে যায় সসম্মানে, মরে চুনোপুটি !
বহুবিধ বঞ্চনায় মগ্ন থেকে সারাটা সময়
নেতা, উপ-নেতা করে সেয়ানা কাকের অভিনয়,
খিদমত করার চেয়ে নিজেরাই চায় যে খিদমত
সব হিস্যা কেড়ে চায় নিজেরাই চায় যে খিদমত
সাত পুরুষের পথে উপার্জন এক পুরুষের
এভাবে পোড়ায় ভাগ্য সুপ্তিমগ্ন ঘুমন্ত জাতের !
অগণ্য সমস্যা তাই পরিবেশ পেয়ে অনুকূল
বর্ধিত প্লীহার মত শেষ করে অস্তিত্বের মূল।
"সুকৌশলে ভূমিকাটা বাদ দিয়ে মূল নায়কের

www.pathagar.com

যেমন দেখায় যাত্রা—অধিকারী খেলা সাফাইয়ের
'ইসলামী সমাজে' তাই দেখি আজ বিস্ময়ে তেমন
পায় না কোথাও পাত্তা ইসলাম বা জনসাধারণ।
নাট্যমঞ্চ জুড়ে থাকে সে সব কৌশলী ধুরন্ধর
জাতিকে গড়ার চেয়ে চায় যারা জাতীয় কবর !
শিয়ালের চেয়ে দ্রুত বদলায় যারা মত, পথ ;
এভাবে তা'রাই নাকি পালটাবে জাতির কিস্‌মত।

"ভাড়াটিয়া চিন্তাবিদ, পেশাদার দুষ্ট বুদ্ধিজীবী
চিরন্তন প্রথামত কুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধির ঢিবি
এক্ষেত্রে সুযোগ পেয়ে মারে ছুঁড়ে মতলবের ঢিল,
ইবলিসের খেলা দেখে অতঃপর হাড়ি ও পাতিল !
ক্রমাগত গণ্ডগোল চলে তাই—মত বদলের,
কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির লোভে চলে খেলা পথ বদলের
দল বদলের মাঠে আনুগত্য মতলবের পায়ে
অস্বীকার করি না যা,—আমাদেরও দিয়েছে হারায়ে।

"সংখ্যাহীন গ্রাম, পল্লী বাদ দিয়ে, শহর সাজিয়ে
নিজেদের জয়ঢাক প্রেমানন্দে নিজেরা বাজিয়ে
যে সব করিৎ-কর্মা খ্যাতিমান হন সহজেই
মেটাতে তাঁদের দাবি কারু আর দ্বিধা, দ্বন্দ্ব নেই।
অথচ অখ্যাত যারা পল্লীকর্মী নিঃস্বার্থ সেবক
তোমাদের চোখে তারা 'গ্রাম্য প্রতিক্রিয়ার বাহক'।
পেন্টুলান পূজা পায় যে অঞ্চলে, সেখানে মানুষ
অদ্ভুত সম্মানী পেয়ে হ'য়ে যায় বেচাল বেহুঁশ।

"কৌশলে দখল ক'রে যাবতীয় পিষ্টক বা পিঠা।
এদিকে অনেক ধূর্ত চাষ করে স্বজাতির ভিটা !
কাজের নমুনা দেখে প্রাণে আর জাগে না সংশয়,—
কি সুবাদে, কোন সূত্রে পায় এরা প্রেরণা দুর্জয়।
সর্বত্র সুবিধা পেয়ে হুঁশিয়ার নাস্তিকের চেলা
দুর্বুদ্ধির তাড়নায় মধ্য দিনে মুণ্ডে মারে ঢেলা !
সকল সমস্যা ছেড়ে শয়তানের হাতে,—সমাধান
আদর্শের ধ্বজাধারী চায় ঢের 'সাচ্চা' মুসলমান।

"পুরাপুরি দুর্নীতির বুনিয়াদে নীতির মন্‌জিল
গ'ড়ে নিতে আনে কেউ ব্যাখ্যা আর বাক্যের মিছিল।
ফরজ তরক ক'রে চায় ফের 'ইজতেহাদ' কেউ,
সিংহের খান্দানে এসে অনর্থক ভিড় করে ফেউ !
বাক্যবাণে সারাক্ষণ করে কর্ণপটাহ জখম

www.pathagar.com

ইসলামের নাম নিয়ে করে খাসা ইসলাম খতম
ভাঁড়ায়ে 'মুস্‌লিম' নাম কিংবা তুলে 'ইস্‌লামী' আওয়াজ
কে না জানে অতঃপর স্ফীতোদর হয় ধোঁকাবাজ,
ধর্মনিরপেক্ষ তবু অপরূপ ধর্মের মুখোশে
সুযোগ সুবিধা মত মুনাফার মাঠ যায় চষে।

"আদর্শের পরিবর্তে চল্‌তি মত কিংবা উত্তেজনা
দিকভ্রান্ত জনতাকে এ জমিনে জোগায় প্রেরণা।
সমস্যা–সংকুল পথে যে কারণে খড়ের আগুন
নিভে যেয়ে মুহূর্তেই অন্ধকার বাড়ায় দ্বিগুণ।
অতঃপর যা হওয়ার হয় তাই ;—সুরের মূর্ছনা
দেয় না সাফল্য এনে ; পথপ্রান্তে মরে উত্তেজনা।

"হল্লাহুজুগের দেশ, দুর্ভিক্ষ বা মড়কের দেশ
আশ্চর্য পন্থায় খোঁজে সম্মানী বা সম্মান অশেষ।
সমস্যা এড়িয়ে যেতে রঙ্গমঞ্চে ক'রে অভিনয়
যাত্রার বীরেরা যত কার্যকালে থাকে অসংশয়।
কখনো নিষ্ক্রিয় প্রাণ শূন্য মার্গে কল্প ইমারত
গ'ড়ে নিয়ে পৃথিবীকে দেখায় আশ্চর্য খিলাফত !
ব্যর্থতায় মিশে যায় কর্মহীন কাহিনী সরব,
হয় না বোররাক জেনো অশ্বতর অথবা গর্দভ।

"নিতান্ত ফক্কড়, মূর্খ, অনভিজ্ঞ নির্বোধ হেকিম
বিপরীত নোস্‌খা এনে যে পন্থায় দেন অশ্ব–ডিম
বিপরীত কাজ ক'রে সে পথেই ঢের বুদ্ধিমান
এ যুগের ভূমিকায় ব্যর্থতার রসদ জোগান !
যখন মুমূর্ষু রোগী সংজ্ঞাহারা মরে অনাহারে,
তখন নৃত্যের দিশা মহা বিজ্ঞ দিয়ে যান তারে !
যখন মৌসুম চলে চুরি আর কালোবাজারের
তখন দাওয়াই দেন কাওয়ালি বা গাজীর গানের !
অবুঝ আদর্শবাদী বোঝেন না এই পরিস্থিতি,
বাঁচাতে নিজের মান সর্বদলে খোঁজেন সম্প্রীতি !

"মহিষের কাছে যদি পৃথিবীর দাও সমাচার
তবু সেই চতুষ্পদ বৃক্ষতলে রবে নির্বিকার !
সমস্যাসংকুল দেশে সমস্যা তো দেখি অফুরান
তবু কি আশ্চর্য কাণ্ড নির্বিকার প্রৌঢ় বা জোয়ান !
পেশাদার কর্মী রূপে করে যারা মঞ্চে আরোহণ
অতি প্রয়োজনে তারা করে শুধু চর্বিত চর্বণ।
কিন্তু সে কথার কথা, লম্ফঝম্প নিত্যনৈমিত্তিক

www.pathagar.com

মতলব হাসিল মাত্র হয়ে যায় নিতান্ত বেঠিক !
খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ সমস্যার কঠিন কবলে
পূর্বাপর একভাবে পঞ্চত্বের পথে শুধু চলে।

"তবু কি মহৎ ভাব, কর্মীদল নিশ্চেষ্ট উদার
অথবা নিষ্ক্রিয় থেকে সমাধান চায় সমস্যার,
বড় জোর বাক্য বুনে এ যুগের সরাইখানায়
প্রচণ্ড তুফান, ঝড় তোলে টেনে ক্ষুদ্র পেয়ালায়।
এবং তাদের সাথে 'চিন্তাবিদ' হায়াত দারাজ
চিন্তা করো স্বপ্নযোগে পেয়ে যাবে অভীষ্ট সমাজ !
স্বপ্নের শা'জাদী সেই স্বপ্নঘোরে হয় অদর্শন
মনে পড়ে 'নাস্কার' বা নাসীরের ভূমিকা তখন।

"নিষ্ক্রিয় থাকার ফল,—দৈন্য আর হীনমন্যতার
মারাত্মক ব্যাধি খোলে অপরূপ মৃত্যুর দুয়ার,
যে কারণে মুখাপেক্ষী হও আজ প্রতি পদক্ষেপে,
পাওনা সান্ত্বনা, শান্তি ধার-করা পোশাকে, প্রলেপে।
অথবা কাজের মাঠে নাম দেখে শূন্যের পাতায়
পূর্ণ ফসলের দিনে হাত ওঠে অজান্তে মাথায়।

"সবার পশ্চাতে চলা রীতি কিংবা প্রথা তোমাদের
কেননা সময় তাতে পাওয়া যায় লক্ষ গীবতের,
সুপ্রচুর অবকাশ পাওয়া যায় চোগলখোরীর
পাওয়া যায় বেশুমার কাজ নষ্ট করার ফিকির !
জাগতিক প্রয়োজনে বেড়ে যায় যদিও অভাব
দুশ্চরিত্র প্রাণী তবু বদলাতে পারো না স্বভাব।

"দুর্নীতির পথে যত প্রাণ নিয়ে হয় টানাটানি,
মৃত এ নদীর দেশে খাও যত নাকানিচুবানি,
অথবা মৌজুদ মাল নেয় যত চুহার সর্দার
সীমান্তের পরপারে ;—সমভাবে থাকো নির্বিকার।
ডাঙায় চালাবে নৌকা এই যদি ভেবে থাকো আজ
তাহলে আষাঢ়ে গল্প শোনো আরো হায়াত দারাজ !
অসংখ্য ভাঁওতায় সব সমস্যার হবে সমাধান,
স্বজাতিকে নিয়ে পাবে ইজ্জতের সাজানো বাগান।

"শুধু এ দিনেই নয়, ইতিহাস আগামী দিনের
স্বর্ণাক্ষরে সাক্ষ্য দেবে তোমাদের পূর্ণ সাফল্যের,
এবং এ 'সুকর্মের' ফলভোগী পরবর্তী যারা
স্মরণ মিনার তুলে রাত্রি দিন দেবে তা পাহারা !
কেননা কীর্তির চেয়ে বহুলাংশে তোমরা মহৎ,

www.pathagar.com

কার সাধ্য আছে আর তোমাদের করে বেইজ্জৎ?
সর্বদা নিষ্ক্রিয় থেকে কিংবা ঢের অপকর্মে ডুবে
যে ফাঁদ পেতেছো তার তুল্য নাই পশ্চিমে ও পুবে।

"নোঙ্গর না তুলে শুধু চালায় যে নৌকা সারা রাত
অবশ্য হয় না তার গম্য স্থলে রজনী প্রভাত।
যত নির্বিকার, ধীর হোক সেই মূর্খ গাঁজাখোর
রাত্রির প্রয়াস তাকে দেয় শুধু শূন্যতার ঘোর!
এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বিষ চাপা দিতে যে অপপ্রয়াস
গীবতের মাঠে নেমে টানে সে অন্যের ইতিহাস।

"মীর-জাফরের দোষ দিতে আজ সকলে উৎসুক
নিজেদের দোষ দেখে তারপর উঁচু কোরো মুখ,
ছিদ্রান্বেষী প্রাণে যদি অতঃপর থাকে আরো শখ
বলো তবে অকপটে কারা বেশী বিশ্বাসঘাতক!
তোমরা অথবা আমি? বেঈমানী কে করেছে বেশী?
বিস্মৃত কাহিনী টেনে কেন ফের করো রেশারেশি?

"কেন মরো উল্টা চালে?...বলো আজ স্থির ক'রে মন,
কি কারণে তোমাদের উত্থানের পূর্বাহ্নে পতন?

"আমাদের ভাগ্যে যেটা জুটেছিল উত্থানের পরে
কিভাবে এল সে এত দ্রুত গতি তোমাদের ঘরে?
তাজ্জব ব্যাপার বটে, উত্থানের পূর্বেই পতন
অদ্ভুত প্রতিভাবলে অঘটন হয় সংঘটন!
যদিচ মৃত্যুর পরে হ'ল কিছু স্মৃতির বিভ্রম
মনে হয় ইতিহাসে দৃষ্টান্তটা রীতিমত কম।

"তাই প্রশ্ন জাগে প্রাণে স্বভাবত, কও 'চিন্তাবিদ',
এই দুর্গতির মূলে আছে কার প্রাণের তাকিদ?
আমার না তোমাদের? আদর্শকে লণ্ডভণ্ড করে
কে বা কারা এ জাতিকে নিতে চায় প্রত্যক্ষ কবরে?
কে খুঁড়ছে এই গর্ত? প্রতিবাদ না ক'রে কার্যত
সাহায্য ক'রেছে কারা এ ব্যাপারে কও প্রথমত।
মওতের আলামত দেখি আজ কেন সর্ব ঠাঁই?
বাচনিক আদর্শের মর্মে কেন প্রাণবস্তু নাই?

"বলো আজ খোলাখুলি এ প্রশ্নের জানাও উত্তর
কার দুর্নীতির ফলে দেখা দেয় সম্মুখে কবর?
আমরা না তোমাদের? স্বদল বা স্বজন তোষণে
কে বা কারা এ জাতিকে সর্বস্বান্ত করে প্রাণপণে?

www.pathagar.com

চোরাচালানের পথে কে পাঠায় রক্ত স্বদেশের?
সমাপ্তির কোন চিহ্ন নাই কেন কালোবাজারের?
স্বাবলম্বী চিত্তে কেন আজ ফের জেগেছে আন্দেশা?
চুরি, জুয়াচুরি, ভিক্ষা কেন হ'ল উচ্চাঙ্গের পেশা?
সত্য ভাষণের শক্তি কেন নাই অহিফেনসেবী?
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় করো নাকি আজ মোসাহেবি?

"নিতান্ত হারামখোর হারামেই যার জারিজুরি,
হারামে যে পরিপুষ্ট সে কেন দেখায় বাহাদুরি?
প্রকাশ্যে বা চুপিসারে যে বেড়েছে হারামের মালে;
যে ফোলে জাতিকে চুষে, কেন তার নির্লজ্জ কপালে
দাও ইজ্জতের ঢেরা? চোর কিংবা পাকা জুয়াচোর,
মতলবী মৌজুদ-দার অথবা যে ধূর্ত ঘুষখোর
শুধু হারামের মালে পায় না কি সর্বত্র সম্মান?
'অভিজাত' ব'লে মান পায় না কি তাদের সন্তান?
তাদের দুয়ার থেকে পরিত্যক্ত 'প্রসাদ' কুড়ায়ে
আসে না কি প্রতি দিন পরিতৃপ্ত লাঙুল ঘুরায়ে
আদর্শের ধ্বজাধারী?

"জ্ঞানপাপী, শেয়ানা মিথ্যুক,
ওয়াদাখেলাফ-কারী হয় না কি ভাবের ভাবুক?
ক্ষেত্রভেদে বহুরূপী প্রয়োজনে বদলিয়ে রঙ
চায় না কি সুকৌশলে শুনে যেতে স্তুতির সারং?
দুষ্কৃতিকারীর স্বার্থ বাঁচায়ে কুচক্রে অবিশ্রাম
চায় না কি তারা আজ মনে গড়া, 'কল্পিত ইসলাম'?
একান্ত অপরিহার্য বৈধ যেটা—ভণ্ডের প্রভাবে
দুর্নীতির দশচক্রে পড়েনি কি ছাঁটাই প্রস্তাবে
সঙ্গীহারা; অসহায়?

"তোমরা তো নিমকহালাল
প্রতিদিন তবে কেন বেড়ে ওঠে অবৈধ জঞ্জাল?
পতনের ইতিহাস যদি জানো প্রাচীন জাতির
নষ্টের গুরুকে তবে কেন করো প্রকাশ্যে খাতির?
আদর্শবাদীর ভাঁওতা কেন দাও? কি আছে যোগ্যতা?
ঈমানে, আমলে আজ দেখাওনি চরম ব্যর্থতা?
মর্দে মুমিনের কাজ কি করেছো মর্দে মুজাহিদ?
কি আশায় শালবৃক্ষ হতে চাও ছত্রাক—উদ্ভিদ?
কেন এ মানের কান্না?

"কি কারণে পাও না ইজ্জৎ?

www.pathagar.com

মীর-জাফরের দোষে কাটা গেল সবার কিস্‌মৎ?
তাই দেখ প্রতি ক্ষণে ব্যর্থতার সরণি পিচ্ছল?
সাফল্যের পথে তাই গড়খাই রয়েছে অতল?
উঁচু শিরদাঁড়া তাই মাটি ছোঁয় আজ অকারণে?
বিকায়ে সর্বস্ব তাই মরো মূর্খ পরানুকরণে
মীর-জাফরের দোষ সর্বাংশে কি? সওয়াল আমার
পারো তো জবাব দাও আজাদীর নিশানবর্দার।

"জাতীয় ঐতিহ্য কেন অবলুপ্ত? কেন বেশী মান
পায় আজও পথে ঘাটে ধার-করা বুলির সন্তান?
বিলাসী বানর যত একমাত্র লেবাসের জোরে
যত্রতত্র চলে ফিরে কেন ঠাঁই পায় সমাদরে?
কেন দিন অযোগ্যের? যোগ্যেরা নিখোঁজ কি কারণে?
প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী কেন পায় পঞ্চত্ব ক্রন্দনে?
ফিরিঙ্গি, ব্রাহ্মণ কেন জুড়ে থাকে কৃষ্টির ময়দান?
তোমার নিজস্ব মাঠ কেন আজ নেয় না তরুণ?
বৈষ্ণব সঙ্গীতে মত্ত মরে কোন ঈশ্‌কের দরুন?
হও না উপুড় হস্ত, কি কারণে হাত পাতা সার?
উত্তরাধিকার কেন ছাড়ো নাই গোলামী শিক্ষার?
পাশ্চাত্যের ন্যাকড়া কেন গলবন্ধ হ'ল তোমাদের?
সাহিত্যে, জীবনে কেন চাও ছবি বিদ্যাসুন্দরের?
কেন গৃহ শান্তিহীন? কদর্যতা কেন এ রাত্রির?
মুক্ত পথে কেন ভিড় দুষ্ট নর 'দ্রষ্টব্য নারীর'?
কেন এ বেহায়া কাণ্ড অনাচার কেন দেশ জুড়ে?
সামাজিক নৈতিকতা নেমে যায় কেন আস্তাকুঁড়ে?
উল্টা বুদ্ধি দার্শনিক কেন ছোড়ে শূন্যতায় ঢিল?
কেন পায় সেরা কল্কে পুঁজিবাদী কঞ্জুষ বখিল?
উচ্চাসন পায় কেন নীতিহীন রাজনীতিবিদ?
ভ্রষ্টের বন্দনা গানে কেন পাও অন্তরে তাকিদ?
সমাজের সর্বস্তরে কেন দেখি এ হীনমন্যতা?
চৌর্যে কেন প্রবণতা? কেন বাড়ে অকাজে দক্ষতা?
কেন নাই মূল্যবোধ? ন্যায় নীতি হারালো কোথায়?
জাতীয় সম্পদ কেন অবলুপ্ত রাত্রির ছায়ায়?
দু'দিনের ভাগ্যবান! চতুর্দিকে কেন দেখ আজ
ভূখ মিছিলের সারি? কেন বাড়ে ভিখারী সমাজ?
কেন এই মুক্ত দেশ অজ্ঞতা ও আকালের দেশ?
অভিজ্ঞের পরিবর্তে কেন হ'ল মাকালের দেশ?
মেহনতের মাঠে কেন তোমাদের জুলফি দেখা দায়?
জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা কেন আজ উঠেছে শিকায়?
সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থেকে কেন ফের বাড়াও হুজ্জৎ?

www.pathagar.com

দুনিয়ার তেজারতে কেন বৃথা দাও খেশারত?
মুসলিম জামাতে কেন নাই আজ ঐক্য-ইত্তেহাদ?
রক্তিম উষায় কেন নেমে আসে ব্যর্থতা বিস্বাদ?
মিল্লাত শতধাছিন্ন কেন ফের বিভেদের পথে?
কেন থামে অগ্রগতি জড়তায় বাধার পর্বতে?
কেন করো কমজোর প্রতিদিন কওমী সত্তাকে?
সবি কি আমার দোষ?

"ভেবে দেখো দুষ্কর্মের ফাঁকে,
চরম মৃত্যুর আগে যদি খুঁজে পাও অবসর
আমাকে রেহাই দিয়ে নিও শুধু নিজের খবর।
ভেবে দেখো স্থির চিত্তে খুলে মুক্ত বুদ্ধির দুয়ার
শুধু কি জাফর একা স্বার্থান্ধ, দ্বিপদ-জানোয়ার?
ভেবে দেখো একবার খুলে রুদ্ধ দৃষ্টির ঝরোকা
উভ্রান্ত জাতিকে নিয়ে কে বা কা'রা দিল বেশী ধোঁকা?
ভেবে দেখো বুদ্ধিমান বিবেকের সতর্ক প্রহরী
কোন পাপে কার দোষে ডুবুডুবু সৌভাগ্যের তরী।

"এ জোড়াতালির নৌকা লক্ষ্যস্থলে যাওয়ার আগেই
ঘূর্ণাবর্তে প'ড়ে ফের কি কারণে হারায়েছে খেই
সে কথাও ভেবে দেখো; ভেবে দেখো তোমার আমার
মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু...। গিরি না কান্তার?

"তোমার যুগের সাথে অস্তমিত আমার যুগের
মিল আছে বহু ক্ষেত্রে। বাদ দিলে পন্থা হুজুগের
অন্তত নৈতিক দিকে কোনখানে পাবে না অন্যথা;
প্রসঙ্গত আমি আজ বলি সেই লজ্জাকর কথা।

"আদর্শবর্জিত জাতি দুশ্চরিত্র সে যুগে যেমন
চারিত্রিক দীনতার ছবি দেখি এ যুগে তেমন!
সেদিন স্বার্থের চক্র দেখেছি যেমন সবখানে
তেমনি চক্রান্ত দেখি এ যুগেও মোহমুগ্ধ প্রাণে!
সমাজের সর্বস্তরে সেদিনের মত দেখি আজ
কাজের বদলে শুধু অপকর্ম অথবা কুকাজ!
জাফরের জামানায় ছিল যত কথার ফানুস
এ যুগেও সবিস্ময়ে দেখি আজ তত অমানুষ!

"অত্যাচারী ঘোষকের মুখ চেয়ে সে যুগ যেমন
হয়েছে দ্বীনের ব্যাখ্যা,—এ যুগেও দেখি যে তেমন।
বাঁচাতে বিশেষ স্বার্থ কওমের হক মেরে তাই

www.pathagar.com

এ যুগের 'আলেমের' অপব্যাখ্যা কম দেখি নাই।
মেটায়ে খেয়ালিপনা জালিমের দেখাতে কৌশল
মৌজুদ র'য়েছে ঢের এ যুগের ফৈজী বা ফজল।
সব কুকর্মের গ্লানি চাপা দিয়ে আমার গর্দানে
পাবে না রেহাই তুমি আজাদীর বেবাহা ময়দানে।

"উচ্ছৃঙ্খল নারী, নর, মোসাহেব, দালাল, শোষক
নির্লজ্জ, মিথ্যুক, ধূর্ত,—দুর্নীতির যে পৃষ্ঠপোষক
সে দিনের মত দেখি এ দিনেও র'য়েছে মৌজুদ।
ইব্‌লিসের চেলা নেয় চক্রবৃদ্ধি হাতে তার সুদ
বিগত রাত্রির কোন প্রতিশোধ সুযোগে ওঠাতে!
এ দিনের শিল্পী, কবি যে কাহিনী চায় না ফোটাতে
তুলি বা কলমে, কিংবা ধামাচাপা চায় দিতে যাকে
কলঙ্কিত ক'রেছে সে এক ভাবে তোমাকে আমাকে।
কাজেই সমান প্রাপ্য পাও যদি সম কর্মফলে
বিস্ময়ের অবকাশ রবে না কিছুই ধরাতলে।

"ঈমান আনার চেয়ে রাখা তারে যেমন কঠিন
তেমনি কঠিন জেনো রক্ষা করা আজাদীর দিন,
সামান্য শৈথিল্য, ত্রুটি দেয় তাকে সহসা নিভিয়ে;
জেনেছি এ কথা আমি স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে।
কিংবা আজাদীর মাঠে যদি আর না থাকে যোগ্যতা
নেমে আসে একদিন অতর্কিতে চরম ব্যর্থতা!
দেখা দিলে বেঈমানী আদর্শের ক্ষেত্রে যথাযথ
গোলামী তক্‌দির শুধু নেমে আসে লানতের মত;
অতঃপর ব্যর্থ হয় বহুবিধ সংগ্রাম-সাধনা
কলিজার রক্তে শুধু সে পাপের জেনেছি মার্জনা।

"বুঝেছিল এই কথা বেরিলির মুক্ত মুজাদ্দিদ,
আজাদী জেহাদে সেই সিংহ-প্রাণ হয়েছে শহীদ।
তার লক্ষ অনুগামী, মুজাহিদ নির্ভীক, দিলীর
কলিজার তাজা খুন দিয়ে গেছে পথে আজাদীর।
সুবহে উম্মীদের মত পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য প্রাণের
শহীদী জামাতে দেখে ম্লান মুখ মীর-জাফরের
তাদের সম্ভ্রম দেখে পলাতক হই আমি ভয়ে,
তাদের সাফল্য দেখি দূর হতে সলজ্জ বিস্ময়ে।

"কিন্তু তোমাদের কাছে কোন শঙ্কা কোন লজ্জা নাই,
নিতান্ত কৃপায় শুধু আমি আজ এ কথা জানাই,
কেননা যেভাবে আজ ইতস্তত ছুটেছো সকলে

www.pathagar.com

পৌঁছে যাবে তাতে জানি শুধু অপমৃত্যুর কবলে।
যাদু তেলেসমাত ঘেরা বাদগর্দ হাম্মাম যেমন
মিথ্যা মায়া মরীচিকা তোমাদের ঘিরেছে তেমন,
কওমের অগ্রগতি চাও আজ তোমরা সেভাবে
অনেক সমৃদ্ধ জাতি লুপ্ত হল নিঃশেষে যেভাবে।

"জ্ঞানী যারা দেখে শেখে, আহম্মক ঠেকেও শেখে না,
প্রত্যহ বাড়িয়ে তোলে শুধু তার মূর্খতার দেনা !
সে মূর্খ প্রাণীর খেলা যেন এক বেবাহা ময়দানে
ইবলিসের ইশারায় ছুটে চলে কাল মৃত্যু পানে,
সম্মুখে পরিখা তবু মানে না সে তার ভ্রান্ত গতি,
পতনের পূর্বক্ষণে জানে না সে ভয়ঙ্কর ক্ষতি,
বোঝে না সে কোন মতে ব্যর্থতার কঠিন জিঞ্জির
নেমে এলে একবার মওকা নেয় দীর্ঘ শতাব্দীর।

"হুঁশিয়ার হও যদি এসো ছেড়ে মূর্খের তরিকা,
বাড়ায়ো না টেনে আর বেকুবের সুদীর্ঘ তালিকা।
যে কারণে বন্দীদশা,—নেমেছিল এ দেশে মরণ
গোলামীর সেই সূত্র—পাপগ্রন্থি করো উন্মোচন ;
অন্যথায় তকদির হবে মীর-জাফরের মত।
আপাত নিশানি যার সর্ব ক্ষেত্রে দেখি অব্যাহত
বেঈমানী, মুনাফেকি কিংবা লক্ষ দুর্নীতির মূলে !
হারায়ে বিবেকবুদ্ধি আর যেন ভেসো না অকূলে !
উন্নত চরিত্রগুণে সমকক্ষ মীর-জাফরের
দেখো নিরুপম দৃশ্য নিজেদের পূর্ণ কৃতিত্বের।

"সম্পূর্ণ আদর্শহীন পেশাদার রাজনীতিকের
সঙ্গে দেখ পুঁজিপতি খুলেছে কি নর্দমা পাপের !
আলেমের ভূমিকায় দেখ চেয়ে কারা চুপে চুপে
ধর্মকে চালাতে চায় শোষকের হাতিয়ার রূপে।
অসাধু অসৎ যত ব্যবসায়ী কিংবা কর্মচারী
দেখ জুয়াচুরি ঘুষে খোলে কোন মৃত্যুর কাচারি !
বিশুদ্ধ শিল্পের নামে পুরাপুরি যৌন বিজ্ঞাপন
ইল্লতের কাণ্ডে দেখ কোন বার্তা হয় উদ্ঘাটন !
ভুঁইফোঁড় খবিসেরা সর্বস্তরে করে আনাগোনা
সমাজ সত্তাকে দেখ কি পন্থায় করে তুলো-ধোনা !
অগ্রগতি দূরে থাক অস্তিত্বটা নিয়ে টানাটানি
দেখো অপরূপ দৃশ্য—'প্রগতির' নামে রাহাজানি !

"পালাবে কোথায় আজ ? পালানোর পাবে না সড়ক,

www.pathagar.com

দেখ চেয়ে চারদিকে সংখ্যাহীন সমস্যা, মড়ক।
পড়েছো নিজেরা ধরা যথারীতি স্বখাত সলিলে
পাবে না মুক্তির পথ কোন মতে, কারু দোষ দিলে।
মীর-জাফরের ঘাড়ে যাবতীয় বিচ্যুতি চাপিয়ে
পাবে না সুরাহা কোনো,—আদর্শের আলোক নিভিয়ে!
পাশ কাটানোর চিন্তা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরর্থক,
পলায়নী মনোবৃত্তি ক্রমাগত বাড়াবে পাতক।

"যে আদর্শ মুখে আছে কেবলি যা রয়েছে কথায়
জিন্দেগীতে তারে আজ রূপ দাও না রেখে হাওয়ায়,
বাস্তবে না নিলে তাকে পাবে না তো লভ্যাংশটা তিল,
ফায়দা কিছু কোনমতে বাক্যালাপে হবে না হাসিল,
যতই করো না চেষ্টা প্রচারটা চালায়ে দৈনিক
কাঠের বিড়াল আর হবে না তো মার্জার সঠিক।
আমার বক্তব্য যেটা কাজেই তা বলি সবিনয়ে
কাজ করো কথঞ্চিৎ প্রাণটা না দিয়ে অভিনয়ে।

"জেহাদী শিক্ষার স্মৃতি যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে
করো তাকে মূলধন এ দিনের ঘূর্ণিত বিপাকে,
অতঃপর নেমে এসো সামগ্রিক কঠিন প্রয়াসে;
পাবে না সাফল্য খুঁজে কোনদিন নৈরাশ্যবিলাসে।
ঈমান, আমল ছাড়া কার্যক্ষেত্রে মুক্তিপথ নাই,
নীতি ও সততা বেচে কোনক্রমে পাবে না রেহাই।
বরং সে মূলধন বিক্রি করে নিজেই বিক্রেতা
হ'য়ে যাবে সর্বস্বান্ত ধূর্ত কিংবা মূর্খদের নেতা।

"যেমন তা হয়েছিল একবার, মীর-জাফরের
জামানায় নেমেছিল যে কারণে রাত্রি দুর্যোগের
বংশপরম্পরা নীতি বিক্রয়ের বিষ-তিক্ত ফল,
বিরাট গহ্বর যাতে দেখা দিল সমুদ্র অতল
এবং ধূর্ত বা মূর্খ পেল যাতে সলিল সমাধি।
জোটেনি তখন ভাগ্যে পরিপক্ব কদলীর কাঁদি।
জুটেছিল একদা যা রহস্য বা আনন্দমেলায়
আবু হোসেনের সেই তখ্‌ত গেল বখ্‌তের খেলায়।

"তারপর আহাজারি অতি দীর্ঘ যুগ যুগান্তরে
পারেনি ঘোচাতে সেই বন্দীদশা—শৃঙ্খল পাপের
বহুবিধ প্রচেষ্টায় শ্বেত দৈত্য নড়েনি বিঘত।
সিন্দবাদ জাহাজীর ঘাড়ে যেন দুর্বহ লানত
জাতির গর্দানে চড়ে সেই পাপ যথা ইচ্ছা তার

www.pathagar.com

নাকে দড়ি দিয়ে নিত্য ঘোরায়েছে পথে বেশুমার,
নিয়েছে ইজ্জৎ কেড়ে ;—কওমের রস, রক্ত, প্রাণ
করে গেছে দীর্ঘ কাল দরিয়ার ওপারে চালান।

"অতঃপর যে পন্থায় গেলো সেটা—জানো সকলেই
শহীদের রক্ত ছাড়া এ রাষ্ট্রের অন্য ভিত্তি নেই।
উত্তরাধিকারী তবু নাই কেউ শহীদী গুণের
মুখে তাই সমারোহ সুপ্রচুর কালি ও চুনের।
আদর্শের নাম নিয়ে ক্রমাগত জানিয়ে দোহাই
বিকৃত স্বভাবটাকে সত্য পথে নিতে পারো নাই।

"দুর্নীতিটা 'নীতি' আর নীতি হয় যেখানে দুর্নীতি
ভণ্ডামির পরিণতি—সেখানেই ওঠে শোকগীতি।
ইসলামের নাম নিয়ে করে গেছো যে হাত সাফাই
তারি পরিণামে দেখো আজ কোন স্থিতি, শান্তি নাই ;
মৌলিক নীতির মাঠে করে নিত্য আত্মপ্রবঞ্চনা
পেয়েছো যা জিন্দেগিতে সে তো আর দেয় না সান্ত্বনা।

"চারিত্রিক গুণপনা পানি আর পায় না তো হালে !
কতটুকু থাকে বাকি চিনি তার মিষ্টতা হারালে ?
অনাদৃত সব খানে, পরিত্যক্ত সকল বাজারে
গুণগ্রাহী চাও তবু প্রতি দিন হাজারে হাজারে,
অন্তঃসারশূন্য তবু দিতে চাও নূতন ইঙ্গিত ;
বাহিরের আড়ম্বরে জাগে শুধু ছুঁচোর সংগীত।

"হুনর হিকমত কার কতটুকু নাই তা অজানা,
নির্ধারিত দিনে আমি আসি ছেড়ে গোরের বিছানা
জেনে নিতে পরিস্থিতি অতীতের অভ্যাসবশত
রাত্রি পোহানোর আগে নিয়ে যাই খোঁজটা অন্তত ;
সে সুবাদে রাখি আমি তোমাদের অসংখ্য খবর ;
সে সুবাদে জানি আমি তোমাদের সম্মুখে কবর।

"যদিও বিস্বাদ কিছু প্রয়োজনে বলি সে কথাটা,
অগ্রগতি নাম নিয়ে পশ্চিমা তন্ত্রের পিছে হাঁটা
এ দিনের সেরা প্রহসন ! যে নিজে পায় না পার
বিকলাঙ্গ সেই মত তোমাদের গর্দানে সওয়ার
মঞ্জিলের পরিবর্তে মৃত্যু পথ দেখায় কৌশলে।
মিল্লাতের গ্রন্থি ছিঁড়ে উল্লসিত তাই দলে দলে
বিকায়ে ঈমান ঐক্য ঘোরো বৃথা শুরুয়া সন্ধানে !
এ ক্ষেত্রে সান্ত্বনা কোথা মীর-জাফরের পালাগানে !
"উপরন্তু বলি আমি—যে ব্যাপারে অভিযুক্ত নিজে

www.pathagar.com

তোমাদের দল মাঝে অনুরূপ বিল্লি দেখি ভিজে,
আজাদী লোপাট ক'রে হ'তে চায় যারা সুরঞ্জিন,
আজাদী বিকাতে যারা কোন দিন হয় না গমগীন,
অপব্যাখ্যা দেয় তারা ধরা যদি পড়ে কোন তালে ;
প্রচুর নমুনা পাবে এ প্রকার দু'পাশে তাকালে।
মেষচর্মাবৃত প্রাণী কিংবা অন্য রাষ্ট্রের দালাল
নিমকহারামী ক'রে সাজে খাসা নিমকহালাল !

"আস্তাকুঁড়-মুখী দ্বার খুলে যায় হাওয়ায় যখন
পোকামাকড়ের ভিড়ে ওষ্ঠাগত হয় প্রাণমন।
গুবরেগন্ধী পোকা যত ভিড় করে আসে চারদিকে
দুষ্ট বুদ্ধি পোকা এসে হামলা করে চুলে বা দাড়িতে।
শান্তি বা স্বস্তির কথা থাকে না মহলে ততক্ষণ
অবাঞ্ছিত কীটাণুরা যাবৎ না হয় বিতাড়ন।
কিন্তু কি আশ্চর্য কাণ্ড, জেগে যারা ঘুমায় অঘোরে
তারাই সে পোকা পোষে জামার আস্তিনে, বাহুডোরে।

"সংক্ষিপ্ত এ রাত্রি আর অতি দীর্ঘ কাহিনী আমার
ফুরাবে না কিছুতেই যত থাক আগ্রহ শোনার,
বরং তা বেড়ে যাবে মাকড়ের জালের মতন ;
সময়ের স্বল্পতায় হবে না রহস্য উদঘাটন।
পার্থিব লোভের উর্ধ্বে বহু দূরে আছি আমি, তাই
ক্ষুদ্র স্বার্থ, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির ফ্যাঁকড়া কিছু নাই,
বিদায়ের পূর্বক্ষণে হুঁশিয়ার ক'রে যাই আজ
বুদ্ধি যদি থাকে ঘটে বুঝে নিও হায়াত দারাজ।

"আজাদীর গূঢ় তত্ত্ব কে জানাতে পারে মুখ্‌তাসার
রহস্যজনক পথে গতিবিধি যার চমৎকার !
আজাদীর প্রাণশক্তি...কর্মধারা গঠনমূলক,
আজাদীর অর্থ নয় নিষ্ক্রিয়তা, অবৈধ পুলক।
আজাদীর অর্থ নয় অবাস্তব পন্থা সহজিয়া,
বিনাশ্রমে ফল প্রাপ্তি কিংবা পাওয়া লাড্ডু বা টিকিয়া,
অথবা কাঁঠাল ভাঙা স্বজাতীয় প্রাণীর মস্তকে।
অন্যের বোঁচ্‌কায় লুব্ধ ছেড়ে দেওয়া লোলুপ হস্তকে।

"আজাদীর সোজা অর্থ বুঝেছিল উল্টাভাবে যারা,
আজাদীর অর্থে যারা বুঝেছিল কর্মহীন ধারা,
স্বার্থ সুবাদেই যারা আজাদীকে চিনেছিল, আর
জেনেছিল স্বাধীনতা তামাশা ও ফুর্তির ব্যাপার,
রাত্রি দিন নৃত্য গীত, সুপ্রচুর শারাব, কাবাব

www.pathagar.com

আলস্য অপরিমাণ, বাইজী ও গজল, রুবাব,
বিজাতীয় ঐতিহ্যের আনুগত্য, নৈতিক স্খলন,
গুপ্ত পাপ, ষড়যন্ত্র, শোষণ অথবা নির্যাতন
যথাযোগ্য প্রতিফল পেয়ে গেছে তারা যথাকালে,
খ্যাতি সাফল্যের মেওয়া অতঃপর জোটেনি কপালে।

"কৃতিত্ব যাদের ছিল সময়ের অপচয়ে শুধু
তাদের সম্মুখে কাল জ্বালায়েছে সাহারার ধু ধু
অন্তহীন মরু মাঠ।...কবুতর, তিতির বাজিতে
কামিয়াবি আসে নাই দ্রুতগামী অশ্বে বা তাজীতে,
বরং সুযোগ পেয়ে সৌভাগ্যের সেই হুমা পাখি
আলস্যের অবকাশে যথারীতি দিয়ে গেছে ফাঁকি,
তিক্ত সেই কর্মফলে নারী, নর, বৃদ্ধ বা বালক
চলেছে পশ্চাতে শুধু দীর্ঘ দিন, হয়নি চালক,
মিটেছে নিশানা নাম, মিটে গেছে ফুর্তির হেরেম
মানুষের ইতিহাসে মূল্য যার হয়নি দেরেম।

"তোমাদের পালা ফিরে এত দিন এসেছে এবার,
আশা করি পাবে ফল স্বার্থ কিংবা উদর সেবার।
হীন প্রবৃত্তির পথে দুষ্কর্মে বা নিষ্ক্রিয় জীবনে
অর্জন ক'রেছো যেটা বিবর্তিত হবে তা মরণে।
কর্মকুণ্ঠ জিন্দেগানি, স্বার্থান্বেষী মতলবী মেজাজ
চায়নি কখনো কেউ পৃথিবীতে ; চায় না তা' আজ।

"প্রত্যেকে নিজের স্বার্থে ব্যতিব্যস্ত থেকে পূর্বাপর
রাষ্ট্র বা জাতির স্বার্থে থাকো যদি পুরা বেখবর,
সম্মিলিতভাবে ফল পেয়ে যাবে প্রাপ্য যা সবার ;
সুকৌশলী ঘুঘু হবে সহজেই ফাঁদের শিকার।
কিংবা পতনের মুখে থেকে খাসা নিশ্চেষ্ট নির্বাক !
শুনে যাবে যথাস্থানে কোহে-নেদা পাহাড়ের ডাক।

"এ কথাটা মনে রেখো—তোমাদেরও আগে বহুবার
বহু সুকৌশলী ধূর্ত করে গেছে ধোঁকার কারবার,
যদিচ পিপড়ের গর্তে পৌঁছে গেছে সে লাভের গুড়
পড়েছে জাতির মুণ্ডে কিংবা পৃষ্ঠে প্রচণ্ড লগুড়।
দুর্নীতি, জুলুম, পাপ, বিলাস অথবা ব্যভিচার।
দু'দিন আগে বা পরে গেছে খুলে ধ্বংসের দুয়ার।

"যারা কিছু বুদ্ধিমান, শিক্ষা নিয়ে ইতিহাস থেকে
দিয়েছে সামাল নৌকা দুর্যোগের কালো মেঘ দেখে,
কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন অজ্ঞতার ঘূর্ণিস্রোত ধ'রে
বেহুঁশ বা বে-খেয়াল পৌঁছে গেছে জীবন্ত কবরে।

www.pathagar.com

দুর্বুদ্ধির ঝরোকায় একবার নাসিকা গলিয়ে
বহু ধড়িবাজ ধূর্ত গেছে জানি ব–মাল তলিয়ে !

"পাত্রভরা দুধ যদি নষ্ট হয় বিন্দু হারামেই
হারামে ভরালে পাত্র জেনো কিছু অবশিষ্ট নেই।
এ কারণে জ্ঞানী যারা ক'রে মৃত্যুপন্থাকে বর্জন
দুধ মদ চিনে খায় সত্যাসত্য করে নির্বাচন।
নাজাতের রাহা যদি চাও, তবে পন্থী নাও সার
অন্যথা ধ্বংসের স্রোতে সমূলেই হবে একাকার।

"হুঁশিয়ার হও যদি, নাও বুঝে ইশারা বিজ্ঞের
অন্তত মৃত্যুর তীরে খুঁজে নাও পন্থা জীবনের।
আলাউদ্দিনের দেও জিন্দা সেই চিরাগের সাথে
সাফল্যের চাবিকাঠি দেবে না তো তুলে আর হাতে।
আপসেআপ কোন দিন হবে না যা হয়নি কখনো,
কাজেই সকল পথে ব্যর্থতার আহাজারি শোনো।
আপাত নিশানি যার পরিস্ফুট সকল ময়দানে
নামায় জাতিকে টেনে অন্ধকারে...ধ্বংসের তুফানে।

"অনিবার্য পতনের মুখে যদি না থাকে সংশয়
তাহলে এখনো জাগো, অতঃপর পাবে না সময়।
বাদ্‌শা বেগমের কথা বন্ধ থাক, কিংবা শাজাদীর
কিস্‌সা করো বন্ধ আজ, খোঁজ নাও আদর্শবাদীর,
আজাদী এনেছে যারা কলিজার লাল তপ্ত খুনে,
গড়ে গেছে ইতিহাস আদর্শের প্রদীপ্ত আগুনে।
ঘটনার খরস্রোত দুঃখ–সুখ আবর্তে ফেনিল।
জাগিয়ে বিবেকবুদ্ধি ভেঙে দিক নষ্টের পাঁচিল।

"কল্পনাবিলাস ছাড়ো শূন্য স্তরে সে পরেন্দা ঘোড়া
ঘোরাবে সুদীর্ঘ কাল ফাঁকির সড়কে আগাগোড়া,
তারপর ফেলে যাবে পতনের অতল গহ্বরে
পাবে না রূপালি রেখা ব্যর্থতার সে কালো জঠরে।
কাজেই কর্মীর রাহা বেছে নাও বাস্তব জগতে
রুটি, রুজি, কৃষ্টি–কলা চাও যদি আবার কিস্‌মতে।

"কর্মকুণ্ঠ যে কওম দেয় শুধু ভাগ্যের দোহাই
খোদার দুনিয়া মাঝে ক্ষতি ছাড়া প্রাপ্য তার নাই।
জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা ধামাচাপা দিয়ে
অনাবাদী রেখো মাঠ, কারিগরি শিক্ষাটা তাড়িয়ে
শিল্পকে শিকায় তুলে, চালু রেখে চোরা কারবার
কামিয়াবি চাও যদি পাবে শুধু দেখা ব্যর্থতার।
"জনশক্তি নিয়ে জানি করো আজ প্রচুর বড়াই,

www.pathagar.com

করি না আপাত আমি এ কারণে তর্কের লড়াই,
কেননা বাস্তবধর্মী যে সয়েছে সংগ্রামী ধকল
সে জানে কিস্মতী কত জনশক্তি কিংবা জনবল।
কিন্তু এই জনশক্তি হয় যদি নিষ্ক্রিয় বেকার
আনে শুধু অপমৃত্যু আনে তিক্ত ছায়া ব্যর্থতার।

"অভিজ্ঞের ইশারায় যদি চাও ব্যর্থতা এড়াতে
তবে বেছে নাও পন্থা, মৃত্যু যদি চাও লুব্ধ রাতে
তাহলে যেভাবে আছো পরিতুষ্ট থাকো সেইভাবে;
কাজ বা আদর্শ ছেড়ে পরিতৃপ্ত বেহায়া স্বভাবে
যথাকালে পাবে ফল একদিন সম্মুখে সবার,
যুগ যুগান্তর আগে সকলে যা পেল একবার।

"অতীতের ইতিহাস না যদি বাড়ায় অভিজ্ঞতা
কার সাধ্য বদলাবে, চাপা দেবে বিষম ব্যর্থতা?
চারিত্রিক দীনতার নর্দমায় যাদের সফর
খুলে যাবে অচিরাৎ যথাস্থানে তাদের কবর।
মওতের মুখে এসে যদি আরও থাকো অচেতন
অবশ্যই পাবে টের নসিবের অভ্রান্ত লিখন।

"জীবন্ত প্রাণীর সাথে মৃতের প্রভেদ যতটুক
জীবিত ও মৃত জানি পার্থক্যটা রাখে ততটুক!
অজস্র কাজের মাঠে এ যখন বাড়ায় ইজ্জৎ
নিষ্ক্রিয় হতাশা নিয়েও তখন পোড়ায় কিসমত,
বড় জোর ঈর্ষাতুর হয় দেখে অন্যের ভালাই!
জোটেনি, জোটে না ভাগ এ পন্থায় হালুয়া মালাই।

"যে যার কর্তব্য কাজে ফাঁকি দিয়ে পাওনা যদি চায়
সময়ের ভাণ্ড থেকে কখনো তা হবে না আদায়,
বরং বর্ধিত হারে সামগ্রিক ধোঁকাবাজি এই
জাতির তক্‌দির টেনে নামাবে ধূলিতে সহজেই।

"মীর জাফরের দোষে কওমের ভাগ্য যদি নামে
লক্ষ জাফরের চক্রে তোমরাও যাবে জাহান্নামে।

"তুমি তো আফিমখোর, শেষ হবে তোমারো সুদিন;
অহিফেন স্বপ্ন হবে দুশ্চিন্তার আঁধারে বিলীন।"

এ কথা ব'লেই শূন্যে মিশে গেল মূর্তি সে পাপের,
কোনোখানে চিহ্ন আর রহিল না মীর-জাফরের!
দুই চোখ মেলে দেখি মগজটা করে চিনচিন,
সে থেকে আফিম আর খাই নাই পুরা সাত দিন॥

www.pathagar.com

তসবিরনামা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

চেনা দুনিয়ার রঙে আঁকা তসবির
(যদি খুলে দাও না বোঝার জিঞ্জির),
সংলাপে আজ করে পথ সন্ধান
খোদার বান্দা হায়াত দারাজ খান॥

বাজ ও বহুরূপী

বহুরূপী : এক রঙ নিয়ে একঘেয়ে, একটানা
কেমন তোমার জীবন হয়নি জানা,
বাজ : রঙটা কি ক'রে বদলাও চুপিচুপি
এ যাবত আমি বুঝি নাই বহুরূপী !
বহুরূপী : বুঝবে কি ক'রে ? আছে কি সে দক্ষতা ?
বাজ : নাই তা মানছি ; নাই হীন কপটতা॥

মৃগ ও শাখামৃগ

শাখামৃগ : সারা বনে কেন গোলমাল বারো মাস ?
আমরা দু'জন 'এক'—বলে ইতিহাস।
মৃগ : ব্যাখ্যাটা এর শুনি আছে অভিধানে,
ও পাড়ার ঐ প্রবীণ প্যাঁচাটা জানে।
শাখামৃগ : এক 'মৃগ' নামে পরিচিত দু'জনেই
মৃগ : 'শাখা' সংযোগে গোলটা বেঁধেছে এই॥

বানর ও হুমাপাখী

বানর : নরে ও বানরে রেশতাটা আছে ঠিক,
এ ব্যাপারে ভুল বোঝে না দার্শনিক।
হুমাপাখী : অনুকরণেই দেখ যে সার্থকতা
পাই না তো আমি তাতে আদমের কথা !
বানর : নরের গোত্রে আমি—তাতে নাই ভুল।
হুমাপাখী : শুধু খাসলতে বিপরীত বিলকুল॥

চড়ুই-বাবুই

চড়ুই : দাওয়াত রইল, সাফ ক'রে তন্ দিল্
যাবেন ; ওটা তো আপনারো মঞ্জিল।
বাবুই : জানি না কি ভাবে ও দালান আপনার !
কি ভাবে পেলেন প্রবেশের অধিকার ?
চড়ুই : কুশলী মনের বুদ্ধিটা সেরা বল !
বাবুই : কৌশল নয় ; ওটা অপকৌশল॥

www.pathagar.com

পোষা পাখী ও জালালী কবুতর

পোষা পাখী : জীবনের স্বাদ চাও যদি মুসাফির
এখানেই তবে বাঁধো নীড় শান্তির।
জালালী কবুতর : সফরের মাঝে পেয়েছি জিন্দেগানী
বদ্ধ জীবন দুঃসহ ব'লে জানি।
পোষা পাখী : না হয় আমার খাঁচাটাই দেব ছেড়ে।
জালালী কবুতর : দুরাশা তোমার মন থেকে ফেলো ঝেড়ে॥

বনগাঁয়ে

উদবিড়াল : বনগাঁয়ে তুমি রাজা ছিলে এত দিন,
আজ থেকে হবে অবস্থা সংগীন।
শিয়াল : খোলাখুলিভাবে জানাও পরিস্থিতি
প্রয়োজন মত পাল্টাতে হয় নীতি।
উদবিড়াল : এসেছে এ বনে পশুদের মাঝে শ্রেয়
শিয়াল : কাল সকালেই হবো তার ভাগিনেয়॥

রাজহাঁস ও পাতিকাক

হাঁস : শেষ তক তুমি নামলে এতটা নীচে
ঘোরো যাবতীয় ধাপ্পাবাজের পিছে!
কাক : কি করি বলুন—বাজারটা ঘোর কালো,
তবু তো পারিনি, ফিঙে এসে ঠোকরালো।
হাঁস : এ ব্যাপারে দেব ফিঙেটাকে উৎসাহ
কাক মানে—আপনারো হ'য়েছে গাত্রদাহ॥

পিঁজরা ও পলাতক পাখী

পাখী : লাগলো না ভালো দুনিয়া দুঃখময়
কেবলি শূন্য ফাঁকা ব'লে মনে হয়।
পিঁজরা : কি আশ্চর্য আবার এসেছো ফিরে?
স্বেচ্ছায় তুমি ধরা দিলে জিঞ্জিরে!
পাখী : বাঁধা পড়ে আছে এখানে আমার খা'ব।
পিঁঞ্জরা : গোলামীর চেয়ে ঘৃণ্য গোলামী ভাব॥

নেকড়ে ও কুকুর

কুকুর : এবারেও যদি না ছাড়ো গোঁয়ার্তুমী
সরষে ফুলের দেখে যাবে মৌসুমী।
নেকড়ে : চর্বচোষ্যে যেভাবে র'য়েছ বেঁচে
লোভনীয় বটে; পায় না অনেকে যেচে।
কুকুর : একটা শর্তে হবে স্বাক্ষর দিতে।
নেকড়ে : গলবন্ধনী পারবো না মেনে নিতে॥

www.pathagar.com

বাঘ ও বলদ

বলদ : জোয়ালের দাগ থাকে না তো আর মনে,
ফিরে পাই প্রাণ চর্বিত চর্বণে।
বাঘ : জেহাদের মাঝে বাঘের জিন্দেগানী,
হায়াত-মওত তুচ্ছ ব'লেই জানি।
বলদ : জেহাদী সবকে হ'য়ে পড়ি পেরেশান।
বাঘ : জোয়ালের নীচে রাখো তবে গর্দান॥

ভাড়াটিয়া ঘোড়া ও সিংহ

ঘোড়া : মুক্ত আজাদ প্রাণীদের সর্দার
বিশেষ সজ্জা তোমারি তো দরকার।
সিংহ : রেকাব জিনের সাজ নিয়ে অপরূপ
লাগামে জবান কেন থাকে নিশ্চুপ?
ঘোড়া : থাকো নিভৃতে—দুঃখটা কারে কই?
সিংহ : আস্তাবলের বাসিন্দা আমি নই॥

শকুনি ও স্বর্ণঈগল

শকুনি : এই তো এখন এসে গেছি কাছাকাছি,
আজ থেকে তবে এক মাযহাবে আছি।
ঈগল : এক মঞ্জিলে-মকসুদ যদি হয়
তবে মযহাবে নেই আর সংশয়।
শকুনি : শ্মশান ছাড়া তো অন্য লক্ষ্য নাই।
ঈগল : সাত আস্‌মান পাড়ি দিয়ে যেতে চাই॥

বাছুর ও বিড়াল

বাছুর : ধরা পড়ো যদি কোনদিন—সাথে সাথে
হাত-কাটা যাবে ইসলামী হুকুমাতে।
বিড়াল : যা'রা মযবুর তাদের চিন্তা নাই,
হুমুমাত থেকে খোরাকিটা পাবে ভাই।
বাছুর : নও মযবুর; নাই কি মনস্তাপ?
বিড়াল : চোরা কারবারে বিল্লীর গুণা মাফ॥

চিলের আলাপ

মিঞা চিল : এ ব্যাপারে তুমি থেকো খুব হুঁশিয়ার,
চিলের তখ্‌তে নাই কোন দাবীদার।
বিবি চিল : যত বুলবুল শেষ হয় গান গেয়ে,
শকুনিরা মরে ভাগাড়ের মড়া খেয়ে।
মিঞা চিল : বুঝলে কিন্তু ওরাও ফোলাবে ছাতি।
বিবি চিল : বাজের সঙ্গে চলে না যে বজ্জাতি॥

www.pathagar.com

ফিঙে ও চিল

চিল : লড়ুয়ে স্বভাব পাখীদের মাঝে যত
দেখেছি,—দেখিনি শিকারী বাজের মত।
ফিঙে : জেহাদের দিনে পেয়েছি সে পরিচয়—
শত সংঘাতে মুজাহিদ নির্ভয়।
চিল : মেনে নিত যদি চিলের এ অহমিকা!
ফিঙে : শাহবাজ তবে হয়ে যেত চামচিকা॥

ফিঙে ও চিল (২)

চিল : রাহাজানি করে জিন্দেগী হয় শেষ,
ভেবেছি এবার হবো দাতা, দরবেশ।
ফিঙে : পাহারাওয়ালার শেষ হবে পিছু হাঁটা,
বাঁচবে সকলে; পানাহ্ পাবে দুনিয়াটা।
চিল : দেবে কি খেতাব—সূফী বা হাতেম দিল্
ফিঙে : নয়া প্রস্তাব মুলতুবি রাখো চিল॥

ফিঙে ও পর-পুচ্ছধারী

পুচ্ছধারী : দুনিয়া জাহান চিনলো না আমাকেই,
কারণ এখানে গুণের কদর নেই।
ফিঙে : বাড়তি পালক খুলে ফেলে লেজ থেকে
আসল চেহারা আর্শিতে নাও দেখে।
পুচ্ছধারী : ধৃষ্ট জবান সামলিয়ে কথা কও।
ফিঙে : ছিলে না যা আগে, এখনো তুমি তা নও॥

চিতাবাঘের তরিকত শিক্ষা

চিতা : নিরামিষে এত কমজোরী গেছে বেড়ে
পারি না দাঁড়াতে আজ আর লাঠি ছেড়ে।
ওস্তাদ : কথা ছিল শুধু ক্ষেপে উঠে অকারণে
হিংসাত্মক কাজ ক'রবে না বনে।
চিতা : বানরটা কাল দিয়ে গেছে কান মলে।
ওস্তাদ : উচিত পাওনা উল্টা বুদ্ধি হ'লে॥

একরকম বাঘের কিস্‌সা

ব্যাঘ্রশাবক : বাঘ মুল্লুকে সব কিছু বেমানান,
তাইতো এখানে থাকি আমি পেরেশান।
প্রবীণ-বাঘ : মেহেরবানিতে লালিত হ'য়েছো কার?
মনে হয় ছাপ বিজাতীয় শিক্ষার।
ব্যাঘ্রশাবক : দেখেছি জীবন ছাগলের পল্লীতে।
প্রবীণ বাঘ : তুমি দেখি চাও ইস্‌লাম কুফরীতে॥

www.pathagar.com

ঐ কিস্‌সার জের

বাঘ : একথা তোমাকে বলেছি হাজারবার
অনুচিত এই ছাগলের ব্যবহার।
ব্যাঘ্রশাবক : গালাগালি দাও প্রতিদিন অকারণে,
কোন্ খান্দানে জন্ম তা রাখি মনে।
বাঘ : আমলে তোমার কেন জাগে সংশয়?
ব্যাঘ্রশাবক : কি জানি কোথায় রয়েছে একটা ভয়॥

নেংটে ইঁদুরের আলাপ

১ম : থাকি সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে
তবু অন্তর কেঁপে মরে ভয়ে ভয়ে।
২য় : পুষির কণ্ঠে ঘুষের ঘন্টা বেঁধে
থাকবো আরামে ফিরাবো না আর কেঁদে।
৩য় : কালো বাজারের কোণে ওটা কার ছায়া
৪র্থ : ঘুষের চাইতে কিস্মতী যার হায়া॥

কুমীর ও তথ্যজ্ঞানী

কুমীর : তোমার দুঃখে আঁসু ঝরে দুই চোখে,
তুমি যা জানো না—জানে তা সর্বলোকে।
তথ্যজ্ঞানী : অনেকেই বলে অশ্রুটা পেশাদারী,
খোলাসা বয়ানে বোঝালে বুঝতে পারি।
কুমীর : সঠিক প্রমাণ পাবে যদি এসো কাছে।
তথ্যজ্ঞানী : থাক ব্যবধান—এখন যেমন আছে॥

কাঁকড়ার গর্তে

শিয়াল : তসলিম বাদ জানাই আরজ আমি
কাঁকড়ার মান সকলের চেয়ে দামী।
কাঁকড়া : আদবটা শুধু না হ'লে রসনাগত
খোশ আমদেদ জানাতাম অন্তত।
শিয়াল : প্রমাণ চাইলে লেজ ধরে এসো উঠে।
কাঁকড়া : একটা শিকার আজ তবে গেলো ছুটে॥

শজারু ও ডালকুকুর

শজারু : এলাম পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে
বনে বনে আর ফিরবো না ভয়ে ভয়ে।
ডালকুকুর : কেল্লার মত শরীর সুরক্ষিত
অকারণে তবু কেন থাকো শঙ্কিত?
শজারু : কি করি প্রাণের ভয় থাকে সুগোপনে।
ডালকুকুর : হাতিয়ারে নয়—হিম্মত থাকে মনে॥

www.pathagar.com

সেগুনের চারা ও বুনো কচু

কচু : ব'লে রাখি আজ, দোষ দিও না কো শেষে—
বাপের স্বভাব নিও না আমার দেশে।
সেগুন : সেগুনের কথা জানি না তেমন কিছু,
শুনি ভেঙে যায়—হয় না তবু সে নিচু।
কচু : লুকানো তথ্য ফাঁস ক'রে দিয়েছে কে?
সেগুন : মেঘে ঢাকা দেও ব'লেছিল কাল ডেকে॥

শবেবরাত—পীলখানায়

বাচ্চা হাতি : হুমা পাখী তবে জানালো কি শেষ কথা?
কত স'য়ে যাবো মানুষের ধৃষ্টতা?
জয়িফ হাতি : আছে যত দিন শিরদাঁড়া সোজা তার
সেরা আসনের হবে সে-ই দাবীদার।
বাচ্চা হাতি : কেড়ে নিতে পারি যদি ঐ শিরদাঁড়া?
জয়িফ হাতি : কেঁচোর মতন পা বেয়ে হবে সে খাড়া।

শবেবরাত—বক ও ডাহুকের এলাকায়

বক : ধার্মিক দলে আমারো তো আছে খ্যাতি
কিন্তু সে নাম হ'য়েছে কি রাতারাতি?
ডাহুক : অসুবিধা হবে ভাবিনি, ঘুমাও ফের।
আমি জেগে থাকি শেষ তক এ রাতের।
বক : ঘুমানোর আগে জেনে যাবো পরিচয়।
ডাহুক : কি লাভ? খ্যাতিতে থাকো নিঃসংশয়॥

রাত্রিশেষে

হুতুম প্যাঁচা : রাত-জাগা চোখ জ্বলে হয় একাকার,
ভোরে তুমি নাও আমার কার্যভার।
কোকিল : আঁধারে তোমার কি ভূমিকা ছিল, আজ
দিনের আলোয় ভুলে গেলে জাহাঁবাজ?
হুতুম প্যাঁচা : আঁধারে ছিলাম মুক্ত প্রাণের শিখা।
কোকিল : কে ছিল তাহ'লে প্রাণীদের বিভীষিকা॥

নৈশ পরিস্থিতি—আলোচনা প্রসঙ্গে

চামচিকা : বিল্লীটা কাল বাগে পেয়েছিল শিকা,
ও-সব ব্যাপারে নাই মোটে চামচিকা।
টিকটিকি : সুফী তুমি ঠিক! মশারিতে দিয়ে দোল
কাল রাতে কা'রা বাধালো গণ্ডগোল?
চামচিকা : মোরাকাবা হালে বুঝিনি বিসম্বাদ।
টিকটিকি : ছট্‌ফটানিটা দেখালো কে ওস্তাদ॥

www.pathagar.com

সী-মোরগের দফতরে

বুলবুল : মিছে কথা কাল ব'লেছিল চামচিকা,
সারা বনে তাই মৃত্যুর বিভীষিকা।
সী-মোরগ : ঈমানের সাথে আছে যার রেশারেশি
স্বরূপটা তার আমলেই ফোটে বেশী।
বুলবুল : মিথ্যাবাদীর কি সঠিক পরিচয়?
সী-মোরগ : পশুর অধম...পশু নয়...পাখী নয়॥

বিতর্ক

কাক : বেহুদা কথায় আর না বাড়িয়ে রাত
করো সরাসরি আদর্শ হুকুমাত।
বাজ : শুনি ও-পথেই—পূর্ণতা মানুষের!
পারবে কি তুমি টানতে ওটার জের?
চিল : পশু-পাখীদের সাথে যার মিল নেই!
কবুতর : যেখানে জালিম কাক আর চিল নেই॥

ডিম চুরি

কবুতর : আর একবার দেখালো সে বাহাদুরি,
পোষা পায়রার ডিম দুটো গেছে চুরি!
ফিঙে : বাহাদুরি যত দেখাক না পাতিকাক
চুরি লুকানোর সময় গুমোর ফাঁক।
হাঁস : চোখ বুঁজে ডিম লুকায় সে সারাদিন!
বাজ : ভাবে চোখ বুঁজে দুনিয়া দৃষ্টিহীন॥

পাখীর দরবার

১ম : বিহঙ্গকুলে যিনি অতি ধড়িবাজ
তাঁর গুণপনা শুনে নাও কিছু আজ।
২য় : যখন যেখানে দাও পান সেখানেই
লুট ক'রে যান;—তারপর দেখা নেই।
৩য় : শুনি তাঁকে নিয়ে লেখা হয় প্রহসন!
৪র্থ : হয়নি তবুও স্বভাব সংশোধন॥

সাপুড়ে ও সাপের পীর

পীর : মুরীদ হ'য়েছে গোখুরাটা অঘ্রানে
সুফীর প্রভাব ফুটে ওঠে তার প্রাণে।
সাপুড়ে : আসল চেহারা শীত শেষে যাবে জানা;
পীরকে সে দেবে যথোচিত নজরানা।
পীর : তোমার কথায় নিরাশার ছাপ দেখি!
সাপুড়ে : স্বভাব ঢাকে না কাফনেও—মানবে কি॥

www.pathagar.com

সাপ ও ছুঁচো

ছুঁচো : দুনিয়ার সাথে যদি হ'লো ছাড়াছাড়ি
উদরে পাঠাও কিঞ্চিৎ তাড়াতাড়ি।
সাপ : দয়া করে যদি বেরোও কণ্ঠ থেকে
নাকে খত দেবো, যাবো ওস্তাদ ডেকে।
ছুঁচো : ভেবেছিলে ছুঁচো নগণ্য, এক ফোঁটা !
সাপ : আজরাইলের অরুচি ও-গন্ধটা।।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর আলাপ

ব্যাঙ্গমী : কেন কি কারণে হাল আমলের কবি
এক মনে শুধু এঁকে যায় কালো ছবি ?
ব্যাঙ্গমা : কালো বাজারের চাপে প'ড়ে বেমালুম
যেহেতু আলোর দুনিয়া হয়েছে গুম।
ব্যাঙ্গমী : ব্যঙ্গোক্তির আছে কোন প্রয়োজন ?
ব্যাঙ্গমা : কাটাতে ধরার দুর্নীতি অসহন।।

দাড়িপাল্লা ও বাটখারা

দাড়িপাল্লা : বে-চইনভাবে র'য়েছি শান্তিহীন
মনে হয় শেষ দাড়িপাল্লার দিন।
বাটখারা : যেভাবে চ'লেছে হাত সাফায়ের খেলা
মনে হয় তাতে আমারো ফুরালো বেলা।
দাড়িপাল্লা : আমার বিচার চিরদিন চুলচেরা।
বাটখারা : দাড়িপাল্লার বদনাম দিলো এরা।।

বাটখারা ও সিন্দুক

সিন্দুক : ছোট মুখে আজ বড়দের বদনাম
ছড়ালে কি আর পুরবে মনস্কাম ?
বাটখারা : ওজনটা যাতে দেওয়া হয় ঠিক মত
এটুকু বলার দাবী আছে অন্তত।
সিন্দুক : তালাদের মত মেনে চলো বাটখারা।
বাটখারা : সিন্দুকটার খেদমতে থাক তারা।।

সিন্দুক ও পাছ-দরজা

সিন্দুক : কালো বাজারের সময়টা হ'লো এই,
কিন্তু তোমার সেদিকে লক্ষ্য নেই।
দরজা : সামান্য ঐ দেড়হাতি অবয়ব
অথচ উদরপূর্তি অসম্ভব।
সিন্দুক : একটু পরেই রাখবো কপাট এঁটে।
দরজা : তামাম দুনিয়া যাবত না যায় পেটে।।

www.pathagar.com

অসহায় অবস্থায়

যাত্রী : ঊর্দ্ধোত্থিত দুই বাহু অসহায়,
কে চায় টিকেট এমত অবস্থায়?
বিজ্ঞাপন : চলে দুনিয়ায় অবৈধ লেনদেন,
হুঁশিয়ার থেকে পকেট সামলাবেন।
পকেট : ভিড়ের চাপে যে শেষ হয় সম্বিৎ!
পকেটমার : এমন সুযোগ এসে থাকে কদাচিৎ॥

শিয়াল ও হরিণ

শিয়াল : আছে বটে কিছু পাণ্ডিত্যের খ্যাতি
অভাজন যাতে সম্মানিতের জ্ঞাতি।
হরিণ : এবং সে সাথে রটে গেছে যে কথাটা
সকল প্রাণীর গেছে তাতে মাথা কাটা।
শিয়াল : সে বদনামের জানি না বিন্দু আমি!
হরিণ : লোকে বলে সেটা শিয়ালের ধূর্তামি॥

কেরোসিনের কুপি ও ইমারতের ছাদ

কুপি : রাতভর আমি আফতাব রওশন
তৈল দানের সুযোগ করো গ্রহণ।
ছাদ : তোমার কথায় মুণ্ড বিঘূর্ণিত,
ভাবছি—দর্প হয় বুঝি চূর্ণিত।
কুপি : কি হেতু তোমার মাথা করে বন্ বন্
ছাদ : আলোর ঊর্ধ্বে ধোঁয়াটাই অসহন॥

'ব্যাঙের মৃত্যু'—হাটুরিয়াদের আলাপ

১ম : ব্যাঙটা তো ছিল দরজা-জানালা এঁটে
শেষ তক কেন মারা গেল পেট ফেটে?
২য় : ভাবেনি সে আগে—ঐভাবে যাবে মারা
কড়ির গরমে হ'লো সে বুদ্ধিহারা।
৩য় : পুরো ঘটনাটা বলো সংক্ষেপ ক'রে
৪র্থ : নইলে হাটের বেলা বুঝি যায় স'রে॥

'ব্যাঙের মৃত্যু'—ধারাবর্ণনা (১)

১ম : কড়িটা কুড়িয়ে পেয়েছিল কুনো ব্যাঙ
সেই গরমেই হাতিকে দেখাতো ঠ্যাঙ!
২য় : শেষে খোলাখুলি জানালো সে এইভাব
বুনো হাতিটাকে ক'রে দেবে লা-জওয়াব।
৩য় : ফুলতে ফুলতে হ'য়ে যাবে পর্বত...
৪র্থ : এবং বন্ধ ক'রবে হাতির পথ॥

www.pathagar.com

'ব্যাঙের মৃত্যু'—ধারাবর্ণনা (২)

১ম দফা : হাতিটা তখন চলছিল পথ দিয়ে...
রুখে উঠে ব্যাঙ দাঁড়ালো সামনে গিয়ে।
২য় দফা : জানি না হাতিটা দেখলো কি দেখলো না,
থামালো না গতি শুধু সে অন্যমনা।
৩য় দফা : ব্যাঙটা তখন ফুলে হ'লো গোলাকার...
৪র্থ : শেষ সংবাদ অজানা নাই তো আর॥

আগুন ও পানি

আগুন : আমার শিখায় জ্ব'লছে সারা জাহান,
কি সাহসে তুমি চেয়ে থাকো অম্লান?
পানি : ধ'রেছ তাহ'লে আত্মপূজার রীতি
—সৃষ্ট জনের কদর্য দুর্নীতি।
আগুন : সবার উর্ধ্বে উঠায়েছি এই শিখা।
পানি : ছাই হয়ে শুধু লুটাবে ও অহমিকা॥

ডেগচির পানি ও দরিয়ার পানি

ডেগচির পানি : এখন আমার কথার সময় নাই,
টগবগ ক'রে গরমে ফুটছি ভাই।
দরিয়ার পানি : পানির তো নয়, ও-স্বভাব আতশের,
তুমি কেন বৃথা টেনে মরো তার জের?
ডেগচির পানি : এবার আমার হ'য়েছে পদোন্নতি।
দরিয়ার পানি : বোঝো নাই শুধু হ'য়েছে কতটা ক্ষতি॥

পেয়ালার পানি ও দরিয়ার পানি

পেয়ালার পানি : দরিয়ার বুকে ছিলাম যতক্ষণ
আস্‌মানি রঙ ঘিরে ছিল তনুমন।
দরিয়ার পানি : যেখানে দরিয়া দেখে নীল আস্‌মান
ছিল সেখানেই তোমার বাসস্থান।
পেয়ালার পানি : এই পাত্রেই পাবো সে জিন্দেগানি!
দরিয়ার পানি : কল্পনাটাকে অভিনব ব'লে মানি॥

পাহাড় ও দরিয়ার পানি

পাহাড় : কোন্ দরিয়ার টানে যাও পথ ভুলে?
যদি চাও, তবে রাখবো উঁচুতে তুলে।
দরিয়ার পানি : যদি ছেড়ে যাই সাগরের পরিবেশ,
এক লহমায় জিন্দেগী হয় শেষ।
পাহাড় : উঁচুতে না উঠে ক'রলে নিজের ক্ষতি।
দরিয়ার পানি : সাত সাগরেই আমার অবাধ গতি॥

www.pathagar.com

সমুদ্র ও বাষ্পবিন্দু

বাষ্প : ছিল এ জীবনে সাগরের বিশালতা,
আজ মনে হয়—বিগত স্বপ্ন-কথা।
সমুদ্র : হৃত গৌরব এখনো কি মনে পড়ে?
বাষ্পোচ্ছ্বাসে তুমি উড়ে গেলে ঝড়ে!
বাষ্প : কে দেয় তোমাকে জীবনের মূর্ছনা?
সমুদ্র : তোমারি মতন অসংখ্য বারিকণা॥

প্রাণ ও প্রাণী

প্রাণী : দুনিয়া জাহানে সবচেয়ে খ্যাতিমান
জানো কি আমারে সম্মান অফুরান?
প্রাণ : আমি আছি তাই তুমি হ'লে আজ প্রাণী,
জিন্দেগানির পথে পেলে সম্মানী।
প্রাণী : নাই যদি থাকে বিকাবো না কম দামে।
প্রাণ : শকুনি সমাজে প্রাণহীন লাশ নামে॥

পোকা ও মাকড়সা

মাকড়সা : সকলেই জানে স্বভাবটা কার বদ,
মানতে চায় না কে সীমানা-সরহদ।
পোকা : আর সাথে সাথে এটাও তো জানে ভাই
কি কারণে কারা জাল ফেলে হামেশাই।
মাকড়সা : মূর্খের মত ধরা পড়ো কেন জালে?
পোকা : ধূর্ত শিকারী নাম কার ডালে ডালে॥

মাটি ও সিংহাসন

সিংহাসন : ব'সবো যখন একা আমি সেজেগুজে
পায়ের তলায় থেকো তুমি মুখ বুঁজে।
মাটি : মুখ বুঁজে আমি ছিলাম তো এতকাল,
বলবো এবার কি হ'য়েছে কার হাল।
সিংহাসন : দর বাড়ানোর অভিনব কৌশল!
মাটি : নয় বুনিয়াদী ফেরেববাজীর ছল॥

ইটের কাহিনী : এক

চিলেকোঠার ইঁট : কি ছিল রেশতা মনে পড়ে না তো আজ,
অকারণে তুমি ওঠাও ফাঁকা আওয়াজ।
ভিত্তির ইঁট : কি ভাবে কখন গড়া হ'লো ইমারত,
প'ড়বে না মনে উঁচু হলে কিস্‌মত!
চিলেকোঠার ইঁট : লাগে না তো ভালো অহেতু আত্মীয়তা।
ভিত্তির ইঁট : ভুলে যাও তবে সৃষ্টিমূলের কথা॥

www.pathagar.com

ইঁটের কাহিনী : দুই

চিলেকোঠার ইঁট : নসীবের দোষে ভেঙে গেল চিলেকোঠা,
নাই কোনখানে সান্ত্বনা এক ফোঁটা।
ভিত্তির ইঁট : দোষ যদি কিছু না ধরো তা'হলে বলি
—অটুট ভিত্তি গ'ড়ে গেছে কৌশলী।
চিলেকোঠার ইঁট : আছে ওখানেই তকদিরে আফতাব।
ভিত্তির ইঁট : ছাড়তে পারলে উন্নাসিকের ভাব।।

ইঞ্জিন ও চাকা

ইঞ্জিন : ছুটি দ্রুতগতি সমান্তরাল রেলে,
তুমি অকারণে শুধু ঘুরপাক খেলে।
চাকা : হ'ত না তোমার ঝড় গতি বেগবান
জীবন আমার না হ'লে ঘূর্ণমান।
ইঞ্জিন : আমি চাই সোজা চ'লবে আমার মত
চাকা : কে চলে তাহ'লে বুঝা যাবে অন্তত।।

খেয়াঘাট ও খেয়ানৌকা

ঘাট : এ–পার ও–পার করা নিতান্ত সোজা,
তোমাকেই দেখি বইতে গাধার বোঝা।
নৌকা : তোমার নজরে হয়তো অল্প দামী :
কাজটা তবুও প্রাণপণে করি আমি।
ঘাট : সমালোচকের দায়িত্ব গুরুভার।
নৌকা : বিশেষত যিনি করেন না পারাপার।।

পাঁচিল ও দরজা : এক

পাঁচিল : প্রবেশাধিকার এ ঘরে পেত না কেউ
যদি না আমার পিছনে লাগতো ফেউ।
দরজা : কোথায় থাকে সে ঘরের সার্থকতা
মেহমানদারি যেখানে হারানো কথা !
পাঁচিল : আমার অহমে ফোটায়েছো তুমি কাঁটা।
দরজা : তবে ভালো ক'রে এঁটে দাও দরজাটা।।

পাঁচিল ও দরজা : দুই

পাঁচিল : ভীপসা গরমে দিল্ হ'লো বেকারার,
আসে না মানুষ ; বাড়ে কীট যক্ষ্মার।
দরজা : আর কিছু দিন দেখো প্রতীক্ষা ক'রে
পাবে যক্ষ্মার মারী কীট অন্তরে।
পাঁচিল : কপাট এবার খুলতেই হবে ভাই।
দরজা : ব্যর্থ অহমে আর কি যুক্তি নাই।।

www.pathagar.com

কড়িকাঠ ও চৌকাঠ

কড়িকাঠ : বুঝি না তোমার কেন এ রুচিবিকার
—লুটালে ধূলায় সব গৌরবভার।
চৌকাঠ : চিরদিন এই আরজুটা আছে দিলে
—আমাকে ছাড়িয়ে যাক ওরা মনজিলে।
কড়িকাঠ : নেতার আসন চাও না সাথে আমার?
চৌকাঠ : সেরা নেতা—যিনি সেরা খিদমতগার॥

পিঁপড়ে ও প্যাঁচা

প্যাঁচা : শেখাবো তোমাকে এমন তেলেসমাত
বুঁদ হ'য়ে যাতে কেটে যায় দিন রাত।
পিঁপড়ে : চাইনি কখনো নেশায় সহজ পথ,
চেয়েছি জীবনে কাজ আর হিম্মত।
প্যাঁচা : তুমি বুঝলে না আমার মনের কথা,
পিঁপড়ে : জানা আছে ঢের পেঁচকের বিজ্ঞতা॥

পিঁপড়ে ও প্রজাপতি

প্রজাপতি : দু'চারটে ডিম আপাতত বেছে রেখে
অন্যগুলোকে শেষ করো একে একে।
পিঁপড়া : খোদার দুনিয়া এমন ক্ষুদ্র নয়
যাতে আছে কারো রিজিকের সংশয়।
প্রজাপতি : আমি কেন তবে আছি বিপদের মাঝে?
পিঁপড়া : কাজ না করার বুদ্ধি লাগায়ে কাজে॥

পিঁপড়ে ও ফড়িং

ফড়িং : ফসলের দিনে করি নাই সঞ্চয়
এসেছে এখন দারুণ দুঃসময়।
পিঁপড়ে : ফসলের দিনে কি ক'রেছ জানা নেই?
কথাটা ব'লতে আশা করি মানা নেই।
ফড়িং : চ'লেছি তখন গানের ছন্দ ধ'রে।
পিঁপড়ে : এখন তাহ'লে কাটাও নৃত্য করে॥

ফড়িং ও মৌমাছি

ফড়িং : পিঁপড়ের কথা শুনলে তো তুমি ভাই?
অমন জবান দুনিয়া জাহানে নাই।
মৌমাছি : ক'রবে কি ভায়া,—মুখাপেক্ষী যে নয়
চিরদিন তাকে ঘিরে থাকে সুসময়।
ফড়িং : ভুলে যাও কেন হাড়-ভাঙা খাটুনিটা!
মৌমাছি : ভিক্ষার চেয়ে হাজার গুণে তা মিঠা॥

www.pathagar.com

কওম ও তক্‌দির

কওম : ব'লে দাও কেন আছি এই বদ হালে
ক'রবো কি আর তুমি ফিরে না তাকালে?
তক্‌দির : যে কওম চলে বিপথে, বিষম ভুলে
আহাজারি তার উঠে মৃত্যুর কূলে।
কওম : তবে কি ভাগ্য রইবে দুঃখে লীন?
তক্‌দির : প্রয়াসী না হ'লে ফিরবে না কোনদিন।।

ইবলিসের বৈঠক : এক

১ম চেলা : বনি-আদমের থামাতে অগ্রগতি
দুষ্ট জিনের সাহায্যে করো ক্ষতি।
২য় চেলা : তুফানে ওড়াও হিমালয়ে চাপা দাও,
মহামারী ডেকে বেমালুম মুছে নাও।
৩য় চেলা : কিছুতেই ওর হবে না তো গতিরোধ।
ইবলিস : শেষ করো শুধু মানবিক নীতিবোধ।।

ইবলিসের বৈঠক : দুই

১ম চেলা : যুগ-যুগান্ত রেখেছি নগ্ন ক'রে
আজম জাতিকে অরণ্যে প্রান্তরে।
ইবলিস : তোমার যা কাজ—কিছুই তা পারো নাই,
পশুর অধম হোক ওরা—আমি চাই।
২য় চেলা : অর্ধ নগ্ন করি যদি আমি তারে?
ইবলিস : পাবে ইজ্জৎ ইবলিসি দরবারে।

ইবলিসের চেলা ও নবীর উম্মত

চেলা : জানতে চাইলে যুগের মনের কথা
মেনে নিতে হবে প্রচলিত সভ্যতা।
উম্মত : বুঝি সহজেই যুগের মনের কথা
বুঝি না অর্ধ-নগ্ন অসভ্যতা।
চেলা : মেনে চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।
উম্মত : গূঢ় মতলব কোন্‌টা—জানতে চাই।।

শাহী লেবাস ও সাধারণ মানুষ

লেবাস : এখনো কি তুমি বোঝোনি আমার কথা?
চলে না এ যুগে পোষাকের উদারতা।
মানুষ : ঘাড়-ধাক্কার মহড়ায় প'ড়ে ঢের
বুঝেছি এ যুগে দাম শুধু লেবাসের।
লেবাস : জানতে পারি কি তোমার মনের কথা?
মানুষ : ব্যাখ্যা চায় কি খোলসের সভ্যতা!

www.pathagar.com

পিতা-পুত্রের আলাপ

পুত্র : একটা পোষাক হেঁটে এল দু'মাইল
সাথে আসে তার তিনশ' তেরটা চিল।
পিতা : পোষাকটা ছিল, মানুষ থাকতো যদি
বইতো না আর দুর্বুদ্ধির নদী।
পুত্র : কাহিনীতে আমি পড়িনি এমন কথা।
পিতা : অকল্পিত এ খোলসের সভ্যতা॥

বাঘ ও ভল্লুক

ভল্লুক : নেশা-রক্তিম দু'চোখে দেখেছি আজ
আমার ভাগ্যে খ্যাতির তখ্‌ত ও তাজ।
বাঘ : মস্তিষ্কটা চাপা দিয়ে পুরোপুরি
কোন্ অজুহাতে পেতে চাও বাহাদুরি?
ভল্লুক : মাথা না খাটালে কেন পুরবে না সাধ?
বাঘ : গবাদি পশুর আছে কোন অপরাধ?

ভল্লুক ও মর্কট

ভল্লুক : মহুয়ার কিছু অভ্যাস ছিল তাই,
দেখছি এখানে সে-আশার মুখে ছাই।
মর্কট : যদি নিয়মিত জুটাও নগদ দাম
পাবে পুরোপুরি মহুয়ার হাম্মাম।
ভল্লুক : ও-নেশা তোমার ছিল না তো কোন দিন!
মর্কট : উপরিটা পেলে কে না হয় রঙ্গিন॥

দুই হাওয়া

কলুষিত হাওয়া : দশটা পাঁচটা করি আমি কারখানা
যদি কিছু থাকে দিতে পার নজরানা।
বিশুদ্ধ হাওয়া : পাঁচটার পর দূষিত করো যে বায়ু
দশটার আগে ফেরে না তো তার আয়ু।
কলুষিত হাওয়া : আনাড়ি কি বুঝে বিশিষ্ট পরিবেশ?
বিশুদ্ধ হাওয়া : যদি না সুরুচি সম্ভ্রম হয় শেষ॥

পাতাবাহার ও পেঁপে গাছ

পাতাবাহার : তোমার কথাই ভেবে আমি আনমনা,
জীবনে তোমার কি অসহ যন্ত্রণা!
পেঁপে গাছ : জীবনের এই দায়িত্ব গুরুভার
কি ক'রে তোমাকে বোঝাবো পাতাবাহার!
পাতাবাহার : সহজেই পারো ফেরাতে তোমার দিন।
পেঁপে গাছ : চাইনি কখনো জিন্দেগী ফলহীন॥

www.pathagar.com

পাতাবাহার ও পেয়ারা গাছ

পাতাবাহার : ভার-বিমুক্ত জীবন আমার মত
পারো না কি নিতে বিজ্ঞানসম্মত?
পেয়ারা গাছ : অলস মগজে বিশেষ দুর্ভাবনা
দিতে পারে শুধু ইবলিসী মন্ত্রণা!
পাতাবাহার : বুঝি না বাঁকিয়ে কথা কও তুমি কী যে।
পেয়ারা গাছ : বাঁকা উক্তির নিশানাটা তুমি নিজে॥

আরণ্য বিবাহ

প্রস্তাবনা : এই নাটকের নামভূমিকায় যার
দর্শন পান,—তিনি নন কৃতদার।
১ম অঙ্ক : তাঁর বর্ধিত মূল্যের পরিমাণ
ঝলসায় যেন তলোয়ার খরশান।
২য় অঙ্ক : এখন দাওয়াত খান তিনি ঘরে ঘরে
৩য় অঙ্ক : বিক্রি হবেন সবচেয়ে চড়া দরে॥

মধু চাঁদে

হুলো বেড়াল : দাম্পত্যের পবিত্র বন্ধনে
আপাতত এক হ'য়ে গেছি দুই জনে।
মেনি বিড়াল : না হ'লে শিথিল পবিত্র বন্ধন
বৈর এ ভাবে বরাবরে দুই জন।
হুলো বিড়াল : মধু চাঁদে হ'ল এটা ফিকে ব্যবহার।
মেনি বিড়াল : দেখেশুনে সব দিল্ আছে বেকারার॥

চড়ুই দম্পতির পরচর্চা

সাহেব চড়ুই : বাবুই পাখীটা হারিয়ে কাণ্ডজ্ঞান
গ'ড়েছে ও-বাসা নিতান্ত বেমানান।
বেগম চড়ুই : বাবুই গিন্নী গোছগাছ ক'রে তাই
ভাবে দুনিয়ায় ও-বাসার জোড়া নাই।
সাহেব চড়ুই : রাশভারি চালে বাবুই বেড়ায় উড়ে।
বেগম চড়ুই : গুমোরে গিন্নী ব'সে থাকে বাসা জুড়ে॥

হাঁস ও কবুতরের প্রতিবাদ

কবুতর : যখন মোটেই ব্যস্ত থাকে না কাজে
তখন মানুষ কুকথার খই ভাজে।
হাঁস : সেই খাসলৎ চড়ুই দম্পতির
পরচর্চায় হামেশা খোঁজে ফিকির।
কবুতর : অথচ দেয়নি প্রমাণ যোগ্যতার!
হাঁস : থামাও জবান বে-শরম বেহায়ার॥

www.pathagar.com

হুলোর কীর্তি

মেনি বিড়াল : পারবে না দিতে হুলোকে এ ঘরে তখ্‌ত্‌,
নিজের বাচ্চা খেয়েছে ও কমবখ্‌ত্‌।
টিয়া পাখী : লেজ কেটে ফেলে কালি দাও ওর নাকে,
সহজেই যাতে চেনা যায় খুনীটাকে।
টিকটিকি : মানুষেরো নাই এমন খারাব গুণ !
হুলো বিড়াল : পশু তো কখনো খায় না ভায়ের খুন॥

শামাদান, জুজদান ও মস্‌জিদ

শামাদান : পুরোহিত শ্রেণী ছিল না তো ইসলামে,
চালু হ'য়ে গেল দেখি তা অন্য নামে।
জুজদান : যেমন ছিল না ইসলামে শ্রেণীভেদ
চালু ক'রে দিল এজিদের শাগরেদ।
শামাদান : আজ আল্লাহর দরবারে পানাহ্‌ চাই।
মস্‌জিদ : আছে মস্‌জিদ মোত্তাকি আর নাই॥

মস্‌জিদ ও জুতাচোর

মস্‌জিদ : হীন পেশা যত ধরেছে হারামখোর
সকলের মাঝে হীনতম জুতাচোর।
জুতাচোর : স্বার্থ সুবাদে করি বটে জুতাচুরি,
কুকাজে আরো কি দেখো নাই বাহাদুরি?
মস্‌জিদ : খুলে দাও জ্ঞানপাপীদের জারিজুরি।
জুতাচুরি : খোদার কালাম মুখে আর মনে ছুরি॥

বৈঠকী আলাপ : এক

১ম : ধর্মের বুলি বলে বটে গাল-ভরা
কাজের বেলায় তবুও দেয় না ধরা।
২য় : যায় না যদিও আমলের পাশ দিয়ে
মুনাফা লোটে সে ধর্মের নাম নিয়ে।
৩য় : নাই কোনখানে ঈমানের ছিটেফোঁটা।
৪র্থ : ধর্মবেপারী—জানি অমানুষ ওটা॥

বৈঠকী আলাপ : দুই

১ম : ছোট জ্বেহাদেই কাঁপে যার অন্তর,
কি করে সে চায় জ্বেহাদুল আকবর?
২য় : নফ্‌সের সাথে লড়ায়ে খরচা নাই,
খোঁজে জ্বেহাদুল আকবর হামেশাই!
৩য় : কিন্তু যেখানে জান মাল দিতে হয়,
৪র্থ : পাবে না সেখানে দেখা ওর নিশ্চয়॥

www.pathagar.com

ইল্‌ম ও আমল

আমল : ইল্‌মের সাথে আমলের নাই যোগ
বুঝি না এদের কেমন এ মারী রোগ।
ইল্‌ম : সত্য জ্ঞানী যে—কপটতা যার নাই
এই মোনাফেকি দেখবে না তার ভাই।
আমল : কি হবে তাদের আমলনামায় লেখা?
ইল্‌ম : নমুনাটা তার দুনিয়ায় যায় দেখা॥

কালি, কলম ও মন

কালি : লেখা নয় কিছু, শুধু সে কালির দাগ।
কাজেই খ্যাতিতে পাবো সিংহের ভাগ।
কলম : তুমি দেখলে না কলমের খাটুনিটা!
বিনা মেহনতে লুটে নিতে চাও পিঠা।
কালি : আমার ওপরে বাড়াতে কে চায় দাম?
কলম : পাবে সকলেই আমার প্রীতি সালাম॥

আঙটি ও হিরা

আঙটি : ঘিয়ে আছি আমি তাইতো তোমার দাম,
নইলে দোকানে জানতো না কেউ নাম।
হিরা : এ ব্যাপারে নাও জহুরির অভিমত,
আশা করি তাতে বুঝে যাবে কিস্মত।
আঙটি : আমার মতটা পার না কি নিতে মেনে?
হিরা : জহুরি ছাড়া কে হিরা জহরত চেনে?

বিদেশী গল্প

মোরগ : খুদের হাঁড়িতে পেলাম এটাকে মিঞা,
কঠিন বস্তা—চেনেনি ময়না, টিয়া।
সওদাগর : কিস্মতী এই মুক্ত—মারওয়ারিদ,
কত চাও দাম? কি তোমার উম্মীদ?
মোরগ : এই বুদ্ধিতে ঘুরছো দরিয়াময়!
সওদাগর : যেটা চিড়িয়ার এলাকাভুক্ত নয়॥

দুই কলমের বাহাস

১ম : তুমি যদি হও নকীব মানবতার,
আমার বেলায় কেন এই অবিচার?
২য় : উচিত জওয়াব পারবে নিজেই দিতে,
কোন আশা নিয়ে চলেছ এ পৃথিবীতে?
১ম : চ'লেছি খ্যাতি ও বাণিজ্যনীতি মেনে।
২য় : কেন রেষারেষি করো তবে সব জেনে॥

www.pathagar.com

স্থূল-সূক্ষ্ম সংলাপ

স্থূল : বুদ্ধি-দীপ্ত যে বাণী তীক্ষ্ণধার
কেন সর্বথা গতায়াত নাই তার?
সূক্ষ্ম : বুদ্ধিহীনের শিঙে যদি হয় ভোঁতা
তলোয়ার পায় গদার মানসিকতা।
স্থূল : সূক্ষ্মতা ছেড়ে কেন গাইবে না মোটা?
সূক্ষ্ম : এটা জলসার, আস্তাবলের ওটা॥

বাঁশ ও শরিফা

বাঁশ : আদব তমিজে বৃথা খুঁজে শরাফতি
বাড়ায়েছ তুমি আজ এই দুর্গতি।
শরিফা : শক্তির সাথে রাখে না তো সঙ্গতি,
বে-আদবী আনে শুধু অপমান ক্ষতি।
বাঁশ : হও বিশিষ্ট-স্বভাবে আমার মত।
শরিফা : ফল আছে যার সে-ই ফলভারানত॥

বাঁশ ও কঞ্চি

বাঁশ : বড়োর সামনে তুমি হ'তে পারো হেয়,
কঞ্চি তবুও থাকবে অপরাজেয়।
বাঁশ : আমার চেয়েও তুমি বেড়ে গেছো দেখি?
কেন ধৃষ্টতা? কারণটা জানাবে কি?
কঞ্চি : আমার শিক্ষা নিয়ে তুমি হও বড়ো।
বাঁশ : বাঁশের চেয়েও কঞ্চি দেখছি দড়ো॥

কবি ও কঞ্চি

কঞ্চি : কঞ্চির চেয়ে বাঁশের শক্তি কম,
আমি থাকি দৃঢ়, ও দেখায় সম্ভ্রম।
কবি : মহৎ যে তার উদার, মুক্ত প্রাণ;
জানায় খোদার সৃষ্টিকে সম্মান।
কঞ্চি : কঞ্চির এই বিদ্রোহ বোঝো কবি!
কবি : শক্তিহীনের ধৃষ্টতা—বে-আদবী॥

আজাদী বার্ষিকীর আলাপ

১ম : আজাদীর মানে হয় যদি প্রসারতা,
কি হেতু পোষাকে এই সংকীর্ণতা?
২য় : আজাদী অর্থে গোলামী বুঝি না, তাই
মুক্ত স্বরূপে আত্মপ্রকাশ চাই।
১ম : কওমী লেবাস ফালতু ও দুঃসহ।
২য় : কি হেতু কণ্ঠে ন্যাকড়ার সমারোহ॥

www.pathagar.com

পাহাড় ও পাতিকাক

কাক : নিজের সত্তা বাঁচানোর রোগে ভুগে
বরাবর তুমি র'য়ে গেলে শিলা যুগে।
পাহাড় : দু'দিনেই তুমি হ'য়েছ মাতব্বর !
বলো তো বাচ্চা কোথায় তোমার ঘর।
কাক : হাজার হাজার মাইল এসেছি উড়ে।
পাহাড় : হাজার হাজার মাইল থাকোনি জুড়ে॥

(ইরানী কিস্‌সা)

এক : মুসাফির ও লোকমান হাকিম

মুসাফির : বিজ্ঞ হাকিম, তুমি সেরা বিদ্বান,
শিখলে আদব কার কাছে লোকমান?
লোকমান : শিখেছি আদব বে-আদবের ঠাঁই
এছাড়া আমার অন্য জওয়াব নাই।
মুসাফির : কি ক'রে মানলে আদবহীনের তেজ?
লোকমান : লাগেনি যা ভালো ক'রেছি তা পরহেজ॥

দুই : চিনি ও ছাই

ছাই : জন্ম আমার আতশের খান্দানে,
আগুনের ভয় কিছু কিছু রেখো প্রাণে।
চিনি : যদ্যপি তুমি অগ্নি কুলোদ্ভব,
বিগত কাহিনী তবু কার কাছে কব !
ছাই : ইক্ষু বংশ—তুমি অতি সাধারণ।
চিনি : ক'রেছি যত্নে মিষ্টতা অর্জন॥

তিন : মানুষের আলাপ

১ম : দেখি দশ ভাই এক দস্তরখানে
খায় জিয়াফত আনন্দে সম্মানে।
২য় : দেখেছ কি দুই কুকুর নির্বিবাদে
কোন মৃতদেহ খেয়ে থাকে এক সাথে?
১ম : সারা দুনিয়ার দৌলৎ যদি পায়?
২য় : লুব্ধ মনের লোভ তবু থেকে যায়॥

চার : কুসঙ্গ

এক : অসৎ সঙ্গে কাটায়েছে যে সময়
শুভ, কল্যাণ কিছু তার তরে নয়।
দুই : ফেরেস্তা যদি দেওয়ের সঙ্গে থাকে
হবে উদ্ধত, অভদ্র পাবে তাকে।
তিন : কদাচার শুধু শেখায় মন্দ জন।
চার : পর-উপকার করে না হিংস্র মন॥

www.pathagar.com

পাঁচ : মাটি ও মুসাফির

মুসাফির : ক'রেছি সফর দূর দেশে দুনিয়ার,
দেখেনি এমন জমিন খোশবুদার !
খোশবুদার মাটি : ক'রেছ সফর মুসাফির দেশে দেশে
কেন বিস্ময় গরীবের কাছে এসে ?
মুসাফির : তুমি কস্তুরী ? খোশবুতে যাই ভুলে !
খোশবুদার মাটি : মাটি আমি ; শুধু ছিলাম গোলাপ-মূলে ॥

কাঁকড়া বিছা ও খেজুর গাছ

বিছা : আমাদের মাঝে নাই আর কোন মিল,
যখম করার কাজে শুধু এক দিল্
গাছ : হক ইনসাফ হ'ল কিনা দেখ বুঝে
কে ঢালে জহর ক্লান্ত মানুষ খুঁজে ?
বিছা : কাঁটার কি নাই হিংসার অপবাদ
গাছ : কাঁটা পেরোলেই ক'রবে রসাস্বাদ ॥

ইঁদুর ও বেজি

ইঁদুর : ভবঘুরে তুমি বনের সীমানা মাঝে ;
সাপ মারা ছাড়া আর কিছু জানা আছে ?
বেজি : দুনিয়া জাহানে এত আছে জানবার,
ক্ষুদ্র এ জ্ঞান নগণ্য কাছে তার।
ইঁদুর : কার শত্রুতা করো তুমি হীন প্রাণে ?
বেজি : যে সাপ তোমাকে প্রথম শিকার জানে ॥

বিছুটি ও মেহেদি পাতা

বিছুটি : তোমাকে নিয়েই হয় যত টানাটানি,
আমার বেলায় শুধু হাত চুলকানি।
মেহেদি : স্বভাবটা তুমি রেখেছো এমন ক'রে
রয়নি যে চাপা দেশে ও দেশান্তরে।
বিছুটি : কোন্ তরিকায় তুমি পেলে ইজ্জৎ।
মেহেদি : কলিজার খুনে রাঙানো শহীদী পথ ॥

কচ্ছপ ও প্রবালকীট

কচ্ছপ : বুঝি না তোমার বুদ্ধিটা বিপরীত !
নিজে ম'রে কেন গড়ো এ দ্বীপের ভিত্ ?
প্রবাল : আমিও বুঝি না, কি তোমার মতলব !
কেন অকারণে তোলো এ উচ্চ রব ?
কচ্ছপ : বুঝেসুজে বাঁচো ; ঝোপ খুঁজে দাও কোপ।
প্রবাল : মহান মৃত্যু বুঝবে না কচ্ছপ ॥

www.pathagar.com

সুর্মা ও পাথুরে কয়লা

কয়লা : তুমি থাকো চোখে, আমি ফিরি পায় পায়
বনি আদমের বুদ্ধিটা বোঝা দায় !
সুর্মা : কি দাহনে পুড়ে, জ্বলে কোন্ জ্বালোয়ায়
হ'য়েছি সুর্মা ;—তুমি তা বোঝো না হায় !
কয়লা : আমি হিংসার আগুনে হ'য়েছি ছাই।
সুর্মা : ঈশ্‌কের দাহে আমি রূপ খুঁজে পাই॥

শীতরাত্রির আলাপ

দুনিয়া : সেই উজ্জ্বল আস্‌মানি শামিয়ানা
লুকালো কোথায়, হয়নি আমার জানা।
আস্‌মান : ছিলাম যেখানে, আছি আমি সেখানেই।
পাই না তোমাকে ; তোমারি তো দেখা নেই।
দুনিয়া : দু'চোখে আমার মৃত্যুর কালো আঁধি।
আস্‌মান : হিম কুয়াশায় বন্দিনী শাহ্‌জাদী॥

শীত ও উত্তরের হাওয়া

শীত : কঠিন আমার খাটুনিটা যায় বেড়ে,
অথচ এদিকে তুমি দিলে হাল ছেড়ে !
হাওয়া : হবে কি হবে না এই দ্বন্দ্বটা মনে
পেরেশান আজ ক'রে ফেলে ক্ষণে ক্ষণে !
শীত : সেই দ্বন্দ্বেই তোমার সময় কাটে !
হাওয়া : সবুজের ছাপ দেখ নাই ক্ষরা মাঠে॥

শীত ও ফাল্গুনের হাওয়া

শীত : এ মাঠে তোমার প্রবেশাধিকার নাই।
এই কথাটুকু আজ ব'লে দিতে চাই।
হাওয়া : আমাকে রুখতে পারো যদি এসো তুমি।
থামাও তা'হলে জীবনের মৌসুমী।
শীত : পারবো না ; তবু আশা যে ছলনাময়ী !
হাওয়া : এ বিরান মাঠে যৌবন হবে জয়ী॥

ফাল্গুনের হাওয়া ও বিরান মাঠ

মাঠ : এসেছিল শীত—শুধু লানতের মত,
এখনো এ মন ঝিমায় মরণাহত।
হাওয়া : শীতের ছোঁওয়ায় যে হ'য়েছে নিষ্প্রাণ,
পাবে জিন্দেগী সে বিরান ময়দান।
মাঠ : নাই প্রশান্তি,—মন সান্ত্বনাহীন।
হাওয়া : আসবে আবার তোমার স্বর্ণ-দিন॥

www.pathagar.com

ফাল্গুন ও পৃথিবী

পৃথিবী : ভেঙে ফেলে আজ মৃত্যুর জিন্দান
জেগেছে জীবন, যৌবন মহীয়ান।
ফাল্গুন : সবুজ ঝাণ্ডা উড়ায়ে এসেছে যারা ;
নব জীবনের মুক্ত নকীব তা'রা !
পৃথিবী : কুয়াশা-পর্দা ছিঁড়ে ফেলে আস্‌মান।
ফাল্গুন : ফাল্গুনে শোনো নব সৃষ্টির গান॥

(সৃষ্টির গান)

কবির প্রতি

মখলুকাত : তুমি সেই শাখী, মৃত্যু হিমের রাতে
আশা ভরা সুর জাগে যার বেদনাতে।
কবি : অপমৃত্যুর কঠিন তুষার শ্বাসে
আমার এ গান আড়ষ্ট হ'য়ে আসে !
দুনিয়া : নিষ্প্রভ হয় দুনিয়ার ছায়া-ছবি।
মখলুকাত : তবু গেয়ে যাও ; তবু গেয়ে যাও কবি॥

কর্মীর প্রতি

দুনিয়া : তুমি যে প্রবালকীট যার সাধনায়
গ'ড়ে ওঠে দ্বীপ শহীদের তরিকায়।
মখলুকাত : নিখিল জাহান—আস্‌মানি যাযাবর
তোমার পথেই ঘুরে আসে কারিগর।
কর্মী : শ্রান্ত জীবনে আজ অবসর চাই।
মখলুকাত : কর্মী তোমার কাজ শেষ হয় নাই॥

জ্ঞানীর প্রতি

দুনিয়া : তুমি সে সিতারা, নিশীথের জুলমাতে
রোশ্‌নি ছড়ায় যে একা অন্ধ রাতে।
জ্ঞানী : রুদ্ধ ঝরোকা, দরজায় প্রতিহত
সেই আলো ফেরে বোবা বেদনার মত !
দুনিয়া : তবু দেখি সেই রূপালি রশ্মি-রেখা !
মখলুকাত : ও পথেই পাবো নয়া জামানার দেখা॥

ধ্যানীর প্রতি

মখলুকাত : আতশী দহনে দীপশিখা ধরণীর,
ব্যথা ও বেদনা তোমারি তো তক্‌দির।
দুনিয়া : মোমের মতন গ'লে তুমি শামাদানে
রোশ্‌নি ছড়াও আলোক-পিয়াসী প্রাণে !
মখলুকাত : আলোকের মূলে কত যন্ত্রণা ব্যথা !
দুনিয়া : বলেনি কখনো ধ্যানীর এ নীরবতা॥

www.pathagar.com

অকর্মণ্যের প্রতি

অকর্মণ্য : কর্মবিহীন জীবনের আন্দেশা
: হারাই বুঝি বা কাজ–না–করার নেশা !
দুনিয়া : দিবা–স্বপ্নের মহড়ায় রঙ্গিন
অপারগ তুমি ছিলে না তো কোনদিন।
অকর্মণ্য : সকলেই জানে আমার এ পরিচয় !
মখলুকাত : দ্বিপদ ;—যদিও সঠিক মানুষ নয়॥

গুহার আঁধার ও নৈশ অন্ধকার

গুহার আঁধার : সারা দিন আমি পাই নাই সান্ত্বনা,
ক্ষুদ্র গুহায় কেঁদেছি অন্যমনা।
নৈশ অন্ধকার : রাতের আঁধারে করো সুখে বিচরণ
ভোরের সূর্য না জাগে যতক্ষণ।
গুহার আঁধার : দু'দণ্ড ঘুরে আমার কি হবে লাভ ?
নৈশ অন্ধকার : লুকাও তাহলে জেগে ওঠে আফতাব॥

ভোরের সূর্য ও গুহার অন্ধকার

সূর্য : খুঁজে ফিরি আমি চিরকাল তোমাকেই,
অথচ তোমার এ যাবৎ দেখা নেই !
অন্ধকার : কঠিন আঁধারে কি লাভ ব্যঙ্গবিদ ?
ঘোচালে আঁধার ভেঙে জড়তার নিদ !
সূর্য : জিন্দেগী পেল জ্বেহাদের ফরমান !
অন্ধকার : আঁধারের যাতে লাঞ্ছনা অফুরান॥

ভোরের সূর্য ও বিশ্বপ্রকৃতি

হাওয়া : খোশ আমদেদ জামানার আফতাব
পুরালে আমার দীর্ঘ রাতের খা'ব।
পানি : মাটির দুলাল চারাগাছ ওঠে বেড়ে
আর কোন দিন যেও না ওদের ছেড়ে।
আসমান : তোমার যা কাজ করো তা আপন মনে !
জমিন : আদিম আঁধার লুকালো গুহার কোণে॥

আরশি ও আফতাব

সূর্য : ক্ষমতা কোরো যদি মুক্ত সূর্যালোকে
পাও যন্ত্রণা ঐ অপলক চোখে।
আয়না : যে আলোর দাহে গ'লবে জমানো পারা
সে আলোর পথে দৃষ্টি পলকহারা।
সূর্য : ফেরাবে না চোখ হ'লে প্রাণ সংশয় ?
আয়না : জীবনে আমার শুধু আঁধারের ভয়॥

www.pathagar.com

আরশি ও বদসুরাত

বদ সুরাত : চেহারাটা কার উঠলো ওখানে ফুটে,
অতিশয় বদ নিতান্ত বিদঘুটে !
আয়না : চোখে না আঙুল দিলে সেটা বুঝবে কি?
কার তস্‌বির ভালো ক'রে দেখ দেখি।
বদ সুরাত : মুখের আদলে মনে হয় যেন চেনা।
আয়না : নিজের চেহারা চিনেও কি চিনবে না॥

য়েমনী মেহমান ও ইরানী মেযবান

মেযবান : মুসাফির, বহুদর্শী বিজ্ঞ জন,
জানাও জ্ঞানী ও নাদানের লক্ষণ।
মেহমান : না জেনে যেখানে বলে কেউ ঢের কথা
বুঝবে সেখানে সক্রিয় মূর্খতা।
মেযবান : জ্ঞানী ব'লে কার খ্যাতি দুনিয়ার মাঝে?
মেহমান : রূপায়িত যার জ্ঞান মানুষের কাজে॥

হরিণ ও কুয়োর ব্যাঙ

ব্যাঙ : কোন্ পৃথিবীর বাসিন্দা তুমি ভাই?
এমন আজব চেহারা তো দেখি নাই !
হরিণ : যে পৃথিবী নয় কুয়োর চাড়িতে ঘেরা,
সেই দুনিয়ার বাসিন্দা হরিণেরা।
ব্যাঙ : ইশারায় মন পূর্ণতা পায় জানি।
হরিণ : তামাম আলমে খোদার মেহেরবানি॥

ভূগোল পাঠ

গাধা : দুনিয়াটা এক এবড়োথেবড়ো মাঠ;
এপাশে গোয়াল ওপাশে ধোপার ঘাট।
মাছ : দুনিয়াটা এক বিষম বহতা পানি,
যেখানে কাতলা করে দিনে রাহাজানি।
ব্যাঙ : আদতে দুনিয়া ইঁদারা এ পরিপাটি।
বাজ : অজ্ঞতা শুধু অন্ধের মাপকাঠি॥

পোনা মাছ ও প্রবীণ রুই

পোনা : কেন থাকো নিয়ে এই অকারণ ভয়?
বঁড়শির মত নাই কেউ সদাশয়।
রুই : খোদা না করুন, অর্বাচীনের কথা
বাড়ায় আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা।
পোনা : টোপের খবর হয়নি তোমার জানা।
রুই : ওটাই তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা॥

www.pathagar.com

'মৌচাক নির্মাণ'

বোলতা : মৌমাছিদের দূরে ক'রে বিতাড়ন
বোলতারা গড়ে মৌচাক সারাক্ষণ।
ভীমরুল : যদি বুনিয়াদ না বানায় ভীমরুল
তবে শুরুতেই থাকবে ভীষণ ভুল !
বিচ্ছু : মৌচাক গড়া শুধু যে আমার কাজ।
মৌমাছি : বিদায় নিলাম দূরতম বনে আজ।।

পাখী ও বাসা

বাসা : দূরান্ত দূরে তোমার প্রাণের টান,
তোমার ওয়াতান—সীমাহীন আসমান।
পাখী : যত দূরে যাই এ কথা ভুলো না তুমি
: দুনিয়ার মাঝে জান্নাত—বাসভূমি।
বাসা : মুক্ত পাখীর দলে কেন করো ভিড় ?
পাখী : জানো না কি তুমি ঈগলেরো আছে নীড় ?

পাখী ও আস্‌মান

আস্‌মান : উড়ে যায় ঝড়ে ঐ খড়কুটো ;
পারবে না তুমি গড়ে নিতে আর দুটো ?
পাখী : পারা না পারার প্রশ্ন এখানে নয়,
রয়েছে এ নীড়ে ক্ষমতার সঞ্চয়।
আসমান : নীল আস্‌মানে আরা কি মাধুরী নাই ?
পাখী : এখানে আমার দাঁড়ানোর আছে ঠাঁই।।

ঝড় ও পাখী

ঝড় : দেখ বৈশাখে মৃত্যুকে মুখোমুখি,
নীড়ের স্বপ্ন দেয় কি এখনো উঁকি ?
পাখী : এই কলিজার লহু দিয়ে গড়া বাসা,
আমার স্বপ্ন জিন্দেগানির আশা।
ঝড় : দেখি বাসভূমি রাখো কোন্ অনুরাগে,
পাখী : পারবে না এই পাখনা ভাঙার আগে।।

গাছ ও তাল : এক

১ম ডাল : ঝড়ে ভাঙে যদি আধমরা ঐ ডাল,
এই শক্তকায় কাটাবে কি তুমি কাল ?
২য় ডাল : সবল সতেজ ডালপালা আছে আরো,
এই কথা ভেবে চিন্তা ছাড়তে পারো।
৩য় ডাল : ভুলে যাও তুমি অহেতুক ব্যাকুলতা।
গাছ : বুঝবে না কেউ তোমরা আমার ব্যথা।।

গাছ ও ডাল : দুই

১ম ডাল : ঝড়ে ভেঙে গেছে আধমরা প্রশাখাটা,
কেন তাতে এই আহাজারি বুক ফাটা ?

www.pathagar.com

গাছ : আধ মরা ব'লে কেন দাও গঞ্জনা ;
ডালের তো নয় সে গাছের লাঞ্ছনা।
২য় ডাল : রুগ্ন যে শাখা আসরে পায়নি মান।
গাছ : তবু তার পথে কাঁদে যে আমার প্রাণ॥

আস্‌মান ও জমিন

জমিন : এখনো কি মনে জাগে সেই বিস্ময়
যেদিন মাটিতে প্রাণের অভ্যুদয়।
আস্‌মান : সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় মানে প্রাণ,
আদম-হাওয়ার হ'ল অভ্যুত্থান !
জমিন : দুনিয়া জাহান হ'য়ে গেল গুলশান।
আস্‌মান : সৃষ্টির সেরা হল সেই ইনসান॥

হুমা পাখীর আলাপ : এক

১ম পাখী : পেরেশান আমি মানুষের হাল দেখে
কোথায় সে ছিল, কোথায় পড়েছে ঠেকে !
২য় পাখী : সত্য ধর্ম ছাড়ে যে সফল জেনে,
বুলন্দ নসিব নামায় নিজে সে টেনে।
১ম পাখী : উঠেছিল ওরা ঊর্ধ্বে ফেরেশতার।
২য় পাখী : নেমে গেছে এরা অতলে পাশবতার॥

হুমা পাখীর আলাপ : দুই

১ম পাখী : কদরের রাতে মুজদা পেয়েছি আমি,
হবে ইনসান আবার অগ্রগামী।
২য় পাখী : কিন্তু সে পথে পাথেয় চাই যে ঢের,
কোন্ সঞ্চয় আছে বনি-আদমের ?
১ম পাখী : শহীদের খুন মৌজুদ আছে জানি
২য় পাখী : সত্যের পথে চাই আরো কোরবানি॥

মাখলুকাত ও মানুষের রূহ

দুনিয়া : পারেনি যা নিতে ফেরেশতা আসমান
সেই ভার নিয়ে হ'লে তুমি মহীয়ান।
রূহ : সে-ভার বওয়ার শক্তি যে অফুরান
দিলেন আল্লাহ্ সব চেনবার জ্ঞান।
মখলুকাত : তাই তুমি পেলে পূর্ণতা কামালত !
দুনিয়া : ধূলির ধরায় আল্লার খিলাফত॥

মোমবাতি ও শামাদান

শামাদান : অশেষ দহনে জ্বালায়ে তনু ও মন
এ ঘন আঁধারে জ্বলবে কতক্ষণ ?
মোমবাতি : মানুষের ঘর ক'রে দিতে রওশন
জ্ব'লবো নীরবে যত হয় প্রয়োজন।
শামাদান : কেন স'য়ে যাও জীবন যন্ত্রণার ?
মোমবাতি : আমি অনুগামী "সিরাজাম মুনিরা"র॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইকবালের নির্বাচিত কবিতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন

১
খোল আঁখি, দেখ চেয়ে এ পৃথিবী, দেখ নভঃতল,
দেখ এই বাষ্প আর হাওয়ার মহল।
তিমির-বিদার সূর্য দেখ চেয়ে দীর্ণ করে সুপ্ত পূর্বাচল।

গুণ্ঠন-বিমুক্ত স্বপ্ন সংগোপন দেখ এই উজ্জ্বল আলোতে,
বিচ্ছেদ দিনের ব্যথা, অশেষ যন্ত্রণা বহ্নি দেখ তুমি ধরাবক্ষ হতে !
অধীর হ'য়ো না তবু আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে
আবর্তিত সংগ্রামের স্রোতে॥

২
দেখ এই ঘনঘটা, বর্ষণমুখর মেঘ
দেখ এই অবিশ্রান্ত শ্রাবণী বাদল,
আকাশের এ গম্বুজ,—শব্দহীন আবহমণ্ডল,
এ পাহাড়, এ সমুদ্র, বালিয়াড়ি—এই মরুতল,
নিয়ন্ত্রিত হবে এরা তোমারি শাসনে !
কাল তুমি দেখিয়াছো উজ্জ্বল ফেরেশতাদল জান্নাত কাননে ;
দেখ নিজ প্রতিকৃতি আজ তুমি সময়ের এ স্বচ্ছ দর্পণে॥

৩
তোমার পলকপাত বুঝে নেবে অনায়াসে অনন্ত সময়,
দূরান্ত আকাশ থেকে তারা-রা তোমাকে দেখে
প্রতিক্ষণে মানিবে বিস্ময়।
প্রজ্ঞার বারিধি তব মানিবে না কোন দিন কোন সীমারেখা,
নভের উচ্চতা ছুঁয়ে চিত্তের স্ফুলিঙ্গ তব দূরে দেবে দেখা,
গ'ড়ে তোল নিজ সত্তা আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রান্তে
তারপর দেখ চেয়ে একা॥

৪
যে সূর্যে প্রদীপ্ত বিশ্ব,—সে তোমার স্ফুলিঙ্গ দহন,
তোমার শিল্পের মাঝে সম্মোহিত আছে এক
সুসম্পূর্ণ পৃথিবী নূতন !
অর্জিত নহে যা শ্রমে—সে জান্নাত অসুন্দর দৃষ্টিতে তোমার,
তোমার বেহেশ্‌ত জানি হৃদিরক্তে সংগোপন (অশ্রান্ত আশার) !
মৃত্তিকার প্রতিকৃতি ! দেখ এ শ্রমের ফল
সংগ্রামের পথে দুর্নিবার॥

www.pathagar.com

৫

'রোজ-ই-আজল'[১] থেকে প্রতি বীণাতন্ত্রী তব অহর্নিশি ক্রন্দনমুখর
রোজ-ই-আজল থেকে প্রেমের বিপণী মাঝে তুমি একা এনেছো খবর,
রোজ-ই-আজল থেকে ধ্যানী তুমি খুঁজিয়াছো
চিরদিন রহস্যের ঘর !
শ্রমশীল !
রক্তক্ষয়ী !
শান্তিকামী !
উষালোক হ'তে অস্তিত্বের
দেখ চেয়ে,—বলো আজ কোন্ অন্তহীন পথে
নিয়ে যাবে অফুরন্ত ভাগ্য এ বিশ্বের ॥

শাহীন

বিদায় নিয়েছি সেই ধূলিম্লান পৃথ্বিতল থেকে
যেখানে জীবন বাঁচে এক কণা শস্যে ধরণীর !
আনন্দ—আনন্দ মোর মরুভূর নিঃসঙ্গ বিজনে
সৃষ্টির প্রথম থেকে এ প্রাণ অশ্রান্ত রাহাগির।

বসন্ত বাতাস, ফুল, বুলবুল, পসারিণী আর
আশিকের রুগ্ন সুর ;...সব কিছু ছেড়ে চলে যাই !
বনের বাসিন্দা যারা—যাদু জানে, যাদুতে ভোলায় !
প্রলুব্ধ প্রাণের সেই সম্মোহনে মুক্তি-স্বপ্ন নাই।

মরু বিয়াবানে দীপ্ত খরধার তরবারি যার
বিজয়ী, গাজী সে বীর, অস্ত্রে তার অপূর্ব স্পন্দন !
ক্ষুধিত নহি তো আমি কবুতর, তিতিরের তরে
প্রমুক্ত আত্মার মত শাহীনের অবাধ জীবন !

হানা দিয়ে ফিরে যাওয়া, ফিরে এসে হানা দেওয়া আর
আজব বাহানা এই রক্তধারা উত্তপ্ত রাখার
প্রাচী প্রতীচীর মাঝে চকোরীর ক্ষুদ্র এ সংসার ;
আমার আকাশ নীলা—অন্তহীন সাম্রাজ্য আমার।

পাখীরা দুনিয়া মাঝে দরবেশ—ভ্রাম্যমাণ তাই,
শাহীন বাঁধে না নীড়—নীড়ে তার প্রয়োজন নাই ॥

---

১. রোজ-ই-আজল—সৃষ্টির প্রথম দিন

www.pathagar.com

ইনকিলাব

দিন মজুরের রক্তে ধনিক গড়ছে মাণিক 'লা'লে নাব'
সেই জুলুমে কিষাণ চাষীর শ্রমের ফসল হয় খারাব
ইনকিলাব...আয় ইনকিলাব...
তস্‌বিদানায় রাখলো ঘিরে মুফতী ঈমানদারের প্রাণ,
পৈতাধারী বামুন রাখে কাফির জনে লা-জওয়াব
ইনকিলাব...আয় ইনকিলাব...
ঘূর্ণি, তুফান, প্রলয়শিখা দেখে চেয়ে তুই মুসলমান,
পুণ্য প্রভাব বিরল এখন, রয় ছড়িয়ে মন্দ ভাব
ইনকিলাব...আয় ইনকিলাব...
আমীর ধনিক খেলছে জুয়া, দাবার ঘুঁটি মিথ্যাময়,
কণ্ঠাগত প্রাণ জুলুমে ; গোলাম তবু দেখছে খাব
ইনকিলাব...আয় ইনকিলাব...
দেখ বাতিলের তামাশা আজ, রয় সে সুযোগ সন্ধানে,
বাদুড় পাখীর হামলা দেখে মুক্ত ভোরের এ আফতাব
ইনকিলাব...আয় ইনকিলাব...
গীর্জাতে হায় ফাঁসি কাঠে ঝুলছে ঈসা নবীর তনু,
কা'বা থেকে বিদায় নিল মুস্তফা ; উম্মুক্ত কিতাব
ইনকিলাব...আয় ইনকিলাব...
দিন মজুরের রক্তে ধনিক গড়ছে মানিক 'লা'লে নাব'॥

খোদার ফরমান

ওঠ,—দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও।
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও॥

কর ঈমানের আগুনে তপ্ত গোলামী খুন,
বাজের সমুখে চটকের ভয় ভাঙিয়ে দাও।
ঐ দেখ আসে দুর্গত হীন দুখীর রাজ ;
পাপের চিহ্ন মুছে যাও, ধরা রাঙিয়ে দাও॥

কিষাণ মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল,
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।
স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল ?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও॥

(অংশ)

গজল ও গীতিকা

১

রঙিন লা'লার দীপ শিখাতে হ'ল উজল শিলা কানন !
গানের দোলা জাগিয়ে গেল বনবিহগের কলকূজন॥

www.pathagar.com

এই বিজনে উঠলো ফুটে ফুল না ওরা পরীর দল !
নীল ঘন–নীল বর্ণবিভা, স্বর্ণতনু, পর্ণাভরণ ॥
ভোরের হাওয়া ছড়িয়ে গেল মোতির মালা এই শিশির,
পাপড়ি পাতায়, মুক্তামালায় উচ্ছল দিন—সূর্যকিরণ ॥
রূপের নেকাব উঠিয়ে নিতে ঐ অপরূপ মুখের 'পর
কি চাহে আজ ? মুখর দিনের নগর না এই বনভবন ॥
যাও ডুবে আজ আপন মাঝে তুলতে গোপন রত্ন বিভব
আমার যদি না হও তুমি, হও না কেন নিজের আপন ॥
মনের ভুবন জানি আমি দীপ্ত শিখা প্রতীক্ষার,
তনু ভুবন জানি সে তো—বঞ্চনা শেষ, শ্রান্তি মগন ॥
মনের বিভব আসলে মনে হারায় না সে আর কখনো,
তনুর বিভব ক্ষণিক ছায়া নিমেষে তার অপসরণ ॥
মনের ধরায় পাইনি আমি অচেনা দূর দেশীর রাজ,
পাইনি আমি মনের ধরায় কোন্ জনা শেখ—কে ব্রাহ্মণ ॥
কলন্দরের তত্ত্ব কথায় জীবন ভরি' ঘনালো লাজ
নয় গো আপন এই তনুমন অন্যে করি সমর্পণ ॥

২

নহ তুমি ধূলির তরে,
নহ নভ–নীলার তরে,
বিশ্ব নিখিল তোমার তরে,
তুমি নহ ধরার তরে ॥
দুঃখ–বিষাদ কাঁটায় ঘেরা
এই ধরণী—পৃথ্বিতল,
নয় গো এ ঠাঁই আশিয়ানার ;
নয় সুখ–নীড় বাঁধার তরে ॥
আর কত কাল রইবে তুমি
এই 'রাবী', 'নীল', 'ফোরাত' মাঝে
তরী তোমার অকূল সাগর
ঊর্মি–উতল বাধার তরে ॥
চাঁদ সিতারার কক্ষে যারা
নিদেশ দিত আপন হাতে,
আকুল চোখে চায় তারা হায়
আজকে নতুন দাতার তরে ॥
এমন বাণী আছে আমার
জানে না যা জিব্রাইল,
রেখেছি সেই বাণী গোপন
আরো সুদূর ধরার তরে ॥ (অংশ)

৩

এই সিতারার শেষে জাহান আছে আরো।
প্রেমের পথে ঝঞ্ঝা তুফান আছে তারা ॥

www.pathagar.com

শূন্যতা মোর শূন্য নহে প্রাণ পরশে,
এই কাফেলায় দল অফুরান আছে আরো ॥
গন্ধ-রঙে রঙিন ধরায় আজ থেমো না,
নীড়ের স্বপন, ছায়া বিতান আছে আরো ॥
ঊর্ধ্বচারী শাহীন তুমি নভঃগামী !
আকাশ পারে আকাশ খিলান আছে আরো ॥
শেষ হ'ল আজ একলা থাকার ক্লান্ত দিন ;
এই পথে মোর সন্ধানী প্রাণ আছে আরো ॥ (অংশ)

তারেকের দো'আ

(স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহ্সালার তারেকের প্রার্থনা)

এরা গাজী—এরা রহস্যজ্ঞানী বান্দা যে মহাবীর
যাদের উপর দিলে তুমি খোদা শুভাশীষ খোদায়ীর।
সাগর, সাহারা যাদের আঘাতে ভেঙে পড়ে দুই ভাগে,
শিলা শিহরায়, পাহাড়চূড়ায় ভয়ের নিশানা জাগে,
দুই আলমের বাজুবন্দ ছেড়ে বে-গানা করে যে দিল,
একী তার স্বাদ খুলে যায় যবে ঈশ্কের ঝিলমিল !

ঈমানদারের চরম বাসনা, লক্ষ্য যে শাহাদত,
দুনিয়া বিজয় শেষ চাওয়া নয়, চায় না সে গণিমত।
কত সুদীর্ঘ দিবস রজনী প্রতীক্ষমাণা লা'লা
রক্তাভরণ চেয়েছে আরবী শহীদের লহু ঢাকা !

এ মরুবাসীরে ক'রেছ একক বিরাট শক্তিবলে,
ভোরের আজানে, প্রভাতের টানে, চেতনা বহ্নিতলে,
ছিল অচেতন যে জীবন এই শতকের ঘুমঘোরে
নতুন চেতনা ফিরে এল তার অজানা এ বাহুডোরে !
হৃদয়ের দ্বার খুলিবার মত অপরূপ মনে হয় ;
মরণ আজিকে তাই কারু চোখে চরম মৃত্যু নয়।
মুসলমানদের দিল তুমি আজ আবার জিন্দা করো,
"ভয় নাই"—এই অভয় বাণীর বিজ্লি মশাল ধরো,
প্রতি হৃদয়ের সংকল্পের রূপ দাও দৃঢ়তার ;
সব মুমিনের দৃষ্টিকে তুমি কর আজ তল্ওয়ার ॥

কর্ডোভা মস্জিদ

১

দিন রাত্রির এ ধারা অধীর,—প্রতি কাহিনীর শিল্পী এই,
দিন রাত্রির এ ধারা অধীর,—জীবন মৃত্যু এরি মাঝেই !

www.pathagar.com

দিন রাত্রির এ ধারা অধীর,—দু'রঙে রাঙানো এই 'হারীর'
—এ রেশমে বোনে মূল সত্তা যে অশেষ বসন গুণাবলীর।
দিন রাত্রির এ ধারা অধীর, বীণাতারে সুর শাশ্বতের,
এরি মাঝে দেখে আদি সত্তা যে সব উত্থান ; পতন ফের।
দিন রাত্রির এ ধারা অধীর কুশলী যাচাইকারীর মত
তোমারে আমারে নিখিল ধরারে করে পরীক্ষা প্রতিনিয়ত।
যদি তুমি হও মূল্যবিহীন, যদি আমি হই অকিঞ্চন
মৃত্যু তোমার ললাটলিখন, আমারো ললাটলিপি মরণ !
কোন্ হাকিকত রাত্রি দিনের (সন্ধ্যা অথবা রাঙা প্রভাত) ?
সময়ের এক তরঙ্গ শুধু, নাই সেথা দিন, নাই তো রাত।
শুধু ক্ষণিকের বসতি এখানে, মৃত্যু এ পথে রয়েছে দায়ী,
ক্ষণস্থায়ী যে পৃথিবীর কাজ, দুনিয়ার কাজ ক্ষণস্থায়ী।
জানি আউয়াল, আখির ফানা ও জাহির বাতিন সকলি ফানা ;
যত তস্‌বির এই ধরণীর নবীন প্রাচীন সকলি ফানা ॥

২

সেই তস্‌বির যার বুকে ছাপ রেখেছে সময় চিরন্তন,
শেষ রেখা যার এঁকেছে মুমিন—মর্দে খোদা যে, খোদার জন,
প্রেমের পরশে মহীয়ান তার কর্মের ধারা অবিশ্রাম ;
প্রেমের উৎস সত্য জীবন মরণ যে তার হ'ল হারাম !
দ্রুত ধাবমান আর চঞ্চল যদিও কালের অমিত বেগ
বন্যা বিপুল এই প্রেমধারা, পারে সে থামাতে বন্যাবেগ।
বর্তমানের দিন ক্ষণ ছাড়া প্রেম-পঞ্জিতে জেনেছি তাই
রয়েছে অশেষ অজানা সময়, যাদের সঠিক অংশ নাই।
জিব্রাইলের নিঃশ্বাস প্রেম, প্রেম যে হৃদয় মুস্তফার,
জানি আল্লার রাসুল এ প্রেম, প্রেমেই খোদার কালাম সার।
প্রেম মত্ততা ক'রেছে ধূলিকে উজ্জ্বলতর, বহ্নিমান,
সুরা ও শারাব—পেয়ালা এ প্রেম মুখ দেখে যাতে মুগ্ধ প্রাণ।
কা'বার পথিক এই প্রেম, আর এই প্রেম হয় সিপা'সালার,
প্রেম রাহাগির, মঞ্জিল পথে রয়েছে হাজার মকাম তার।
জীবন-তন্ত্রী প্রেমের পরশে পেল গীতিকার এ সঞ্চয়,
প্রেম থেকে এল জীবনের জ্যোতি ; প্রেম থেকে প্রাণ বহ্নিময়।

৩

প্রেম থেকে জানি অস্তি তোমার ওগো মস্‌জিদ কর্ডোভার,
ক্ষয় নাই যার, নাই তো বিলয়, অতীত অথবা অধুনা আর।
হোক্ তস্‌বির অথবা পাথর, বেণুকার সুর অথবা গান
হৃদয়-রক্তকণায় শিল্প হয় জীবন্ত হৃদি সমান।
শিলাকে যে করে জিন্দা দিল, সে জিগরের তাজা কাতরা খুন,
হৃদয়-রক্তে জাগে অসহন বেদনা দহন, সুর ; আগুন।
হৃদয়-জাগানো প্রেরণা তোমার, হৃদয়-জ্বালানো আমার গান ;

www.pathagar.com

তুমি শুধু ডাকো আমি খুলে যাই সকল হৃদয় তিমির-ম্লান।
যদিও সীমিত এক মুঠো ধূলি দেখ চেয়ে রূপ নভঃনীলার
আরশের চেয়ে কম নয় জানি আদমের সিনা—বক্ষ তার।
কতটুকু লাভ, ফায়দা কি বল সিজদায় এই ফেরেশ্‌তার,
পাবে সে কোথায় আতশী দহন, আবেগ এমন ;—বেদনা ভার।
যদিও কাফের আমি হিন্দের দেখ এ জওক, শওক ঘোর,
দরূদ সালাত হৃদয়ে আমার, দরূদ সালাত ওষ্ঠে মোর।
তীব্র বাসনা সুর তন্ত্রীতে, তীব্র বাসনা বেণু-বীণায়,
জাগে : আল্লাহু, আল্লাহু গীতি প্রতি ধমনীতে, প্রতি শিরায়।

৪

অপরূপ এই গঠন তোমার, মর্দে খোদার এই দলিল ;
সে-ও ছিল জানি জলিল, জমিল ;—তুমিও জলিল, তুমি জমিল।
ভিত্তি তোমার রয়েছে অটুট, বেশুমার থাম হয়নি নত,
র'য়েছে দাঁড়ায়ে সিরিয়ার বালু বক্ষে খেজুর বীথির মত।
তুর পাহাড়ের নূর দেখা যায় তোমার মুক্ত দরজা থেকে,
জিব্রাইলের ইশারা যেমন মিনারচূড়ায় যায় গো ডেকে।
মর্দে মুমিন—মুসলমানের সত্তা কখনো মেটে না জানি,
আজান ধ্বনিতে খুলেছে সে মুসা, ইব্রাহিমের গোপন বাণী।
জমিনের নাই গণ্ডী যে তার, আসমান তার সীমানাহীন,
দজ্‌লা, ফোরাত, দানিয়ুব, নীল তার দরিয়ার স্রোতে বিলীন।
দেখেছে সে জানি জটিল সময়, জানে সে কাহিনী সুরের রেশ,
গত রাত্রিকে অনাগত পথে চ'ল্‌বার সেই দিল নিদেশ।
তৃষিত প্রাণের সাকী সেই জানি,—মরু পথচারী আকাঙ্ক্ষার,
খাঁটি শারাবের পেয়ালা সে হাতে, হাতিয়ারে খাদ মেশেনি আর।
বীর সৈনিক হাতে তলোয়ার : লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্...
তলোয়ার ছায়ে বর্ম যে তার : লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্...

৫

রহস্য যত মুমিন জনের তোমার তরেই হ'ল প্রকাশ,
আতশী দিনের আবেগ যে তার, দীর্ঘ রাতের তপ্ত শ্বাস।
বুলন্দ্ মকাম পেয়েছে সে যার কল্পনা ছোঁয় নভ-কিনার,
তার মত্ততা, অপার বাসনা, নম্রতা আর গরিমা ভার।
বান্দা মুমিন মুসলমানের হাত জানি আমি খোদার হাত,
কারিগর সেই কর্মস্রষ্টা, জয়গাথা লেখে যার বরাত।
খাকে আর নূরে গড়া যার তনু পেল সে বান্দা প্রভুর গুণ,
দু'জাহান থেকে মুক্ত সে জানি, দিল বে-নেয়াজ প্রেম-আগুন।
স্বল্প উমিদ, মহৎ লক্ষ্য ছুঁয়ে যায় তার আকাশ নীল,
তার আচরণে, তার দৃষ্টিতে জিন্দা হয় যে মুর্দা দিল।
মধুর অথবা সেই মৃদুভাষী, ক্ষিপ্ত শুধু সে অন্বেষণে,
জঙ্গে জেহাদে মুক্ত হৃদয়, সততা সুঠাম জাগে সে মনে।

www.pathagar.com

মর্দে খোদার দৃঢ় বিশ্বাস চির সত্যের কেন্দ্রভূমি,
তামাম আলম শেষ হয় যেথা শুধু কুহেলির প্রান্ত চুমি'।
যুক্তি জ্ঞানের সেই মঞ্জিল,—প্রেম থেকে গড়া সত্তা যার,
সারা বিশ্বের মহফিলে সেই দীপ্ত আত্মা পূর্ণতার।

৬

ওগো মস্‌জিদ ! প্রাণৈশ্বর্যে ধর্মের তুমি মুক্ত দান,
তোমার তরেই আন্দালুসিয়া পেয়েছে জমিনে কা'বার মান।
তোমার তুলনা খোঁজে যদি কেউ আকাশের নীচে এই ধরায়,
পাবে সে কেবল মুমিনের দিলে পাবে না অন্য কালো ছায়ায়।
আহা সেই সব সত্য পথিক আরবের বীর ঘোড়সোয়ার
ঈমানের পথে মুজাহিদ যারা আন্‌লো মহৎ নীতি বিচার,
রহস্যগাথা তাদের জীবন, তাদের শাসন খুলেছে এই
হৃদয়ের এই রাজ্য শাসনে রাজসিকতায় ম্লানিমা নেই।
প্রাচী প্রতীচীকে শেখালো তারাই, খুলে দিল দ্বার বিজ্ঞানের,
শত অজানার আঁধার যখন ছিল বুকে চেপে প্রতীচ্যের।
আজো দেখি তাই তাদের রক্তে আন্দালুসের নারী ও নর
উজ্জ্বল মুখ, উদার হৃদয়, আতিথেয়তার নয়তো পর।
আজো দেখি তাই সঞ্চরি ফেরে মৃগাক্ষী যত কাননময়,
এখনো তাদের দৃষ্টির তীর পার হয়ে যায় ভীরু হৃদয় ;
'য়েমনের সেই খোশবু হাওয়ায় পাই যে এখনো, ওঠে যে রণি'
এ মাটির গানে আরবের সুর,—দূর হেজাজের প্রতিধ্বনি।

৭

সিতারার চোখে তোমার জমিন অপরূপ নীল নভ সমান,
কত শতাব্দী, আহা কত যুগ শোনেনি এ মাটি সেই আজান।
কোন্ সে বিরান অধিত্যকায় অথবা সে কোন্ জমিনে হায়
ঝঞ্ঝা ঝড়ে ও ঘূর্ণাবর্তে প্রেমের কাফেলা পথ হারায় !
দেখেছে একদা জার্মানী তার ধর্মীয় নীতি সংস্কার,
পুরাতন রীতি স্মৃতির নিশানা জানি কোনখানে রাখেনি আর,
পাদ্রী পোপের সততা এখন যেন সে অলীক আখ্যায়িকা,
ছুটেছে এখন চিন্তার তরী সম্মুখে স্রোত কুজ্‌ঝটিকা।
আঁখি বিস্ফারি দেখেছে ফরাসী খুন-রাঙা সেই ইনকিলাব,
প্রতীচীর বুকে দিয়েছে যা এনে বিপর্যয়ের এ সয়লাব।
জীর্ণ প্রাচীন রোম ছিল নিয়ে রক্ষণশীল প্রথা, বিচার,
নবজাগরণে চেয়েছে সে ফিরে নওজোয়ানীর নওবাহার।
সেই বিক্ষোভ ঘূর্ণিতে ঘোরে ইস্‌লাম আর মুসলমান,
এ খোদায়ী 'রাজ'—রহস্য যার পারে না জানাতে কারু জবান।
দেখ সমুদ্রতল হতে কোন্ সম্ভাবনার হয় প্রকাশ,
দেখ কোন্ রঙে বদ্‌লায় আজ নীলা গম্বুজ—নীল আকাশ।

www.pathagar.com

৮

গোধূলি-মগ্ন মেঘ ছুঁয়ে যায় খাড়া পাহাড়ের উঁচু কপাল,
সূর্যাস্তের রক্তাভা যেন বাদাখশানের হীরক লাল !
সহজ, সরল কৃষাণ কুমারী গেয়ে যায় এক আতশী গান,
হৃদয়-তরীর পথে যৌবন যেন উচ্ছল বিপুল বান।
শোন নদী ধীর 'বাদিল কবীর' বিদেশী পথিক তীরে তোমার,
দুই চোখে তার নেমেছে এখন অন্য যুগের স্বপ্নভার।
আছে তকদির পর্দা আড়ালে লুকানো এখনো নয়া জাহান,
নেকাব-মুক্ত তবু তার ঊষা দু'চোখে আমার দীপ্তিমান।
যদি চিন্তার মুখ থেকে আমি সরাই ঘোমটা ; প্রতীচী তবে
হবে চঞ্চল, আমার গানের অগ্নি দহনে অধীর হবে।
মরণ সমান সে জীবন, যেথা নাই বিপ্লব—ইনকিলাব !
সকল জাতির এই প্রাণধারা, চিত্ত বিভব—ইনকিলাব !
ভাগ্যের হাতে কওম যেমন খর তরবার তীক্ষ্ণধার,
প্রতি মুহূর্তে নেয় যে হিসাব, নাই নিষ্কৃতি সেখানে আর।
সকল চিত্র অসম্পূর্ণ হৃদয়ের তাজা রক্ত ছাড়া ;
সব সংগীত বিষাদে পূর্ণ হৃদয়ের তাজা রক্ত ছাড়া॥

জিব্রাইল ও শয়তান

জিব্রাইল

প্রাচীন দিনের সঙ্গী ! গন্ধ ও বর্ণের বিশ্বে কি নিয়ে তোমার দিন যায় ?

শয়তান

অগ্নি ও আক্রোশে তিক্ত, বিস্বাদ ব্যথায় ম্লান, প্রতীক্ষায়, ক্লান্ত প্রত্যাশায়।

জিব্রাইল

যায় না এমন ক্ষণ যখন তোমার নাম জান্নাতে হয় না উচ্চারণ !
হৃত গৌরবের পথে পারো না কি মুছে দিতে গ্লানি-ম্লান ও ছিন্ন দামন ?

শয়তান

কী গোপন অভিশাপে জ্বলি আমি রাত্রিদিন বুঝিবে না—হায় জিব্রাইল !
বিভ্রান্ত, উন্মাদ চিত্ত জান্নাতে এসেছি ফেলে পান-পাত্র—স্বপ্নের নিখিল !
এখানে ধরার বক্ষে মুহূর্তের অধিবাস—অসম্ভব ; এ যে অসম্ভব।
এ নৈঃশব্দ্যে নাই পথ, গৌরব-প্রাসাদ নাই ; নাই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের রব !
আশার বিদ্যুৎ যার নিখিল বিশ্বের বুকে ছায়া ফেলে তিক্ত বেদনার
কি আশ্বাস দেবে তারে, নিরাশ হোয়ো না কভু কৃপাময়—
কৃপাময় আল্লার ?

জিব্রাইল

তোমার উন্নত শির নামায়েছে ধূলিতলে অকল্পিত বিদ্রোহ তোমার,
অবশিষ্ট আছে আর ফেরেশতার কি সম্মান, কি মর্যাদা দৃষ্টিতে আল্লার ?

www.pathagar.com

শয়তান

আমার বিদ্রোহী আত্মা জ্বালিয়াছে অনির্বাণ বহ্নিশিখা আদমের বুকে
আমারি বিদ্রোহে যুক্ত বুদ্ধি-মননের বস্ত্রে ধূলিমুষ্টি চলেছে সম্মুখে।
সত্য অসত্যের দ্বন্দ্বে দ্রষ্টা তুমি দূরবর্তী দূরপ্রান্তে আছো দিবাযামী,
প্রমত্ত ঝঞ্ঝার মুখে কে জাগে সংগ্রামী চিত্ত—জিব্রাইল ! তুমি কিংবা আমি ?
খিজির সহায়হারা, অসহায় ইলিয়াস সে ঝড়ের প্রমত্ত গতিতে !
আমার ঝঞ্ঝার পথ সমুদ্রে সমুদ্রে আর তরঙ্গিত নদীতে নদীতে।
তবু তুমি এই প্রশ্ন শুধায়ো আল্লার কাছে পাবে তাঁর যখন দিদার,
মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়েছে আজ অফুরান প্রাণ-রক্তে কার ?
সর্বশক্তিমান যিনি—বিকীর্ণ কাঁটার মত বক্ষে তাঁর জাগি যে অম্লান,
চিরন্তন কাল শুধু তোমরা গুঞ্জরি যাও : সুমহান প্রভু সুমহান।

বু'আলী কলন্দর

মুহব্বতের কুঅতে যখন সত্তার পূর্ণতা
শক্তি তাহার মুষ্টিতে আনে সসাগরা ধরাতল,
তার কব্জায় ঝলসিয়া ওঠে আল্লার দেওয়া বল !
ধরা পড়ে তার মুঠিতে ধরার সঞ্চয় ; সম্বল।
ভাঙে সে রাতের নিঁদ,
নির্দেশ তার মেনে চলে ভয়ে দারিয়ুস ; জামশিদ।

যাঁর কথা জানে সারা হিন্দুস্তান—
জালালী ফকীর বু'আলী কলন্দর,
যার পরশনে মরুভূমি হ'ল জান্নাত-সুন্দর,
প্রসঙ্গ যাঁর এনে দিল ফের তাজা গোলাবের গান,
তাঁর জীবনের একটি কাহিনী শোনাবো অতঃপর ;
—তামাম হিন্দে মশহুর যিনি বু'আলী কলন্দর।
এক দিন তাঁর ভক্ত মুরীদ চলেছিল পথে একা,
ফুটেছিল তাঁর ললাটে চিন্তা, ধ্যান-গম্ভীর লেখা।
বাদশার প্রিয়, সুবার আমীর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে
চলেছিল, সাথে লশকর চলে তাঁর নির্দেশ বয়ে।
সমুখে যখন পড়িল তাঁদের ফকীর দীউয়ানা সেই
নকীব তখন ফুকারিয়া বলে এই :
"বেহুঁশ পথিক, পথ ছেড়ে চল আমীর ওমরাহের।"

দুনিয়ার হাল ছিল না সে ফকীরের,
আপনার ভাবে বিভোর হ'য়ে সে চ'লেছিল এক মনে,
আমীরের এক উদ্ধত দাস নির্ভীক সেই ক্ষণে
ক্রুদ্ধ আঘাত হানিল হেলায় শিরে সেই ফকীরের।
আমীরের পথ ছাড়িয়া আহত ফকীর চলেন ফের।

www.pathagar.com

ক্ষত মস্তক জীর্ণ বস্ত্রে বাঁধি
কলন্দরের দরবারে এসে ফকীর পাড়িল কাঁদি।

গর্জি উঠিল নিমেষের মাঝে বু'আলী কলন্দর,
জ্বলিয়া উঠিল আগুনের মত প্রশান্ত অন্তর,
গলিত লাভার বন্যা ভাসালো সুষুপ্ত বন্দর।
মিসমার করি বজ্র যেমন পড়ে পর্বতচূড়ে
তেমনি আদেশ ধ্বনিয়া উঠিল কলন্দরের সুরে,
বলিল : এখনি ফকীরের লিপি দাও শাহী দরবারে,
দরবেশী এই পত্র পাঠাও হিন্দের বাদশারে,
"আমার ভক্ত মুরীদে মেরেছে আমীর অকস্মাৎ,
ঢেলেছে সে তার জীবনে তীব্র জ্বলন্ত হুতাশন,
এখনি বন্দী কর তুমি সেই—আমীর খবীস-মন ;
নতুবা অন্যজনারে দানিব তোমার সালতানাত।"

আল্লাহ্ওয়ালা ফকীরের চিঠি গেলে বাদশার কাছে
থরথর করি' কাঁপিয়া উঠিল বাদশা বিষম ভয়ে,
সূর্য যেমন নিষ্প্রভ হয় রোশনি আসিলে ক্ষয়ে
বিবর্ণ হ'ল বাদশা তেমনি ফকীরের চিঠি পেয়ে।
হাতকড়া এক পাঠালো তখনি সেই আমীরের তরে
কলন্দরের কাছে মাফ চায় বাদশা বিষম ডরে।
বু'আলীর কাছে দূত হ'য়ে গেল আমীর খসরু কবি ,
—যাঁর কাব্যের মাধুরী জাগাতো জোছনা রাতের ছবি,
যাঁর সুরজাল জাগিত গভীর মৌলিক মন হতে,
ভেসে যেত এই হিন্দের বুক সে সুর-ধারার স্রোতে...
তাঁর সঙ্গীতে বু'আলীর মন গলিল কাঁচের মত ;
কাব্যসুষমা রাখিল সেবার বাদশাহী অক্ষত।

পাহাড়ের মত সাম্রাজ্য সে তবু
হ'ল মহীয়ান কাব্যের সরণিতে !
আহত কোরো না ফকীরের দিল্ কভু,
ফেলো না নিজেকে জ্বলন্ত বহ্নিতে॥

পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে

মুজাদ্দিদের মাজারে আজ এ দিল বেকারার !
আকাশতলে মাটি যেমন আলোর সম্ভার॥
পায় সিতারা শরম যে এই ধূলিকণা দেখে,
হেথায় গোপন মর্দে মুমিন সাহেবে আস্রার॥
জাহাঙ্গীরের সম্মুখে যাঁর হয়নি নত শির,
নিশ্বাসে যাঁর উষ্ণতা পায় আজাদী-আহ্রার॥

www.pathagar.com

হিন্দে যিনি মিল্লাতেরি ছিলেন নেগাহবান্,
আল্লা যাঁকে ক্রান্তিকালে করেন হুঁশিয়ার॥
আর্‌জি ওঠে তখন প্রাণের : দাও ফকীরি মোরে,
দুই চোখে হায় দৃষ্টি তবু জাগ্রত নই আর॥

আফসোস এই জিন্দেগীতে হওনি শাহীন তুমি,
দৃষ্টি তোমার এই জীবনে চেনেনি ফিত্‌রাত,
সকল ভাগ্য নিয়ন্তার এ অমোঘ বিধান জেনো
দুর্বলতার কঠিন সাজা মৃত্যু অপঘাত॥

পাশ্চাত্যের শক্তি

পাশ্চাত্যের শক্তি সে নয় রোবাব অথবা বেহালাতে,
নাই সে শক্তি পর্দাবিহীন নারীর নৃত্য জলসাতে,
নাই সে শক্তি পুষ্পমুখী ও যাদুকরীদের মায়াজালে,
নাই অভিনব কেশ-কর্তনে, নগ্ন উরুর তালে তালে,
নাই সে শক্তি নাস্তিকতায়—ধর্মবিহীন মতামতে
নাই সে শক্তি লাতিন হরফে—প্রাচীন লিপির শরাফতে,
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প থেকে সে পেয়েছে বিশ্বে বিপুল বল,
এ আগুন থেকে চিরাগ যে তার হ'ল রওশন—সমুজ্জ্বল।

নাই হিকমত পোশাকের ছাটে, পাবে না জামার বদৌলতে ;
প্রতিবন্ধক নয় জেনো কভু পাগড়ি আমামা জ্ঞানের পথে॥

গতি

সারা জাহানের জিন্দেগী শুধু চলার মাঝে,
"রস্‌মে কুদিম"—এ রীতি প্রাচীন সকল কাজে।
শোন রাহাগির ! এ পথে দাঁড়ানো কুহক প্রীতি,
গতিহীনতার মাঝে সুগোপন মরণ ভীতি।

যারা গতিমান, এই পথে তারা গিয়াছে হেসে,
দাঁড়ায়েছে যারা শেষ হ'ল তা'রা জড়ের বেশে।

আমলে বরজাখ

মুর্দা
সে আগামীকাল কবে, কোন দিন ;—রোজ কেয়ামত হবে যখন
যদি জানো তুমি প্রাচীন আবাস ! বল তবে তার রূপ কেমন।

www.pathagar.com

কবর

জানো না কি তুমি শত বর্ষের মুর্দা তুহিন মরণে ছাওয়া
রোজ কেয়ামত প্রতি মৃত্যুর পিপাসা-বিধুর চরম চাওয়া।

মুর্দা

পরম কাম্য রোজ কেয়ামত গোপন চাওয়া যে মরণে, তার
পড়ি নাই ফাঁদে, হইনি শিকার,—নাই সংযোগ সাথে আমার।
মৃত লাশ আমি শত বর্ষের, একশো বছর হ'য়েছে পার ;
তবু নই আমি পেরেশান এই আঁধার জঠরে মৃত্তিকার।
আর একবার জীর্ণ এ দেহে আত্মা আমার হবে সোয়ার,
—এই যদি হয় রোজ কেয়ামত, তবে নই আমি খরিদ্দার।

গায়েবী আওয়াজ

সাপ, বৃশ্চিক আর পশুদল,—কারো তক্‌দির নয় এমন,
দাস জানি যারা তাদের ভাগ্যে রয়েছে মৃত্যু চিরন্তন।

ইস্রাফিলের আওয়াজ ওদের পারে না তো দিতে ফিরায়ে প্রাণ,
জীবনেও ওরা মরার শামিল, বোঝা ব'য়ে যায় অপরিমাণ।
মৃত্যুর পরে ফিরে যাওয়া প্রাণে মুক্ত জনের এ তক্‌দির,
জীবিত প্রাণীর ভাগ্যে যদিও আছে একবার স্বাদ মাটির।

কবর (মুর্দার প্রতি)

দুনিয়ায় ছিলে গোলাম, কেন তা বলনি জালিম দীর্ঘ দিন ?
বুঝেছি এবার কি কারণে, কেন আমার এ খাক কালো কঠিন !
মলিন আমার এ মাটির রঙ হ'ল কাল সিয়া তোমারি তরে,
ইজ্জৎহারা এ মাটির মন ওঠে শিহরিয়া তোমারি তরে।

মাটির দোআ

শোন পাক জাত মালিক আল্লাহ্ !—শোন ফরিয়াদ আজ আমার,
পানাহ্ দাও খোদা ! গোলামের লাশ থেকে পানাহ্ চাই হাজারবার।

গায়েবী আওয়াজ

এই পদ্ধতি প্রাণের যদিও আনে সৃষ্টিতে বিপর্যয়,
তবু রহস্য জিন্দেগানির এ পথেই হয় জীবনময়।
'জ্বলজ্বলা' ঐ ভূকম্পনের যে আঘাতে ওড়ে খাড়া পাহাড়,
সে জ্বলজ্বলায় অধিত্যকায় ফিরে আসে ফের নওবাহার !
অপরিহার্য সৃষ্টির পথে চরম ধ্বংস বিশ্বত্রাস
জীবনবোধের জটিল চক্রে এই সমাধান,—এ আশ্বাস।

জমিন

এ চিরন্তন মৃত্যু এবং জিন্দেগানির এই জেহাদ,
এই সংগ্রাম হবে নাকি শেষ, মিটবে নাকি এ বিসম্বাদ ?

www.pathagar.com

পুতুল-পূজার মোহ থেকে মন পায়নি তো আজও তার নাজাত,
জ্ঞানী, জ্ঞানহীন হয়েছে গোলাম, প্রভু যে ওদের লাত মানাত !
কোথায় অতলে হারালো মানুষ, হারালো কোথায় সেই সিফাত !
দৃষ্টিতে আর হৃদয়ে আমার এ যে গুরুভার শিলা প্রপাত !
কেন মানুষের দুঃখ রাতের শেষে নামছে না আজ প্রভাত ?

জামানা

যা আছে আজ আর হবে না,
যা ছিল তার নাই নিশানা,
আসেনি যা তারি পথে
জাগে অশেষ এই জামানা ॥
কণায় কণায় যায় ছড়িয়ে
এই সুরাহি পাত্র থেকে,
গণি আমি আপন মনে
দিন রজনীর তস্‌বিদানা ॥
সবার সাথে চেনা আমার
তবু যে মোর পথ নূতন
বাহন আমি, আমি সওয়ার ;
কঠিন আমার আঘাত হানা ॥
কার বল দোষ,—যদি তুমি
না এলে মোর মহ্‌ফিলে,
রাতের শারাব দিনে দেওয়ার
রীতি আমার নাই তো জানা ॥

আমার কথা জানে না কেউ,
জানে না ঐ জ্যোতির্বিদ,
জানে না তার তীরের ফলক
কোথায় শিকার ; কোন্ ঠিকানা ॥

নয় প্রতীচীর সন্ধ্যা রঙিন,
রক্ত নদী ঐ দূরে,
ভোরের পানে দেখ চেয়ে
আজ ও কালের শেষ সীমানা ॥

বিশ্ব-ধরার স্বভাব থেকে
ছিনিয়ে নিল শক্তি যে,
নয় নিরাপদ বিজ্‌লিশিখায়
এখন যে তার আশিয়ানা ॥

www.pathagar.com

জানি ওদের মৌসুমী আর
নীল দরিয়া, নৌ-বহর,
কেমন করে রুখবে তবু
ভাগ্যলিপির এই বাহানা ॥
নতুন জাহান উঠ্‌ছে জেগে
মৃত্যুমুখী এই ধরা,
ফিরিঙ্গীদের কারসাজিতে
হ'ল যে হায় খুমারখানা ॥

ঝড়তুফানের মুখে যে জন
জ্বালিয়ে রাখে দীপশিখা ;
সেই দরবেশ,—বান্দা খোদার
পায় দৌলত শাহিয়ানা ॥

মোনাজাত

যারা করুণার প্রার্থী,—তাদের
মুশকিল তুমি করো আসান
এই অসহায় পিপীলিকাদের
সুলায়মানের করো সমান ॥

সেই দুর্লভ ঈশকের শিখা
করো তুমি আজ সুলভে দান,
হিন্দের এই মঠবাসী জনে
করো তুমি খোদা মুসলমান ॥
সঘন বিষাদে বহিছে নয়নে
অঝোরে অশ্রু-রক্তধার ;
কোটি খঞ্জরে দীর্ণ হৃদয়
হাহাকার করে ওঠে আবার ॥

পুষ্প-সুরভি ক'রেছে প্রকাশ
গোপন কাহিনী মালঞ্চের ;
হবে বিশ্বাসহন্তা কুসুম !
নেবে কি ভ্রান্ত ভূমিকা ফের !

ফুল মৌসুম শেষে দেখি আজ
পড়ে আছে তার বন বীণার ;
বিরান এখন গোলাব কানন
গানের পাখীরা গাহে না আর ॥

www.pathagar.com

শুধু গেয়ে যায় সারা দিনমান
বুলবুল এক সঙ্গীহারা ;
সুরে ও বিষাদে পূর্ণ কণ্ঠ
ঢালে হৃদয়ের রক্তধারা ॥

সনুবর শাখা ছাড়িয়া কখন
গীতি বিহঙ্গ গিয়াছে চলি,
ঝরা কুসুমের পাপড়িতে হায়
ছেয়ে গেছে সারা বনস্থলী।

এ গুলশানের সব গৌরব
সব রীতি হ'ল অপসরণ ;
পত্র-বিরল প্রশাখা যে তার
নগ্নতা হেরি চায় মরণ ॥

চলমান এই ঋতুর চক্রে
গাহে এক পাখী আপন মনে,
সঙ্গীহীনতা ভুলবে সে যদি
বোঝে কেউ ব্যথা এ ফুলবনে ॥
আনন্দ-হারা জীবন এখানে
মরণ আনে না স্বস্তি আর
দীর্ঘশ্বাস ভরেছে আকাশ
দেয় প্রশান্তি রক্তধার !

আরশি আমার এ হৃদয় থেকে
চিন্তাধারার জাগে প্রয়াস,
কত উজ্জ্বল স্বপ্নের দল
এ হৃদয়ে মোর চায় প্রকাশ ॥

এ কাননে কেউ বোঝে না আমার
ব্যথা-দীর্ণ এ প্রাণের জ্বালা
বেদনা-চিহ্ন যার বুকে
সমব্যথী মোর নাই সে লা'লা ॥

যেন গো দীর্ণ হয় প্রতি মন
এ করুণ গানে বুলবুলের,
বাঙ্গে দারার ভাঙে যেন ঘুম
সব হৃদয়ের—;মৃত মাঠের ॥

যেন জীবন্ত হয় প্রাণময়
এই সঙ্গীতে সারা নিখিল
প্রাচীন সুরায় তৃষার আবার
জাগে যেন সব পিয়াসী দিল্ ॥

www.pathagar.com

আজম দেশের পেয়ালা যদিও
হিজাজী শরাব পাত্রে মোর,
হিন্দের এই গীতিকা তবুও
রয়েছে হিজাজী সুরের ডোর॥

অশ্বেতর ও সিংহ

সিংহ
মরু আর বনে বসতি যাদের
তুমি তো তাদের গোত্রে নহ,
কে তুমি? তোমার কোন্ খান্দান
কে তোমার পিতা? কে পিতামহ?

অশ্বেতর
আমার মামার সাথে হুজুরের
নাই পরিচয় সম্ভবত
যিনি বাদশাহী আস্তাবলের
গৌরব;—গতি ঝড়ের মত॥

"শেকোয়া" থেকে

১
কেন সয়ে যাব এ ক্ষতির পালা
লাভের অঙ্ক নির্বিকার?
আগামী দিনের বুক ভরে কেন
নেব অতীতের বিষাদভার?
মুগ্ধ শ্রবণ রবে উন্মন
শুনতে কি সুর বুলবুলের!
নিশ্চুপ কেন রবো চিরদিন?
ফুল নই আমি মালঞ্চের!
এই পুঞ্জিত বেদনায় আজ
জীবন আমার বাণী মুখর
আল্লাহ্‌র নামে নালিশ আমার
হোক এই মুখ ধূলিধূসর॥

২
তোমার বন্দা সেবক নামেই
আমি খ্যাতিমান এই ধরায়
শোনাই তবু এ দুখের কাহিনী
মুক্ত তোমার রাজ-সভায়।

www.pathagar.com

নীরব যদিও হৃদয়-তন্ত্রী
গুমরায় প্রাণ করুণ রবে
যদি ক্রন্দনে আসে গো বাহিরে
ক্ষমতা করো দোষ হে প্রভু ! তবে

দেখ অভিযোগ যে এনেছে তার
ভক্তের ছাপ র'য়েছে বুকে
বন্দনা করা রীতি যার, প্রভু !
শোন এ নিন্দা তাহারি মুখে।

সময়ের পরে তোমার সত্তা, প্রভু !
অস্তিত্ব ঘিরে ছিল গুলশান।
গোলাপ যদিও ছিল মালঞ্চে তবু
সুরভি তখনো হয়নি প্রকাশমান

* *

মন্দিরে বলে মূর্তিরা আজ
: গেল মুসলিম ঈমানদার
তোলে আনন্দ উল্লাস ধ্বনি
গেল চ'লে যদি দ্বারী কাবার।।

* *

চ'লে গেল তারা গাহিত যাহারা
মুক্ত কণ্ঠে হুদীর গান,
চ'লে গেল তারা এই অবেলায়
সাথে নিয়ে গেল আল কোরান।।

কাফের বে-দ্বীন দেয় টিটকারি
কি ক'রে তোমার প্রাণে তা সয়
তৌহিদ তরে হৃদয়ে তোমার
জাগে না কি সাড়া বেদনাময় ?

তোমার দুনিয়া মুসলিম ছাড়া
অন্য সবারে চায় যে আজ
স্বপ্নবিলাসী ছিল যে ভুবন
সেই শুধু তোলে ফাঁকা আওয়াজ।।

তবে তাই হোক চ'লে যাই মোরা
আসুক অন্য জাতি ধরায়
চ'লে গেলে তুমি বলো না আবার
তৌহিদ শিখা নিল বিদায়।

ধরণীর বাস চাহি মোরা যাতে
নাম থাকে তব মহিমাময়
সাকী যদি আর না থাকে তবে
শুধু কি সুরার পাত্র রয় ?

www.pathagar.com

জঙ্গে জিহাদে যুদ্ধের মাঠে
পড়েছি নামাজ হ'লে সময়
কাবা-মুখী সব আহ্‌লে হেজাজ
সিজদাতে শির পেত অভয়॥

হোক মাহমুদ অথবা আয়ায
দাঁড়ায়েছি মোরা এক কাতার
মানিনি বিভেদ পাশাপাশি থেকে ;
কেবা সুলতান, ফকীর আর॥

জানি নাই দিন, মানিনি রাত্রি
তোমার ধরায় অনবরত
তৌহিদী সূরা বহি অবিরাম
ফিরেছি তোমার সাকীর মত॥

পার হয়ে গেছি মরু বিয়াবান
পার হয়ে গেছি খাড়া পাহাড়
তুমি বলো প্রভু, ব্যর্থতা নিয়ে
আমরা কখনো ফিরেছি আর ?

শুধু জমিনেই নহে তবে শোন
সত্য নিশান বহি তোমার
অতলান্তিকে ঝাঁপায়ে পড়েছি
চিরদুর্জয় ঘোড়সওয়ার॥
হ'ল দরবার শূন্য তোমার
নিয়াছে বিদায় প্রেমিক যারা।
নিয়াছে বিদায় নিশীথের শ্বাস
প্রথম প্রাতের অশ্রুধারা॥

যারা দিয়েছিল হৃদয় তোমারে
নিয়ে গেছে তারা পুরস্কার॥[১]

জওয়াব-ই-শিক্‌ওয়া

অতীতের সেই গরিমার দিন,—শেষ হ'ল তার পালা,
নওবাহারের গৌরবভার হারায়েছে গুলে লা'লা।
যখন আশিক ছিল মুসলিম,—প্রেমিক সে আল্লার,
ছিল কি অভাব দরদী দিলের প্রেমের একাগ্রতার ?
মেনে নাও তবে মহান সংজ্ঞা সুদৃঢ় সত্যের
করো প্রতিষ্ঠা নবীর বিধান ;—কানুন আহমদের॥

---

১. ফররুখ আহমেদের পাণ্ডুলিপির প্রাথমিক খসড়া থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

আজ সুকঠোর জাগরণ তব নব প্রভাতের তীরে
আজ তুমি ভালবাস না আমারে ভালবাসো সুপ্তিরে,
রমজান মাসে রোজার বিধানে দেখ আজ কঠোরতা !
বলো বলো তবে এই কি তোমার প্রেমের একাগ্রতা ?
দৃঢ় বিশ্বাস বৃন্তের 'পরে জাগে কওমের মন
আসমানে তারা নাহি জাগে, যদি না থাকে আকর্ষণ ॥

*

মুহম্মদের সরণি ছাড়িয়া কা'রা হ'ল পলাতক ?
সুবিধাবাদের পন্থা খুঁজিয়া নিল কে প্রবঞ্চক ?
কারা হ'ল আজ পর-পদ-লেহী অন্যের অনুসারী ?
পিতৃ-পন্থা ত্যাগী হ'ল কারা শ্রান্তির পথচারী ?
হৃদয়ে তোমার নাই যে বেদনা, নাই আর ভাবাবেগ
মুহম্মদের পয়গামে তব নাই শ্রদ্ধার রেখ ॥

*

মসজিদে শুধু আসে গরীবেরা মোর,
সহিছে গরীব সিয়ামের তৃষা ঘোর,
শুধু গরীবেরা নেয় যে আমার নাম,
বাঁচায় সে আজো পর্দা তোমার ;—পুরায় মনস্কাম।
মাতাল ধনিক ঐশ্বর্যের ডোরে
মত্ত নেশায় ভুলিয়া গিয়াছে মোরে ॥

*

মুফ্‌তী আজিকে হারায়েছে তার প্রজ্ঞার পূর্ণতা,
নাই হৃদয়ের সেই উত্তাপ, নাই বাক মত্ততা,
র'য়েছে আজান, নাই শুধু আর পাক রুহু বিলালের ;
দর্শন আছে, নাই গাজ্জালী—প্রতীক সে মুমিনের।
মস্‌জিদ শোকে মর্সিয়া পড়ে, নামাজী সেথায় নাই ;
হিজাজী ঈমানদারের চিহ্ন কোথাও খুঁজে না পাই ॥

*

আয়েশ-পূজারী ! দিন কাটে তব আরাম প্রত্যাশায়,
মুসলিম নামে পরিচয় দাও...এই কি নিশানি...হায় !
নাই হায়দরী তুষ্টি, নাহি যে বিত্ত ওসমানের ;
কোন্ সংযোগ রাখো তুমি আজো সে পিতৃপুরুষের ?
কুল মখলুকে ছিল মাননীয়, ছিল যারা মুসলিম।
কোরান ছাড়িয়া পাও শুধু আজ অপমান নিঃসীম ॥

*

আত্মহন্তা তোমরা, তাদের ছিল যে আত্মজ্ঞান,
ভ্রাতৃত্বের বিরোধী তোমরা, তারা ছিল মহীয়ান,
বাক্য-বিলাসী তোমরা, তাহারা ফিরেছে কাজের টানে,
কুসুমের তরে কাঁদো, তারা ছিল নির্লোভি গুলশানে !
সারা দুনিয়ার সব জাতি শোনে তাদের কীর্তিগাথা ;
কালের বক্ষে সেই গৌরব আসন রয়েছে পাতা ॥

www.pathagar.com

নিরাশ হয়ো না তবু বাগবান দেখি এ শূন্য পুরী,
আসবে সুদিন সিতারার মত ফুটবে ফুলের কুঁড়ি,
মুছে দিতে হবে শুধু বাগানের সকল আবর্জনা,
শহীদী রক্তে জাগবে কুঁড়িতে ফুটবার মূর্ছনা,
দেখ দিগন্তে রক্ত রঙিন প্রতীচীর অম্বর
উদয়-সূর্য রশ্মির এই রক্তিম স্বাক্ষর॥

*

নিখিল জাহান জানে না যে দাম, মূল্য জানে না হায়!
কুল মখলুক সেই পরিচয় আবার জানিতে চায়
তোমার কাকুতি, অনুভূতি, প্রাণ ধরণীর সম্পদ
মখলুকাতের সেরা দৌলত মহীয়ান খিলাফত!
নাই বিশ্রাম, চেও না আরাম কর্মের সরণিতে;
লহ গুরুভার জাগাতে ধরারে ইসলামী দীপ্তিতে॥

*

জ্ঞানের বর্ম দিয়েছি তোমারে প্রেম তব তরবারি,
মোর দরবেশ লহ খিলাফত;—হও সুযোগ্য তারি।
আগুনের মত প্রোজ্জ্বল হ'য়ে জাগবে ও তকবির;
হও মুসলিম, তদ্‌বির তব জানি হবে তকদির;
তুমি যদি হও মুহম্মদের প্রেমিক, আমিও তবে
তোমার প্রেমিক হবো;
দুনিয়া তো ছোট, লওহ্ কলম দেব আমি তোমাকেই;
চিরদিন আমি তোমার প্রেমিক রবো॥

খোদার দুনিয়া

কে তিনি—মাটির নিবিড় আঁধারে লালন করেন বীজ?
কে তিনি—ওঠান সহজে এ মেঘ দরিয়ার ঢেউ থেকে?
কে তিনি—আনেন পশ্চিমী হাওয়া, সুফলপ্রসূ এ বায়ু?
এ জমিন কার? অথবা এ কার সূর্য-রশ্মিধারা?
মুক্তার মত ফসল করেন শস্যের শীষে জমা!
কার ইঙ্গিতে অনুভূতিময় মাসের পরিক্রমা?

শোন জমিদার—এ খেত-খামার এ তোমার নয়,
এ তোমার নয়,
এ নয় তোমার কোন সম্পদ; আমারো এ নয়
কোন সঞ্চয়॥

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক

ব্যক্তি ও সমাজসত্তা—দর্পণ, সূতা ও মোতি,
ছায়াপথ—নক্ষত্রের মত

www.pathagar.com

সমাজে ব্যক্তির মূল্য, ব্যক্তির সংযোগে থাকে
সমাজের রূপ অব্যাহত,
যখন সমাজদেহ ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত করে অস্তিত্ব নিজের
উধাও সমুদ্রবক্ষে বারি-বিন্দু রূপ নেয় মহাসমুদ্রের।
সমাজের ভবিষ্যৎ অথবা অতীত মনে ছায়া ফেলে তার;
সুগঠিত চরিত্রের অধিকারী, তার সত্তা
স্বপ্ন দেখে আগামী ঊষার।

অশেষ সময় তার, শেষ নাই, সীমা নাই, যুগ চিরন্তন
সমাজের প্রাণাবেগে ঊর্ধ্বমুখী আত্মা যার খোঁজে উন্নয়ন;
কাজের হিসাব নেয় বিশাল সমাজসত্তা
তার কাছে যেন অনুক্ষণ।

সম্পূর্ণ সমাজময় অন্তর বাহির, তার—
দেহ মন সুগঠিত সমাজের ছাঁচে
সমাজের ভাষা থেকে ভাষা পায়
প্রেরণা পায় যে পূর্বপুরুষের কাছে।
সমাজ-সান্নিধ্যে তার গ'ড়ে ওঠে চরিত্রের দৃঢ় বুনিয়াদ,
সমাজের নামান্তর সেই ব্যক্তি হয় নিজে, হয় স্বপ্নস্বাদ,
এক হয় শক্তিশালী অনেকের সহযোগিতায়;
একীভূত হ'য়ে জানি অনেক অসংখ্য আত্মা একে রূপ পায়।

একটি কথার গ্রন্থি স্থানচ্যুত হয় যদি
কাব্য রূপ হয় অর্থহীন,
যে পত্র বিচ্ছিন্ন হয় বৃক্ষশাখা হ'তে, আর
পায় না তো ফাল্গুন সুদিন,
মিল্লাতের জমজম—পুণ্যবারি যে মানুষ করে নাই পান
নিষ্প্রভ নিস্তেজ তার অগ্নিকণা চিরদিন মৃত্যুর সমান।
নিঃসঙ্গ যখন ব্যক্তি হয় সে সামর্থ্যহীন
পায় না তো কামিয়াবি—পথের সন্ধান
যখন সমাজ দেয় নীতি ও শৃঙ্খলা তাকে
ভোরের হাওয়ার মত ভারমুক্ত সহজে সে হয় গতিমান।

শমশাদ বৃক্ষের মত মাটিতে নিবদ্ধ মূল তার,
শৃঙ্খলায় বেঁধে তাকে বিশাল সমাজসত্তা দেয় স্বাধীনতা,
যখন আবদ্ধ হয় নিগড়ে কঠিন শৃঙ্খলার
হরিণীর নাভিমূলে সুরভিত মেশ্‌ক শোনে
অপরূপ তার সৃষ্টিকথা॥

www.pathagar.com

আসরারে খুদী : সূচনা খণ্ড

দুরন্ত দস্যুর মত যখন প্রোজ্জ্বল সূর্য হানা দিল শর্বরীর 'পরে
আমার ক্রন্দনধারে শিশির-সিঞ্চিত হ'ল গোলাবের মুখ,
নার্গিসের ঘুমঘোর মুছে নিল মোর অশ্রুকণা,
উজ্জীবিত তৃণদল উল্লাসে ছড়ায়ে যায় আমারি সে একাগ্র আবেগে।

আমার বাণীর শক্তি পরখ করিয়া নিল মালঞ্চের মালাকর এসে,
মোর গীতিকার প্রাণ বপন করিল আর তুলে নিল দৃপ্ত তরবারি,
আমার অশ্রুর ধারা ছড়ায়ে গেল সে মালী মৃত্তিকার বুকে
তন্তুর ঊর্ণার মত অরণ্যের সাথে মোর আর্ত সুর করিল বয়ন।

যদিও কণিকা আমি তবু জানি খরপ্রভা সূর্য সে আমারি,
সহস্র ঊষার দীপ্তি সংগোপন মোর বক্ষ মাঝে,
জাম্‌শিদের পাত্র হ'তে উজ্জ্বল আমার ধূলি জানে সংজ্ঞা তার
জন্ম যে নেয়নি আজো ধূলিরুক্ষ ধরিত্রীর বুকে !
শিকার ক'রেছে মোর চিন্তাধারা সেই হরিণীকে
বাহিরে আসেনি আজো যে এখনো অনস্তিত্ব অন্ধকার থেকে।

সবুজে শ্যামলে মোর মনোহর অরণ্য সুন্দর,
আমার বসন-প্রান্তে সুপ্ত আজো সংখ্যাহীন গোলাবকুঁড়িরা,
নীরব আমার সুরে সম্মিলিত গীতিকার দল।
আঘাত দিয়েছি আমি নিখিলের হৃদয়তন্ত্রীতে,
প্রতিভার প্রাণকেন্দ্রে সদ্য বিকশিত এই গীতিকা দুর্লভ
অপরিচয়ের সূত্রে অজানা বিস্ময় আনে সহযাত্রী পথিকের প্রাণে।

তরুণ সূর্যের মত জন্ম মোর এ বিশ্বের বুকে,
আকাশের কক্ষপথ, বিচিত্র এ নভাঙ্গন পরিচিত নহে মোর কাছে,
আমার আলোক স্পর্শে জাগে নাই কক্ষ পথে এখনো তারা-রা,
তাপমান যন্ত্রে মোর চঞ্চল হয়নি আজো পারদ কণিকা,
নৃত্যপরা রশ্মি মোর স্পর্শ করে নাই আজো সমুদ্রের বুক,
স্পর্শ করে নাই আজো ভোরের রক্তাভা মোর পর্বতশিখর,
অস্তিত্বের আঁখি আজো পরিচিত নহে মোর কাছে ;
কম্পিত তনুতে জাগি, ভীত আমি সত্তার প্রকাশে।

প্রাচী'র দিগন্ত হ'তে উঠে এল প্রভাতের যে রশ্মি আমার,
সঞ্চিত রাত্রির ঘন অন্ধকার সহজে সে করিল লুণ্ঠন,
একটি শিশিরবিন্দু ঠাঁই নিল পৃথিবীর ; গোলাবের বুকে।

তাদেরি প্রতীক্ষা করি শতাব্দীর রাত্রিশেষে জেগে ওঠে যারা,
মোর অন্তরের বহ্নি নেবে যারা এক দিন, কত সুখী ; কত সুখী তারা।

www.pathagar.com

প্রয়োজন নাহি মোর আজিকার মানুষের বিমূঢ় কর্ণের,
আমি বাণী অনাগত যুগের কবির।

আমার বাণীর গূঢ় রহস্য বোঝে না এই যুগ,
মোর ইউসুফ নয় পণ্য এই মূক বিপণীর,
প্রাচীন সঙ্গীর প্রজ্ঞা হতাশ্বাস ক'রেছে আমারে;
আমার সিনাই জ্বলে অনাগত ভবিষ্যের মুসার আশায়।

ওদের বারিধি স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ শিশিরের মত,
আমার শিশিরকণা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র বিশাল,
আমার সংগীতধারা পরিচিত পৃথ্বি ছেড়ে সীমারেখা টেনেছে নূতন;
এ বাঁশী ডাকিয়া ফেরে পথহারা শ্রান্তজনে মঞ্জিলের পথের আশ্বাসে।

কত কবি জন্ম নিল সে মহাকবি মৃত্যু শেষে,
আমাদের রুদ্ধ আঁখি খুলেছিল যে নিজের দৃষ্টির আলোকে।
মাজারের মৃত্তিকায় যেমন গোলাবকুঁড়ি দীর্ণ করে সুপ্ত পর্ণাধার
নিঃসীম শূন্যতা থেকে নূতন দিগন্ত পানে যাত্রা শুরু হ'ল পুনর্বার।

অসংখ্য কাফেলা জানি পার হ'য়ে গেছে এই মরু
নিভৃতে,—উটের মত মিশে গেছে তা'রা দূরে শব্দহীন মৃদু পদক্ষেপে।

প্রেমপন্থী চিত্ত মোর, এ ক্রন্দন প্রকৃতি আমার,
রোজ হাশরের মত শব্দিত ঝঞ্ঝায় আমি শুনি একা নৈঃশব্দ্যের সুর,
তন্ত্রীর শক্তিকে মোর অতিক্রম ক'রে যায় সুরের উচ্চাশা,
তবুও নিঃশঙ্ক আমি এ বীণার দুর্জয় শক্তিতে।

সে বারিবিন্দুর যদি দেখা নাহি হ'ত মোর খরস্রোত সাথে
সেই ছিল ভালো;
ভয়ঙ্করী রূপ তার হয়তো উন্মাদ ক'রে দেবে এ সিন্ধুকে!
কোনো নদী পারিবে না ধারণ করিতে মোর ওমান দরিয়া
আমার উদ্দাম বন্যা চাহে আজ নিখিলের সব সিন্ধু; সমুদ্র ফেনিল।

যদি এ কুঁড়ির স্বপ্নে গোলাবের গুলশান না জাগে আমার,
তবে এই ফাল্গুনের মেঘচ্ছায়া মূল্যহীন, কৃপা তার ছায়া ব্যর্থতার।
বজ্র ও বিদ্যুৎ সুপ্ত, সম্মোহিত অন্তরে আমার;
শিলা আর সমতল পিষে ফেলে ব'য়ে যাই আমি।

যদি তুমি মাঠ হও যুদ্ধ করো তবে মোর সমুদ্রের সাথে,
সিনাই পাহাড় যদি, তবে তুমি নাও মোর বিদ্যুৎ বিভাস,
আব-হায়াতের আমি অধিকারী, প্রাজ্ঞ আমি জীবনের গূঢ় রহস্যের,
মোর অগ্নি গীতি হ'তে করিয়াছে ধূলিতল জীবন-সঞ্চয়,

www.pathagar.com

বিস্তার ক'রেছে পক্ষ ঘনতর অন্ধকারে দীপ্তিময়ী স্ফুলিঙ্গের মত।
যে কথা জানাবো আমি খোলেনি কখনো কেউ সে অজ্ঞাত
রহস্যের দ্বার,
চিন্তার দুর্লভ মুক্তা গাঁথিতে চাহেনি কেউ আমার মতন !
চিরন্তন জীবনের গূঢ় বার্তা যদি তুমি জেনে নিতে চাও
তবে তুমি এস,
আকাশ, মৃত্তিকা যদি জয় ক'রে নিতে চাও তবে এস তুমি !
বন্ধহারা যে আকাশ সেই শুধু এই গান শেখায় আমারে ;
এ গানের সুরজাল ঢাকিতে পারি না আমি বন্ধুর দুয়ারে।

ওগো সাকী ! ওঠো, ওঠো ঢালো পাত্রে রঙিন শারাব,
কালের ভ্রূকুটি তুমি স্তব্ধ ক'রে দাও মোর অন্তর্লোক থেকে।
জমজমের ধারা হ'তে ভেসে আসে যে সুরা উজ্জ্বল,
সে সুরার পূজারী যে বিত্তশালী চিরদিন সম্রাটের মত।
চিন্তাকে সে ক'রে তোলে আরো স্থির, আরো প্রজ্ঞাময়,
তীক্ষ্ণ আঁখি ক'রে তোলে তীক্ষ্ণতর আরো,
তৃণকে সে দান করে পর্বতের ভার ;
সিংহ-শক্তি দেয় সে শিবারে।

ধূলিকণা তুলে নেয় সাত সিতারার মাঝে, বারিবিন্দু স্ফীত হয়
সমুদ্রের মত,
রোজ হাশরের মত্ত কোলাহল মাঝে আনে গূঢ় নিস্তব্ধতা ;
তিতিরের পদতল রাঙায় সে ঈগল শোণিতে !
ওঠো, ঢালো স্বচ্ছ সুরা মোর পেয়ালায়,
আমার চিন্তার কৃষ্ণ শর্বরীর বুকে তুমি এনে দাও চন্দ্রালোক আজ,
যেন নিয়ে যেতে পারি ভ্রাম্যমাণ জনতাকে মঞ্জিলে আমার,
তীব্র প্রাণ-চঞ্চলতা দিতে পারি যেন এই জড়তার বুকে,
উদ্যত উৎসাহে যেন যেতে পারি নবীনের দৃপ্ত অভিযানে ;
পরিচিত হ'তে পারি নূতনের অগ্রগামী রূপে !

আঁখিতারকার মত হ'তে পারি দৃষ্টিমান মানুষের কাছে,
বিশ্বের শ্রবণে যেন যেতে পারি আমি সুর হ'য়ে,
কাব্যের সুষমা যেন পরম ঐশ্বর্যময় হয় লেখনীতে ;
আমার কান্নায় যেন জেগে ওঠে শুষ্ক তৃণ অশ্রুসিক্ত ; প্রাণের প্রান্তরে।
রুমীর প্রতিভা দীপ্তি উদ্দীপিত ক'রেছে আমাকে,
রহস্যের গ্রন্থ হ'তে আজ আমি গেয়ে যাই গান,
আত্মা তাঁর অগ্নিকুণ্ড, জ্বলন্ত, উজ্জ্বল,
আমি শুধু অগ্নিকণা প্রাণ পাই মুহূর্তের তরে।
পতঙ্গের মত মোরে গ্রাস করিয়াছে তাঁর দীপ্ত অগ্নিশিখা,
আমার পেয়ালা পূর্ণ করিয়াছে কানায় কানায়,
স্বর্ণমহিমায় মোর মৃত্তিকারে ফেরায়েছে রুমী,

www.pathagar.com

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ক'রেছে সে মোর বিভূতিরে,
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, বিভা কেড়ে নিতে বালুকণা উঠে এল মরুভূমি থেকে।

পথিক তরঙ্গ আমি তাঁর সমুদ্রের বুকে ফিরে আসি বিশ্রাম আশায়,
ফিরে আসি তুলে নিতে মুক্তাখণ্ড তাঁর,
দীউয়ানা মাতাল আমি মত্ত তাঁর সুরের সুরায়।
জীবন সঞ্চয় করি তাঁর বাণীমূলে।

তখন অনেক রাত্রি।—বেদনায় পরিপূর্ণ হৃদয় আমার
আল্লার দরবারে মাঝে তুলেছিল তিক্ত ফরিয়াদ,
ব্যথাতুর বিশ্বমাঝে পানপাত্র শূন্য দেখে উঠেছিল আমার বিলাপ
তারপর ঘুমঘোরে ক্লান্ত চক্ষু ডুবে গেল দুঃসহ ব্যথায়।
অকস্মাৎ সত্যদ্রষ্টা সে নরের হ'ল আবির্ভাব,
সত্য উপাদানে যিনি লিখিলেন ফোরকান ইরানী ভাষায়,
মোরে বলিলেন তিনি, 'উন্মত্ত প্রেমিক !
পান করো প্রেমের শারাব,
হৃদয়তন্ত্রীতে হানো কঠিন আঘাত।
তোলো তুমি সীমাহীন সে উদাত্ত সুর,
সুরাপাত্রে ফেলে দাও মস্তক আপন,
আঁখি তব দাও অস্ত্রমুখে,
ব্যথিত শ্বাসের উৎস কর আজ মৃদু হাসি তব ;
তোমার অশ্রুর রঙে হোক আজ রুধিরাক্ত মানুষের বুক।

'নীরব কুঁড়ির মত কত দিন জাগিবে একাকী,
সুরভি বিস্তার করো গোলাবের মতন সহজে।
নিস্পন্দ রসনা তব জীবনের গভীর ব্যথায়,
নিজেকে নিক্ষেপ করো অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনের মত,
নীরবতা ভঙ্গ করো ঘণ্টা-ধ্বনি সম,
কান্নার সহস্র সুর উচ্চারণ করো তুমি প্রতি অঙ্গ হ'তে।
অগ্নি তুমি লেলিহান পরিপূর্ণ করো বিশ্ব তোমার আভায়,
দগ্ধ করো পৃথিবীকে নিজের দহনে।
রহস্য জানায়ে দাও সে প্রাচীন সুরাবিক্রেতার,
সুরার তরঙ্গ হও, স্বচ্ছ হোক তোমার বসন।
ভয়ের আরশি তুমি ভেঙে ফেলো বিপণীর মাঝে,
ভেঙে ফেলো সুরার পেয়ালা,
নলের বাঁশীর মত বাণী নিয়ে এস তুমি নলবন থেকে,
লায়লার দ্বার থেকে আনো তুমি বার্তা মজনুর,
নতুন সুরের ধারা সৃষ্টি করো তোমার সঙ্গীতে ;
উদ্যত উৎসাহে আজ জনতারে কর বিত্তবান।

'হে আশিক ! ওঠো, জাগো,
আবার প্রেরণা দাও জীবিত আত্মারে,

www.pathagar.com

উচ্চারণ করো তুমি নবীন জাগৃতি ;
বাণীর যাদুতে তব জাগুক জীবন্ত আত্মা কুল !
হে পথিক ! ওঠো, ওঠো,
অন্যতর পথে তুমি করো পদক্ষেপ,
দূর করো অতীতের একটানা ক্লান্ত ঘুমঘোর,
পরিচিত হও তুমি সংগীতের আনন্দের সাথে ;
ওগো কাফেলার ঘণ্টা, ওঠো, জাগো তুমি !'

সে বাণীর প্রেরণায় বক্ষ মোর হ'ল উদ্ভাসিত
সুঠাম বাঁশীর মত স্ফীত হ'ল সুরের জোয়ারে,
সংগীত তন্ত্রীর মত অকস্মাৎ উঠিলাম জেগে
মানব শ্রুতির তরে প্রস্তুত করিতে এক জান্নাৎ নূতন।

তুলিয়া দিলাম সব যবনিকা আত্ম-রহস্যের,
গোপন সংবাদ তার বিশ্বময় দিলাম ছড়ায়ে !
অসমাপ্ত সত্তা মোর অসুন্দর, ছিল মূল্যহীন ;
প্রেম দিল পরম পূর্ণতা !
লভিলাম পরিপূর্ণ মানুষের রূপ,
বিশ্বপ্রকৃতির জ্ঞান ভিড় ক'রে এল বক্ষ মাঝে।

দেখিয়াছি আকাশের গতিমান স্নায়ুর স্পন্দন,
চাঁদের শিরায় আমি দেখেছি শোণিত বহমান !
এ জীবন রহস্যের যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে দিতে,
প্রকৃতির জ্ঞানাগারে জেনে নিতে জীবনের গঠনকৌশল
ক্রন্দন ক'রেছি আমি দীর্ঘ রাত্রি মানুষের লাগি ;
নিরন্ধ্র রাত্রির বক্ষে ছড়ায়েছি চাঁদের সুষমা।

ভক্তিনত আমি শুধু এক সত্য ধর্মের নিকটে,
পরিচয় আছে যার সংখ্যাহীন পর্বত প্রান্তরে ;
অমর সুরের অগ্নি জ্বালায়ে যায় সে নিত্য মানুষের হৃদয়ের মাঝে।
ক্ষুদ্র এক পরমাণু ক'রেছিল সে কভু বপন
পরিপূর্ণ সূর্য এক তুলে নিয়ে গেল অবশেষে ;
রুমী, আত্তারের মত ফসল রাখিল তার সংখ্যাহীন কবি।

আমি এক দীর্ঘশ্বাস উঠে যাব অন্তহীন নভ-নীলিমায়,
আমি শুধু ধূম্র তবু জ্বালাময় অগ্নি হ'তে আমার উত্থান !
সমুচ্চ চিন্তার স্রোতে ঊর্ধায়িত লেখনী আমার
প্রকাশ ক'রেছে সেই অন্তহীন রহস্য বিপুল,
যবনিকা অন্তরালে সংগোপন, ছিল যে লুকায়ে
যেন এক বিন্দু হয় সীমাহীন সমুদ্রের মত ;
বালুকণা হয় যেন বাঁধমুক্ত সাহারা বিশাল।

www.pathagar.com

মোর মসনভীর দৃষ্টি নহে শুধু কবিতা সৃষ্টির,
রূপ-উপাসনা আর প্রেম-সৃষ্টি লক্ষ্য নয় তার,
আমি ভারতের কবি, আধেক চাঁদের মত
মোর পাত্র অপূর্ণ আজিও !
ভাবের দুরূহ যাদু চেয়ো না আমার কাছে,
চেয়ো না আমার কাছে সুমধুর ইক্ষুর মতন ;
তবুও মধুরতর ইরানের সুন্দর জবান।
উজ্জ্বল সৌন্দর্যে তার ভাবাবিষ্ট আমার হৃদয়,
জ্বলন্ত কুঞ্জের মত রূপে তার পল্লবিত হ'ল এ লেখনী,
হে সুধী ! দিয়ো না দোষ মোর দীন সুরাপাত্র দেখে ;
তৃষিত অন্তর দিয়ে নাও শুধু এ সুরার স্বাদ॥

ভিক্ষা

সিংহের নখর থেকে করো নিত এক দিন দুঃসাহসী যারা
ধূর্ত শৃগালের রূপে বিবর্তিত ; নিঃস্ব আজ তারা।
নৈরাশ্যের এ সঙ্গীত, দারিদ্র্যের তিক্ত ফল উৎসমুখ এই বেদনার ;
এ ব্যাধি নেভায়ে দেয়
সমুজ্জ্বল শিখা উচ্চাশার।

অস্তিত্বের পাত্র থেকে পান করো পানীয় রক্তিম,
কালের ভাণ্ডার থেকে কেড়ে নাও ঐশ্বর্য নিঃসীম,
উটের হাওদা ছেড়ে নেমে এস উমরের মত !
ঋণগ্রস্ত হ'য়ে তুমি কারো কাছে হোয়ো নাকো নত।

আর কতকাল তুমি গোলামীর দেখবে স্বপন ?
নলের উপরে তুমি উঠে যেতে চাবে আর
কতকাল শিশুর মতন ?

যে শুধু তাকায়ে থাকে আকাশের পানে প্রত্যাশায়
ভিক্ষার দীনতা নিয়ে নেমে যায়, আরো নেমে যায়,
ভিক্ষায় প্রকাশ করে দীনতার বীভৎস স্বরূপ,
দীনতর ক'রে তোলে ভিক্ষুকের সর্বহারা রূপ ;
রূহের সিনাই থেকে কেড়ে নেয় আলোক প্রোজ্জ্বল।

দারিদ্র্যের তিক্ত জ্বালা করিয়াছে তোমারে বিহ্বল !
তবু না ভিক্ষার অন্ন,—মুখাপেক্ষী হয়ো না কৃপার
চেয়ো না দুর্যের কাছে বারিবিন্দু ক্লান্ত পিপাসার,
রোজ হাশরের ময়দানে নবীজীর কাছে তুমি হয়ো না লজ্জিত,
ভিখারী আত্মার মত হয়ো না বিবর্ণ, প্রকম্পিত।

www.pathagar.com

সূর্যের সঞ্চয় থেকে মুখাপেক্ষী চাঁদ নেয় জীবিকা আপন,
করুণা-কলঙ্কে তাই কলঙ্কিত চিরদিন চাঁদের জীবন।

শক্তি ও সাহস চাও সর্বশক্তিমান পাক দরবারে আল্লার,
দুরূহ ভাগ্যের সাথে যুদ্ধ তুমি করো দুর্নিবার,
দ্বীনের গৌরব তুমি নামায়ো না টেনে ধূলিতলে।
মূর্তি-আবর্জনা-মুক্ত কা'বা যার শ্রমের বদলে
মনে রেখ তাঁর বাণী, মনে রেখ ওগো সাবধানী,
'আল্লার অশেষ প্রেম নির্ধারিত তার তরে জানি
যে নিজে সংগ্রহ করে আহার্য সঞ্চয় তার সর্ব শ্রম মানি।'
ঘৃণ্য সেই মুখাপেক্ষী অন্যের করুণা-প্রার্থী জন
কপর্দক বিনিময়ে কৃপার আগুনে হায় যে করে সম্মান সমর্পণ।

সুখী সে স্বাধীনচেতা, রৌদ্রদগ্ধ, চাহে না তবুও
আব-হায়াতের পাত্র কোন দিন খিজিরের কাছে,
অশ্রুসিক্ত নহে যার আঁখিপাত ; নাই যার
দীনতার তিক্ত অন্তর্জ্বালা ;

সে নহে মৃত্তিকাখণ্ড !
সে পূর্ণ মানব—শুধু তারি তরে সম্মানের ডালা।
মহান তারুণ্য তার ঊর্ধ্বশির তরুর মতন
আল্লার আরশ তলে সম্মানিত হয় সর্বক্ষণ।
সে রিক্ত ? তবু সে জেনো আত্মার আলোকে দীপ্ত, পূর্ণ, শক্তিমান !
ক্ষয়িষ্ণু সঞ্চয় তার ? তবু জেনো সবচেয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ তার মুক্ত প্রাণ।

একটি সমুদ্র যদি ভিক্ষায় সঞ্চয় করো বহ্নি বন্যা পাবে শুধু তাতে,
একটি শিশির-বিন্দু অশেষ মাধুর্যময়
যদি সে অর্জিত হয় আপনার হাতে।
সমুদ্রের মাঝে রাখো জল-বুদ্বুদের মত
অধোমুখ পেয়ালা তোমার,
হও তুমি সম্মানিত মহান মানব, আর
হও তুমি সম্মানিত খলিফা আল্লার॥

আকাঙ্ক্ষা

আতপ্ত রক্তের ধারা প্রবাহিত করে দেহে আকাঙ্ক্ষার কণা,
বাসনার দীপাগ্নিতে মৃত্তিকা-তনুতে জাগে আলোর মূর্ছনা,
বাসনার তীব্রতায় এ জীবন পানপাত্র পরিপূর্ণ কানায় কানায় ;
চঞ্চল জীবনধারা গতির প্রবাহ খোঁজে বাসনার দীপ্ত প্রেরণায়।

www.pathagar.com

পরম বিজয়ে শুধু পূর্ণ বনি আদমের অতৃপ্ত জীবন,
বাসনার মর্মমূলে মানুষের জয়বার্তা খোঁজে আকর্ষণ।
জীবন শিকারী এক, আকাঙ্ক্ষার মাঠে তার ফাঁদ ;
সুন্দরের কাছে আনে আকাঙ্ক্ষা প্রেমের সুসংবাদ !

জীবনগীতির সুর বাসনার কেন্দ্রে জাগে !
কেন ? কি কারণে ?
যা কিছু সুন্দর, শ্রেয়—জানায় পথের বার্তা বিভ্রান্ত, বিজনে।
তোমার অন্তর মাঝে অহর্নিশি আঁকে মূর্তি তার,
তোমার অন্তর মাঝে সৃষ্টি করে বহ্নি আকাঙ্ক্ষার,
সুন্দর করিছে সৃষ্টি বাসনার সম্পূর্ণ জোয়ার,
প্রকাশের মুক্ত ছন্দে অগ্নিশিখা জ্বলে আকাঙ্ক্ষার ;
কবির অন্তর মাঝে নেকাব তুলিয়া নেয় সে চির সুন্দর,
সিনাই পাহাড় থেকে সৌন্দর্যের তীব্র দ্যুতি পাঠায় খবর ;
দৃষ্টিতে সুন্দর তার নিমেষে সুন্দর তার প্রিয়তর অপূর্ব যাদুতে !
বুলবুল শিখেছে গান অফুরন্ত তার ওষ্ঠপুটে,
গোলাবের রক্তাধর বর্ণে তার হ'য়েছে উজ্জ্বল,
তার অনুরাগে জ্বলে পতঙ্গের প্রেমী বক্ষতল,
প্রেম কাহিনীর পটে সেই তো জাগায় রঙ সুতীব্র উজ্জ্বল।
সমুদ্র পৃথিবী এই সংগোপন মাটি ও পানিতে,
শতেক তরুণী বিশ্ব সংগোপন আছে তার অন্তর নিভৃতে।
মননের মরু মাঠে কোটেনি যখন ফুল জীবনের অজানা প্রহরে।
আনন্দ ব্যথার গান শোনেনি তখন কেউ সুরহারা নির্জন প্রান্তরে।

তার সুরজাল হেথা ব'য়ে আনে মোহময় যাদু অপরূপ,
একটি কেশের সাথে টেনে আনে পর্বতের সমগ্র স্বরূপ,
চাঁদ সিতারার সাথে চিন্তার সহস্র বিশ্ব পাড়ি দেয় একা,
জানে না কুরূপা পৃথ্বি ; সৃষ্টি করে এ সৌন্দর্য লেখা।

আব-হায়াতের প্রার্থী ভ্রাম্যমাণ সে এক খিজির !
সুচির-তিমির-গর্ভে আছে তার শ্রেষ্ঠ কাম্য নীর,
নীরব অশ্রুতে তার প্রাণবন্ত অস্তিত্বের তীর।

মৃদুগতি চলি মোরা অনভিজ্ঞ নূতন যাত্রিক,
পায়ে পায়ে প'ড়ে যাই স্খলিত পথের মাঝে বিভ্রান্ত পথিক,
সংগীতের সম্মোহন ভোলায়েছে আমাদের পথে বুলবুল,
পেতেছে কুহক মায়া, অনন্ত পথের দিশা ক'রে দিতে ভুল,
যেন সে চালাতে পারে প্রাণ-উষ্ণ জান্নাত ভূমিতে ;
জীবনের ধনু যেন পূর্ণ চক্ররূপ নেয় সে মুগ্ধ শোণিতে।

কাফেলা সম্মুখে চলে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি তুলে, দূরে বাঁশী বাজে,
যখন মরুর হাওয়া ব'য়ে যায় মৃদু গতি

www.pathagar.com

পথ খোঁজে গোলাবের মর্মগ্রন্থি মাঝে,
তার যাদুস্পর্শে জাগে জিজ্ঞাসা-চঞ্চল এ জীবন,
এ বিশ্বের জনতারে তার মহফিল মাঝে অনায়াসে করে আমন্ত্রণ !
সুলভ হাওয়ার মত হেলাভরে দিয়ে যায় অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি তার।

সেদিন ঘৃণিত জাতি মৃত্যুর শ্রান্ত
রেখে যায় জীবন সম্ভার ;
ঘৃণিত তাদের কবি বিলুপ্ত করে যে এসে
জীবনের আনন্দ অপার।

* * *

কাব্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে
যাচাই করিয়া নাও জীবনের পরীক্ষা পাথরে,
চিন্তার উজ্জ্বল দীপ্তি জীবনে দেখায় পথে কর্মের প্রহরে ;
বিদ্যুৎ-চমক জানি অগ্রগামী আসন্ন বজ্রের।
কাব্য সৃজনের মাঠে দিতে পারে শক্তি সে যোগ্যের,
আরবের মৃত্তিকায় ফিরে যেতে দেয় সে যোগ্যতা।

অন্তরে আঁকিয়া নিয়ো সাল্‌মা আরাবীর পুণ্য কথা
হেজাজের ঊষা যেন জাগে 'কূর্দ' শর্বরীর ক্লান্ত মধ্যভাগে।
গোলাব তুলেছো তুমি ইরানের শত গুলবাগে,
দেখেছো ইরানে, হিন্দে অপরূপ সৌন্দর্য-বিথার,
মরুভূর খরোত্তাপ অনুভব করো একবার !
প্রাচীন খর্জুর সুরা একবার করো তুমি পান,
তোমার শিয়রে তার তপ্ত বক্ষ হোক উপাধান,
সমর্পণ করো তনু আজ তার উত্তপ্ত হাওয়ায়।
রেশম-বিলাসী তুমি, ঠাঁই নাও অমসৃণ কার্পাস শয্যায়।
পুষ্পের কোমল পর্ণে নৃত্য করিয়াছ তুমি বংশপরম্পরা,
কোমল শিশিরে ওষ্ঠ সিঞ্চন ক'রেছ তুমি ওগো রক্তাধরা,
জ্বলন্ত বালুর পরে ছুঁড়ে ফেল আজ আপনারে,
ডুবে যাও, ডুবে যাও জমজমের পুণ্য উৎসধারে।
বুলবুলের মত তুমি কেঁদে যাবে কত কাল কান্না ব্যর্থতার ?
কত কাল রবে তুমি বিলাসী বাস্সিদা বাগিচার ?

* * *

বাঁধো নীড় পর্বতের উন্নত শিখরে,
বিদ্যুৎ-বজ্রাগ্নি ঘেরা সুদুর্গম উচ্চতার শীর্ষে বাঁধো নীড়,
ঈগলের নীড় ছেড়ে আরো ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্ব স্তরে,
যেন যোগ্য হ'তে পারো জেহাদের—এই জিন্দেগীর ;
তোমার তনু ও আত্মা দগ্ধ হ'তে পারে যেন
এই প্রাণ-বহ্নির উপরে॥

www.pathagar.com

ঈমান

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লার' রশ্মি আছে বুকে যতক্ষণ
পারবে সহজে তুমি পিষে যেতে অনায়াসে সকল ভীতির আক্রমণ।
নিষ্কম্প আত্মার মত আল্লাতে বিশ্বাস যার পরিপূর্ণ তনুর মাঝারে,
হয় না সে নত শির, হয় না সে ত্রস্ত কোন বিভ্রান্ত শক্তির অহঙ্কারে
পত্নী আর সন্ততির মোহ থেকে মুক্ত সেইজন
সংযত, খোদার রাহে পারে সে কোরবানি দিতে পুত্রকে আপন।
হয়তো সে সঙ্গীহীন, শক্তিমান তবুও সে পূর্ণ এক বাহিনীর মত,—
মূল্যহীন তার কাছে প্রশ্বাস বায়ুর চেয়ে জিন্দেগানী মুক্ত অনাহত॥

শৃঙ্খলা

সুরভিত হয় বায়ু বন্দী হ'লে কুসুমের বুকে,
সুরভিত হয় মেশ্‌ক বদ্ধ হ'য়ে নাভিমূলে কস্তুরী মৃগের,
আকাশে সিতারা চলে প্রাকৃতিক বিধানের নীচে নতমুখে
জেগে ওঠে তৃণদল মেনে পন্থা ক্রমবর্ধনের।
অশেষ দহনে জ্বলে আলোক বিলায়ে চলা ধর্ম প্রদীপের,
শিরায়, শিরায় চলা নৃত্যপরা ধর্ম শোণিতের,
ঐক্যের বিধানে ক্ষুদ্র বারিবিন্দু হয় এক সমুদ্র উত্তাল,
ঐক্যের বিধান মেনে ক্ষুদ্র বালুকণা হয়
অন্তহীন সাহারা বিশাল।
আইনের আনুগত্য যদি আনে এইভাবে শক্তি অফুরান,
শক্তির উৎসকে তবে কেন করো অবহেলা ক্লান্ত, ভীরু প্রাণ॥

মর্দে মুমিন

নেমে এস তুমি আজ অদৃষ্টের আরোহী—সওয়ার !
নেমে এস দীপ্ত শিখা যুগান্তের,—পরিবর্তনের ;
দীর্ণ ক'রে যাও তুমি আমার সঘন অন্ধকার ;
আলোকিত ক'রে তোল দৃশ্য অস্তিত্বের।
স্তব্ধ ক'রে দাও তুমি সমস্ত জাতির কোলাহল,
জান্নাতের মাধুরীতে উঠুক সম্পূর্ণ হ'য়ে
সুরধারা,—মুক্ত ; প্রাণোচ্ছল।

ওঠো, জাগো মুক্ত প্রাণ আবার বাজায়ে যাও
সমুহান ভ্রাতৃত্বের সুর,
প্রেমের সে পাত্র দাও ফেরায়ে সবার হাতে
(সুরার সুরাহি ভরপুর,),

www.pathagar.com

প্রশান্তির দিন ফের ব'য়ে আনো পৃথিবীতে আর একবার ;
শান্তি বাণী নিয়ে যাও যুদ্ধকামী মানুষের জীবনে আবার !
সমগ্র মানব জাতি শস্যক্ষেত্র যেন আর তুমি তার পূর্ণাঙ্গ ফসল,
জীবন যাত্রার পথে সংখ্যাহীন কাফেলার মঞ্জিল ;—তুমি সে লক্ষ্যস্থল।
হৈমন্তী শাসনে ঝরা পত্র দলে এস তুমি বসন্তের মত,
নিয়ে যাও আমাদের প্রেম প্রীতি হৃদয়ের,—মুক্ত, অনাহত।
যে সম্মান আমাদের সে শুধু তোমারি ঋণ ওগো অন্যমনা !
নীরবে আনত মুখে ব'য়ে যাই আজ মোরা
জীবনের ব্যথা ও বেদনা॥

কণিকা

ধর্ম কি জানো ?
— মৃত্তিকা থেকে উত্থান !
যেন এ আত্মা খুঁজে পায় তার সত্তার সন্ধান॥

*

করো উন্নত সত্তা এমন
যেন তক্‌দির লেখার আগে
শুধান আল্লা বান্দাকে : বলো
কি বাসনা তোর হৃদয়ে জাগে॥

*

খোদায়ী প্রেমের আলোক যখন
খুঁজে পায় নর সত্তা ফের,
শাহানশাহীর রহস্য যত
তখনি তো ভাসে দুই চোখে গোলামের॥

*

শোন হুঁশিয়ার পান্থ সুজন
তোমার চলার পথে গো যদি
গুলশান থাকে, হও শবনম ;
সাহারা থাকিল তুফান হও॥

*

দুর্বার তরঙ্গ এক ব'য়ে গেল তীর–তীব্র বেগে,
ব'লে গেল : আমি আছি, যে মুহূর্তে আমি গতিমান,
যখনি হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই॥

*

জরাজীর্ণ এ আকাশ, পুরাতন এ সব তারা–রা,
আমি শুধু চাই তারে সদ্যজাতা যে পৃথ্বী নূতন॥

*

হারালো যখন ধর্মাবরণ
একতা কোথায় রহিল হায় !
ঐক্যসূত্র গেল যদি ভাই
মিল্লাৎ সাথে নিল বিদায়॥

www.pathagar.com

হারায় গরিমা ; সম্মান ;—জাতি আকাশ খিলানতলায়,
হারায় যখন সে আত্মজ্ঞান ধর্মে ; কাব্যকলায়॥

*

জীবন যেখানে ক্ষীণস্রোতা নদী গোলামির ছোঁওয়া লেগে,
আজাদীর মাঠে সেথা সীমাহীন সমুদ্র ওঠে জেগে॥

*

বিশ্বাসহীন কাফের যে দীন বিশ্বে হয় সে হারা,
মুমিনের মাঝে হারায় নিখিল জগতের প্রাণধারা॥

*

বসন তোমার হয়নি মলিন
স্বদেশ-ধূলিতে অপরিসর,
তুমি ইউসুফ নয়নে তোমার
কেনান সমান প্রতি মিশর॥

*

আনো বিশ্বাস পরাজিত জন
কুদরতী হাত তুমি খোদার !
হে গাফেল ! যদি আনো বিশ্বাস
পদানত তুমি রবে না আর॥

*

ব্যক্তির প্রাণ সমাজসঙ্গ
আর কিছুতেই নয় !
সিন্ধু-বক্ষে বাঁচে তরঙ্গ
আর কিছুতেই নয়॥

*

সব হৃদয়ের ঐক্য-সূত্রে
সমাজ-দেহের এ পরিচয়,
একটি আলোর শিখা নিয়ে জ্বলে
এ সিনাই চির জ্যোতির্ময়॥

*

একটি কথার গ্রন্থি হারায়ে
গুমরে কবিতা অর্থহীন,
যে সবুজ পাতা হারায় প্রশাখা,
হারায় সে তার ফাগুন দিন॥

*

সত্য ন্যায়ের সবক নে ফের,
নে সবক তুই বীরত্বের,
তোরে দিয়ে কাজ হবে রে আবার
সারা দুনিয়ার ইমামতের॥

*

সৃষ্টির আদি যুগ থেকে আছে চালু
এই পদ্ধতি, এই রীতি পুরাতন,

www.pathagar.com

নবীর দীপ্ত শিখার সাথে
আবু লাহাবের দ্বন্দ্ব চিরন্তনী।

*

যে নর খঞ্জর ধরে আল্লা ছাড়া অপরের তরে,
তার দর্পী তলওয়ার বিদ্ধ হয় চির দিন নিজের পঞ্জরে॥

*

যেদিন বিচ্ছিন্ন হ'ল ধর্ম আর রাষ্ট্র একে একে ;
লালসার আধিপত্য দেখা দিল সেই দিন থেকে॥

*

বাদশাহী বিক্রম আর পরিহাস এ গণতন্ত্রের,
বিচ্ছিন্ন যখন ধর্ম রাজনীতি থেকে
অবশিষ্ট থাকে শুধু নীতি চেঙ্গিজের॥

*

ব্যক্তি ও সমাজ যদি যুক্ত হয় খুলে যায় রহ্‌মতের দ্বার,
সমাজ সান্নিধ্যে পায় ব্যক্তির মানস চির মূল্য পূর্ণতার,
সমাজের সাথে রাখো সখ্যতা, সংগ্রামী হও ; হও মুক্তপ্রাণ ;
মহান নবীর কথা মনে রেখো : দলত্যাগী সে যে শয়তান॥

*

মানুষের সেবা শুধু নেতৃত্বের মূলতত্ত্ব
মোদের জীবন পদ্ধতির,
ফারুকের ইনসাফ সহজ, সরল আর
নির্বিলাস জীবন আলীর !
সাচ্চা দিল্ মুস্‌লিম নিল এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব যখন ;
ঐশ্বর্য, শক্তির মাঝে নিল বেছে নির্বিলাস ফকীরী জীবন॥

*

মুস্তফার মুহব্বত অমূল্য পাথেয় যার জীবন পথের
পূর্ণ আধিপত্য তার প্রসারিত জলেস্থলে এই জাহানের॥

স্বাধীন তিমির মত বাস করো অন্তহীন সমুদ্র সলিলে।
যে নর সত্তাকে তার মুক্ত করে সীমানার কারাগৃহ থেকে
ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ভেঙে চিত্ত তার মুক্তি পায়
আদিগন্ত আকাশের নীলে॥

*

তারায় তারায় গ্রহে সিতারায় র'য়েছে বিশ্ব ছড়ানো
সঞ্চরমান প্রজ্ঞার চোখে নতুন আকাশ জড়ানো !
দৃষ্টি যখন ফেরায়েছি আমি মোর আত্মার পাথারে ;
দেখেছি তখন আছে সুগোপন সিন্ধু আমারি মাঝারে।

*

লাভ লোকসান হিসাব ছাড়ায়ে
থাকা জানি সেই তো জীবন,

www.pathagar.com

কভু রাখা প্রাণ, কভু দেওয়া প্রাণ
জানি জানি আমি এই তো জীবন॥

*

মর্দে মুমিন—ঈমানদারের
নিশানি জানাই, শোন ;
মরণ লগ্নে হাসি ছাড়া মুখে
চিহ্ন রবে না কোন॥

*

আসবে সুরের হারানো রেশ, হয়তো সে আর আসবে না,
হেজাজ হাওয়া আসবে অশেষ, হয়তো সে আর আসবে না,
সীমান্তে আজ প'ড়ল এসে এই ফকীরের দিনগুলি ;
আসবে নতুন ধ্যানী এ দেশ ; হয়তো সে আর আসবে না॥

পাহাড় ও কাঠবিড়ালি

কাঠবিড়ালির কাছে পাহাড় বল্‌ল বিজন ময়দানে,
'পারিস্‌নে তুই ম'রতে ডুবে ভরা দীঘির মাঝখানে?
একটুখানি জিনিষ তবু অহঙ্কারের ভাব দেখি,
বল্‌ব কি আর সামান্য জ্ঞান, সব-ই ফাঁকা ; সবে মেকি।
নগণ্য যা পাচ্ছে কদর এখন খোদার কুদরতে,
বেকুব এবং বাজে লোকের কাছেই ধরা হয় ফতে।
কেমন ক'রে আমার সাথে হয় তুলনা মন মত,
এই দুনিয়া, জাহান সারা আমার কাছে হয় নত ;
আমার যত গুণগরিমা ! ... কি আছে তোর সন্ধানে?
কোথায় বিশাল পাহাড় আবার কাঠবিড়ালি কোন্‌খানে?'

কাঠবিড়ালি বল্‌ল রেগে, 'সামাল দিয়ে কও কথা,
বাজে বুলি, বুক্‌নি শোনে ;—মাথায় কারো নাই ব্যথা।
নাই বা হ'ল তোমার মত প্রকাণ্ড এই ধড়খানা,
নও তুমিও আমার মত এই কথাই যায় জানা।
হ'ল এই জাহানে সব-ই খোদার হিকমতে।
কেউ বড়, ... কেউ ছোট ভাই, সবই খোদার হিকমতে।
বিরাট বপু ক'রে ধরায় তোমায় গ'ড়ে দেন যিনি,
হাল্কা দেহে গাছে চড়ার শক্তি আবার দেন তিনি।
এক পা চলার নাই তো মুরোদ, তাকত কিছু নাই কাছে,
ব্যর্থ বড়াই করা ছাড়া আর কি তোমার গুণ আছে?
হও যদি ভাই বড় তুমি চল আমার পথ ধ'রে,
একরত্তি সুপুরিটা ভাঙো দেখি জোর ক'রে।
এই দুনিয়ার ম'ফিল মাঝে অকেজো নয় তাই কিছু ;
আল্লা পাকের কারখানাতে খারাব ব'লে নাই কিছু!'

www.pathagar.com

দোওয়া

আমার মনের সাধ যা কিছু
দোওয়ার মত ফুটছে জানি,
চিরাগ যেমন তেমনি যেন
হয় খোদা, মোর জিন্দেগানি।
এই দুনিয়ার আঁধার যেন
দূর হয়ে যায় আমায় দেখে,
রোশ্‌নি যেন পায় সকলে
আমার আলোক-রশ্মি থেকে।
সুন্দর হয় আমার বাঁচায়
যেন আবার এই জাহান,
ফোটা ফুলের শোভায় যেমন
হাসে সোনার গুলিস্তান।
পতঙ্গ হয় যেমন, খোদা !
তেম্‌নি কর আজ আমারে,
ভালবাসি যেন আমি
মুক্ত জ্ঞানের দীপ শিখারে।
জীবন আমার করে যেন
দুঃস্থজনে সমর্থন,
দুঃখী এবং বৃদ্ধ জয়ীফ
যেন আমার হয় আপন।
আল্লা মালিক ! প্রভু আমার
বাঁচাও পাপের কলুষ থেকে,
চালাও আমায় সেই পথে,—যার
লিখন শুধু পুণ্য লেখে॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাল্কা লেখা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

অনেকেই বলে : হায়াত দারাজ একরোখা,
মতান্তরে সে তীর ছুঁড়ে মারে চোখা চোখা !
কিন্তু কথাটা সত্য কী না ও কতটুকু
সত্য ; — সে কথা ভেবে দেখো আজ ততটুকু।
'অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে চাওয়া বাহাদুরী'
হায়াত দারাজ বলে সর্বদা, 'ডাহা চুরি।'
বোঝে না সে কেন অন্যের ঝাল ধার করো।
ভিক্ষা–লব্ধ পরের পুচ্ছ সার করো !
শত চেষ্টায় হয়নি জেনো যা কৌলিক,
হাজার কোশেশ ক'রে তা হবে না মৌলিক।
হায়াত দারাজ চায় শোধরাতে ভুল তার,
কেননা সে চায় সঠিক সত্য মূল তার !
যদি নির্মূল করার চেষ্টা করো, তবে
বন্ধুত্বের খাতা থেকে তার সরো তবে।
পাক হুকুমতে লাগলে আঘাত ছাড়ে না সে,
ব্যঙ্গের বেত অহেতু কখনো নাড়ে না সে,
অকারণে তীর ছোড়ে না অধীর চোখা চোখা,
মন্দ না হলে করে না দ্বন্দ্ব একরোখা ॥

নামভূমিকায়

তোমার স্বপ্ন, — খাল কেটে আনা ঘরে কুমীর
(অর্থাৎ কী–না কুমীরের রাজপাট) !
তাইতো তোমার মনে ও মগজে ঢের ফিকির
খোঁজে সর্বদা যাবতীয় আটঘাট ॥

গণ–কীর্তনে বোঝাও : কুমীর, সোদর ভাই !
হুঁশিয়ার ভণে : মটকায় শুধু ঘাড়,
প্রতীক্ষা করে নদীতীরে কাজ ক'রে কামাই
সুবিধা মাফিক মারতে তুলে আছাড় ॥
কুমীরের সাথে আত্মীয়তা বা রেশ্‌তা খুঁজে
আশা আর ভাষা, কৃষ্টির চাও মিল !

www.pathagar.com

হাড়ে হাড়ে যারা টের পেল তারা চক্ষু বুজে
বলে : মাঝখানে আছে ঢের খাল-বিল॥

কুমীর তোমাকে কি দিল জানি না, কি দিতে চায়
যদিও সে কথা হয় নাই পুরো জানা,
তবু অবশ্য বুঝি মোটামুটি — নদী চড়ায়
দিয়েছে সে মোটা রক্তিম নজ্‌রানা॥

হায়াত দারাজ দেখেছে জীবনে ঢের কুমীর,
জানে, — বেসামাল কে এখন নাজেহাল,
নিয়েছে শরণ কি কারণে কোন্ সুবুদ্ধির,
আনতে কুমীর কোন্ পথে কেটে খাল॥

প্রেমানন্দ গোস্বামী

প্রেম-পন্থী সে গোস্বামী মহা প্রাণ
ধ্যান করে সবই 'অখণ্ড অম্লান !'
পুব দেশে গেলে জমে না যে কারবার
বুঝেছে সে, তাই ধ্যান করে বারবার,
বগলতলায় বাগিয়ে বক্র ছুরি
করে জ্ঞানপাপী ধ্যানের ঘরে সে চুরি !

হায়াত দারাজ চেনে ঐ 'শিবনেত্র'
তাইতো সে তোলে ব্যঙ্গের বিষ বেত্র।

বলে সে : যেখানে আছো, ঠিক থাকো ভায়া,
হাত বাড়ালেই পাবে যে বিষম হায়া,
পরিণাম ভেবে কাজ করে সজ্জন,
করে না অহেতু প্রচার বা তর্জন ;
হোক না শরীর হাতির মতই বড়ো
কোরো না সকল পথে তুমি নড়োচড়ো।
হায়াত দারাজ তোলে না আওয়াজ ব্যর্থ ;
ঘটে অঘটন যদি কেউ করে দ্ব্যর্থ॥

ধ্যানী প্রেমানন্দ সমীপে

সকলেই জানে, কেন মার্জার ধ্যান করে।
বাগে পেলে তাই পিঠের চামড়া 'ট্যান' করে॥

www.pathagar.com

আমরাও জানি, কেন তুমি আজ ধ্যান করো,
কারে দুশ্‌মন, কারে অনুচর জ্ঞান করো॥

কিন্তু তুমি তো কাছে নও, আছো দূর দেশে
গেয়ে যাও গান 'এক–অখণ্ড' সুর ঘেঁষে॥

জ্ঞানপাপী কিছু এখানে সে তালে তাল ধরে,
তোমার ঘাটেই নৌকা ভেড়াতে হাল ধরে॥

মজা দেখে এরা গান গায় মোটা, মিহি স্বরে ;
তোমার বাহন রেগে তোলে হ্রেষা চিঁহি স্বরে॥

সংক্ষিপ্ত এ ভাষণ চালাক প্রেমানন্দকে,
শুধু ইঙ্গিত আত্মাটা যার আছে বন্ধকে॥

'নিরপেক্ষ' প্রেমানন্দ গোস্বামীকে

ধর্মনিরপেক্ষ বলে অধর্মটা নেই নাকি ?
কেমন করে অধর্মকে আজকে বলো দেই ফাঁকি ?
বলদ খাওয়ার অপরাধে ধর্মভীরুর হয় বলি,
মানবতার উঠলে আওয়াজ তারেও সাথে দেই ঢাঁকি॥

ধর্ম থেকে আদর্শবাদ, কৃষ্টি এবং সভ্যতা,
ধর্মনিরপেক্ষ দেশে পালিয়ে বেড়ায় ভব্যতা !
বড়াই তবু কমে না তার, তাকায় যখন এক চোখে ;
শালীনতার মানলে শাসন কোথায় থাকে নব্যতা॥

ধর্মনিরপেক্ষ মুলুক নাচে গরুর গৌরবে,
ছড়িয়ে পড়ে পুণ্য গাথা চার পেয়েটার সৌরভে,
কিন্তু যারা করেনি ঐ গরুর ঘরে দণ্ডবৎ
হয়তো আজো আছে বেঁচে জ্যান্তে–মরা রৌরবে॥

ধর্মনিরপেক্ষ দেশে নাইকো শরম পণ্ডিতের,
ধর্মনিরপেক্ষ ভাবেই চায় সে দাফন খণ্ডিতের !
দিন হিসাবে দাঙ্গা বাড়ায় !... সংখ্যালঘুর বরাত জোর
ধর্মনিরপেক্ষ দেশে তাই সে দলে দণ্ডিতের॥

'মাৎস্যন্যায়'—নীতির সেরা, ...কাজেই যারা মছলিখোর
দুর্নীতিকে নীতির নামে দেয় চালিয়ে বেদম জোর

www.pathagar.com

(ইচ্ছা করে সব কিছু খাই) ! ... ব্যাপার দেখে ব্যঙ্গবিদ
রুবাই লিখে রাত্রি কাটায় হায়াত দারাজ সুর বিভোর।।

গুরু-শিষ্য সংবাদ

গুরু

কে বলে আর লাগবে না জোড়, টুকরো যদি বর্তন ;
সবাই মিলে বাহু তুলে গাও জোরে আজ কীর্তন।

শিষ্য

নেচেছি ঢের, গেয়েছি ফের ঐ পুরোন কীর্তন,
গান গিয়েছে মাঠে মারা ; ব্যর্থ যে আজ নর্তন।

গুরু

নতুন ভাবে করো শুরু সঙ্গীত আর নৃত্য,
হয়তো তাতে খুশী হবে শেখ সাহেবের চিত্ত।

শিষ্য

শেখ জানে তার স্বকীয়তা, মৌলিকতা, কৃষ্টি,
ঘাটালে সে লাকড়ি তুলে করবে অনাসৃষ্টি,
বাজুতে সে পেয়েছে তার তমদ্দুনী হিম্মৎ,
তুমিই বরং গান গেয়ে যাও ; আমি করি সঙ্গত।।

ঘোগ-সংবাদ

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, বাঘ রাখে না খোঁজ তার ;
বাঘের পকেট কেটেই আবার ঘোগটা বাড়ায় রোজগার।।

বাঘের চোখে ধুলো দিয়ে গর্ত খোঁড়ে রাত দিন,
বাঘ বোঝে না, খরচা দিয়ে খাওয়ায় সে ভোজ সাত দিন।
বাঘ জানে না সুড়ঙ্গটা কোন্ দিকে কার নির্দেশে ;
কেমনভাবে চল্‌ছে কোথায় ; কোন্ দুরাশার তীর ঘেঁষে।
এ সব জানার আগেই যে বাঘ ঘুমায় টেনে কম্বল,
আরাম করে এদিকে ফের ঘোগ লোটে তার সম্বল।।

একটা থেকে দু'টো হল, দু'টোর পরেও ঢের ভাই
ঘোগের মাসী-পিসী আসে বাঘের ঘরে ফের ভাই !

www.pathagar.com

চলন বলন কার কিরকম বাঘ রাখে না খোঁজ তার,
জানে না কার পকেট কেটে বাড়ে ঘোগের রোজগার !
মন মেজাজে খাসা যে বাঘ ঘুমায় টেনে কম্বল ;
ঘোগটা তখন দল ডেকে ফের লোটে বাঘের সম্বল ।।

ঘোগের সাথে কান কথা কে যায় বলে ঐ ফিস্‌ফিস্,
যাওয়ার সময় দেয় সে গুঁজে ঘোগের ট্যাঁকে কিশমিশ,
সুড়ঙ্গটার কাজ দেখে যে হয়েছে তার দিল্ খোশ,
রাত্তিরে তাই গান গেয়ে যায় লাল, বাদামী, নীল ঘোষ।
বাঘটা এ সব বোঝার আগে বনবাদাড়ে সব চুপ,
ধূর্ত রাতের ঝুলি থেকে ঘুম ঝরে যায় ঝুপঝুপ ।।

বাঘের ঘরের গোপন খবর ভোর না হতে সাত কান,
বোঝে না বাঘ এই ব্যাপারে রয়েছে কার হাত টান !
অলক্ষিতে কম্বলটা বন্ সীমানা হয় পার,
হিসাব করে দেখলো যে বাঘ এই নিয়ে ঠিক ছয়বার !
কাজে কাজেই রাগের মাথায় করে বেদম চিটপিট ;
ঘোগটা তখন ঘরের কোণে লুকিয়ে হাসে মিট্‌মিট্ ।।

এমন ভাবেই কাটছিলো দিন জব্দ হয়ে বারবার,
বাঘের চোখে হঠাৎ ধরা পড়ল ঘোগের কারবার।
সুড়ঙ্গটার মুখে দেখে অন্য রঙের টিপ সই
সন্দেহটা রইল না আর, এটা কাদের ঠিক সই !
ঘোগের খোঁজে তাই সে এখন করছে বাগান তোলপাড়,
গভীর বনে ঘোগটা পালায় ; বাঘ ওল্টায় ঝোপঝাড় ।।

সংলাপ
(সুবিধাবাদীর সৌজন্যে)

১ম

এদিকেও নই, ওদিকেও নই, আছি মাঝখানে,
যখন যেদিকে লাভ খুঁজে পাই, অশ্ব ছোটাই,
রঙিন সড়কে কড়িও জোটাই নামও ফোটাই ;
সুবিধাবাদের পন্থা যে চেনে শুধু সেই জানে।

২য়

এ পথের মজা আর এ পথের মার বিস্বাদ
চাখতেই হবে, সুযোগ পেলেই ওরা নেবে দাদ।

www.pathagar.com

সব বিশ্বাস ফুরাবে যে দিন, হোয়ো না অবাক
দেব না লুটতে দু'দিকে সে দিন 'ডুড ও টামাক'।

১ম

বোঝে না সহসা ঘুমন্ত এই জনসাধারণ
অতি হুঁশিয়ার সুবিধাবাদীর কথোপকথন।
সামলিয়ে যদি চাল দাও ভায়া না হয়ে বেতাল ;
ভ্রান্ত জনতা বোঝার আগেই ধ'রবে সে তাল।

২য়

কিন্তু যে দিন বুঝবে সে দিন ঠিক বুঝবেই
সকল সড়কে সুবিধাবাদীকে ওরা খুঁজবেই,
চির দিন এই প্যাঁচটা তাদের রবে না অজানা ;
আজ থেকে ভাই খুঁজে ফেরো তাই নতুন ঠিকানা॥

দুই বিড়ালের কথা

নামের কাঙাল ছিল না তো ঐ হুলো বিড়াল,
এ কুনো বিড়াল মাছের সঙ্গেই নামও চায়,
পা চাটার গুণে এখানে সেখানে খ্যাতিও পায় ;
দেখে বিস্মিত ঐ ভ্যাগাবণ্ড হুলো বিড়াল !
ভাবখানা তার অধঃপতন এতটা নিচে
হয় যদি তবে কুনো বিড়ালের জীবন মিছে।

হুলো বলে : যারা কর্মী পুরুষ, — কীর্তিমান
খ্যাতিটা তাদের পিছনেই আসে ল্যাজের মত,
নিজের গরজে এঁটে থাকে সাথে ব্যাজের মত ;
ল্যাজের পিছনে ঘোরা জীবনের অসম্মান।
টিটকারি দেয় মাঝখান থেকে অনেকে ভাই ;
হুলোটা আবার করে না কেয়ার কাউকে তাই।

নামের কাঙাল এ কুনো বিড়াল বোঝে না ঠিক,
প্রতি রাতে তাই হুলোর সঙ্গে বচসা বাধে,
কখনো তর্ক হয় না তো শেষ নির্বিবাদে ;
হুলো আর কুনো ভুলে যায় জ্ঞান দিগ্বিদিক !
এ বলে, "আমার নাম যদি জোটে"...ও বলে "ব্যাস্
শুনতে চাই না।"... তারপর শুরু, "মিঞাও... ফ্যাঁশ..."

www.pathagar.com

আরণ্য কাহিনী

বুদ্ধির বলে অজেয় ভূমিকা দেখেছি ঢের,
হাসির খোরাক জোগাতে অজেয়; পায় না টের।
হয় সে পাগল যদি পায় ফাঁকে উঁচু আসন,
যতটুকু জ্ঞান ঘটে আছে দেয় নির্বাসন।
ভাবে না সে মোটে হ'ল কী–না তার অনধিকার,
সব ব্যাপারেই গলায় সে শিঙ নির্বিকার।
উঁচু আসনের চিন্তা যে মনে সারাটা ক্ষণ;
সকল মঞ্চে দাঁড়িয়ে সে তাই দেয় ভাষণ।
ধূর্ত শিয়াল জেনে যায় তার দুর্বলতা
তিন সন্ধ্যায় দলে সে জানায় গোপন কথা।
তারপর ফের দিনদুপুরেই সুযোগ পায়,
ছাগ–নৃত্যের করে আয়োজন বন–সভায়।
উঁচু মঞ্চের লোভ দেখিয়ে সে, ভোলায় মন,
জয়ধ্বনিতে জানায় 'স্বাগত' সম্ভাষণ।
বেকুব ছাগল খুশী হয় পেয়ে এ বাহাদুরী;
এ দিকে শিয়াল করে ছাগলের তল্পী চুরি।
তার আস্তানা কেড়ে নিয়ে ধরে ঐকতান,
বোঝে না ছাগল, নাচে সে পাগল — মুগ্ধ প্রাণ॥

ইরানী কিস্‌সা

আহা চটো কেন? চটলে তোমার আসল চেহারা হয় প্রকাশ
অপকর্মের মাঝে তুমি নাই, রেখেছি আমরা এ বিশ্বাস।

আমরা বলিনি মুরগি চুরির ঘটনায় ছিল তোমার নাম,
কাজীর আঙুল ঘুরবার সাথে পুরলো জাতির মনস্কাম।

লুকাতে পালক তুমি আচানক হাত দিলে কেন খালি মাথায়
বৃথা আমাদের দোষ দাও আজ, নিজেই গড়ালে কাল খাতায়।

যত সাধ তুমি দাও গালাগালি, যত খুশী তুমি কুকথা কও
আমরা তো ঢের আগেই বলেছি: তুমি অতি সৎ, অসাধু নও।

ধরা পড়ো যদি রাগের মাথায়;
আসল চেহারা হয় প্রকাশ;
আমরা নাচার! সব মানুষেরি
আছে সহজাত অবিশ্বাস॥

www.pathagar.com

ব্যাঙের গল্প
(হস্তী দর্শনের অনুকূলে)

আমরা তো দেখি পুরো হাতীটাকে, ওরা শুধু দেখে ঠ্যাং !
'হাতীর স্বরূপ থামের মতন' – চ্যাঁচায় কূয়োর ব্যাং।
যদি প্রতিবাদ করে কেউ তবে ব্যাঙেরা দেখায় ঠ্যাং ;
মেনে নিলে বাণী খুশী হয়ে ব্যাং গায় যে, ঘ্যাঙর ঘ্যাং।

সঙ্গে সঙ্গে রঙিন খেতাব দিয়ে দেয় উপরন্তু,
সেই খেতাবের রঙ দেখে ফের পাকায় বিবিধ জন্তু।

শুধু বিজ্ঞানী মাথা চুলকায়
ওষ্ঠাগত যে প্রাণ ;
ব্যাঙের মগজে না যদি মেলে তা
'বুর্জোয়া বিজ্ঞান'॥

আজব 'প্রগতি?'

'কেন ধার করো পরের পুচ্ছ ?'
'কেন স্বজাতিকে করছ তুচ্ছ ?'
: বুঝবে না তুমি এটাও 'প্রগতি' ;
: বুঝবে না যেটা সেটাও 'প্রগতি'।

'টেনে চলো কেন ভিক্ষার জের ?'
'দাঁড়াও না কেন দু' পায়ে নিজের ?'
: বুঝবে না তুমি এটাও 'প্রগতি'।
: বুঝবে না যেটা সেটাও 'প্রগতি'।

'কেন ছেড়ে যাও নিজের কৃষ্টি ?'
'কেন অন্যের পণ্যে দৃষ্টি ?'
: বুঝবে না তুমি এটাও 'প্রগতি' ;
: বুঝবে না যেটা সেটাও 'প্রগতি'।
'বিজাতীয় চাপে কেন বে–সামাল ?'
'ডালে বসে কেন কাটো সেই ডাল ?'
: বুঝবে না তুমি এটাও 'প্রগতি'
: বুঝবে না যেটা সেটাও 'প্রগতি'।
(স্বগত)
হায়াত দারাজ বোঝেনি 'প্রগতি'
কেননা বিপথে খোঁজেনি 'প্রগতি'॥

www.pathagar.com

টুকরো কবিতা

পহেলা হিস্‌সা

ইশারা

যেখানে ভেড়ার শিঙে পূর্বাপর ভাঙে সব ধার
কি লাভ সেখানে খুঁজে দীপ্তি আর তীক্ষ্ণতা হিরার !
বরং সেখানে ঢের কার্যকরী পদার্থ এমন
তীক্ষ্ণতার পরিবর্তে আছে যার প্রচুর ওজন ॥

॥ এক ॥

আজাদীর লক্ষণ

স্বাধীন জাতির প্রাচীন এ লক্ষণ
মজবুত তার শিরদাঁড়া আর মন।
ও দুটো জিনিষ ছাড়ে না সে কিছুতেই
বাঁচাতে বরং করে থাকে প্রাণপণ ॥

গোলামী স্বভাব

গোলামীতে যদি করে কেউ গৌরব,
কে বোঝাবে তাকে আজাদীর সৌরভ ?
আঁকড়িয়ে থাকে দাগের চিহ্নগুলো
কানে দেয় তুলো ; পিঠে খাশা বাঁধে কুলো ॥

সওয়াল-জওয়াব

'সারাটা শরীরে গোলামীর কালো ছাপ'
শুধাই সবারে, 'এল এটা কোন পাপ
ঐতিহ্যের সঙ্গে করে বিবাদ ?'
উত্তর আসে, 'বিদেশের উমেদার,
তল্পী বওয়ার মাঠে ওর কারবার ;
বৈদেশিকের মনোরঞ্জনে সাধ।'

মৌলিকতা বিষয়ক বিতর্কে

মৌলিকতায় আছে ঢের বাহাদুরি ;
সব জামানায় কিম্মতী সেই জামা,

www.pathagar.com

অনুকারী যদি খ্যাতিমান হত তবে
শাখামৃগ হ'ত সব চেয়ে খ্যাতনামা॥

অনুকারীর আব্দার

চার পায়ে হাঁটা স্বভাব আমার
দুই পায়ে তুমি কেন হাঁটো?
হাঁটো চার পায়ে আমার মতন
মৌলিকতার আশা ছাঁটো।
করবে না আশা ছাঁটাই তোমার
হাঁটবে আবার সোজা হ'য়ে?
মরো তবে আজ সমালোচনার
বাক্য ঝাঁটার বোঝা বয়ে॥

প্রহসন

আহা কি করুণ; —পরানুকরণে ব্যর্থ প্রয়াস,
পরের পুচ্ছ গুচ্ছে গুচ্ছে গুঁজে বারোমাস!
তাইতো এ ভুল বিষয়বস্তু নির্বাচনেও,
অন্যের মুখে দাওয়াই সেবন মৃত্যু ক্ষণেও।
পারো না ছাড়তে কদর্য এই হীনমন্যতা
(সেরা প্রহসন, —অনুকরণেও ফোটে ব্যর্থতা)।

মূল্য-নির্ণয়

আপাত অচেনা ঈগলের চেয়ে
ভাবে ওরা: বড় এ চেনা চড়াই,
তাই ঈগলের সাথে চটকের
তুলনায় করে অহেতু বড়াই।
ঈগলের রূপ জানলে কখনো
ক'রতে না আর তর্ক লড়াই,
বুঝতো কদর ঈগলের; আর
বুঝতো কি দরে বিকায় চড়াই॥

www.pathagar.com

।। দুই ।।

অনাত্মীয় পরিবেশ

অনাত্মীয় পরিবেশ
জেনে নিতে চাও যদি ঠিক,
তবে জেনে নাও আগে
তুমি কোন্ পথের পথিক।।

অখণ্ড লোভের বেপারিকে

খণ্ডিত জমিন দেখে বেড়ে যায় কারণ ক্ষোভের,
প্রচার চালায়ে যাও তাই তুমি অখণ্ড লোভের !
'এক আশা, এক ভাষা, এক কৃষ্টি' — গাও তুমি যত,
উপরোক্ত কারণেই ব্যবধান বেড়ে যায় তত।।

'এক আশা'

এক আশা কোন দিন হয়নি, হবে না কোনমতে,
এ ক্ষেত্রে বিরোধ বড় রামরাজ্যে আর খিলাফতে !
খোর্মা খেজুরের সাথে কদলীর এ নয় বিবাদ,
স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ বাড়ায়েছে অতন্দ্র ফ্যাসাদ।।

'এক ভাষা'

বাংলা ভাষা এক যদি 'মুসলমানি বাংলা' কেন কও ?
হিন্দু রূপ দিতে তাকে সংস্কৃতের বোঝা কেন বও ?
'বাঙালির এক ভাষা' — কিভাবে এ গুরু বাক্য মানি ?
ব্রাহ্মণ্যবাদীর 'জল' কি কারণে হয় নাই পানি।।

'এক কৃষ্টি'

'এক কৃষ্টি' চাও যদি কেন তবে নিত্য অঘটন ?
স্বতন্ত্র জীবনাদর্শে কেন উল্টা মানসগঠন ?
সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য কেন সর্বস্তরে — কান্নায়, হাসিতে ?
এ যায় মক্কায় যদি কেন তবে ও যায় কাশীতে।।

www.pathagar.com

সাহিত্যে ঐতিহ্য : এক

ঐতিহ্যটা চাও যদি আঞ্চলিক ভিত্তিতে কেবল
তাহ'লে গুরুর সঙ্গে কেন তুমি করো না কোন্দল?
'বাঙলার কবি' কেন মহারাষ্ট্র, রাজপুতানার
কাল্পনিক গাথা গানে ক'রে দেন হৃদয় উজাড়?
মক্কা মদীনার পথে কেন তবে সতর্ক পাহারা?
কি সূত্রে বাঙালি হয় ভিন্নভাষী অবাঙালি ধারা॥

সাহিত্যে ঐতিহ্য : দুই

পুরা আঞ্চলিক শর্তে দিতে যদি চাও ঠিক দাম
তাহ'লে তোমার কাব্য কি উপায়ে পায় পরিত্রাণ?
লঙ্কা কাণ্ড কি কারণে রাঢ় বঙ্গে লুটে নেয় নাম?
কোন্ বাংলা নিয়ে বলো লেখা রাম–রাবণের গান?
দূরান্তের কিস্‌সা বলে অতঃপর কেন অভিমান;
পুঁথিতে তোমার কেন অকারণে ওষ্ঠাগত প্রাণ॥

কুয়োর ব্যাঙ

'কূপমণ্ডুকের দৃষ্টি শ্রেষ্ঠ' ব'লে যে কুয়োর ব্যাঙ
সর্বদা ওস্তাদি করে বন্দী থেকে নিজ নিকেতনে,
কি ক'রে বোঝাবে তাকে? বুদ্ধির দু'পায়ে মেরে ল্যাঙ
ভাবে সে সমগ্র বিশ্ব বাঁধা আছে নিজের প্রাঙ্গণে!
গোটা দুনিয়াকে তাই বেমালুম দেখে তার কাছে
(বিশ্বাস করো না–করো, ব্যাঙ তার স্বপ্ন নিয়ে আছে)॥

পলাণ্ডু গবেষণা

যখন কাজের মাঠে অকাজের অনুরোধ ক্রমে
ভুয়া পন্ডিতের বুলি অকারণে বাড়ায় যন্ত্রের
মুণ্ডের, ভেরেন্ডা ভাজা সেই সাথে চলে পুরাদমে;
অভিজ্ঞজনেরা কন : ইহাই পলাণ্ডু গবেষণা॥

www.pathagar.com

দাঁও

উর্বর জমিনে যেথা গজায় আগাছা রাতারাতি,
পণ্ডিতম্মন্যেরা সেথা মারবে না কেন ঘোড়া হাতি?
প্রকৃত সজ্জন আর গুণীরা যেখানে এক পেশে,
পায় না ইরানী পাত্তা; ফারসি পড়ে অন্য কেউ এসে॥

দুঃখের কারণ

বিজাতীয় কৃষ্টি কেন্দ্রে পারো নাই হ'তে 'সব্যসাচী'
(দুঃখ ওখানেই)! শুধু খোলস দেখেই বেকারার
করেছে বেতাল নৃত্য; পারো নাই যেতে কাছাকাছি!
কি লাভ শিখণ্ডী হ'য়ে (কিংবা মৃগ শাখায় সওয়ার)॥

কাক-চরিত

অতি ধূর্ত কাক যদি গুঁজে দু'টো পায়রার পালক
আপ্রাণ প্রয়াসে তার করে যায় 'বকম' 'বকম';
কবুতর আখ্যা তাকে দেবে কোন নির্বোধ বালক
(বিশেষত যে অঞ্চলে ঘটে থাকে কাণ্ড ওরকম)॥

॥ তিন ॥

তল্পী

তল্পী বহনের বিদ্যা আছে যার ঘটে কিংবা দিলে;
অনেক দুর্লভ পাখী মেরেছে সে ঐ এক ঢিলে॥

তৈল

তৈল মর্দনের ধারা প্রচলিত এখানে, কেননা
এ মাঠে দেখেছি ঢের শ্রম-বিমুখের আনাগোনা।
উপরন্তু এ অঞ্চলে ভাগ্যবান আছেন দেদার
যাঁদের তৈলাক্ত মুণ্ড করে যোগ্য, অযোগ্য বিচার॥

কৌশলী

যেহেতু উত্তপ্ত অন্নে ক্রমান্বয়ে বিষণ্ন মার্জার
এবং উচিত বাক্যে ততোধিক বিষণ্ন পৃথিবী,

www.pathagar.com

সেহেতু বিল্লীকে দিয়ে ঠাণ্ডা ভাত, ... মিঠা কারবার
চালু রেখেছেন এই দুনিয়ায় ঢের মিঞা বিবি ॥

দু' নৌকায়

দু' নৌকায় পা দিয়ে কে পেয়েছে এ দরিয়ার কূল,
তবু দেখি অনেকেই করে যায় মারাত্মক ভুল !
'কোন্ শ্রেণীভুক্ত এঁরা' — হামেশাই করেছি সওয়াল ;
জওয়াব পেয়েছি 'যারা অতি চালাকিতে বে-সামাল' ॥

কথা প্রসঙ্গে

'সত্যের খাতিরে যদি কিছুক্ষণ দেখ নিয়ে দম
বুঝবে অপ্রিয় সত্য পরিহার করাই নিয়ম।'
'সুবিধাবাদীর পন্থা সত্যান্বেষী পথিকের নয়,
যদিচ মাধুর্য তাতে ক্ষুণ্ন হয় সময় সময় ॥'

'যেখানে —'

যেখানে বিজ্ঞানবিদ তাড়া খেয়ে পালায় যেমন
অবাঞ্ছিত প্রাণী, কিংবা জ্ঞানী-গুণী চিঁড়ে চ্যাপ্টা প্রাণে
অভাবের তাড়নায় হয় অপমৃত্যুর ইন্ধন ;
বুঝি না সেখানে আমি 'অগ্রগতি' কথাটার মানে ॥

আদর্শবাদী লেখকের প্রতি

যেখানে সম্মান পায় কালোবাজারের
মহাজন (ভুরিভোজে চর্বিপুষ্ট দেহ),
সেখানে আদর্শগত ভাগ্য লেখকের
বিড়ম্বিত হবে তাতে আছে কি সন্দেহ ?

॥ চার ॥

জিজ্ঞাসা

'ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন'
অট্টালিকা যদি কেউ গড়ছে এমন,

www.pathagar.com

ইষ্টকের নিচে রেখে দুর্বুদ্ধি পৃথক
অন্য কেউ করে নাকি কর্ম ধ্বংসাত্মক ?

প্রচার

যে যুগের মারপিট অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রে আণবিক
প্রচার না হ'লে তার সূক্ষ্মতর হবে বেগতিক,
কাজেই কৌশলী চক্রে চ'লেছে প্রচার সূক্ষ্ম ডোজে
(এ পথের হাকিকত জানে যারা অর্থ তারা বোঝে)॥

প্রচারের ধারা

কৃষ্টির মাধ্যম সেরা, প্রচারের অস্ত্র এ মোক্ষম
(ঐ অস্ত্রে কুপোকাত যাবতীয় পর্বত ও ঘট) !
রঙিন মোড়কে ঘেরা নিরুপম সুন্দরী, নির্মম
নিপুণ কটাক্ষে তার এনে দেয় জাতীয় সংকট॥

দোহাই

হিংসা ও হিংস্রতা যদি দেয় শান্তি–সাম্যের দোহাই,
মনে রেখো অশান্তির, অসাম্যের জের মেটে নাই॥

ইটের বদলে

ইটের বদলে যারা ব্যতিব্যস্ত খেয়ে পাটকেল ;
শুধাও পূর্বাহ্নে কেন দেখিয়েছে নষ্টামির খেল॥

হিংসা

নাসিকার অগ্রভাগ ছেঁটে ফেলে তাপে অন্তরের
বোঁচা হওয়া চলে (তাতে যাত্রাভঙ্গ হয় কি অন্যের)॥

সর্পিল

পরিচিত বনে তার চিকণ, সর্পিল দেহ ঢেকে
সুযোগের সন্ধানে যে ক্রমাগত ঘোরে এঁকেবেঁকে

www.pathagar.com

তন্বী সে সুঠাম, যার গতি ছন্দে জাগে বনতল ;
অবসর পেলে সে কি ছেড়ে দেয় না হেনে ছোবল ?

(মন্তব্য)
অলক্ষ্যে অনেক কথা
এ যাবত টেনেছে নেকাব,
কিন্তু কে পেরেছে কবে
চাপা দিতে বিশিষ্ট স্বভাব ॥

শিল্প-বিচার

যদি কোন বেরসিক করে উল্টা শিল্পের বিচার
ছেড়ে যেতে রাজি আছি নির্বোধ ব্যক্তির কারবার।
শুধু সচকিত হই এ সংবাদে কখনো কখনো
সমালোচনার ভার নেয় যদি ব্যর্থ শিল্পী কোনো।

(মন্তব্য)
পচা শামুকের ধার
বেঁচে আছে কিংবদন্তী হ'য়ে,
'পা কাটার যম' কারা
চিন্তা ক'রে দেখো স্থির হ'য়ে ॥

শিল্পী

শিল্পীর নৈপুণ্য বুঝি দেখে তার পরিমিতি বোধ,
স্পর্শে তার সুরজাল সৃষ্টি করে নিষ্প্রাণ সরোদ,
কিন্তু আনাড়ির হাতে পড়ে যদি যন্ত্র মূল্যবান
কিঞ্চিৎ আলাপে তার শ্রোতাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥

কবিতা

অনভিজ্ঞতার মাঠে অঙ্গভঙ্গী দেখিয়ে প্রচুর
যদি কেউ চায় নাম (কবিযশঃপ্রার্থী অর্বাচীন)
তবে নিঃসন্দেহে জেনো ব-কলমে জীবনের সুর
পুতুলের ভেল্কি দেখি প্রাণাবেগে হবে না রঙিন ॥

www.pathagar.com

অশ্লীল কবিতা প্রসঙ্গে

পশুর প্রবৃত্তি নিয়ে চায় যারা মর্মের পুলক
অশ্লীল ভাষায়, ভাবে গায় গান রিরংসামূলক,
পাশবিকতার নিম্নে সে সব দ্বিপদ জানোয়ার
কৃষ্টিক্ষেত্রে পূর্ণ করে শূন্যাসন বারবনিতার ॥

অবোধ্য কবিতা

কবিতা প্রলাপ নয় (অতঃপর অর্থ যার নেই
ঊন-পঞ্চাশের ঘর সে খুঁজুক ; আছে তা কাছেই) ॥

পরগাছা

টবের কৃপায় যার প্রতি দিন মরা কিংবা বাঁচা
বাগিচায় অবাঞ্ছিত মূল্যহীন সেই পরগাছা ॥

ঐতিহ্য-বোধ

ঐতিহ্য না চিনে তার কেউ যদি লেখে হিজিবিজি
রসজ্ঞের মজলিসে হবে না কি সেটা বেতমিজি ?

বিক্রীত

বিকায়ে নিজের সত্তা যে ভোলে জাতীয় তমদ্দুন
হবে না কি তার দান ধার করা কদলী, বেগুন ?

কাফেলার অগ্রগতি

বিশেষ প্রাণীর ডাকে কাফেলা কি থেমেছে কখনো
যদ্যপি সে গতিবেগে ঈর্ষাতুর হয় প্রাণী কোনো ॥

দুস্‌রা হিস্‌সা

উদ্ভট ব্যাপার

নর্দমার ময়লা পানি স্বভাবত ঘোলাটে, — সেখানে
যায় না কিছুই দেখা। ভ্রান্ত হবে সেখানে কি ভাষা ?

www.pathagar.com

'সমুদ্র-অতল' তারে কবে কোন মূর্খ, বুদ্ধিনাশা ?
অর্থহীন প্রলাপে কি পাবে কেউ জীবনের মানে ?

অন্তর্দ্বন্দ্ব

'হবে কি হবে না' — এই দ্বন্দ্ব যদি থাকে কারো মনে
তুষের আগুনে জ্বলে কারণে অথবা অকারণে।
সবর অথবা ধৈর্য এই ক্ষেত্রে যার যত কম
মানসিক নৃত্য তার তত বেশী অথবা চরম।।

আত্মবিক্রয়ের পন্থা

আত্মবিক্রয়ের পন্থা অনায়াস-লভ্য তাই ব'লে
কারা নেবে ওই রাহা (সুপরিকল্পিত হট্টগোলে) ?
কারণ এটাই জানি হুঁশিয়ার মানুষের নীতি
অস্তিত্ব বজায় রেখে বিশ্বপ্রেম করা যথারীতি।।

অদ্ভুত উদারতা

নিজ সত্তা বিক্রি করে ঔদার্যের নাম নাও যদি
ঠাঁই পাবে সভাস্থলে বড় জোর পা-পোষ অবধি,
গলায় গলায় মিল কোন দিন হবে না সেখানে ;
দৌর্বল্য ঔদার্য নয় (এ কথাটা নির্বোধও জানে)।।

হজম শক্তি

অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগে মরে নাই কখনো রাক্ষস
বরং বেড়েছে ক্ষুধা যত তার বেড়েছে বয়স,
শৈশবে বিস্মিত হয়ে শুনেছি আজব রূপকথা,
এখন সর্বত্র দেখি হজম শক্তির ব্যাপকতা।।

মাৎস্যন্যায় নীতি

চুনো মাছ খাওয়া যদি বৃহৎ মৎস্যের মূল নীতি
তাহ'লে কি ভাবে বলো চুনোদের অকারণ ভীতি ?
হোক না প্রাচীন আর অতিশয় অভিজাত রীতি
চুনোদের কাছে ওটা আদ্যোপান্ত কঠিন দুর্নীতি।।

www.pathagar.com

আদর্শের নামে
আদর্শের নাম নিয়ে মুনাফা ওঠালে পায় পায়,
আদর্শ নামে না মাঠে, ঘুরে মরে হাওয়ায় হাওয়ায়॥

শক্তির উৎস
প্রতিপক্ষ পেরেশান থাকতো যে আদর্শের জোরে
কোথায় পাবে সে শক্তি আজ তাকে পাঠিয়ে কবরে?

স্বপ্নচারী
স্বপ্নযোগে যদি কেউ ফল পেতে চায় বিশ ধামা
সুবুদ্ধি ফেরার আগে নেয় না সে কাজের হাঙ্গামা॥

পরিণতি
ময়দান থাকে না ফাঁকা কোন দিন হাসি ও কান্নার,
সুবুদ্ধি পালায় যদি দুর্বুদ্ধিটা নেয় কার্যভার॥

উৎকট পরিকল্পনা
ঘোড়ার সামনে গাড়ী (নভস্পর্শী কল্পনার তেজে
ব্যর্থতা ঝিমায় শুধু অতি-শ্রান্ত অশ্বটার লেজে)।

সহজ পন্থা
সহজ পন্থায় কাজ সর্বদাই হয় না সহজে,
দেখে যারা না বুঝেছে অতঃপর ঠেকে তারা বোঝে।
দুরূহ ভাগ্যের পথে লড়েনি যে, তার তকদির
দেয়নি সহজ মতে সাফল্যের আশ্চর্য ফিকির॥

বাস্তব বুদ্ধি
চাহিদার সাথে নিত্য আছে যোগ সরবরাহের,
যে জানে, — সময়মত রাখে খোঁজ বিবিধ পণ্যের।
কিন্তু যে রাখে না খোঁজ (রঙিন আশায় স্বপ্নাতুর)
পরিস্থিতি না বুঝেই অকুস্থলে হয় সে ফতুর॥

ব্যবসায়
নগদের কারবার এখানে (যদিও
ধার নিয়ে বহু ব্যক্তি হন স্মরণীয়)॥

www.pathagar.com

পলায়নী ভাব
পলায়নী ভাবটাকে কেন তুমি জ্বালাও বেদম?
বিস্তর মুনাফা এতে (তুলনায় মেহ্নত কম) !

পলাতকের কৃতিত্ব
পালিয়ে যে বেমালুম ইজ্জতের পিঠে মারে ছুরি,
সুখ্যাতি গাও না-গাও ; নিজে সে দেখাবে বাহাদুরি॥

মামার দৌলৎ
মামার দৌলতে যদি কিস্তিমাত হয় সহজেই
তবে বুঝে নাও কেন ভাগিনেয় অন্য পক্ষে নেই॥

'কাজীর গরু'
গোয়ালে অস্তিত্ব নাই (গ্রন্থে যদি শুধু নাম থাকে
কে দিয়ে নগদ মূল্য কিনে নেবে ভুয়া প্রাণীটাকে) !

'সরিষার ভূত'
সুদীর্ঘ সুযোগে সরষে ভূতগ্রস্ত যেখানে নিজেই
ভূত তাড়ানোর বিদ্যা সে মুলুকে অন্য কারু নেই॥

কওমী দায়িত্ব
কওমী দায়িত্ব ছেড়ে সকলেই দেখে যদি দায়
অগত্যা হ'তেই হবে দলবদ্ধভাবে নিরুপায়।
লুটের ময়দান ভেবে যদি পার্শ্ববর্তীর পকেট
প্রত্যেকে লোপাট করে তবে কারো ভরবে না পেট॥

'ক্ষেতের বেড়া'
যেখানে ক্ষেতের বেড়া খায় শস্য, তরকারি, আনাজ ;
সেখানে ফসল রক্ষা স্বভাবত অসম্ভব কাজ।
এ ক্ষেত্রে ভেড়ার দোষ যাবত না হয় সংশোধন,
শস্যহানি আশঙ্কাটা জেগে থাকে মাঠে ততক্ষণ॥

খেশারত
যে মাঝি নিষ্ক্রিয় ভাবে হামেশাই থাকে বে-সামাল ;
আশ্চর্য কি তার কাছে নৌকা যদি হয় বানচাল?

www.pathagar.com

যাত্রী যারা এ নৌকায় না হ'লে পূর্বাহ্নে হুঁশিয়ার
অত্যন্ত সহজে বোঝে কর্মফল নিশ্চিন্ত থাকার॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণ
সকল ব্যাপারে যদি
চাও তুমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ
শুরু ও শেষের কথা
কেন তবে করো অনুমান॥

হুজ্জতের ফায়দা
কোলাহল ক'রে কাক পারেনি কি বাড়াতে পশার
বাজারে (যেখানে ব'জ কঙ্কে পায় নাই কোন দিন,
সেখানে কৌশলে ধূর্ত করে না কি রুজি রোজগার)?
হুজ্জতেই টিকেছে সে; হিকমত চায়নি কঠিন॥

চক্র ও চক্রান্ত
পূর্ণ গোলাকার ব'লে চাকা ঘুরে চলে নির্বিবাদে,
চক্রান্ত হ'লেই শুধু প'ড়ে যায় বিষম ফ্যাসাদে,
অতএব কেউ যদি চায় তার নিরঙ্কুশ গতি
হুঁশিয়ার থেকে যেন বুঝে নেয় নিরঙ্কুশ ক্ষতি॥

একটি প্রতারণার কাহিনী
প্রবঞ্চনা পেশা তার (নেশা ছিল কৌশলী বঞ্চনা),
তবু দেখি অতি ধূর্ত করে শেষে আত্মপ্রতারণা।
সুবিখ্যাত একদিন প্রতারক মহলে—মিছিলে,
জানি না কিভাবে আজ পড়ে গেছে স্বখাত সলিলে॥

(মন্তব্য)

যদিও এড়িয়ে চলে
অতি ধূর্ত পাখী ফাঁদটাকে
তবুও সময় আসে
যে মুহূর্তে ফাঁদ ধরে তাকে॥

দুর্দিনের পরিচয়
দুর্দিনে যে পরিচয় দিলে তুমি সেটাই সঠিক
(সুদিন সুবাদে এই পরিচিতি নয় আন্তরিক)॥

www.pathagar.com

উচ্চবিত্ত
উচ্চবিত্ত যে জীবন গজদন্ত মিনারে রঙিন
শোষণের পন্থা গেলে হয় তার অবস্থা সংগিন,
কাজেই বিব্রত কিছু বাঁচাতে ও অভিজাত ঠাট
(কিঞ্চিৎ অসদুপায়ে) হুর, পরী, সম্ভোগের হাট॥

মধ্যবিত্ত
মধ্যবিত্ত সমাজের অনুভূতি হারানো জীবন
চলে মাঝামাঝি বেগে কদাচিৎ হয় অগ্রগামী,
তখন আকাশে তার শোনা যায় ঝড়ের স্পন্দন;
ঝড় থেমে গেলে ফের পূর্ববৎ দেয় সে সেলামী॥

নিম্নবিত্ত
নিম্নবিত্ত নামধারী পাতালের অধিবাসী যারা
রয়েছে তাদের ঘিরে উচ্চ আর মধ্যের পাহারা;
জমিতে, খনিতে, হ্রদে, দরিয়ায় অথবা জঙ্গলে
উপরোক্ত অনুগ্রহ রাখে ঘিরে অশেষ কৌশলে॥

পরিস্থিতি : এক
'সৌধের আশ্বাস ব্যর্থ,' — কেন যদি জেনে যেতে চাও,
তবে জেনে নাও; — ওরা চাখে নাই সে বাসি পোলাও॥

পরিস্থিতি : দুই
'কিংবদন্তী হয়ে কেন র'য়ে গেল আত্মীয় সুবাদ?'
— প্রশ্নের উত্তরে বলি : ক'রেছে ওদের বরবাদ॥

প্রশ্নোত্তর : এক
'আদর্শের রূপায়নে কেন এ ব্যর্থতা?'
'কর্মীদের বে-ঈমানী কিংবা অযোগ্যতা।'
প্রশ্নোত্তর : দুই
'খ্যাতি-অর্থ-প্রতিপত্তি পুজার কি ফল?'
'যে রোগে আদর্শবাদী মুনাফেকি বাড়ায় কেবল।'

মাতব্বর ও স্পষ্টবাদী
'সারা দেশ ছেয়ে গেল কেন হীন চৌর্যে ও মিথ্যায়?'
'দুষ্ট লোক বলে থাকে এ তোমারি কর্তব্যনিষ্ঠায়॥'

www.pathagar.com

বর্ণচোরা ও হায়াত দারাজ : এক
'ধর্মের সামান্য জেনে সর্বত্র দেখাও বাহাদুরি।'
'অপিচ অবোধ্য থেকে মারি না সত্যের পিঠে ছুরি॥'

বর্ণচোরা ও হায়াত দারাজ : দুই
'মোল্লাকি ইস্‌লাম নয়, — খোলাখুলি বলে রাখি আজ।'
'মোনাফেকটাও নয়, — সাচ্চা রাহে শুরু হোক কাজ॥'

বর্ণচোরা ও হায়াত দারাজ : তিন
'শান্তি ধর্ম মানো তবু কেন চাও জেহাদের সাজ?'
'কারণ অশান্তি চক্র সুকৌশলে ক'রে যায় কাজ।'

ঐতিহাসিক ও ইতিহাস
'কিভাবে, কখন বলো মারা পড়ে নীতি আর ন্যায়?'
'ন্যায়ের মুখোশ পরে দণ্ড ধরে যখন অন্যায়॥"

নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়
'করি বা না করি কাজ, দোষত্রুটি দেখে যাই কার।'
'বুঝেছি তাহলে তুমি কর্তব্যের টিকেট চেকার॥'

অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ
'সোনায় সোহাগা শুধু হয়নি তোমার কাছে এসে।'
'সোনায় সোহাগা হয় অভিজ্ঞ কর্মীর সমাবেশে॥'

মড়ক ও ভুক্তভোগী
'পাওনাগণ্ডা বুঝে দাও, চলে যাই নিজের সড়কে।'
'অত্যধিক নাওনি কি সর্বাত্মক দুর্ভিক্ষে, মড়কে?'

গেঁটে বাত ও রোগী
'কোন গাঁটে নেব ঠাঁই নির্বাচন কর তা নিজেই।'
'ঔদার্যের ধাপ্পা থেকে তবে কি রোগীর মুক্তি নেই?'

ব্যাঙ ও রুই মাছ
'পুচ্ছ গর্বে মহফিলে বাড়াবাড়ি ক'রেছে ব্যাঙাচি।'
'যাবৎ না খসে লেজ টানবে না তাকে কাছাকাছি॥'

www.pathagar.com

ফড়িঙ ও পিঁপড়ে

'ভোর না হওয়ার আগে কি কাজে চলেছ মুখ বুজে?'
'এতটা সকালে তু[illegible]'লেছ কোথায় সেজেগুজে?'
'মুক্ত প্রভাতের পথে দু জনারি এক পরিচয়।'
'অবশ্য অন্যের মুণ্ডে কাঁঠাল ভাঙার পন্থা নয়।।'

অধর্ম ও ধর্ম

'ধর্ম আর অধর্মের মধ্যে কেন প্রভেদ, তিক্ততা?'
'যেহেতু হয়নি আজো সত্য ও মিথ্যের সমঝোতা।'
'শুভেচ্ছা থাকলে মনে হয় না কি মিলন সার্থক?'
'ভেক নিয়ে এ যাবত করেনি কি চেষ্টা ঢের 'বক'?'

'প্রগতি'পন্থী ও হায়াত দারাজ : এক

'যুগধর্ম মেনে চলো, প্রগতির পথে চলো ছুটে
পিছিয়ে হাজার সাল কেন তুমি যেতে চাও উটে?'
'স্বাতন্ত্র্য নীতির প্রশ্নে (দুর্বুদ্ধি না থাকে যদি পেটে),
এ ক্ষেত্রে বিরোধ নাই বাইনে বা উটে আর জেটে।'

'প্রগতি'-পন্থী ও হায়াত দারাজ : দুই

'প্রগতির পথে যদি আনে বাধা আদর্শ তোমার,
কিভাবে সখ্যতা, মিল সম্ভব? বলো তা এই বার।'
'প্রগতি না হয় যদি বেহায়া ফুর্তির কারবার
মানুষের অগ্রগতি পথে বাধা হবে না তোমার।'

প্যাঁচা ও বাজ

'বিরাট মূর্খতা নিয়ে বুঝবে কি প্যাঁচার কদর,
ঘন অন্ধকার বনে চলে যার সুতীক্ষ্ণ নজর?'
'ইঁদুর না চেয়ে শুধু চাও যদি আজাদী, ইজ্জৎ
খোঁজো মুক্ত দিবালোকে হিক্‌মত; বাজের হিম্মৎ।'

কুমীর ও সমুদ্র

'তরঙ্গ তুফানে ক্লান্ত ভেবেছি এ কথা দীর্ঘ দিন
নদীতে কাটাবো কাল স্বপ্ন আর শান্তিতে রঙ্গিন।'
'একটু সতর্ক থেকো, দুষ্ট বুদ্ধি সঙ্গে যায় যদি
তোমার স্বপ্নের তাপে জাহান্নাম হবে সেই নদী।'

তার্কিক ও ধার্মিক

'ধর্ম নামে চালু আছে দীর্ঘ দিন যত লোকাচার
যে কোন কারণে হোক অর্ন্তবর্তী ধর্মীয় সংস্কার।'

www.pathagar.com

'বাঘ সিংহ নামে যদি চালু থাকে বিল্লী ও শিয়াল ;
বিড়াল হয় না বাঘ ; সিংহ প্রাণ হয় না শৃগাল।'

গাধা ও সিংহ

'হাজার হাজার বাক্য বলেছেন এখানে সবাই
যদি অনুমতি দেন বক্তব্যটা সংক্ষেপে জানাই।'
'জ্ঞানী, গুণী, ধৈর্যশীল সব শেষে বলেন সংক্ষেপে,
অত্যন্ত বাধিত হব বাক্যালাপ করো যদি মেপে।'
'সকলে যা বলেছেন এতক্ষণ, —হয়নি কিছুই ;
সুচিন্তিত মত বলি : জমি নয় কিছুতেই ভুঁই।'
'এতটা নিরেট তুমি বুঝি নাই দু' মিনিট আগে ;
গর্দভের গবেষণা সব মূর্খতার পুরোভাগে।'

দোস্ত ও হায়াত দারাজ

'আদর্শ কর্মীর খ্যাতি চায় যারা কর্মহীন পথে
তাদের উপমা কিছু পেয়েছো কি কাব্যের জগতে।'
'এক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই বুদ্ধিহীন গাধার মেছাল
মানুষের মান চেয়ে যে নির্বোধ কাটায়েছে কাল !
অথচ স্বপ্নের ঘোরে ভাবেনি কখনো চতুষ্পদ
মানুষের দল মাঝে নাই তার সীমা ও সরহদ।।'

ইব্‌লিস ও হায়াত দারাজ

'কমনীয় কল্পনার কাব্য গীতি ছেড়ে দিয়ে আজ
ব্যঙ্গের চাবুক নিয়ে কেন ঘোরো হায়াত দারাজ ?'
'ইব্‌লিসের ষড়যন্ত্রে অবকাশ নাই কল্পনার
ব্যঙ্গের চাবুকে খুঁজি যথাযোগ্য সমাধান তার।'
'ক্ষমা মহতের ধর্ম, মুমীনের বিশিষ্ট স্বভাব ;
তোমার চরিত্র কেন উপরোক্ত গুণের অভাব ?'
'ইব্‌লিসের গুপ্তচর পায় যদি আত্মীয় খেতাব
বরাবর যা হয়েছে এবারেও হবে সেই লাভ।'

(মন্তব্য)

তখনি সন্দেহ জাগে যে মুহূর্তে ইব্‌লিসের মুখে
শুনি ইন্‌জিলের বাণী, যে মুহূর্তে পরিচিত পাপী
সাধু বেশে অকস্মাৎ মিষ্ট হেসে দাঁড়ায় সম্মুখে
তিক্ত অভিজ্ঞতা বলে : এনেছে সে দুর্বুদ্ধির ঝাঁপি।।

www.pathagar.com

তিস্‌রা হিস্‌সা

।। এক ।।

(প্রাচীন প্রবাদ ও শ্লোক অবলম্বনে)

এক : ঈদের চাঁদ
যেমন 'ঈদের চাঁদ' — দুর্লভ ব্যাপার,
দীর্ঘ ইন্তেজারে শুধু দেখা পাও যার।

দুই : মরদের কথা
হাতীর দাঁতের মত মরদের কথা,
এক বার বলে যেটা হয় না অন্যথা।

তিন : দো-দেল বান্দা
দু' মুখো সাপের মত দুই দিল্ যার
দুনিয়ায় করে শুধু ধোঁকার কারবার।

চার : মোল্লার নজর
মুর্দা যাক জাহান্নামে অথবা জান্নাতে
মোল্লার নজর শুধু রুটি হালুয়াতে।

পাঁচ : দিল্লীর লাড্ডু
যে খেলো দিল্লীর লাড্ডু, খায়নি যে আর ;
দু'জনার ভাগ্যে দেখি পস্তানোই সার।

ছয় : মেকীর প্রাধান্য
যা কিছু চম্‌কায় তার সব-ই সোনা নয়
মেকীর প্রাধান্য দেখি অনেক সময়।

সাত : অতি-সংসারী
তপ্ত দুধে মুখ যার পোড়ে একবার
ফুঁ দিয়ে খায় সে ঘোল অতি চমৎকার।

আট : ধুবীর কুকুর
যে নয় ঘরের কিম্বা যে নয় ঘাটের
হতচ্ছাড়া সেই প্রাণী ধুবীর নাটের।

নয় : পিঁপড়ের পাখা
গজালে পিঁপড়ের পাখা ওড়ে সে যখন
তখন প্রবীণ ; জ্ঞানী চিন্তাযুক্ত হন।

www.pathagar.com

দশ : বে-হায়ার লক্ষণ
ছুঁচোর নর্তন ঘরে, বাহিরে ফুটানি
বেহায়া প্রাণীর এই আজব নিশানি।

এগারো : ইল্লৎ ও খাস্‌লৎ
ইল্লত যায় না ধুলে বহু পাত্র পানি ঢালো যদি,
স্বভাবের মলিনতা থেকে যায় মরণ অবধি।

বারো : অভ্যাস
সিঁদকাঠি সুবাদে যে যৌবনে করেছে হাঁটাহাঁটি
বার্ধক্যে নিজের ঘরে (অভ্যাসবশত) খোঁড়ে মাটি।

তেরো : সঠিক মূল্যবোধ
পায়ে দিলে সোনাদানা, মোতি দিয়ে দু' পাখা সাজালে
কাক র'য়ে যাবে কাক ; রাজহংস হবে না সে কালে।

চৌদ্দ : প্রকৃত গুণী
খানা ডোবা তোলপাড় পুঁটিদের ফরফরানিতে,
অগাধ পানিতে রুই ঘোরে একা নির্বিকার চিতে।

পনেরো : হিংসুক
সাপের সুঁচালো দাঁতে থাকে কিছু বিষের সঞ্চয়,
হিংসুকের সারা মন, সর্ব সত্তা বিষে বিষময়।

ষোল : ছিদ্রান্বেষী
দেখে না নিজের দোষ পর ছিদ্রে উৎসাহী পরম,
ছিদ্রান্বেষী জীবনের এ ব্যর্থতা জেনেছি চরম।

সতেরো : মূর্খতা
সকল ব্যাধির মূল, প্রতিকার গ্রন্থে খুঁজে পাই,—
র'য়েছে ঔষধ ; শুধু মূর্খতার মেলে না দাওয়াই।

॥ দুই ॥

সংশয়িত
মুখে মুক্তির বুলি তবু কেন বগলে ইঁট
(নও তো শেখ ফরিদ) !
বলো তো কোথায়, কোন্ জলসায় বিকালে পিঠ
(বলো তো কার মুরীদ) ॥

www.pathagar.com

ফাঁকা বুলির পশারীকে
বাহাদুর তুমি — প্রমাণ দিয়েছো ঠিক !
হাল হকিকত যারা জানে, বলে
: অবস্থা বেগতিক !
যদিচ রেওয়াজ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ;
আসল চেহারা রাখে না গোপন
গাল–ভরা বুলি ফাঁকা।

হিতৈষী ও হায়াত দারাজ
'অমর হওয়ার যদি থাকে সাধ
কোরো না এভাবে আশা বরবাদ
সমস্যা টেনে অফুরান।'
'সমস্যাহীন জীবন যাঁদের
তাঁরাই টানুন ও নেশার জের ;
ও জামাতে আমি বেমানান।'

প্রজাপতি ও মৌমাছি
'নামতে চাই না কঠিন কাজের জাঁতায়,
চাই শুধু নাম উচ্চ খ্যাতির পাতায়।"
'দুনিয়ার সেরা আহম্মকের খাতায়
নামটা তোমার রইবে প্রথম পাতায়।'

অকর্মা ও কর্মী
'পারবে না যদি তবে কেন যাও কাজে,
কেন অকারণে ঘোরো নিমখুন হ'য়ে ?'
'যে নামে কাজের ময়দানে সেই জানে
আসে কামিয়াবি কত ব্যর্থতা স'য়ে।'

জেওর ও জহুরী
'হিরার কদর ছিল গোজাশ্‌তা জামানায়।'
'তোষণ যখন ছিল ঢের কম দুনিয়ায়।'
'স্বজন–তোষণে ক্ষতির মাত্রা কতটুকু ?"
'ধ্বংসের পথে কওমী সফর যতটুকু।'

অনভিজ্ঞতার খেশারত
কেতাবে সাঁতার শিখে মিঞা সাব তিন রাত
পানির উপর হলেন যখন চিৎপাত
পানিটা তখন ক'রল যে কাজ ! ... বেরসিক
না বুঝেই বলে, 'ছিল না মিঞার মাথা ঠিক।'

www.pathagar.com

প্রকৃত বিড়াল

কাঠ বিড়াল

কাঠের বিড়ালে যদি কাজ হ'ত ভাই
শিকারী বিড়াল থাক্‌তো না দুনিয়ায়।

কাঠের বিড়াল

কাঠবিড়ালেরো যত পরিচয় পাই
শিকার-সুবাদ তত দূরে স'রে যায়।

শিকারী বিড়াল

তর্ক থামিয়ে এবার বিদায় হও ;
শিকারী বিড়াল দু'জনার কেউ নও॥

॥ তিন ॥

অবারিত প্রশ্ন

বুদ্ধিতে ঢের দিয়েছি শান
বুঝতে চায় না তবু এ প্রাণ ;
মাথা নেড়ে ভাবে মনের শিক !
ক্ষুধায় অন্ন হামেশা চায়,
বোঝানো যে তাকে হ'য়েছে দায় ;
এটা কোন্ রোগ দার্শনিক ?

বানরের পিঠা ভাগ

দাড়ি-পাল্লাধারী বানর
(১ম বিড়ালের প্রতি)

ভোজ্য বস্তু ও দিকে হয়েছে বেশী
না-খেলে কিছুটা সমতা হবে না আর.....
[অধিকাংশ পিঠা ভক্ষণ]

(২য় বিড়ালের প্রতি)

ওজনটা দেখি এ দিকেই হ'ল বেশী
পুনরায় কিছু করি সদ্ব্যবহার.....
[অবশিষ্ট পিঠা ভক্ষণ]

উভয় বিড়াল সমস্বরে

পিঠা দূরে থাক, নাই যে পিঠারো দাগ !

বানর
(বৃক্ষারোহণ পূর্বক)

একেই তো বলে বানরের পিঠাভাগ॥

www.pathagar.com

বক্‌রি ও বলদ

বকরি

'খোরাকিতে লাগে যার যতটুক
হিস্যায় পাবে ঠিক ততটুক',
এ ভাবেই বুলি তুমি ঝাড়লে?
কেন তবে ঘাসগুলো কাড়লে?

বলদ

কেতাবের বুলি রেখে কেতাবেই
দুনিয়াকি চল্‌ছে না এ ভাবেই॥

দুই বন্ধুর আলাপ

'কি কারণে বলো শেষ হ'ল তিমি মাছ,
প্রতিশ্রুতি ও প্রতিভার হ'ল শেষ?'
'আগাছা সহজে বেড়ে ওঠে, শাল গাছ
বাড়ে না; — না পেলে সুযোগ্য পরিবেশ।'
'অত মেহনতে চাই না তো শাল গাছ
খতিয়ান করে বল্‌ছি এ শেষমেশ।'
'ইচ্ছামতই পারবে দেখাতে নাচ
সারা দেশ যদি হয় আগাছার দেশ।'

গতি

'গতির অর্থে বোঝালে অগ্রগতি
উৎকর্ষের কঠিন পথের
জেহাদে হবে সে ব্রতী।'
'হ'লে তার অন্যথা?'
'উল্টা গতির মাঝে অগতির
হবে সার মাথা ব্যথা।'

সওয়াল-জওয়াব

'খোলসটা আছে, নাই শুধু প্রাণপাখী
কি নামে এবার সেই প্রাণীটাকে ডাকি?'
'যে নামেই ডাকো দেবো না সে আর সাড়া
যে হারালো তার প্রাণশক্তির ধারা।'

রূহানী আলাপ : (কোরবানি উপলক্ষে)

'সেই কোরবানি নিজের কলিজা ছিঁড়ে
দিয়েছিল নবী — খলিল, ইব্রাহিম!'
'এই কোরবানি প্রবঞ্চকের নীড়ে
চলেছে বাড়িয়ে বঞ্চনা নিঃসীম।'
'আল্লার রেজা পেয়েছে সে কোরবানি।'
'এ চেয়েছে গোশ্‌ত; ... শরাফত খান্দানী॥'

www.pathagar.com

ক বি তা গু চ্ছ

কিঞ্চিৎ ভূমিকা

বোঝো না যখন সূক্ষ্ম ঠাট্টা
তখনি চালাই রুক্ষ গাঁট্টা,
তখনি ভাই চাষ ক'রে যাই
নির্বুদ্ধির বিরান মাঠটা।

আশা ক'রে আছি, এইভাবে ফের
কিছুটা সুবিধা হবে ফসলের,
হবে দরকারি তরিতরকারি
হবে যদ্যপি মেজাজ খাট্টা !

কি করি, উপায় দেখি না তো আর,
ক্রমেই গরম সব্জী বাজার,
যদি চাও পার তাহ'লে আবার
কাজে লাগো চোখ না করে ভাট্টা।

হায়াত দারাজ খান হুঁশিয়ার
করে না প্রহার না ক'রে বিচার
যদি ভাঙে ঘাড় তাহ'লে নাচার
দেখে নিও কবুলতি ও পাট্টা॥

দস্তুরি

শোনো প্রকাশ্যে দর কষাকষি বিপজ্জনক
তার চেয়ে চলো নয়া কৃষ্টির সীমা নিরূপক
শুঁড়িখানাতেই, ভাঙা ডানাতেই লাগাও পালক,
উড়বো রঙিন নেশায় ! লজ্জা ? নও তো বালক !
ভয় শুধু ঐ কর্মীকে দেখে নয়া জামাতের,
খাঁটি ইস্‌লামী আদর্শ খোঁজে রক্তে বুকের,
একটু দূরেই চলো তবে যাই। হই নিরাপদ।
শোনো এই বার, কল্পলোকের দামী মসনদ
বিক্রি হবেই, উচ্চ দরেই (কি আর উপায়),
খদ্দের আছে অনেক (ভেবো না ধরব দু' পায়),
করতে এসেছি রোজগার, তাই করছি দালালি
(নিমকহালাল নও, করব না নিমকহালালি)
প্রথামত নেব পাওনাগণ্ডা আজকে ভোরেই,
যদি কিছু তুমি পেয়ে যাও, পাবে টাকার জোরেই।

www.pathagar.com

(ডাহিন বা বাম) নিষ্কাম নন এরা অনেকেই
প্রগতিবাদীরা প্রতিক্রিয়ায় ঘেরা অনেকেই,
ব্যূহ ভেদ যদি করতেই চাও মুদ্রা ছড়াও,
করো আয়োজন পার্টির, ঘরে ডেগটি চড়াও,
কিছু চাঁদা দান করো অম্লান, প্রশান্ত মুখ,
দেখবে ভাগ্য নয়কো তোমার মোটেই বিমুখ।

কেন ভয় পাও? খরচ করতে কি হেতু ডরাও?
বলছি যা শোনো আমাদের ভুঁড়ি আগাম ভরাও,
তারপর দেখো তোমার ভুঁড়িতে, প্রিয়ার চুড়িতে
বাজবে এমন সুর, — থামে না যা পাথরে : নুড়িতে।

মোগলাই খানা? সে তো অবশ্য হামেশা খাবেই!
হুরপরী চাও? অভাব কি তার, হামেশা পাবেই!
অবরোধ নামে পর্দা, আদব করেছি তো দূর,
নাম-ভূমিকায় নামবে সহজে মানুষ পশুর।

তাহলে রইল কথা সোয়া লাখ (দু' চার ছটাক
বিলাতী সঙ্গে); পেটাবো তবেই জোরে জয়ঢাক!

আমরা দালাল; হারাম হালাল করি না বিচার,
চাষ ক'রে ফিরি সব অন্দর, সকল বাজার,
যেখানে মধুর শর্ত সেখানে করি আনাগোনা,
বড় খুশী আজ হয়েছি, কারণ হ'ল জানাশোনা।
এখন তাহ'লে উঠে পড়ি আগে কিছু অকালেই,
আদাব আরজ, — দেখা হবে ফের কাল সকালেই॥

নাম মাহাত্ম্য

দুনিয়া জাহান সকলি তোমার, — কি বলো ইয়ার!
নাম মাহাত্ম্যে বেবাহা মালের তুমি হকদার!
শুধু মুস্‌লিম নামে এতখানি যদি হয় ভাই
তাহ'লে দেখছি নাফরমানের কোন ভয় নাই,
কারণ কখনো করি নাই কাজ মুসলমানের,
লোক-লজ্জায় পরি নাই তাজ, মুসলমানের,
ধ'রেছি হামেশা জোচ্চুরি- ঘেঁষা সাজ বেরদর!
রেস খেলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি আস্ত শহর,
ক'রেছি দলীয় ত'বিল লোপাট বাঁচাতে এ ঠাঁট,
ক'রেছি পুকুর চুরি কৌশলী চক্রে বিরাট,
বাইজীর পা'য় মত্ত হাওয়ায় ভদ্র সুজন

www.pathagar.com

দ্বীন ও দুনিয়া ভুলে সর্বদা করেছি কূজন,
ক'রেছি বিরান মুমিনের প্রাণ মস্‌জিদ ঘর,
নামাজ, রোজার ধারি নাই ধার, রাখিনি খবর,
গরীবের হক মারতে ভুলিনি যে কোন সুযোগে ;
'মুস্‌লিম' নামে লাভ আছে ঢের যোগে ও বিয়োগে।
ঐ নাম বেচে দু' পয়সা হল ব্ল্যাক মার্কেটে,
বিপদে প'ড়েও এসেছি বাইরে শুধু পায়ে হেঁটে,
সঙ্গদোষেই কুকাণ্ড ক'রে হাঙ্গামা তার
দলীয় নামের দৌলতে ঘাড়ে চাপেনি আমার।

এই ব্যাপারেই দুঃখিত তুমি? পোড়ে মন দেহ?
আমার ঈমানে কেউ অহেতুক করো সন্দেহ?
তাহ'লে জানাই : কী বালাই! আমি নামে মুস্‌লিম,
অন্য চিহ্ন খুঁজলে মিলবে অশ্বের ডিম।
ঈমানের কথা তোলো যদি বলি : মূর্খ নাচার
জীবনে ও চীজ খুঁজিনি, খুঁজেছি মওকা বাঁচার।
উমর, আলীর ওয়ারিশ আমরা সব মুজাহিদ?
এটা তোমাদের অন্যায় কথা, অহেতুক জিদ!
য়ুনিভার্সিটি তালিম দিয়েছে বলেনি কখনো
উমর, আলীর ওয়ারিশ হ'তে বা মুজাহিদ কোনো।
আরামের পরিবর্তে কি ক'রে (ভেবে হয়রান)
রোজা ও নামাজ ক'রব কায়েম, রাখব ঈমান।
'বল' নাচে যাই? রাত্রি কাটাই? ওটা অভ্যাস।
এশা বা ফজরে ঘুম এসে পড়ে, — যেতে দাও ব্যাস।
আর কি বলবে? ব'লেছ তো ঢের, — এখনো পাপের
আছে না কি জের? আছে কি কারণ মনস্তাপের?

কি বলো? খোদার হক ছাড়া আছে মানুষের হক?
টুপি নাই যার লাগাবে সে কার টুপিতে পালক?
আহা চটো কেন? জিজ্ঞাসা করি করি না বিবাদ ;
'কবে আমাদের ছিল ইস্‌লামী আদর্শবাদ?'

ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিয়ে ভেবে দেখ ফের
আমার মতন এ পাক জমিনে সাধু ঘোরে ঢের,
আমারি মতন জাতির মুণ্ড বেচে খায় কেউ,
আমারি মতন মদের ফেনায় কেউ খায় ঢেউ,
মুস্‌লিম নাম ভাঙিয়ে খেয়েছে আমারি মতন
এক বা দু'জন নয় (সজ্জন আছে অগণন)!

এখনো চ'লছে ঐ নাম নিয়ে পাকা তেজারতি,
লুটছে দু' হাতে কিস্মতী মাল আজো মহারথী!

www.pathagar.com

রেখেছে গরম ঘুষের বাজার পাকা খেলোয়াড়,
সুদের চক্র ভাঙবে কে আর না খেয়ে আছাড় !
এক পাশে কাত রয়েছে কর্জে–হাসানা ; জাকাত ;
কোন্ দেশে নাও ধর্মের নাম মূর্খ স্যাঙাত ?
গরীবের পরে কেন এত কোপ ? কেন চটো ভাই ?
(মুসলিম নাম দিয়ে কিছু মাল যদিচ জমাই) ?
খাঁটি হ'তে আমি চাইনি, চেয়েছি আয়েশী জীবন,
যে উপায়ে হোক লুটে নিতে দাও ; রাখো সারমন ॥

টুকরো আলাপ

এক : দোস্ত ও হায়াত দারাজ

'ইয়ার্কি ছলে টেনে দাও লেজ সকলের,
জেনো রীতিমত বিরক্তিকর এ ব্যাপার,
পদ্য তোমার হয় দুঃসহ ধকলের,
চায় না তো কেউ বিছুটি পাতার এ 'র‍্যাপার'।
রসাল শায়েরী করো নিয়ে কিছু ইজ্জৎ
এরাও বাঁচ্‌বে ; তোমারো ফিরবে কিস্‌মত।'

'পাপীর সঙ্গে পরিচয় ব'লে পাপকেও
ছেড়ে যেতে হবে ? এ যে দেখি বড় জঞ্জাল,
স্বজন তোষণ করব নিয়ে কি সাপকেও
— সকল শান্তি করে যে হামেশা পয়মাল ?
ইয়ার্কি ছলে টানি নাই লেজ সকলের,
চেয়েছি খুল্‌তে মুখোশ পাপের ; নকলের ॥'

দুই : দর্শক ও আদর্শবাদী

'চোর তো শোনে না ধর্ম কাহিনী,
সাম্‌নে মেনেও পাঠায় বাহিনী
কাজটা দেখলে ধর্মের !
এ কেমন রোগ ? মূলটা কোথায়,
যদি জানা থাকে জানাও সভায় ;
হয়তো হবে তা' কর্মের।'

'সকল ব্যাধির দাওয়া আছে ভাই,
মুনাফেকিটার কোন দাওয়া নাই ;
চির দুশমন সত্যের।
দু' মুখো সে পাপ ভোলায় ধোঁকায় ;
আর মতলবে মুণ্ড ঝোঁকায় ;
খোঁজ রেখো তার তত্ত্বের।'

www.pathagar.com

তিন : মেরুদণ্ডহীন ও মেরুদণ্ডবিশিষ্টের আলাপ

'শিরদাঁড়া নাই যে সব প্রাণীর
তারাই রয়েছে স্বপ্নপাড়ায়,
শিরদাঁড়ওয়ালা প্রাণীরা বৃথাই
অশান্তি আর বিপদ মাড়ায়।
বুদ্ধিবিহীন সেই প্রাণীগুলো
অপমৃত্যুর সাম্‌নে দাঁড়ায়;
মরে শেষতক যন্ত্রণা নিয়ে
দুর্ভাগ্যের কঠিন তাড়ায়।'

'মেরুদণ্ডের ইশারা যেমন
দুনিয়ার বুকে খাড়া পাহাড়
ঝড়ে ও তুফানে প্রলয় প্লাবনে
ঊর্ধ্বমুখী সে রয় নিসাড়।
কেঁচোর মতন সহজপন্থা
মেনে নিতে তার রয়েছে মানা।
সংকল্পের প্রতীক ! ... সহজ
সমর্পণটা নাই তো জানা।'

চার : সওয়াল - জওয়াব
'গূঢ় প্রয়োজনে যদি কেউ ছাড়ে ইস্‌লামী পরিচয়
পারো না কি হ'তে তার ব্যাপারেও কিছুটা অসংশয়?'
'পারি না, কারণ নয়া প্রয়োজনে ছেড়ে যাবে সব কিছু,
স্বপ্ন দেখার সময় পাব না মাথাটাকে করে নীচু।'

পাঁচ : সওয়াল-জওয়াব
'নাই ইস্‌লাম জীবনের কোনখানে,
তবু মুস্‌লিম সন্তান ব'লে
দাবীর কি আছে মানে?'

'যেন প্রাণহীন প্রাণী সে গোরস্তানে,
অথবা অচল কানা কড়ি যেন
বাজারের মাঝখানে।'

ছয় : সেরা কাজ
ছুঁচো।। আমার কাজটা সবচেয়ে বড় ভাই।
প্যাঁচা।। আমার কাজের তুলনা জাহানে নাই।

www.pathagar.com

ইঁদুর।। আমার কাজের জেনো সেরা গৌরব।
বানর।। আমার ঊর্ধ্বে ওঠা যে অসম্ভব।
তেলাপোকা।। শ্রেষ্ঠ কর্মী আমি সারা দুনিয়াতে।
চামচিকা ।। যত মহত্ব আমার কাজের সাথে।।

সাত : শেষ জওয়াব

'ওরা অন্যের কাজ কি বোঝে না মোটে,
কেন তবে এই ভুল অহমিকা জোটে?'

'চায় না তো কাজ, খ্যাতি শুধু চায় জানি,
না খেটে প্রচুর সম্মান, সম্মানী।'

'দেখে প্রতিদিন ফেরাউনী খাস্‌লৎ
কে দেবে ওদের কর্মীর ইজ্জৎ?'

'মাটির তলায় সাড়ে তিন হাত ঘর,
পাবে সেখানেই অন্তিম সুখবর।'

আজব চিড়িয়া

জানি আছে এক দেশ;
পর্ণগ্রাফীর
পাতা ওল্‌টানো ছাড়া সে দেশেও আছে ঢের কাজ,
বহু রসিকের কণ্ঠে তবু ফের সবিস্ময়ে শুনি
উল্টা সুর অথবা আওয়াজ।

সারা দিন এরা বসে থাকে,
যৌনবিকৃতির ছবিটাকে
জীবনের সার ব'লে জানে!
পথের কুকুর হার মানে।।
সেক্সের পূজারী যে মানে না সে জেহাদী শপথ,
জীবনের লহু দিয়ে গড়ে কারা মানুষের পথ,
জানে না সে কারা ভাঙে জালিমের কাল পর্বত,
গড়ে কা'রা নয়া হুকুমত।

সারা দিন তাই ব'সে থাকে,
যৌন বিকৃতির ছবিটাকে
জীবনের সার বলে জানে,
পথের কুকুর হার মানে।।

www.pathagar.com

তাজ্জব ব্যাপার

(জনৈক মেটে ফিরিঙ্গির আকস্মিক বাংলা কথা শুনিয়া)

বাংলাও বলেন ? — আহা, তাতেই তো কৃতার্থ এ দেশ
অথবা এ দেশবাসী তাকায় বিস্ময়ে নির্নিমেষ।
কমসে কম দু' বছর কিংবা আরো কিছু দীর্ঘ কাল
কাটায়ে বিলেতে যিনি ফিরেছেন বাড়ন্ত কপাল ;
বিজাতীয় লেবাসের সাথে তার নিজস্ব জবান
উল্টে যাবে অকুস্থলে এ কথা তো জানি মেহেরবান।

কারণ খান্দানী ঘরে জন্ম নিয়ে, করে এস্তেমাল,
হামেশা ফিরিঙ্গী বুলি, — যাঁরা হন প্রত্যহ বেচাল
অর্থাৎ সাহেবজাদা যাঁরা ঠিক, আপনি তাঁদের
শীর্ষস্থলে না হলেও তলদেশে নন তো গাছের।
'উপরন্তু দীর্ঘ কাল কাটায়ে বিদেশে বেকারীর
কি ভাবে কবেন বাংলা ?' — জানায় বয়স্য দিলদার।

বিদেশী সাজের মত বিজাতীয় বুলি আপনার
সিন্দবাদ জাহাজীর ঘাড়ে তাই ছিল গুরুভার।
দুর্বহ সে বোঝা নিয়ে এগিয়েছে এ জাতি ততটা
ফাঁকা প্রগতির পথে বাহ্য জ্ঞানে বোঝেন যতটা।
কাজেই যে জিন্দেগানি করেন আনন্দে গোজরান
কে না জানে দেশী ভাষা সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বেমানান !
লেবাসের সাথে ঠিক মিল রেখে এখানে অন্তত
দেশীভাবে কথা বলা আপাতত হয়নি সঙ্গত।
এ কারণে অন্তরঙ্গ এমনকি পরিচিত যারা
মোসাহেব সেজে নিত্য দরজায় বসালো পাহারা
জাতীয় ভাবের 'কিছু' যাতে আর না হয় প্রকাশ
(চেষ্টার কসুর তাতে হয় নাই, রাখি এ বিশ্বাস)।

তাই দেখি আপনার বাচ্চাকাচ্চা এ বাংলা জবান
দেশী ভাষা ছেড়ে করে বিদেশী ভাষায় অন্তর্ধান,
ফিরিঙ্গী জবানে খাসা শুরু হয় তার হাতে খড়ি (!)
বিজাতীয় প্রথামত শিশু কণ্ঠে ঝোলে দড়াদড়ি।
অধিকন্তু খরচ করে শেখান আপনি গৃহিণীকে
পবিত্র ফিরিঙ্গী বুলি (নইলে মান হ'য়ে যায় ফিকে) !

রাষ্ট্র বা জাতির কথা এ ক্ষেত্রে ওঠে না কোন ক্রমে,
ফিরিঙ্গী ভাষা বা ভাব ক্রমাগত ওঠে যে চরমে,
বুলির সর্দার কুলি মানপত্র দিয়ে যায় হেসে,
রাখেন সযত্নে সেটা (মাতৃভাষা হয় একপেশে)।

www.pathagar.com

সকলেই জানে এটা দীর্ঘকাল নকলনবিশ।
দেশী ভাষাটার সাথে রাখেন না কোন মিলমিশ।

তবু কি আশ্চর্য কাণ্ড, ভেবেছিল কে কবে এমন
নিতান্ত অজ্ঞাতসারে মুখ থেকে বাংলা উচ্চারণ!
কে জানে কিসের টানে অথবা কী গূঢ় প্রয়োজনে
অনাদৃতা বাংলা ভাষা স্থান পেল আপনার মনে!
তাই আজ সচকিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত জনগণ
নির্বাক বিস্ময়ে শোনে আপনার কথোপকথন।।

গুরু শিষ্য সংবাদ

(তমদ্দুন প্রসঙ্গে)

জানালো গুরুর কাছে অতি ধূর্ত চেলাচামুণ্ডেরা,
'শিলাদৃঢ় পাকিস্তান তমদ্দুনী রোশ্‌নিতে ঘেরা,
সংকল্প সংযুক্ত বাহু পরিপূর্ণ আদর্শের টানে
হয়না শিথিল আর সহস্র ভেকের ঐকতানে,
শতাব্দীর ঘূর্ণাবর্তে পাকিস্তানী হায়াত দারাজ
তৌহিদী আলোতে চায় গড়ে নিতে নতুন সমাজ,
সমন্বয়-পন্থীদের মিষ্টালাপে তোলে সে আওয়াজ,
অতঃপর ও অঞ্চলে ব্যর্থ হল আমাদের কাজ।'

চিন্তাযুক্ত গরু শেষে বলিল, 'এ অসম্ভব কথা,
কি ক'রে লোভের গুড় ছেড়ে দিয়ে নেব এ ব্যর্থতা?
তমদ্দুনী ব্যাখ্যা দিয়ে জিতে যাবে হায়াত দারাজ?
পুনর্বার নবোদ্যমে শুরু করো ফেলে আসা কাজ।
'এক কৃষ্টি' প্রচারেই যুক্ত হবে খণ্ডিত কল্পনা—
বহু আচার্যের ধ্যান, — স্বপ্নলব্ধ যোগীর জল্পনা।'

শিষ্যেরা কহিল রেগে, 'স্থির চিত্তে শোনো মহাশয়
অসম্ভব ও দুষ্কর্ম আমাদের করায়ত্ত ও নয়।
যে ব্যাপারে নিঃসংশয় যাবতীয় পাকিস্তানী; আজ
সে ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ নয় হুঁশিয়ার হায়াত দারাজ।
যে জাতি উঠেছে জেগে তমদ্দুনী স্বাতন্ত্র্যের জোরে
ভুয়া সংস্কৃতির চালে তাঁকে দেওয়া চলে না কবরে।'

গুরু কন, 'কেন রাগো? দল বৃদ্ধি করে যাও, আর
কৃষ্টির মোড়কে করো কৌটিল্যের কৌশল প্রচার,
এ ভাবেই লুপ্ত হবে তমদ্দুনী স্বাতন্ত্র্যের ঝাঁজ,

www.pathagar.com

স্বপ্নেও পাবে না টের পাকিস্তানী হায়াত দারাজ।'
হায়াত দারাজ বলে, 'জিতা রহো বেটা, ও বস্তায়
লেজ-কাটা নির্লজ্জের লোলুপ দুরাশা দেখা যায়॥'

সংস্কৃতি সংবাদ

হরিদাসের পুনরার্বিভাব

বাজারে দর্শন দিল আবার 'যবন হরিদাস'।
আহা কত পুণ্যফলে দেখি আজ অনিন্দ্যসুন্দর
সেই মর্কটের মূর্তি — চন্দন-চর্চিত কলেবর,
ফোঁটা কাটা। এনেছে সে প্রসাদের পরিত্যক্ত ঘাস।

জানালো সে দিতে চাই পাকিস্তানে নতুন আশ্বাস,
কেষ্ট ও বিষ্টুর চেলা করে যাই চির স্মরণীয়
বিজাতীয় কদাচার লেহন সুবাদে সহনীয়
দাসত্বের পৈতাধারী (এতটুকু পাবে না বেফাঁস)।

বিস্ময় জাগিল মনে : হরিদাস মরেনি তাহ'লে ;
এখনো সে বেঁচে আছে সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে ;
খাসা পাকিস্তানী পোষ্য দুধে-ভাতে, লেপে ও কম্বলে !

অনুকরণের গঙ্গা এ জমিনে বওয়াবে সে ব'লে
আহা বাচ্চা। ভগীরথ আরাধনা ক'রেছে পর্বতে,
অতঃপর নেমেছে সে দুগ্ধপোষ্য এই গণ্ডগোলে॥

হরিদাসের স্বগতোক্তি

ছিল আশা প্রচারের ঘূর্ণাবর্তে, প্রচণ্ড আওয়াজে
স্বপ্নটা সুড়ুৎ ক'রে জোড়া লেগে যাবে ভাগ্যক্রমে।
লাগেনি তা হে কমরেড ! সেই ক্লান্ত ব্যর্থতার লাজে
প্রেমের সলিতা মোর নিঃশেষিত হয় দমে দমে।

ছিল আশা নেতৃত্বের তিরোধানে শস্য-শ্যামা দেশ
অক্কা পাবে (অন্তত ভিত্তিতে তার ধরে যাবে ঘুণ),
সে আশাও লুপ্ত আজ ; তরুণ কর্মীরা ছিন্ন বেশ
প্রদীপ্ত উৎসাহে দেখি সুসমৃদ্ধ করে তমদ্দুন।

আরবি, ফারসি ভিড় করে সাহিত্যে ! নতুন খিলাফত
ঢুঁ মারে সমস্যাকীর্ণ রাজনীতির জটিল প্রাঙ্গণে !

www.pathagar.com

তবে কি হেরার রশ্মি খুঁজে নেবে প্রকাশের পথ?
ধর্মনিরপেক্ষ ধূয়া ডুবে যাবে কালের গর্জনে?
দিক দিগন্তের ধারে উচ্চকিত কিন্তু শুনি কার স্বর?
কি বার্তা সেখানে ওঠে? দিতে চায় সে কার কবর?

হরিদাসের আক্ষেপ

গুরু তো পগার পার, তবু তার নির্দেশ এখনো
ভেসে আসে স্বপ্নভূমি দূর ভাগীরথী কূপ থেকে
বুড়িগঙ্গা তীরে। আর মধ্য-দিনে ঘনায় যখন
নিতান্ত দুঃসহ রাত্রি; — হিলালী ঝাণ্ডার জোরে

তাহ'লে কি পাক ভূমি টিকে যাবে? আর তমদ্দুন
স্ফীত হবে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে কদলী দেখিয়ে।
আদি অখণ্ডত্ব ধূয়া ভাগ্যে তার পাবে কি বেগুন
কিংবা মর্তমান এই শত্রুপুরে কোমর বাঁকিয়ে?

গুরু তো পগারপার, এ সকল পড়ে না নজরে,
এদিকে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, অবস্থা সংগীন,
নৈরাশ্যের চাপা ঝড় ক্রমাগত মুণ্ডে ও পাঁজরে
করে যে কুকাণ্ড, তাকে আর বলা চলে না রংগিন।

ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে প্রতিক্ষণে আমি মরি আজ;
মরিয়া মরে না শুধু পাকিস্তানী হায়াত দারাজ।

হায়াত দারাজ — স্বপ্নচারী সংবাদ

হায়াত দারাজ

বাঘের শ্যালিকা নয়, ব্যাঘ্র কুলে জন্ম নয়; তবু
ভাগ্য বলে খালা আম্মা যাবতীয় ব্যাঘ্রশাবকের!

স্বপ্নচারী

কার কথা বলো তুমি হায়াত দারাজ?

হায়াত দারাজ

অতি তুচ্ছ
পরপদলেহী এক মার্জারের কথা।

স্বপ্নচারী

তবে কেন
এ ভনিতা? বিড়ালের কোন কথা যদি জাগে মনে
নিতান্ত সহজভাবে, খোলাখুলি জানাতে পারো তা।

www.pathagar.com

হায়াত দারাজ

জীবন যেখানে নয় সহজ, সাপের কুণ্ডলীতে
জীবন যে'খানে বাঁকা ; — সেখানে অথবা সে জমিনে
দাঁড়িয়ে সহজভাবে কথা বলা পণ্ডশ্রম শুধু।

স্বপ্নচারী

কিন্তু বিড়ালের কথা ?

হায়াত দারাজ

অবান্তর নয় মোটে তাই
চাপা সে থাকে না আর। জানি সেই ধূর্ত ভিক্ষাজীবী
পোষমানা; রঙ্গমঞ্চে উঠে বৃথা কেশর ফোলায় ;
যদিও কেশর নয় শীর্ণ স্কন্ধে কতিপয় রোঁয়া।

স্বপ্নচারী

কেন দাও মার্জারের অসঙ্গত তুলনা ? আমি কি
শুনিনি প্রথম ভোরে নকীবের মুক্ত পদধ্বনি ?
গোলামী জিঞ্জির ভেঙে আমি কি আনিনি আজাদীর
মুক্ত বহ্নি ?

হায়াত দারাজ

লেজ নিয়ে আস্ফালন বাঘের মাসীর
সঙ্গে তুলনীয়।

স্বপ্নচারী

ব্যঙ্গোক্তি স্বভাব যার, বাঁকা চোখে
দেখে যে দুনিয়া, তাকে কিছু না বলাই ভালো ; তবু
এই জীবনের সাথে বিড়ালের ভাগ্য তুলনায়
সঙ্গতি রয়েছে কী না ; — চিন্তা করেছো কখনো ?

হায়াত দারাজ

বিড়ালের ভাগ্যে বাঁচো, পুরাপুরি সে কথা বলি না ;
বিশেষত সে মাটিতে — যার প্রতি পথ, ধূলিকণা
উজ্জ্বল রয়েছে আজও তাজা খুনে লক্ষ শহীদের ;
যদি ভাগ্যে হয় কারু তবে তা তাদেরি। অকারণে
উত্তরাধিকার সূত্রে দাবী করো তুমি যে তাদের
সম্মান, তা শুধু আজ মার্জারের আত্মপ্রবঞ্চনা।
ব্যাঘ্রশাবকের নাম অরণ্যে থাকে না সংগোপন,
ব্যর্থ আস্ফালন শুধু আনে ক্লান্তি মার্জার জীবনে
সৃষ্টি করে রঙ্গমঞ্চে প্রহসন গতানুগতিক।

www.pathagar.com

স্বপ্নচারী
মুক্ত মানুষের সাথে প্রতি পায়ে ভীরু মার্জারের
অহেতু তুলনা শুধু তোমার অশেষ প্রগল্‌ভতা।

হায়াত দারাজ
যদিও পেয়েছো কিছু শারীরিক উত্তরাধিকার
পূর্বপুরুষের, তবু দেখ চেয়ে সংকল্পের পথে
মুক্ত মানুষের চেয়ে মিল পাবে মার্জারের সাথে।

স্বপ্নচারী
তিক্ত অভিযোগে শুধু তিক্ততর প্রশ্ন টেনে আনে।

হায়াত দারাজ
ঘুম ভাঙলেও যারা পাশ ফিরে শোয় চোখ বুজে।
তাদের জাগানো বৃথা, যতবার তুমি ডাক দেবে
গভীর ঘুমের ছলে তত তারা শোবে পাশ ফিরে।
কাজেই সকল চেষ্টা ব্যর্থ সেই মগজের কাছে
যে দেয় প্রচুর মূল্য এই পার্শ্ব পরিবর্তনের।

স্বপ্নচারী
সোজাভাবে কথা বলা নাই কি তোমার অভিধানে?

হায়াত দারাজ
আত্মপ্রতারণা যদি খোঁজে রূপ দার্শনিকতার
অন্তত সেখানে জানি বক্রোক্তি হবে না অসঙ্গত,
কেননা ও দুষ্ট বুদ্ধি কোন দিন সহজ আঙুলে
ওঠেনি, খোলেনি তার ভারগ্রস্ত মুখোশ কখনো,
বরং খুঁজেছে ঢের সারল্যের আস্তরণ টেনে
কৌটিল্যের কূট নীতি আজাদীর ইজ্জৎ ছাড়িয়ে।

স্বপ্নচারী
আত্মপ্রতারণা কার কবে তুমি দেখেছো কোথায়,
কঠিন বক্রোক্তি শুধু ক'রে যাও আজ অকারণে ।

হায়াত দারাজ
যে নিজের শুভ বুদ্ধি ক্রমাগত রাখে চাপা দিয়ে
বিতর্কের অন্তরালে দুষ্ট বুদ্ধি খেলা করে তার,
বোঝালে সহজভাবে বোঝে না সে সহজে ; অথবা
যে ভাবে অন্যের মুখে নেশা করা চলে অল্প ব্যয়ে
যায় না বোঝানো তাকে ধূমপানে অভ্যস্ত যে নয়।

www.pathagar.com

স্বপ্নচারী
আরো বলো স্পষ্টভাবে।

হায়াত দারাজ
আদর্শের কদর্থ তোমার
প্রতি কাজে।

স্বপ্নচারী
দায়ী তুমি প্রতি পদে করেছ আমাকে।
কিন্তু যে আদর্শ, বলো নিজ পায়ে পারে না দাঁড়াতে
কেন মরি অনর্থক আমি তার ভারবাহী হয়ে?

হায়াত দারাজ
আদর্শের অর্থ কেন খোঁজো শুধু পুঁথি ও কিতাবে?
আদর্শের প্রাণ বাঁচে সম্পূর্ণ বাস্তব রূপায়ণে
জীবনে, বিশ্বস্ত শ্রমে। সেই দাম দিয়েছ কখনো?
দুর্লভ স্বপ্নের মত হাতে এল আজাদীর ফল,
সুস্বাদু হয়নি কেন যদি আজ শুধাই সে কথা
প্রত্যুত্তর দেবে কোন কালো বাজারের মহাজন,
কোন স্বার্থান্বেষী নেতা, কোন ধূর্ত ইমাম অথবা
অকর্মণ্য —কল্পনাবিলাসী তুমি; তুমি স্বপ্নচারী?
নিজের দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বিলাসে
কোন মার্জারের পন্থা খুঁজে ফেরো স্বপ্ন-মুগ্ধ মনে?

স্বপ্নচারী
গলগ্রহ মার্জারের অবান্তর প্রসঙ্গ এখানে
অসঙ্গত, অর্থহীন।

হায়াত দারাজ
অকস্মাৎ অপস্মার হ'লে
দিশাহারা চিন্তাজাল ছিঁড়ে যায় যেমন রোগীর
তোমার বিচ্ছিন্ন চিন্তা তেমনি বিকৃত। অনুকারী,
শক্তিহীন, চিহ্ন নাই কোনখানে স্বাবলম্বনের
স্বাধীন বাঘের নাম নাও কোন আত্মীয় সুবাদে?
অথচ এ কথা বলো কে না আর জানে পৃথিবীতে
পোষমানা বিড়ালের সঙ্গে তার প্রভেদ কতটা?
পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে কাটে দিন যে হীন প্রাণীর,
চৌর্য বৃত্তি পেশা যার, নেশা যার ভিক্ষায়; অপিচ
বাচনিক মুখরতা ছাড়ে না যে — সেই তো মার্জার।
তার সাথে কোন দিন চলে না বাঘের আলোচনা।
নিমেষে কাঁপায়ে বন সে মুক্ত প্রতীক আজাদীর

www.pathagar.com

জ্বলন্ত শিখার মত সে জীবন্ত, নির্ভীক, বিশাল
আপনার বাহু বলে নেয় কেড়ে আপন শিকার,
কারো মুখ চায় না যে, করুণার প্রত্যাশী যে নয়
তার সাথে তুলনায় এই দীন মার্জার জীবন
কত হাস্যকর।

স্বপ্নচারী

অদ্ভুত ঘোলাটে বলে মনে হয়
হায়াত দারাজ খান ! তোমার নির্মম মুখরতা।

হায়াত দারাজ

আরো বেশী মনে হবে, নেমে যাও যদি আরো নিচে
প্রবৃত্তির। নিজের প্রবৃত্তি জালে নিজের সত্তাকে
বাধা দিয়ে ইচ্ছা-অন্ধ আদিগন্ত পৃথিবীর বুকে
আরো কর্মকুণ্ঠ হয়ে চাও যদি আজাদীর স্বাদ
বিস্বাদ ঘোলাটে বলে মনে হবে ; মনে হবে আরো॥

হায়াত দারাজ শূন্যচারী সংলাপ

হায়াত দারাজ

এ এক আজব দেশ ! মাঠে মাঠে অত্যন্ত সহজে
সোনার ফসল ফলে ; অতঃপর আরো সহজেই
উঠে যায় অদৃশ্য পকেটে ! সে পকেট কত বড়,
কতটা অতলস্পর্শী কেউ তার জানে না ঠিকানা।
শুধু জানে এ নিয়ম, বঞ্চনার এ কাল ফ্যাসাদ
রয়ে যাবে চির কাল, সরানো যাবে না কিছুতেই।
আশ্চর্য এ দেশে তবু আবেগের উদ্দাম জোয়ারে
বৎসরান্তে আসে বান, ডুবে যায় নদী, নালা, মাঠ ;
দুরন্ত তুফান ওঠে ক্ষুদ্র পেয়ালিতে। বন্যাবেগে
পরিকল্পনার ঢেউ আসে ফিরে সুপরিকল্পিত
বহু মুণ্ড ঘুরে, কিন্তু ফল লাভ হয় না কখনো।
যে ক্ষুব্ধ তুফান ওঠে এক দিন ছোট পেয়ালিতে
সে তুফান মিশে যায় পূর্ববৎ সেই পেয়ালায়,
মিশে যায় কোলাহল অর্থনীতি, শিক্ষা ও কৃষ্টির
প্রচুর হল্লার শেষে কোনখানে ; কেউ তা জানে না।
বহু ঘাটে পানি খেয়ে, বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে
দেখেছি জিন্দেগীভর দায়িত্ব এড়িয়ে যথারীতি
কিভাবে সহজে এরা ঘূর্ণাবর্তে পেতে চায় পার !
বাস্তব-বিমুখ স্বপ্নে, বিভ্রান্ত হাজার মতবাদে
এ এক আশ্চর্য জাতি বুঝেও বোঝে না কোন দিন।

www.pathagar.com

শূন্যচারী
কে তোমার পাকা ধানে মই দিল? কে তোমার মনে
ছেড়ে দিল অশান্তির এ পোকা চঞ্চল? মধ্যরাত্রে
প্রচুর আফিম খেয়ে কেন দগ্ধ করো এ জাতিকে
অবান্তর বাক্যালাপে?

হায়াত দারাজ
মই দিল যে আমার মাঠে
তোমার ধানেও তার লুব্ধ দৃষ্টি!

শূন্যচারী
অনিদ্রা রোগের
ফল, কিংবা আফিমের পরবর্তী কার্যক্রম শুধু।
কে আমার দুশ্‌মন? অথবা কে কল্পিত তোমার
শত্রু সেই, — অন্তঃসারশূন্য ক'রে দেবে যে সহসা
এ জাতিকে?

হায়াত দারাজ
মনে রেখো অসতর্ক গৃহস্থ যেখানে
ঘুমায় দরজা খুলে, চুরি যায় বে-সামাল তার
সর্বস্ব। চোরের নাম কিংবা তস্করের পরিচয়
দেয় না সুফল, যদি বুদ্ধি তার না ফেরে মগজে।

শূন্যচারী
বুঝেছি সহজে তুমি দেবে না চোরের পরিচয়
কিন্তু এ-ও মনে রেখো, অহেতুক দুশ্চিন্তা তোমার
অলীক দুঃস্বপ্ন শুধু। যে আজাদী এল বহু দামে
এমন ভঙ্গুর নয়, উড়ে যাবে কল্পিত ঘূর্ণিতে;
তোমার আমার প্রাপ্য যথারীতি দেবে সে বুঝিয়ে।

হায়াত দারাজ
আজাদীর অর্থ নয় বিনাশ্রমে সব কিছু পাওয়া,
স্বাধীনতা খুলে দেয় শুধু সব শ্রমের দুয়ার,
যে পারে কাজের মাঠে নেমে যেতে শুধু সেই পারে
মুঠো ভরে তুলে নিতে সাফল্যের সোনা, পারে না যে
পথপ্রান্তে মরে। জীবন এখানে কেন স্বাদহীন
দিশাহারা কানামাছি কেন আজ ওড়ে ঘুরে ঘুরে,
ক্লান্ত দিন — ক্লান্তিকীর্ণ রাত্রির কঠিন আবর্তনে,
কেন? কতটুকু তার খোঁজ রাখো বলো শূন্যচারী।

শূন্যচারী
সে কথা আমার নয়, নেবে যারা এই জনতাকে
মুক্তির মনজিলে, তুমি জেনে রাখো দায়িত্ব তাদেরি;
আমার কর্তব্য যেটা খোঁজ রাখি আমি সে কাজের।

www.pathagar.com

হায়াত দারাজ

তোমার কর্তব্য তুমি কতটুকু ক'রেছে পালন
এ যাবৎ? ভর দিয়ে অবাস্তব পরীর পাখায়
কি মেওয়া এনেছো লুটে কোকা'ফের শিলারণ্য থেকে
শূন্যচারী?

শূন্যচারী

ব্যঙ্গোক্তির মাঠে দাও অন্যকে বুঝিয়ে
ক'টা ধানে ক'টা চাল, কিন্তু তুমি নিজের হিসাব
খতিয়ান ক'রেছো কি এ জীবনে? দায়িত্ব তোমার
ক'রেছো পালন তুমি কোন দিন পুরাপুরিভাবে?
তোমার কথায়, কাজে কেন জাগে আফিমের নেশা?

হায়াত দারাজ

সমালোচনার পথ মুক্ত হোক, চেয়েছি এটাই।

শূন্যচারী

আত্মসমালোচনার পথ রুদ্ধ কে ক'রেছে কবে?
কিন্তু মনে রেখো খান, ও দৃষ্টি প্রাচীন; যুগধর্মী
আধুনিক নয়।

হায়াত দারাজ

মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখো তুমি,
দেখো তুমি ছিঁড়ে ফেলে যুগ-ভ্রান্ত খোলসের নিচে
যে মন রয়েছে চাপা ভোলেনি সে স্বধর্ম কখনো;
প্রয়োজন আছে তার তীক্ষ্ণ আত্মসমালোচনার।

শূন্যচারী

তোমার অভিজ্ঞ মনে এ তিক্ততা নিরর্থক নয়,
কিন্তু মনে রেখো খান! অকারণে তিক্ততা বাড়িয়ে
লাভ নাই কখনো জীবনে। বরং যেভাবে আছি
দায়িত্ব-বন্ধন-মুক্ত ক'রে রয়ে যেতে চাই সেভাবেই,
সমস্যার কন্টকিত মরু মাঠে আনন্দের খোঁজে
ভার-মুক্ত প্রাণ আমি .....

হায়াত দারাজ

আর আমি ব্যঙ্গবিদ এক
ভারবাহী; — তদুপরি অহিফেনসেবী। মিল নাই
দু'জনার কোনখানে, তবু, তবু আমি বলি আজ
একটা কর্তব্য আছে তোমার আমার সকলেরি
সে কর্তব্য। যদি আমি ছেড়ে যাই, কিংবা যদি তুমি
ছেড়ে যাও সে দায়িত্ব, শোধ নেবে অশেষ সময়।
খুলে দেবে একদা সে সুনিপুণ অতি ক্ষিপ্র হাতে
সমস্ত ফাঁকির চক্র, সব খেলা আত্ম-বঞ্চনার
জীবনের মাঠে নয়, পথে শুধু পঞ্চত্ব প্রাপ্তির॥

www.pathagar.com

প্রবন্ধ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইকবাল প্রসঙ্গ

[ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পেঁটরায় বন্ধ রেখে যখন রাজনৈতিক চালের কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে ঐ দু'টি বিষয়ের নাম ব্যবহার করা হয় তখন জাতি অবনতির যে স্পর্শ অনুভব করে সে স্পর্শ আত্মঘাতী। সংক্রামক ব্যাধির মত সেই মৃত্যুর ছোঁয়াচ জাতিকে বিকলাঙ্গ করে ফেলে। সম্প্রতি আমরা এসে পড়েছি সেই সংকটের সামনে যখন দ্বীন ও তমদ্দুনের কথা সর্বদাই উচ্চারিত হতে শুনছি আমাদের রাজনৈতিক ঝাণ্ডাবাহীদের মুখে ; কিন্তু প্রতিক্ষণেই অনুভব করছি ঐ দুটি অস্ত্রে নেতৃস্থানীয়দের বৈষয়িক সুযোগ সন্ধান। দুঃখের বিষয় এই যে, ছাত্র ও সুধী সমাজও এই সুবিধাজনক রাজনৈতিক ঐকতানে নিজেদের কণ্ঠ ডুবিয়ে জাতির তমদ্দুনের সমাধি রচনা করতে দ্বিধা বোধ করছেন না। ফলে মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সাহচর্য থেকে ক্রমাগত আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। এই অবহেলার ফলে নিকট ও সুদূর অতীতের চিন্তাধারার কোন সন্ধানই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং সেদিনও যিনি আমাদের মধ্যে সশরীরে বেঁচে ছিলেন প্রাচ্য ভূখণ্ডের সেই শ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা ইকবালের প্রতিভার ও আদর্শের কথা যেন আজ আমরা ভুলতে বসেছি।

বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও তামদ্দুনিক কবি হিসাবে সকল দিগন্তবাসীর অভিনন্দন পেলেও আল্লামা ইকবালের কবিতা—দুয়েকটি জনপ্রিয় (এবং নিম্ন স্তরের) কবিতা ছাড়া বাংলা ভাষায় ইকবালের বিশাল কাব্য-ভাণ্ডার পাঠক সাধারণের কাছে এক রকম অবরুদ্ধ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। সম্প্রতি কয়েকজন উৎসাহী কবি ও সাহিত্যিকের দৃষ্টি ইকবালের কাব্য-সাহিত্য ও তার অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁদের এই উৎসাহ প্রশংসাজনক হলেও ইকবালের যে বিশাল কাব্য-সম্পদ শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অনধিগম্য হয়ে রয়েছে সেই অপরিচিত মঞ্জুষার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় নিবিড়তর করাতে হলে মুসলিম লেখক সম্প্রদায়কে এদিকে আরো অনেক বেশী মনোযোগী হতে হবে।

ইকবালের কবিতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে—পৃথিবীর কাব্য-ভাণ্ডারে ইকবাল যে বিশিষ্ট জাগরণের বাণী বয়ে এনেছেন তা সকল কালের উপযোগী হলেও আদর্শচ্যুত, পরাধীন মুসলমান সমাজের জন্যই তার প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশী। একথা অনস্বীকার্য যে, ইকবালের বিপ্লবী-চিন্তার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গেই ভারতীয় মুসলিমের মনে আজাদীর স্বপ্ন-বহ্নি মেঘের মত পক্ষ বিস্তার করেছে। আমাদের রাজনৈতিক ঝাণ্ডাবাহীর দল প্রয়োজনমত ভুলে গেলেও লেখক সম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে একথা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আল্লামা ইকবালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য "আসরার-ই-খুদী"র সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।]

"আসরার-ই-খুদী"র প্রকাশকাল স্মরণীয় ; কারণ বর্ষচক্রের গাণিতিক হিসাবের সঙ্গে প্রতিভার আবির্ভাব সংযুক্ত না হলেও ইকবালের আত্মপ্রকাশ সময়ের দিক দিয়েও বিস্ময়কর। সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একজন শক্তিশালী

www.pathagar.com

নবীবের, কারণ দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সংকটের ঘূর্ণিচক্রে নিষ্ফল সংগ্রাম করে দুনিয়ার মুসলমান অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। পলাশী প্রান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ভারতীয় মুসলিমের স্বাধীনতার পথে যে বাধা এনেছিল, ওহাবী আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহেও সেই জগদ্দল শিলা স্থানচ্যুত হয়নি। কয়েকজন কৌশলী নেতা ব্রিটিশের মনোরঞ্জন করে জাতির অস্তিত্ব কোন মতে বাঁচিয়ে রেখেছিলো ; কিন্তু তাতে গোলামীর দৈন্যই ফুটে উঠেছিল মারাত্মকভাবে। আফগানিস্তান, পারস্য, আরব, মিসর ও তুরস্ক তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রেত-নৃত্যে মুখরিত।

উনিশ শতকের প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন মুসলিমপ্রধান দেশগুলিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়নি। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তিনি যে প্রাণ-বন্যার সঞ্চার করেছিলেন, উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁর দেহাবসানের পর ইকবাল এলেন তাঁরই উত্তরাধিকারী হয়ে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শনে সমান অভিজ্ঞ আল্লামা ইকবাল প্রচার করলেন মূল ইসলামের প্রাণ-বাণী। দাস মনোভাবাপন্ন স্থবির জাতি একদিন বিস্ময়ে শুনলো স্বাধীন জীবনের প্রবহমান সংগীত :

দুর্বার তরঙ্গ এক বয়ে গেল তীর-তীব্র বেগে
বলে গেল : আমি আছি যে মুহূর্তে আমি গতিমান
যখনি হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই।

ইকবাল তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন আমিত্বের দিকে। মূল ইসলামী ভাবধারায় তিনি ব্যাখ্যা করলেন সত্তার রহস্য, কারণ ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তি-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশেই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে এবং এই পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিহিত আছে।

যদিও কণিকা আমি তবু জানি খরপ্রভা সূর্য সে আমারি,
শত প্রভাতের বহ্নি সংগোপন মোর বক্ষ মাঝে,
জামশিদের পাত্র হতে উজ্জ্বল আমার ধূলি জানে সেই নাম
জন্ম যে নেয়নি আজও ধূলিম্লান ধরিত্রীর বুকে,
হরিয়া এনেছে মোর চিন্তাধারা সেই হরিণীকে
বাহিরে আসেনি ছুটে যে আজিও অনস্তিত্ব অন্ধকার হ'তে।

আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মতবাদ ইকবাল গ্রহণ করেছিলেন মূল কোরান থেকে, ইরানী কবিদের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন তিনি সেই মতবাদ।

অস্তিত্বের রূপ সে তো আত্মার অলঙ্ঘ্য পরিণাম
যা কিছু সম্মুখে জাগে সবই জেনো রহস্য আত্মার
চেতনার দীপ্তি নিয়ে সে যখন তাকায় সম্মুখে
জাগায় চিন্তার বিশ্ব নিবিড় নির্যাসে যার
সংগোপন আছে বিশ্ব শত
বেখুদীর রূপ সেই মুক্ত করে প্রকাশের দীপ্ত দিবালোক।
জানি জানি এই আত্মা ধরিত্রীর বুকে রাখে বৈষম্যের বীজ
নিজেকে সে অন্যরূপে করে অনুভব,
আপনার রূপ নিয়ে গড়ে যায় অপরের রূপ ;
প্রকাশ্যের মুক্ত ছন্দে গড়ে তোলে আনন্দ দ্বন্দ্বের।

www.pathagar.com

তার হত্যামূলে শুধু আপনার শক্তি অনুভব
আত্মপ্রবঞ্চনা তার জীবন রওগন
রক্তধারে স্নান করি বেঁচে ওঠে গোলাবের মত।

শতেক গোলাব বন ধ্বংস করে ফোটাতে সে একটি গোলাব
একটি সুরের লাগি সৃষ্টি করে শত আর্তনাদ,
এক আকাশের লাগি প্রকাশ করে সে শত চাঁদ,
একটি বাণীর তরে সৃষ্টি করে কথা অফুরান।

জানি এই নিষ্ঠুরতা অপব্যয় তার
পূর্ণ করে সৌন্দর্য আত্মার ;
ফরহাদের তিক্ত ব্যথা মেনে নেয় সৌন্দর্য শিরায় ;
এক মৃগনাভি মানে মৃত্যু শত কস্তুরী মৃগীর ;
লেলিহ আতশে ধ্বংস পতঙ্গের সেই তকদির ;
উজ্জ্বল চেরাগ জানি সে যন্ত্রণা করে সমর্থন।

আত্মবিকাশের জন্য যে সংগ্রাম—ইকবাল সমর্থন করেছেন সব সময়, কারণ তাঁর আদর্শ পুরুষ কখনো প্রগতিবিরোধী বা প্রতিক্রিয়াশীল নন। নিখিল মানব-সমাজের জন্য যে পুরুষ অথবা প্রকৃত মুসলিমের অভ্যুদয়, ইকবালের মানস-চক্ষে আমরা দেখেছি সেই পুরুষরূপ। সেই পুরুষের আদর্শেই ইকবাল গড়তে চেয়েছেন বর্তমান সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে। ধর্ম বলতে ইকবাল বুঝেছেন মূল ইসলামকে।

'আল্লার গুণরাজিতে সমৃদ্ধ হও' এই হাদিসের উপর ইকবালের সম্পূর্ণ সত্তা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করছে বলা যেতে পারে। কারণ উক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই ইকবাল বুঝতে পেরেছিলেন যে, ক্ষুদ্রতম সত্তার পক্ষেও কামালিয়াত বা পরিপূর্ণতা লাভ করা আদৌ অসম্ভব নয়। পরিপূর্ণতার পথে ইকবাল সর্বদা প্রবহমান জীবনের কল্পনা করেছেন। অবশ্য তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত। প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে যখন সম্প্রসারশীলতা সংযুক্ত হয়, তখনই মুক্ত হয় পূর্ণতার পথ। এই পথে প্রয়োজন আছে সত্যিকারের পথ-প্রদর্শকের অথবা তাঁর ব্যাখ্যাতার। রাসুলুল্লাকে প্রকৃত পথ-প্রদর্শক এবং সাহাবায়ে কেরাম ও ফকিরদিগকে রাসুলুল্লার বাণী ও জীবনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে ইকবাল গ্রহণ করেছেন। পীর হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত সাধক ও মহাকবি জালালউদ্দীন রুমীকে। "আস্‌রাব-ই-খুদী"র 'পূর্বাশা'য় ইকবালের বর্ণনা পাওয়া যায় পীর-ই-রুম সম্পর্কে :

রুমীর প্রতিভা-দীপ্তি উজ্জীবিত করেছে আমারে
রহস্যের গ্রন্থ হতে আমি আজ গেয়ে যাই গান
আত্মা তাঁর অগ্নিকুণ্ড শাশ্বত, প্রোজ্জ্বল
আমি শুধু ক্ষণপ্রভা অগ্নিকণা এক।

মোর পতঙ্গেরে গ্রাস করিয়াছে তাঁর অগ্নিশিখা,
আমার পেয়ালা পূর্ণ করিয়াছে কানায় কানায়।
স্বর্ণমহিমায় মোর মৃত্তিকারে ফেরায়েছে রুমী ;
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড করেছে সে মোর বিভূতিরে।
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, বিভা কেড়ে নিতে বালুকণা
উঠে এল মরুভূমি হ'তে।

www.pathagar.com

পথিক তরঙ্গ আমি তাঁর সমুদ্রের বুকে
ফিরে আসি বিশ্রাম আশায়।

ইসলামের শক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

ক্ষুদ্র এক পরমাণু করেছিল সে কভু বপন
পরিপূর্ণ সূর্য এক তুলে নিয়ে গেল অবশেষে।

এই ইসলামকেই ইকবাল চিরন্তন ধর্মের মর্যাদা দিয়েছেন, ইকবালের কাছে ইসলামের সম্ভাবনা অপরিসীম। দার্শনিক কবি ঘোষণা করেছেন :

দেখিয়াছি আকাশের গতিমান স্নায়ুর স্পন্দন,
চাঁদের শিরায় আমি দেখেছি, শোণিত বহমান
এ জীবন রহস্যের যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে দিতে,
প্রকৃতির জ্ঞানাগারে জেনে নিতে জীবন কৌশল,
ক্রন্দন করেছি আমি কত রাত্রি মানুষের লাগি ;
নিরন্ধ্র তিমির বক্ষে ছড়ায়েছি চাঁদের সুষমা।
ভক্তি নত আমি শুধু এক সত্য ধর্মের নিকট
পরিচয় আছে যার পর্বত প্রান্তরে ;
আমার সুরের বহ্নি জ্বালায়ে যায় যে নিত্য
মানুষের হৃদয়ের মাঝে।

আত্ম-সংরক্ষণ অথবা আত্মার পরিপূর্ণতার জন্য মূল ইসলামের প্রয়োজনীয়তা তিনি ঘোষণা করেছেন। আজীবন তাঁর কাব্যের বিশাল অংশ ইসলাম ও আত্মা সম্পর্কে মুখরিত, যে আত্মা ইসলামের বিধান মেনে ইশ্‌ক বা প্রেমে সংরক্ষিত হয়—সেই মুসলমানের মধ্যে ইকবাল দেখেছেন ইনসান-ই-কামেল বা পূর্ণ মানবের প্রতিশ্রুতি। "আসরার-ই-খুদী"র বহু স্থানে আলোচনা করা হয়েছে ইনসান-ই-কামেল সম্পর্কে। ইনসান-ই-কামেল ও ইশ্‌ক সম্পর্কে ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করতে পারব নিম্নোদ্ধৃত অধ্যায়ে। ফারসী কবিদের অনুসরণে ইকবাল একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে আশেক ও কামেল মুসলমানের নিখুঁত ছবি একেঁছেন :

মুহব্বতের কুওতে যখন সত্তার পূর্ণতা।
শক্তি তাহার মুষ্টিতে আনে সসাগরা ধরাতল
তার কব্জিতে ঝলসিয়ে ওঠে আল্লার দেওয়া বল
ধরা পড়ে তার মুষ্টিতে জল-স্থল ;
ভাঙে রাত্রির নিঁদ
নির্দেশ তার মেনে চলে ভয়ে দরিয়ুস জামশিদ।

যাঁর কথা জানে তামাম হিন্দুস্থান ;
জালালী ফকির বু'আলী কলন্দর !
যাঁর পরশনে মরুভূমি হল জান্নাত-সুন্দর
যাঁর কথা ফিরে নিয়ে এল বয়ে তাজা গোলাবের গান
তাঁর জীবনের একটি কাহিনী শোনাবো অতঃপর :
তামাম ভারতে মশহুর যিনি বু'আলী কলন্দর।
একদিন তাঁর ভক্ত মুরীদ বাজারের পথে একা
আন্‌মনে যেতে নেহারে প্রেমের সুগভীর রাঙা লেখা,
বাদশা'র প্রিয় ওমরা তখন ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে

www.pathagar.com

চলেছিল সাথে লশকর চলে তার নির্দেশ ব'য়ে।
সম্মুখে যবে পড়িল তাদের ফকির দীওয়ানা সেই
নকীব তখন ফুকারিয়া বলে এই :
বেহুঁশ পথিক পথ ছেড়ে চলো আমীর ওমরাহের।

দুনিয়ার হাল ছিল না সে ফকিরের,
আপনার ভাবে বিভোর হয়ে সে চলেছিল একমনে!
ওমরার এক উদ্ধত দাস নির্ভীক সেই ক্ষণে
তীব্র আঘাত হানিল তখন শিরে সেই ফকিরের।

ওমরার পথ ছাড়িয়া আহত ফকির চলেন ফের।

কলন্দরের জলসায় আসি ফকির পড়িল কাঁদি
গর্জে উঠিল নিমেষের মাঝে বু'আলী কলন্দর
জাগিয়া উঠিল আগুনের মত প্রশান্ত কন্দর
গলিত লাভার বন্যা ভাসাল সুষুপ্ত বন্দর।
মিসমার করি বজ্র যেমন পড়ে পর্বতচূড়ে
তেমনি আদেশ ধ্বনিয়া উঠিল কলন্দরের সুরে
বলিল : এখনি ফকিরের লিপি দাও শাহী দরবারে
দরবেশী এই পত্র পাঠাও গর্বিত বাদশারে—

'মোর খাদিমেরে মারিয়াছে তব ওমরা অকস্মাৎ :
ঢেলেছে যে তার জীবনে তীব্র জ্বলন্ত হুতাশন :
এখনি বন্দী কর তুমি সেই ওমরা খবীস মন :
নতুবা অন্যজনারে দানিব তোমার সুলতানাত।'

আল্লাওয়ালা ওলির চিঠি গেলে বাদশার কাছে
থরথর করি কাঁপিয়া উঠিল বাদশা বিষম ডরে
সূর্য যেমন নিষ্প্রভ হয় রোশ্‌নি আসিলে ক্ষয়ে
বিবর্ণ হ'ল বাদশা তেমনি ফকিরের চিঠি পেয়ে।

হাতকড়ি এক পাঠালো তখনি সেই ওমরার তরে
কলন্দরের কাছে মাপ চায় বাদশা বিষম ডরে।
বু'আলীর কাছে দূত হয়ে এল আমীর খসরু কবি
যার কাব্যের মাধুরী জাগাতো জোছনারাতের ছবি
যার সুরজাল জাগিত গভীর মৌলিক মন হ'তে
ভেসে যেত এই হিন্দের বুক সে সুর-ধারার স্রোতে...
তার সংগীতে বু'আলীর মন গলিল কাঁচের মত
কাব্য-সুষমা রাখিল সেবার বাদশাহী অক্ষত।
পাহাড়ের মত সাম্রাজ্য সে, তবু
বেঁচে গেল শুধু কাব্যের সরণিতে
আহত কোরো না ফকিরের দিল্ কভু
ফেলো না নিজেকে জ্বলন্ত বহ্নিতে।

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে ইকবালের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী কতখানি বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট তার দৃষ্টান্ত আমরা ভালোভাবে পাই উদ্ধৃত কবিতার প্রথম দিকের কয়েকটি চরণে। নির্বাণ অথবা আত্মবিলোপের থিওরিকে ইকবাল বরাবর উপেক্ষা করেছেন এবং সমানভাবে ঘৃণা করেছেন ভণ্ডামিকে। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ফকিরের মত আড়ম্বরশূন্য ছিলেন ; কিন্তু শক্তিমান ছিল তাঁর মন—একটি নির্জীব জাতিকে দাসসুলভ নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের পঙ্ককুণ্ড থেকে টেনে তোলার মত বলিষ্ঠ নির্ভীক মন।

ইকবালের সমাজচেতনতা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণতার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তা সমাজবোধেরই পরিচায়ক। কারণ :

পীর আমাদের তাকায়ে বৌদ্ধ দিকে
ফতোয়া ব্যবসা ধরেছে মুফতী ব্যবসাদারীর টানে
এর পরে কোন পথ নেব বেছে
পীর আমাদের মুখ ফেরায়েছে শারাবখানের পানে।

জাতির এই দুর্দিনে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না। তাই কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ব্যক্তি ও সমাজকে তিনি দিয়েছেন সঠিক পথের নির্দেশ। কীটসীয় এরস্কেপিজম তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি, প্লেটোর দর্শন এবং ভারতীয় বৈরাগ্যের সুরকেও তিনি উপেক্ষা করেছেন। তাঁর মনের পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে আমাদের উঠতে হবে তাঁর মননের উচ্চ স্তরে যেখানে Iqbal stands on a hill by himself (Dr. R. A. Nicholson) আর যেখান থেকে তিনি ঘোষণা করেছেন :

ধূলিকণা তুলে নেয় সাত সেতারার মাঝে
বারিবিন্দু স্ফীত হয় সমুদ্রের মত
রোজ হাশরের মস্ত কোলাহল মাঝে আনে প্রগাঢ় স্তব্ধতা
তিতিরের পদযুগল রাঙায় সে ঈগল শোণিতে।...

সেই শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের রাজ্যে, সেই জ্ঞান ও অনুভূতির উচ্চ শিখরে।

নজরুল-প্রসঙ্গ

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ...

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের কামানের আওয়াজ থেমে গেল কিন্তু পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মানুষ প্রতিক্ষণে আর এক অপমৃত্যুর আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে রইল। মুছে গেল তার শান্তি, মুছে গেলে তার স্বপ্ন, নিভে গেল তার সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির মহত্তর মানবীয় পরিকল্পনা। পৃথিবীর বুকে তখন dead land মরা জমির অনুর্বর অসোয়াস্তি। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্যের কথা এই যে, চরম মৃত্যুসংকটের মধ্যে জেগে উঠল ঘুমন্ত মুসলিম দেশগুলি ; তুরস্ক, মিশর ও ইরানে সাড়া উঠলো নবজাগরণের ; হিন্দুস্তানের মুসলমানের মনেও সেই জাগরণের জোয়ার বলিষ্ঠ সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেল। ঠিক এমন সময় মুসলিম

www.pathagar.com

বাংলার প্রথম কবি নজরুলের কণ্ঠে শোনা গেল জীবনের পরম স্বীকৃতির বাণী—তিনি ঘোষণা করলেন : চির উন্নত মম শির।

পলাশীর আম্রকাননে মুসলমানের যে সৌভাগ্য-সূর্য পরাজয়ের যবনিকায় ঢাকা পড়েছিল, ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় মুসলমানের বহ্নি-যৌবনে যে তুহিন পাথর নেমেছিল সেই স্থবিরত্বে অধীর গতিবেগ সঞ্চার করলেন কবি নজরুল ইসলাম। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে মহাকবি ইকবাল অবশ্য অনেক আগেই সন্ধান দিয়েছিলেন আবেহায়াতের। তাঁর দেশকালজয়ী প্রতিভার সঙ্গে নজরুলের তুলনা করতে যাওয়া বাতুলতা। তবু একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে পলাশী যুদ্ধের পর নজরুল ইসলাম বাঙালী মুসলমানের জাগরণের প্রথম কবি।

পৃথিবীর চলমান স্রোতের সাথে অদ্ভুত সামঞ্জস্য রেখেছে বাঙালী মুসলমান সমাজের প্রাণবন্ত মননের ধারাবাহিকতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যে সংস্কৃতি জেগে উঠল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্রের মধ্যে থেকে সে সংগ্রহ করল জীবনের নতুন পাথেয়।

নজরুল ইসলামের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসময় প্রাণ-প্রবাহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বেগবান জলপ্রপাতের মত অকাল বার্ধক্যের যুগসঞ্চিত জরদ্‌গব শিলাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যাদুকরের মত—সমস্ত দেশ তাঁকে অভিবাদন জানাল। কিন্তু কাব্যের চরম উৎকর্ষে পৌঁছানোর আগেই নজরুল অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

নজরুল ইসলামের কবিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলতে পারে। নজরুলের শক্তি যেমন বিস্ময়কর তাঁর কাব্যিক স্খলনও তেমনি বিস্ময়কর। অদম্য ভাবাবেগের জন্য তাঁর অধিকাংশ দীর্ঘ কবিতাই নিখুঁতভাবে জমাট বাঁধতে পারেনি, শব্দচয়নের দিক দিয়েও তাঁর দুর্বলতা আছে যথেষ্ট। অগভীর জীবনবোধ এবং দার্শনিক দৃষ্টিশক্তির অভাব তাঁর সবচাইতে বড় ত্রুটি। শুধু এই একটি কারণেই তিনি সর্বকালের কবি হতে পারেননি। নজরুল নিজেও তা বুঝতেন এবং সেকথা স্বীকার করে গেছেন, কিন্তু নজরুলের সহজ স্বীকৃতি ও অবহেলা বাঙালী মুসলমান সমাজের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, কারণ তারা আরও চেয়েছিল নজরুলের কাছে, তারা তাদের নিজের দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি চেয়েছিল কবি নজরুলের কবিতায়।

নজরুল সাহিত্যের পটভূমি

ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের জাতীয় জীবনে যে মারাত্মক নৈরাশ্য আর অবসাদের সৃষ্টি করেছিল, ১৯০৫ সালের আগে তার ভেতর কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি।

এই সুদীর্ঘ সময় একটানা ক্লান্তি ও হতাশার। অন্ধকার যবনিকা দীর্ণ করে কোন সূর্যের সাক্ষাৎই এ সময় পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

তবু জাতি পুরোপুরিভাবে মরেনি।

রাজনীতি আর অর্থনীতি-ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হয়েও শুধুমাত্র মৌলিক তমদ্দুনের জোরেই এ জাতি কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা মৃত্যুর নামান্তর না হলেও মুমূর্ষু প্রাণীর আত্মরক্ষার ক্লিষ্ট প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। তার নিজস্ব তাহ্‌জীব-তমদ্দুনের ক্ষীণ রেখা কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার নিজস্ব অস্তিত্ব।

ইতিহাসের এই পটভূমি পিছনে রেখে বিচার করলে পরিস্থিতির গুরুত্ব আমরা সহজেই বুঝতে পারবো। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এই অচলায়তনে প্রথম সাড়া জাগালো। আর আত্মবিস্মৃত জাতির জীবনে খিলাফৎ আন্দোলনই সর্বপ্রথম নিয়ে এল দুকূল-প্লাবী বন্যা।

খিলাফৎ আন্দোলন-কালে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একাধিক কারণে স্মরণীয়। আত্মবিস্মৃত জাতি বহুদিন পরে শুনলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। নতুন করে পেল সে তার ঐতিহ্যের পরিচয়।

স্বতন্ত্র তমদ্দুনের বৈপ্লবিক দাবীতে পাকিস্তান আন্দোলন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে একদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনন্দিত হয়েছিল তার গোড়া পত্তন হয় এ সময় থেকেই।

বহু শতাব্দী ধরে বাঙালী মুসলমান আরবী-ফারসী মিশ্রিত যে বাংলা জবান গ'ড়ে তুলেছিল, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ষড়যন্ত্র যে ভাষার কণ্ঠরোধ ক'রেছিল, কাজী নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনীতে তার নতুন প্রকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন শিক্ষিত সমাজ। এমনকি, জনসাধারণের মধ্যেও সাড়া পৌঁছতে দেরী হ'ল না।

ইসলামের মরমীবাদ ও সুফীবাদ থেকে কাজী নজরুল যে উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন সেই ঐতিহ্যের প্রাণ-শক্তিই দেশের দুর্গত জনসাধারণকে বিপুল বেগে আকর্ষণ করলো মঞ্জিলের পথে।

নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা ! লাল তেরী খুন কিয়া খুনিয়া।

অথবা—

আবুবকর, উস্‌মান, উমর, আলী হায়দার
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা,
দাড়ি-মুখে সারিগান—লা-শরীক আল্লা।

কবির কাব্য যেমন আশ্বাসের বাণী বয়ে আনলো, তেমনি সে উদ্বুদ্ধ করলো জাতিকে নতুন চেতনায়। এই সঙ্গে ইসলামের মানবতাবোধ, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচার কবি-চিত্তে যে চেতনার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করল তার কাহিনী খিলাফৎ আন্দোলনের একটি অধ্যায়কে যেমন প্রাণবন্ত করে তুলেছিল, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তেমনি জেহাদী ফরমান শুনিয়েছিল।

এই অগ্নি-গীতির সঙ্গে গজল ও কাব্য-গীতির মধুর রসে জনসাধারণের চিত্ত অভিসিঞ্চিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের গীতোচ্ছ্বাস একটি অচেতন জাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাঁর হারানো সম্বিৎ।

www.pathagar.com

বঙ্গ-ভঙ্গ, খিলাফৎ, অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে যে কবি-মানস গঠিত হয়েছিল, তার অশান্ত মনের প্রতিচ্ছায়া দেখেছি আমরা তাঁর রচনায়। বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ অধ্যায়ে রয়ে গেছে তাঁর দ্বন্দ্ব-মুখর মনের ছাপ।

পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছে। আর সবচাইতে আশার কথা এই যে, আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে।

যদি তাই হয়, তাহলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। কেন হবে এ নিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কিন্তু একটা কারণে আমাকে বাধ্য হয়ে দু'একটি কথা প্রসঙ্গত বলতে হচ্ছে।

পাকিস্তানের, অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে এ কথা সর্ববাদীসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অবাচীন মত প্রকাশ করেছেন যা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপায়িত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাঁদের অভিমত।

কী কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পিছনে কাজ করছে এ কথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি। যে মনোবৃত্তির ফলে প্রায় দুশো বছর বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, সেই অন্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আবার আমরা ইসলামকে গলা টিপে মারার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছি। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আরো দুঃখের কথা এই যে, পূর্ব পাকিস্তানে এমন মানুষ আছেন (সংখ্যায় যত অল্পই হোক না কেন) যাঁরা একমাত্র মানসিক দুর্বলতার জন্যই মাতৃভাষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে অস্বীকার করে ইসলামী ঐতিহ্যের মহান দায়িত্ব অপর একটি প্রাদেশিক ভাষার কিঞ্চিৎ-পরিপুষ্ট ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

কারণ : (এক) ঐ প্রাদেশিক ভাষাটি তথাকথিত শরিফদের ভাষা।

(দুই) ঐ প্রাদেশিক ভাষায় কয়েকখানি ইসলামী তমদ্দুনমূলক গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হয়েছে।

প্রথম কারণটি হাস্যকর। দ্বিতীয় কারণটি অযৌক্তিক।

অবশ্য ঐ দুটো কারণকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে এক কল্পনা করা হ'য়েছে। আর ঐ কারণটির বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ!

শরাফতি কথাটার প্রকৃত ইসলামী অর্থ যাঁরা জানেন তাঁরা যে এই জাতীয় কথা উচ্চারণ করেন না, অন্তত করতে পারেন না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বাংলা ভাষাকে যে ইসলামী

www.pathagar.com

ভাবধারার শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত করা যায় এ বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক দীনতা ঘোচাতে হলে শুধু লেখক সম্প্রদায়কে নয়—রাষ্ট্র ও সমাজের বিত্তবান অংশকেও এ দিকে মনোযোগ দিতে হবে ; জনসাধারণের কথা আমি ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছি। কারণ, অধিকাংশ লোকের মত জনগণও লুণ্ঠিত সম্প্রদায় (অবশ্য বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে)।

রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপে বিত্তবানের সহযোগিতা কামনাকে কেউ যদি পুঁজিবাদের সমর্থন মনে করেন, তাহলে ভুল করবেন। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের বা পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ শত্রু বলে সর্বপ্রথম গণ্য হতে পারে কুফরী ও ক্যাপিটালিজম। আর ঐ দুটোর বিরুদ্ধেই বৈরী মনোভাব নিয়ে আমাদের জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস ! সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্র, রাষ্ট্রভাষা ও আমাদের জাতীয় সাহিত্য গড়ে তুলতে সহযোগিতা (সাহায্য নয়) করতে পারেন কেবলমাত্র তাঁরাই যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ইসলামী গণতন্ত্রের আলোক-দীপ্ত।

কোন্ প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী এর বিরোধিতা করবেন তাও আমাদের অজানা নেই। সেই শ্রেণীর বিরোধিতা আমরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অনুভব ক'রেছি। নিরক্ষর জনগণকে সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত করার চেষ্টা এঁদের এ পর্যন্ত সফল হলেও, আর সম্ভব হবে না। সময়ের চাকা তার গতি পরিবর্তন ক'রেছে। জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে চেপে রাখা কারুর সাধ্যেই কুলোবে না।

ঐ ন্যায়সঙ্গত দাবীর বলেই পাকিস্তানের জনগণ শুধু আহার্যের নয়--সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার কেড়ে নেবে। গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপায়িত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমি আগেই বলেছি যে, বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামী সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে। সেই কথাই আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি।

ব্যায়াম-শিক্ষক মোহাম্মদ জনাব আলী

কড়েয়া এমেচার জিম্‌ন্যাস্টিক ক্লাব—১৪০ কড়েয়া রোড। ছোট একখানা ঘরে একজন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধের উৎসাহে তিরিশ বছর থেকে এ-ক্লাব চলে আসছে। কলকাতার শ্রেষ্ঠ ভারোত্তলনকারী দল ছাড়া এই বৃদ্ধকে এবং ক্লাবকে খুব বেশী লোক চেনে না। তার কারণ এই ক্লাবের অর্থাভাব। আর সব-কিছু এখানে আছে — টাকা ছাড়া।

www.pathagar.com

এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ জনাব আলী আজীবন দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে একে বাঁচিয়ে রেখেছেন। শুধু বাঁচিয়ে রাখাই নয়, এঁর হাতে শিক্ষিত যুবকেরা বার্বেল ভারোত্তলন, প্যারালাল বার এবং রোমান রিংয়ের প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এর আগে প্রতিযোগিতায় ছাত্র পাঠাতে কোন ভারতীয় মুসলমানের সাহস হয়নি — অবশ্য কুস্তি ছাড়া। যন্ত্র ব্যায়ামের কথাই আমি এখানে বলছি।

"স্টেটসম্যানে" (২২-৪-৩৭) গত বছর এই খবরটা প্রকাশিত হয় :

ভারোত্তোলনকারী ৮ স্টোন ১ম স্থান —এফ. হোসেন ৩৭০ পাউন্ড।

৯ স্টোন (চ্যাম্পিয়ন) ১ম স্থান — এস. হোসেন ৪৩৫ পাউন্ড।

এই দুইজন যুবক মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

কিন্তু এঁদের সাফল্যের পেছনে আছে ব্যায়াম-শিক্ষক জনাব আলীর আপ্রাণ চেষ্টা।

প্রথমে এঁদের শরীর অত্যন্ত দুর্বল ছিল। জনাবের কাছে এঁরা চার বৎসর প্যারালাল বার, ডাম্বেল, বারবেল এবং রোমান রিং প্রাকটিস করে ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছেন।

এই ক্লাবের আর একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ আবুল হোসেন। দু' বৎসর একসারসাইজ করে ইনি জনাবের প্রিয় শিষ্য।

সঙ্গে আরো কয়েকজন স্বাস্থ্যবান যুবকের চিত্র দেয়া গেল। ব্যায়াম-শিক্ষক জনাবের প্রচেষ্টায় এই যুবকেরা স্বাস্থ্যের প্রচুর উন্নতি করেছেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক জনাবের ঐকান্তিকতা এবং পরিশ্রম এঁদের স্বাস্থ্য সংগঠন করেছে।

হেনরী স্মিথ এই ক্লাব থেকে ট্রেনিং নিয়ে এই বৎসর অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশানে ১১ স্টোন চ্যাম্পিয়ন হন।

এবার আর একজন যুবকের কথা বলব — ইনি শেখ সুলেমান। ইনি বাগবাজার জিম্‌ন্যাশিয়াম কর্তৃক অনুষ্ঠিত ক্যালকাটা প্যারালাল বার কম্পিটিশানে 'বি' ক্লাস চ্যাম্পিয়ন হন।

এই ছবিগুলো দেখলে কারুর সন্দেহ থাকবে না যে মুসলমানেরা চেষ্টা করলে অনায়াসে সবরকম ব্যায়াম আয়ত্ত করতে পারেন।

মুসলমানদের জীবনে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। বহুদিনের সঞ্চিত তিমিরে সূর্যরশ্মিসম্পাত হয়েছে। ব্যায়ামের দিকেও তার অন্যথা হয়নি।

কিন্তু সমাজের এদিকে দৃষ্টি থাকা উচিত। যে কষ্টের মধ্যে জনাবকে ক্লাব চালাতে দেখেছি, সত্যিই তা বিস্ময়কর। অর্ধাহারে অনাহারে, দরিদ্র যুবকদের খাদ্যের সংস্থান করে দিয়ে ইনি যেভাবে পরিশ্রম করেছেন, তার তুলনা খুব বেশী নেই।

অথচ কর্পোরেশন থেকে ইনি কোনরকম সাহায্য পাচ্ছেন না। আশা করি, কর্পোরেশনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে।

বারান্তরে এই ক্লাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নাটক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজ-রাজড়া

www.pathagar.com

পরিচয়

পুরুষ

হোবুচন্দ্র—রাজা (সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি)
গোবুচন্দ্র—মন্ত্রী (বংশাধিকার বলে নির্বাচিত)
কবি—বিধি-বহির্ভূত উৎকট চরিত্রের অধিকারী।
বৃদ্ধ মোড়ল—প্রবীণ গ্রাম্য নেতা।
নিতাই—হোবুচন্দ্রের পেয়ারা চাকর।
নেপাল—হোবুচন্দ্রের ক্ষৌরকার।
মাতব্বর, যাত্রাদলের ছোকরা, গ্রাম্য যুবক ইত্যাদি।

নারী

দুয়োরাণী—হোবুচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী (প্রথম পক্ষের স্ত্রী যেমন হওয়া উচিত)।
সুয়োরাণী—হোবুচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী (দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যেমন হওয়া উচিত)।

www.pathagar.com

গোড়ার দিক

এক

[ব'নেদী আমলের একখানা আটচালা ঘরে অর্থাৎ দরবার কক্ষে আমকাঠের তৈরী বিশাল সিংহাসনে মহারাজ হোবুচন্দ্র কানে তুলা গুজিয়া আঁটোসাঁটো হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। হোবুচন্দ্র ছাড়া ঘরের মধ্যে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই। বাহিরে বেড়া দেওয়ার ও খুটি পোতার অসমমাত্রিক উৎকট শব্দ। সময় সকাল]

হোবু : (কান হইতে তুলা ফেলিয়া দিয়া) দুত্তোর রাজা হওয়ার নিকুচি। এই ফাঁকা ঘরে কানে তুলো গুঁজে একা একা গম্ভীর হ'য়ে ব'সে থাকা যায় নাকি? (চিন্তা করিয়া) তার চেয়ে একটু নেশা করা যাক। (উচ্চস্বরে) নিতাই, ও নিতাই, আমার আফিমের কৌটোটা নিয়ে আয় তো।

নিতাই : (নেপথ্যে) আজ্ঞে আনছি কর্তা।

হোবু : (গর্জন করিয়া) কর্তা কী–রে হারামজাদা, মহারাজ ব'লবি।

নিতাই : (পূর্ববৎ দূর হইতে) আজ্ঞে আনছি মহারাজ।

(নিতাই আফিমের কৌটা আনিয়া দিলে, বড়ি তুলিতে তুলিতে)

হোবু : রোজ রোজ আর এইরকম ভালো লাগে না। অতো কি চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায়?

নিতাই : কর্তা! (হোবু চোখ পাকাইয়া তাকাইতেই থতমত খাইয়া) আজ্ঞে মহারাজ...

হোবু : (খুশী হইয়া) কি বল্।

নিতাই : আজ্ঞে মহারাজ, আপনি রোজ সকালে কানে তুলো গুঁজে ফাঁকা ঘরে অমন ক'রে ব'সে থাকেন কেন?

হোবু : (বিষণ্ন কণ্ঠে) আর বলিস কেন, গোবুর কথা শুনে আমি মারা গেলাম। সেই নিশুত রাত থেকে শুরু ক'রে দুপুর অবধি রোজ এই রকম চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হয়।

নিতাই : কেন মহারাজ?

হোবু : গম্ভীর হওয়ার মহড়া দেওয়ার জন্যে।

নিতাই : সে আবার কি?

হোবু : তুই ওসব বুঝবি না, রাজা হলে বুঝতিস্।

নিতাই : আপনাদের অনুগ্রহ থাকলে হয়তো কোন দিন রাজা হ'তেও পারি।

হোবু : (চিন্তা করিয়া) তা আশ্চর্য কিছু নয়। তোর শ্বশুর আছে?

নিতাই : আজ্ঞে না।

হোবু : তা হলে রাজা হ'তে পারবি না।

নিতাই : কেন?

www.pathagar.com

হোবু : কেন আবার কি! আমার শ্বশুর ছিলেন ব'লে আমি রাজা হ'য়েছি। তোর শ্বশুরই নেই, তুই আবার রাজা হ'বি কি ক'রে?

নিতাই : মামা কি শ্বশুর থাকলেই রাজা হওয়া যায় নাকি?

হোবু : আমি তো হ'য়েছি।

নিতাই : কেমন ক'রে?

হোবু : এ সব আবার গোপন কথা যাকে–তাকে ব'লতে নেই। (চিন্তা করিয়া) যাক্, কারুর কাছে ফাঁস করিস্‌নে যেন।

নিতাই : মহারাজের ভুড়ি ছুঁয়ে দিব্যি ক'রছি। (ভুড়ি স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইল)

হোবু : তবে শোন্। আমার শ্বশুর মশায় এই রাজ্যের আগেকার রাজাকে ধাপ্পা দিয়ে এই সিংহাসন আমার জন্য দখল ক'রে দিয়েছেন।

নিতাই : কে, দুয়োরাণীর বাবা?

হোবু : হ্যাঁ। ভাল কথা, এক কাঁদি পাকা কলা শ্বশুর মশায়কে পাঠিয়ে দিস্ তো নিতাই। বাতের রুগী—পেলে খুশী হবে। কবরেজটা আবার শ্বশুর মশায়কে কলা খেতে দেয় না। একদিন লুকিয়ে দিয়ে আসিস্।

নিতাই : মর্তমান কলার একটা কাঁদিতে রং ধ'রেছে, সেইটেই না হয়...

হোবু : না, না, মর্তমান কলা হ'লে দিস্‌নে, আমিই বরং খাবো। অন্য কোন জাতের কলা পাক্‌লে দিস্। আর একটা কথা—গোবু যেন টের না পায় যে কলা পেকেছে। গোবুটা এমন চোর হ'য়ে উঠেছে আজকাল যে, টের পেলেই রাত্তিরে এসে কলা চুরি ক'রে নিয়ে পালাবে। গোবুকে কিছুতেই ব'লবিনে। বুঝলি?

নিতাই : হ্যাঁ, বুঝেছি, ব'লব না। কিন্তু আপনি রোজ এই রকম ফাঁকা ঘরে কানে তুলো গুঁজে চুপ করে ব'সে থাকেন কেন সে কথা তো বললেন না।

হোবু : তোর কি দরকার তা'তে?

নিতাই : (মিনতি করিয়া) বলুন না মহারাজ!

হোবু : আচ্ছা শোন্। আমি নতুন রাজা হ'য়েছি তো, সেইজন্যে রাজারা যেমন ক'রে গম্ভীর হ'য়ে সিংহাসনে বসে, আমিও সেই রকম গম্ভীর হ'য়ে বসার চেষ্টা করি।

নিতাই : কেন?

হোবু : কেন আবার? নৈলে প্রজারা ব'লবে যে, হোবুচন্দ্র ধাপ্পা দিয়ে রাজা হ'য়েছে; রাজার মত ব'সতে পর্যন্ত জানে না।

নিতাই : আর কানে তুলো গোঁজেন কেন?

হোবু : বুঝিস্‌নে রাজাদের বুদ্ধি কান দিয়ে যদি বেরিয়ে যায়।

নিতাই : ওঃ সেই জন্যে!

হোবু : হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো, নৈলে এতটুকু সিংহাসনে এত কষ্ট ক'রে -

নিতাই : এতটুকু সিংহাসন কোথায় এরকম সিংহাসনে আমার মত জন-তিনেক তো খুবই...

www.pathagar.com

হোবু : (ভীষণ চটিয়া) বেরো হারামজাদা, আমার খেয়ে আবার আমাকে দেখেই ওর চোখ টাটাচ্ছে। বেরো, বেরো এখান থেকে...

(নিতাই দ্রুতগতিতে পলায়ন করিল এবং একগাদা নথিপত্র লইয়া গোবুচন্দ্র প্রবেশ করিল)

গোবু : এই কাগজগুলোয় একটা ক'রে সই দিন মহারাজ।

হোবু : (মুখ খিচাইয়া) এসেছো! এই সাত সকালেই একগাদা কাগজ নিয়ে এসেছো! আমি বাঁচি না আমার কষ্টে আর যতো সব...

গোবু : কেন, আপনার আবার কিসের কষ্ট? আপনি তো দিব্যি খেয়ে দেয়ে ...

হোবু : (আবার মুখ খিঁচাইয়া) ঘুমিয়ে সিংহাসনে ব'সে আরাম ক'রছি।

গোবু : (রাগের কারণ বুঝিতে না পারায় বিপন্ন কণ্ঠে) আপনি রাগ ক'রছেন কেন, আমি তা মোটেই বুঝতে পারছিনে। আমাকে কি কিছু ক'রতে হবে?

হোবু : (পূর্ববৎ মেজাজে) হ্যাঁ, করতে হবে। একটা ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে নিয়ে এসো। এক্ষুনি। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রৈলে যে, বুঝতে পারছো না? (টানিয়া টানিয়া) একটা ছুতোর মিস্ত্রী, বুঝলে? যাও।

গোবু : (মাথা চুলকাইয়া) ছুতোর মিস্ত্রী দিয়ে কি হবে?

হোবু : আমার মুণ্ডু হবে। দেখছো না সিংহাসনের দুই হাতলের চাপে আমার ভুঁড়ি ফেটে যাবার মতো হ'য়েছে।

গোবু : (রাজার অবস্থায় আনন্দ চাপিয়া) কিন্তু মিস্ত্রী এসে ক'রবে কি?

হোবু : আঃ, জ্বালাতন ক'রলে দেখছি। বলি, ঘটে কি এক আধ ছটাকও বুদ্ধি নেই তোমার? মিস্ত্রী এসে হাতল কেটে সিংহাসনখানা পাশে বাড়িয়ে দেবে। বুঝেছ? যাও।

গোবু : সিংহাসনখানা কাটলে দামী জিনিসটা নষ্ট হ'য়ে যাবে। তা'বিলের অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। এ সময় সিংহাসনখানা নষ্ট করে দিলে নতুন গড়াও আর সম্ভব হবে না।

হোবু : (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) বক্তৃতা শুরু ক'রে দিলে দেখছি। বলি সিংহাসনখানা আমার, না তোমার বাবার?

গোবু : (স্বগত) আমার বাবারও নয়, তোমার বাবারও নয়। যে রকম জোচ্চুরি ক'রে শ্বশুর-জামাইয়ে সিংহাসন দখল ক'রেছ তা একটু আগে জানতে পারলে।

হোবু : (ধমক দিয়া) কী বিড়বিড় করছ। যাও না মিস্ত্রী ডেকে নিয়ে এসো।

(দরবার কক্ষে দুই একজন করিয়া সভাসদ প্রবেশ করিতে লাগিল)

১ম সভাসদ : প্রাতঃ-প্রণাম, মহারাজ কি ব্যস্ত আছেন?

হোবু : (ক্রুদ্ধ স্বরে) ব্যস্ত মানে? দেখছো না এই ব্যাটা মন্ত্রীকে ব'লছি একটা মিস্ত্রী ডেকে আনতে, আর ব্যাটা কিনা তর্ক শুরু ক'রে দিয়েছে।

গোবু : ব্যাটা ব্যাটা ক'রবেন না না মহারাজ! ভালো হবে না ব'লছি। মনে রাখবেন যে রাজরাজড়াদের দিন খতম হ'য়ে আস্‌ছে।

১ম সভাসদ : আহা, আপনারা ঝগড়া ক'রবেন না। আমিই না হয় মিস্ত্রী ডেকে আন্‌ছি।

(বাহির হইয়া গেল)

www.pathagar.com

হোবু : (নরম হইয়া) রাগলে নাকি গোবু? তুমি বুঝতে পারছো না আমার ভুঁড়িতে কীরকম...

গোবু : (বিষণ্ন গম্ভীর কণ্ঠে) আমাদের রাগে কার কি আসে যায়। গরিব মানুষ, পেটের জ্বালায় মন্ত্রিগিরি ক'রতে এসেছি। সকল অপমানই আমাদের গা-সওয়া হ'য়ে গেছে।

হোবু : না না মন্ত্রী, তুমি রাগ কোরো না। আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে। (একটু থামিয়া) কি ব'লছিলে তুমি?

গোবু : (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) এই কাগজগুলোতে একটা ক'রে টিপসই দিয়ে দিন। লেখার যা বাকি আছে তা আমি পরে ঠিক ক'রে নেব। যে সব জায়গায় সই দিতে হবে সে সবগুলো জায়গা বরং আপনি দেখে নিন। নইলে আবার...

হোবু : (নিরক্ষরতার উপর কটাক্ষ করায়) হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে আর মোড়লি ক'রতে হবে না। সই কোথায় দিতে হয়, সে বিদ্যে আর তোমার জাহির না ক'রলেও চলবে। দাও কাগজ।

(এলোপাথাড়ি টিপ সই দিতে লাগিলেন)

গোবু : (হা হা করিয়া) ক'রলেন কি? ক'রলেন কি মহারাজ? সবগুলো দলিল নষ্ট ক'রে দিলেন। আমাকে জিগ্‌গেস ক'রলেই তো সই দেয়ার জায়গা দেখিয়ে দিতাম।

হোবু : (ভীষণ চটিয়া) চুপ্....ফের যদি হল্লা ক'রেছ, তাহলে শূলে চড়াবো তোমাকে।

(হোবুচন্দ্রকে আর ঘাটাইতে সাহসে কুলাইল না বলিয়া গোবুচন্দ্র চুপ করিয়া গেলেন। জনৈক কর্মচারী সভাকক্ষে প্রবেশ করিল)

কর্মচারী : মহারাজ! কাল আপনি গান শুনতে চেয়েছিলেন। লোক এসে গেছে।

হোবু : (উৎফুল্ল স্বরে) লোক এসেছে? কি, মেয়েলোক? নর্তকী? গায়িকা? ক'জন?

কর্মচারী : (স্বগত) ব্যাটা লম্পটের হদ্দ, মেয়েমানুষের নামেই পাগল। বোতল না দেখেই মাতাল। (প্রকাশ্যে) না মহারাজ, এ রাজ্যে মেয়েমানুষ আর গান গায় কোথায়? যাত্রার ছোকরা এসেছে ক'টা।

হোবু : (নিশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা ডাক দাও।

কর্মচারী : (হাঁক দিয়া) ওরে ক্যাবলা, দলবল নিয়ে ভেতরে আয়। এক্ষুণি তোদের গান গাইতে হবে মহারাজের সামনে।

(কিল্‌বিল করিয়া ছেলেরা ভিতরে ঢুকিল)

হোবু : (স্বগত) ছোঁড়াগুলোর চেহারা দেখছি খাসা, কাটছাটও ভাল... (প্রকাশ্যে) বেশ গান শুরু করো।

ক্যাবলা : মহারাজ! একটা গান বিশেষ ক'রে আপনাকে শোনানোর জন্যে আমাদের মূল গায়েন ব'লে দেছেন...

হোবু : (খুশী হইয়া) তা বটেই তো. মূল গায়েন বিচক্ষণ ব্যক্তি। বেশ সেইটেই শুরু করো।

www.pathagar.com

গান

গাধা যদি ব'সলো এবার
পশুরাজের সিংহাসনে
গাধার স্বজন নীরব হ'য়ে
রইবো কেন বন-ভবনে॥
ধূয়া : আসুন নৃত্য করি॥
চার পেয়ে নাচ নাচতে দেখে
হবে যাদের ওষ্ঠ ফাঁক,
জুটবে তাদের ভাগ্যে লাথি
আধমণ আর তিন ছটাক,
কিন্তু যারা বাজিয়ে যাবে
সামনে পিছে গাধার ঢাক
পাবে তারা তকমা খেতাব
ফিরবে না কেউ শূন্য মনে॥
ধূয়া : আসুন নৃত্য করি॥
ভাই ভাগ্নের কথা ভেবে
কমবে না আর রাতের নিদ,
অনায়াসে পেরিয়ে যাব
নিশুত রাতে চালিয়ে সিঁদ
নেব গ'ড়ে সাত মহলা
ইমারতের পাষাণ ভিত
হুজুর যদি করেন দয়া
মূঢ় এবং ইতর জনে॥
ধূয়া : আসুন নৃত্য করি॥

হোবু : (বোমার মত ফাটিয়া) কী চালাকি পেয়েছো আমার সঙ্গে! আমি গাধা, আমি জোচ্চুরি করে বসেছি পশুরাজের সিংহাসনে! মোটা মানুষ ব'লে যেন আমি আর বুঝি না কিছু! গানের নাম ক'রে আমাকে অপমান! দাঁড়াও তবে—আমিও দেখাচ্ছি মজা। (বিপুল গর্জনে পার্শ্ববর্তী মন্ত্রীকে) মন্ত্রী!

গোবু : (রাজাকে লাঞ্ছিত দেখিয়া সানন্দে) আজ্ঞে মহারাজ।

হোবু : এক্ষুণি সবগুলো ছোকরাকে শূলে চড়াও।

গোবু : ছোকরাদের কী দোষ মহারাজ! যে গান বেধেঁছে, সেই কবিই তো নষ্টের গোড়া।

হোবু : ঠিক্—ঠিক্; ওরে কে আছিস, কবিকে এক্ষুণি ধ'রে নিয়ে আয় আর একটা শূল ঠিক ক'রে রাখ।

জনৈক কর্মচারী : আজ্ঞে মহারাজ, শূল একটাও নেই।

হোবু : কেন? পৌনে দু'শো শূল ছিল আমার! কি হ'ল সেগুলো? বলো শীগ্‌গির, নইলে তোমাকেও শূলে চড়াবো।

জনৈক কর্মচারী : (ইতস্তত করিতে লাগিল) আজ্ঞে মহারাজ ...আজ্ঞে।

হোবু : (ভীষণ ধমক দিয়া) বলো শীগ্‌গির, নইলে ধনে প্রাণে মারা পড়বে।

www.pathagar.com

কর্মচারী : (জড়িত কণ্ঠে) আজ্ঞে মহারাজ, সবগুলো শূল মন্ত্রী মশায় রত্না কর্মকারের কাছে বিক্রী ক'রে খেয়েছেন।

হোবু : (আর্তনাদ করিয়া) হায় হায়, সবগুলো শূল বিক্রী ক'রে খেয়েছে, কবে আমাকেও বিক্রী ক'রে খাবে। (উত্তেজিত কণ্ঠে) ধরো, ধরো তোমরা ওকে। একেও আমি শূলে চড়াবো।

(সভাসদগণ গোবুচন্দ্রকে ধরিতে যাইবে এমন সময় কবিকে বাঁধিয়া জন-কয়েক লোক সভাকক্ষে প্রবেশ করিল)

কবি : মহারাজ আমাকে স্মরণ ক'রেছেন?

হোবু : (ক্রোধে ফাটিয়া) পাজী, নচ্ছার, ছুঁচো...

কবি : মহারাজ!...

হোবু : ইতর, অভদ্র, পশু...।

কবি : মহারাজ!

হোবু : বেল্লিক, জানোয়ার, গাধা (হঠাৎ গাধার কথা মনে পড়ায় বাক্যস্রোতে হোঁচট খাইয়া) তুমি আমাকে গাধা ব'লেছ! অপদার্থ, শয়তান, আমি গাধা? (কর্মচারীর প্রতি) এক্ষুণি এই বদমায়েশটাকে শূলে চড়াও।

কর্মচারী : মহারাজ! একটা শূলও নেই।

হোবু : ওঃ হোঃ হোঃ, সবগুলো শূল চুরি ক'রেছে ঐ শয়তানটা। (চিন্তিতভাবে) তাহলে কি করা যায়? (স্বগত) দুত্তোর, মাথায়ও কিছু আসছে না ছাই! মন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া আর হবে না দেখছি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মন্ত্রী! তোমার মাথায় কিছু আসছে? শূল নেই অথচ শূলে চড়াতে হবে। কি ক'রে তা সম্ভব?

গোবু : (বিরস কণ্ঠে) আমাকেও তো শূলে চড়াবেন মশায়। আমি কেন ব'লতে যাব?

হোবু : আচ্ছা তোমাকে মাপ ক'রে দিলাম। বলো এবার।

গোবু : কাঁচা বাঁশ ছুঁচলো ক'রে কেটে...

হোবু : (আবিষ্কারের আনন্দে) হ্যাঁ হ্যাঁ মোটা একটা ভালো বাঁশ ছুঁচলো ক'রে কেটে এই বদমায়েশটাকে তার ওপর বসিয়ে দে তোরা।

গোবু : বেশী মোটা বাঁশ হ'লে হবে না মহারাজ! কবি এত সরু যে শেষ কালটায় হয়তো নিজেই সে বাঁশের শূল হ'য়ে বাঁশের মধ্যে ঢুকে যাবে। তার চাইতে মজবুত দেখে একটা সরু বাঁশ আনা যাক...

হোবু : ঠিক্ ঠিক্? ওরে, তোরা একটা সরু বাঁশ কেটে নিয়ে আয় তো মজবুত দেখে।

(বাঁশ আনিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিয়া কয়েকজনের প্রস্থান)

কবি : মহারাজ! মহানুভব ব্যক্তি আপনি। আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন...

হোবু : প্রাণভিক্ষা পাবে না কিন্তু।

কবি : প্রাণভিক্ষা আমি চাই না। জীবনের শেষ মুহূর্তে শুধু একটা কবিতা আবৃত্তি ক'রে যেতে চাই।

হোবু : কবিতা-টবিতা আমি বুঝি না বাপু।

www.pathagar.com

কবি : এটা কোন কঠিন দার্শনিক কবিতা নয়, এটা শুধু আমার দুঃখের একটা ছড়া।

হোবু : ওঃ ছড়া? তাহ'লে বলো। ছেলেবেলায় ঢের ছড়া শুনেছি পিসীমার কাছে। বেশ শুরু করো এইবার।

কবি : (হোবুর দিকে ফিরিয়া আবৃত্তি শুরু করিল)

লেখা পড়া করে যে
গাড়ী চাপা পড়ে সে,
লেখা পড়া করে না যে
গাড়ী চাপা পড়ে না সে।

হোবু : (খুশী হইয়া) আহাহা, অত্যন্ত খাঁটি কথা। কী বলো মন্ত্রী? (মন্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না)

কবি : (মরিয়া হইয়া গোবুর মুখের সামনে হাত নাড়িয়া)

কারু কম নয় সে
মন্ত্রীও হয় সে
সেলামিটা অন্তত
জুটে যায় মনমতো,
স্বাধীন এ রাজ্যে
বারোয়ারী কার্যে
বাড়ে তার চেকনাই
চিন্তার রেখ নাই।

হোবু : (কবিতার উচ্চ ভাবে এবং মন্ত্রীর বে-ইজ্জতিতে মহাহর্ষে) বাঃ বাঃ কেয়াবাত! তোফা! (মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া) কথা ব'লছ না যে মন্ত্রী! (স্বগত) ওঃ বুঝেছি, আঁতে ঘা লেগেছে তোমার। (প্রকাশ্যে) ব'লে যাও কবি।

কবি : (নিশ্চিন্ত মনে)

সুতরাং ভাই হে
কোন লাভ নাই হে
বেনা বনে ছড়িয়ে
কবিতার বড়ি এ।

হোবু : (গলিয়া গিয়া) আহা বড়ো দুঃখের কথা। তুমি কি জীবনে নিরাশ হ'য়েছ কবি? আচ্ছা, আমি তোমার প্রাণভিক্ষা দিলাম। বাকিটুকু শেষ করো।

কবি : (পূর্ববৎ)

তার চেয়ে খুলে প্রাণ
গেয়ে যাও সারি গান
মূর্খের কার্য
করো শিরোধার্য॥

হোবু : মন্ত্রী! একে দু'শো টাকা বকশিশ দাও। আমি একে সভাকবি ক'রলাম।

গোবু : দু'শো টাকা ত'বিলে নাই।

হোবু : (ত্যক্ত স্বরে) কী, আমি রাজা মানুষ, আর আমার ত'বিলে দু'শো টাকা নাই! যেখান থেকে হোক এনে দাও। বৈকুণ্ঠ মহাজনের কাছ থেকে ধার

www.pathagar.com

ক'রে এনে দাও। যাও দেরী করো না। (গোবুর প্রস্থান) আজকের মত সভাভঙ্গ হ'ল ; কবি ছাড়া সব্বাই চ'লে যাও !

(কবি এবং হোবু ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

কবি : আপনার মহানুভবতার জন্যে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মহারাজ !

হোবু : না না, তার কোন দরকার নেই।

কবি : আমি কি মহারাজের কোন কাজে লাগতে পারি ?

হোবু : লাগার জন্যেই তো তোমাকে রেখেছি। তবে আমার পিছনে লেগো না। গোবুর পেছনে লেগো। দেখলে না, তোমার কবিতার একটা খোঁচা খেয়ে সে সময় বাছার মুখ কেমন চুন হ'য়ে গ্যালো। ঐ রকম হামেশা গোবুকে খোঁচা দিয়ে তুমি কবিতা লিখবে ; কেমন ? ব্যাটা আমাকে একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে। যেমন চোর ওটা, তেমনি অকর্মা। দেখলে না দু'শো টাকা পর্যন্ত আমার ত'বিলে নেই। সব চুরি ক'রে খেয়েছে। মায় শূলগুলো পর্যন্ত বিক্রী করেছে। এত বড় হারামখোর। আর এমন কুঁড়ে যে, একটা মিস্ত্রী পর্যন্ত ডেকে আনতে চায় না।

কবি : আপনার মিস্ত্রীর দরকার আছে ? আমি মিস্ত্রীর কাজও জানি।

হোবু : তুমি মিস্ত্রীর কাজ জানো, এ আবার কেমন কথা ! তুমি তো কবি, গান বাঁধাই তো তোমার কাজ।

কবি : গান বেঁধে এ দেশে পেট চলে না। অন্য দেশে চলে। সে কথা যাক, মিস্ত্রীর কাজ ছাড়া আমি দর্জির কাজ, বাবুর্চির কাজ আর মুচির কাজও জানি। কাজ পেলে ক'রেও থাকি।

হোবু : কেন, ও সব কাজ করো কেন ?

কবি : শুধু আমি নই। এ রাজ্যের সকল কবি, পণ্ডিত আর বিদ্বানেরা ওসব কাজ করেন। যাঁরা করেন না, তাঁরা না খেয়ে পটোল তোলেন।

হোবু : বড়ো মজার ব্যাপার, এ তো আমি জানতাম না। তা তুমি যখন মিস্ত্রীর কাজ জানো তাহলে আমার আর ভাবনার কোন কারণ নেই। কাল সকালে আমার সিংহাসনখানা কেটে বাড়িয়ে দিও তো। হাতলের চাপে আমার বড়ো কষ্ট হয়।

কবি : কাল সকালেই আপনার সিংহাসন দু'হাত চওড়া ক'রে দেব।

হোবু : দু' হাতের দরকার নেই। হাত খানেক চওড়া ক'রে দিলেই চ'লবে। আচ্ছা, এখন তাহ'লে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দুই

[প্রশস্ততর সিংহাসনের হোবুচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছিলেন। একখানা কাগজ হাতে করিয়া গোবুচন্দ্র প্রবেশ করিলেন]

গোবু : মহারাজ ! এই নিন। (কাগজ বাড়াইয়া দিলেন)

হোবু : ও কিসের কাগজ ?

www.pathagar.com

গোবু : আমার পদত্যাগপত্র।

হোবু : তার মানে?

গোবু : আমি মন্ত্রীগিরি ছেড়ে দিচ্ছি। এই কাগজে সেই কথাই লেখা আছে।

হোবু : কেন? কী হ'য়েছে?

গোবু : কী আবার হবে, কিছুই হয়নি।

হোবু : আহা, খুলেই বলো না। তোমার কথা না বুঝলে, আমি কি ক'রতে পারি?

গোবু : মহারাজ! সেদিন যে লোকটাকে আপনি সভাকবি বানিয়েছেন, সে একটা আস্ত শয়তান।

হোবু : (খুশী চাপিয়া) সে কি? সে একজন বিদ্বান লোক আর তুমিও বিদ্বান। তার পেছনে লাগা তোমার অন্যায় কাজ। আমি না হয় লেখাপড়া জানি না কিন্তু তুমি তো...

গোবু : (অসহিষ্ণুভাবে হোবুকে থামাইয়া দিয়া) মহারাজ! কি ব'লছেন আপনি! বিদ্বান হ'লে কি হয়, ও ব্যাটা একটা আস্ত শয়তান। অমন বদমায়েশ ঘুঘু আমি আর জীবনে দেখিনি।

হোবু : কী হ'য়েছে খুলেই বলো না।

গোবু : সে কথা বলা যায় না। যতো রাজ্যের মিথ্যে বদনাম রটিয়ে ঐ শয়তান কবিটা আমার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

হোবু : (মনে মনে হাসিয়া) : কী বলে কবি?

গোবু : বলে না তো কিছু। আমার বদনাম ক'রে ছড়া লেখে আর গান বাঁধে। সারা দেশের মানুষ সেই ছড়া কেটে আর গান গেয়ে বেড়ায়। কোনখানে আমি মুখ দেখাতে পারি না।

হোবু : আসল কথাই তুমি ব'লছো না। ছড়া আর গানেরও মানে আছে!

গোবু : (মরিয়া হইয়া) সে সব ছড়া আর গানের মূল কথা হ'চ্ছে আমার চুরি আর ঘুষ। আমি নাকি দিনদুপুরে পুকুর চুরি করি, আর রাত-বে-রাতে ঘুষ খেয়ে বেড়াই; —এই হ'চ্ছে গানের ভাব আর ছড়ার মানে।

হোবু : (স্বগত) কথাগুলো যে মিথ্যে নয় তা তুমিই সব চাইতে ভালো জানো। (প্রকাশ্যে) তাই তো, কবিটা বড় বৃজ্জাত দেখছি।

গোবু : মহারাজ! শুধু তাই নয়। আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত ফাঁসিয়ে গান বেঁধেছে।

হোবু : (স্বগত) বেশী ফাঁসাতে গেলে যে আমিও মারা প'ড়ব। (প্রকাশ্যে) কার কার নাম জড়াচ্ছে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে?

গোবু : (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) কৈবর্তপুরের রাজা আর গোয়ালাপাড়ার সেনাপতির সাথে। মহারাজ! আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস ক'রবেন না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

হোবু : (নিজের নাম না ওঠায় হাঁফ ছাড়িয়া) তাই তো, এর একটা বিহিত করা দরকার। তা শূলটুলগুলো পর্যন্ত নেই। (উদাসীন কণ্ঠে) আমি আর কি করি, বলো।

গোবু : (ব্যগ্র কণ্ঠে) মহারাজ যদি ওকে শূলে চড়ান তাহ'লে আজ বিকেল নাগাদ আমি রত্না কামারকে দিয়ে একটা শূল তৈরী করিয়ে আনতে পারি।

www.pathagar.com

হোবু : (স্বগত) কবিকে শূলে চড়ানোর আগ্রহ যে বড় বেশী দেখছি। (প্রকাশ্যে) শূল তো তৈরী ক'রবে। কিন্তু দেখো কবিকে শূলে চাপালে শূল যেন ভেঙে না যায়। গত বছর সরকারী টাকায় দু'শো গোরুর গাড়ী তৈরী করালে, তার একটারও চাকা ঘুরলো না। শেষ কালে গাড়ীগুলো ভেঙে জ্বালানি কাঠ ক'রতে হবে।

গোবু : মহারাজ ! খাঁট ইস্পাত দিয়ে এমন শূল তৈরী করবো যাতে আর না ভাঙে।

হোবু : (হাই তুলিয়া) ত'হবিলেও টাকা নেই, তুমিই তো বললে সেদিন।

গোবু : মহারাজ ! আমি নিজেই গাঁটের টাকা খরচ ক'রে শূল বানিয়ে দেব। (করুণ স্বরে) আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না, মহারাজ। আমি আর বাইরে মুখ দেখাতে পারছিনে। শয়তান কবির উৎপাতে আমার মাথা বিগড়ে যাবার জোগাড় হ'য়েছে।

হোবু : তাই নাকি ? (গোঁফের আড়ালে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সেই চাপা হাসি মন্ত্রীর নজরে পড়িয়া গেল)

গোবু : (স্বগত) ওঃ, ব্যাটা বাস্তাবি লেবু, এটা তাহলে তোমারই কারসাজি। আমাকে জব্দ করবার জন্যে তাহ'লে তুমিই কবিকে দিয়ে তোপ দাগছো। আচ্ছা দাঁড়াও গোলআলু, আমিও দেখি তোমার ভুঁড়িতে ক' ছটাক বুদ্ধি আছে (প্রকাশ্যে) মহারাজ ! তাহ'লে ?

হোবু : তাহ'লে ডাক একবার কবিকে।

গোবু : (চীৎকার করিয়া) কবি ! এদিকে এসো তো একবার। (কবির প্রবেশ)

কবি : কেন ডাকছেন মশায় ?

গোবু : মহারাজ তোমাকে ডেকেছেন।

কবি : (হোবুর দিকে ফিরিয়া) নমস্কার, মহারাজ !

হোবু : নমস্কার। নতুন কি লিখলে কবি ?

গোবু : (স্বগত) বাঃ, দিব্যি পীরিতের কথা জ'মে উঠ্‌লো দেখছি !

কবি : একটা ছেলে-ভোলানো ছড়া শেষ ক'রে আর একটা ধাড়িদের কবিতা শুরু ক'রেছি।

হোবু : বেশ বেশ শোনাও দেখি ; প্রথমে ছড়াটাই শোনাও।

কবি : শুনুন (গোবুর দিকে তর্জনী নির্দেশ করিয়া আবৃত্তি) :

সর্বদমন ভূতের বাচ্চা আসবে যখন ঘোর সন্ধ্যা।
ব'লবে এসে : ঘুষের বাজার দেব না হ'তে আর মন্দা !
শোন খোকন ঘুষের জোগাড় রাখবে ক'রে সকাল বিকাল !
বুলবুলিতে ধান খাবে না, পাবে না আর বর্গী নাগাল।
দেশ-বিদেশের রাজকন্যে হ'ন্যে হ'য়ে ঘুরবে পিছে
উঠ্‌বে তুমি সবার পরে, রৈইবে নাকো কারু নীচে।
গোলা তোমার উঠ্‌বে ভ'রে ধ'রবে মানুষ তোমার জোকার,
সর্বদমন ভূতের বাচ্চা আস্‌বে খোকন ঘুমাও এবার॥

হোবু : (উল্লসিত কণ্ঠে) তোফা হ'য়েছে ! কী বলো মন্ত্রী। (স্বগত) কথা কইছো না যে বড়। চুরি ক'রে আমার ত'বিলটা তো ফাঁক ক'রে দিয়েছ। এবার ঘুষ খেয়ে দেশটাকে উজাড় করার মতলবে আছ। ব্যাটা পাজীর পা ঝাড়া (প্রকাশ্যে) ধাড়িদের কবিতাটা শোনাও তো কবি।

www.pathagar.com

কবি : সেটা এখনো শেষ হয়নি মহারাজ।
হোবু : যতটুকু হ'য়েছে তাই শোনাও।
কবি : (আবৃত্তি শুরু করল)

দলে আর উপদলে গোলমাল পাকিয়ে,
প্রয়োজনমত কোমরটা বাঁকিয়ে
(অর্থাৎ নৃত্যের ভঙ্গীতে
প্রচারের সহযোগী সঙ্গীতে)
নিজে না নেচেও যাব অন্যকে নাচিয়ে ;
দাঁও ঠিক মেরে যাব মুণ্ডটা বাঁচিয়ে॥
পারি না, ছাড়ি না তবু এই শেষ আশাকে !
সনাতনী কৌশলে জ্বালাবই বাসাকে ;
মেরে যাব পাত্রটা পায়সের
বুদ্ধিটা ধার ক'রে বায়সের

চোখ বুঁজে অনায়াসে বাঁচাবো এ নাসাকে
কদলী দেখিয়ে যাব যাবতীয় চাষাকে॥

গোবু : (স্বগত) কবিটা যে বুদ্ধিমান তা'তে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক হ'য়েছে। একে দিয়েই কাজ বানাতে হবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো।
হোবু : (বোকার মত) ধাড়িদের কবিতাটা মোটেই বুঝতে পারলাম না। তুমি বুঝতে পারলে কিছু মন্ত্রী?
গোবু : হ্যাঁ, খুব খাসা হ'য়েছে।
হোবু : (ঘাবড়াইয়া গিয়া) খাসা হ'য়েছে মানে?
গোবু : (স্বগত) মানে বোঝাবো তোমাকে হাড়ে আর মাংসে। ব্যাটা হোবু গোবুকে তুমি চেনোনি। জোচ্চুরি ক'রে সিংহাসন দখলে এনে আজ তুমি সাধু হ'য়েছ। দু'পয়সা ঘুষ খেয়েছি ব'লে ঘুষের ছড়া তৈরী ক'রে আমাকে শোনানো হ'চ্ছে। বেশ মজা আমিও দেখাবো। মরি তো দু' শালাই এক সাথে ম'রব।
হোবু : (শঙ্কিত কণ্ঠে) আবার তুমি বিড়বিড় ক'রছো কেন মন্ত্রী?
গোবু : কবিতাটা ভালো হ'য়েছে তাই আওড়াচ্ছিলাম মনে মনে।
হোবু : (নিশ্চিন্ত হইয়া) ওঃ, তাই বলো।
গোবু : মহারাজ ! একটা কথা মনে প'ড়লো।
হোবু : কী কথা?
গোবু : কবির সামনে...
হোবু : তা'তে কি, ও তো আমার পোষা লোক।
কবি : (মুখ চোখ লাল করিয়া—মনে মনে) পোষা লোক তোমার ! অশিক্ষিত জানোয়ার কোথাকার !
গোবু : (স্বগত) 'পোষা লোক' খেতাব পেয়েই কবির চেহারা আগুনের মত হয়ে উঠেছে। হোবুর স্বভাব কি আমি আগেই জানতাম। ব্যাটা এক পুরুষ বড়লোক হ'য়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। দেখা যাক সুয়োরাণীর কলকাঠি টিপে এবার কতটা এগোয়। (প্রকাশ্যে) না, এমন কিছু গোপন কথা নয়। কবির প্রশংসাই ক'রতে চেয়েছিলাম, তবে কিনা তার সামনে...

www.pathagar.com

হোবু : (দ্বারাজ কণ্ঠে) আরে, তারিফ তো সামনেই ক'রতে হয়। আর তা ছাড়া ও এখন মানুষ হ'চ্ছে আমার টাকায়, ওর তারিফ করার মানেই হ'ল আমাকে তারিফ করা। কি বলো কবি?

(কবি উত্তর দিল না, রাগে গরগর করিতে লাগিল)

গোবু : ধ'রেছে, ওষুধ ঠিক ধ'রেছে। যতো চালাকই হও না কেন, কবি তো। বাবা, তোমার ভাব-প্রবণতা যাবে কোথায়। আত্মসম্মানে ঘা লাগতে না-লাগতেই চেতে উঠেছো। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমি বলছিলাম যে, আপনার সুয়োরাণীকে একটু লেখাপড়া শেখালে হয়তো তাঁর মেজাজটা একটু মোলায়েম হত। কবি তো বিদ্বান মানুষ, ওকেই না হয় সেই ভার দেওয়া যাক্। কী বলেন আপনি?

হোবু : (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) —সুয়োরাণীর কথা ব'লে আমার মনে আর কষ্ট দিয়ো না, মন্ত্রী। অমন বেয়াড়া মেয়েমানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

গোবু : কেন আবার নতুন কিছু ক'রলেন নাকি তিনি?

হোবু : বললে ত আর কষ্ট কমবে না, তবু ওঠালে যখন কথাটা, তখন শোন। রূপের অহংকারে সুয়োরাণীর আর মাটিতে পা পড়ে না। আমাকে বলে মেড়ুয়া, হুতুম প্যাঁচা, তেলের পিপে। আরো কত কী।

গোবু : (কৃত্রিম সহানুভূতি দেখাইয়া) আঃ,হা হা এত বড় অপমান!

হোবু : তোমাকে আর কী লুকোব গোবু, ব'লতে ঘেন্নাও হয়...

গোবু : তবু বলুন। পেটের কথা পেটে থাকলেই অশান্তি আর বেরুলেই শান্তি।

হোবু : তবে শোন। সেদিন সুয়োরাণী বল্‌লে তোমার ঐ জালার মত ভুঁড়ি থাকতে কে তোমার কাছে যেতে পারে।

গোবু : কী, এত বড় কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ, আমি কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে একটা নালিশ করব। এই যে সুয়োরাণী অমন বেয়াড়া হ'য়ে উঠেছেন, সে শুধু আপনার গাফলতির জন্যে।

হোবু : (বিস্মিত কণ্ঠে) আমার গাফলতির জন্যে?

গোবু : হ্যাঁ, আপনার গাফলতির জন্যে। আপনি তাঁকে হরদম গহনাপত্র দিচ্ছেন, কিন্তু সৎ শিক্ষা দিচ্ছেন না বলেই তিনি বেয়াড়া হ'য়ে গেছেন, আপনাকে আর কিছুতেই পরম গুরু বলে স্বীকার করছেন না।

হোবু : বলো কি! এর বিহিত আছে নাকি কিছু?

গোবু : আছে বৈ কি। একজন বিদ্বান লোকের কাছে পড়লেই সুয়োরাণী শুধ্‌রে যাবেন, কবি তো একজন বিদ্বান লোক, ওকে যদি রাজি করাতে পারেন তাহলে...

হোবু : কবি আর রাজি হবে না কেন? ও তো আমার পোষা লোক। কবি, আজ দুপুর থেকেই তুমি রাণীকে পড়াবে?

কবি : (দৃঢ় স্বরে) আমি পারবো না।

হোবু : (ধমক দিয়া) আলবাৎ পারবে, একশোবার পারবে।

www.pathagar.com

কবি : (পূর্ববৎ) আমি পারবো না।

হোবু : (চিৎকার করিয়া) আমি তোমাকে শূলে চড়াবো।

কবি : আমি তাতে রাজি আছি।

গোবু : (স্বগত) তাই তো এ ব্যাটা আবার বেকুবি শুরু করলে। (প্রকাশ্যে) কবি, তুমি একটু ভেবে দেখো। সুয়োরাণীকে পড়াবে, তাতে আর ক্ষতি কী হয়েছে?

কবি : (স্বগত) কী হ'য়েছে? আমি আজ রাজার পোষা লোক হ'য়েছি, আগামীকাল হবো রাণীর পোষা কুকুর। (প্রকাশ্যে) না, আমি পারবো না।

হোবু : (গর্জন করিয়া) কী, আমার সামনে বেয়াদবি! তোমাকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

কবি : বেশ, তা'তেও আমি ভয় পাইনে।

গোবু : (মিনতি করিয়া) মহারাজ, কবিকে আমি রাজি করাবো, আপনি ধমকাবেন না।

হোবু : ওকে রাজি করাতে না পারলে তোমাদের দু'জনকেই আমি শূলে চড়াবো।

(রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন)

গোবু : কবি, তুমি কী পাগল হ'লে নাকি? রাণীকে পড়াবে তা'তে ক্ষতি কি?

কবি : না না আমি রাণীকে কিছুতেই পড়াতে পারবো না।

গোবু : (স্নিগ্ধ কণ্ঠে) কেন পারবে না? হঠাৎ চ'টে উঠলে কেন?

কবি : চ'টবো না? আমাকে মহারাজ বলেন কিনা পোষা লোক! ক'দিন পরে বলবেন পোষা জানোয়ার।

গোবু : ভায়া, রাজ-রাজড়ার মেজাজই ওইরকম।

কবি : তাহ'লে রাজ-রাজড়া বললে সত্যিকারের ইতর ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না।

গোবু : কবি, তোমাকে আমি বুদ্ধিমান বলেই জানতাম।

কবি : নির্বুদ্ধিতা আবার দেখলেন কখন?

গোবু : নির্বুদ্ধিতা নয়, আবেগ-প্রবণতা!

কবি : (বিস্মিত কণ্ঠে) আবেগ-প্রবণতা? মাফ করবেন, আমার ধারণা ছিল মন্ত্রীরা গোমূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু এখন দেখছি যে আপনি শিক্ষিত মানুষ।

গোবু : ওটা ব্যতিক্রম। আমাদের কাজে লেখাপড়ার দরকার হয় না। দুষ্টুবুদ্ধি থাকলেই হ'ল। (একটু থামিয়া) দেখ তোমার কাছে আমি মন্ত্রীগিরির আসল রহস্য ফাঁস করে দিলাম। ফাঁসিও না যেন।

কবি : আমার সাথে না লাগলে আমি কারুর সাথে লাগি না।

গোবু : খুব ভালো কথা। কিন্তু তোমার একমাত্র দোষ আবেগ-প্রবণতা; যার ফলে আজ তুমি প্রাণে ম'রতে চ'লেছ।

কবি : কিন্তু আত্মসম্মানের চাইতে কি প্রাণ বড়ো?

www.pathagar.com

গোবু : আলবৎ। সম্মান একবার গেলে দশবার ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু প্রাণ গেলে কোন্ শা'—

কবি : তা ঠিক ম'রে গেলে কেউ ফিরে আসে না তবে কিনা...

গোবু : এখনো তবে কিনা!

কবি : আপনি কি করতে বলেন?

গোবু : আপাতত রাণীকে পড়িয়ে প্রাণটা বাঁচাও।

কবি : কিন্তু এই অসম্মান...

গোবু : এই অসম্মানের প্রতিশোধ পুরোপুরি তুমি নিতে পারবে।

কবি : (উৎফুল্ল কণ্ঠে) কেমন করে?

গোবু : আগে প্রাণে বাঁচো, তারপরে দেখবে প্রতিশোধ নেওয়ার পথ কেমন করে খুলে যায়।

কবি : বুঝতে পারলাম না।

গোবু : না বোঝার কি আছে এতে? সারাদিন তো আর ছাত্রী পড়াবে না। অবসর সময়ে প্রজাদের মধ্যে ঘুরে তাদের ক্ষেপিয়ে রাজার শেকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারবে। (ইতস্তত করিয়া) ভালো কথা, মেয়েমানুষ-টেয়েমানুষের দিকে কোনরকম বদ-খেয়াল নেই তো?

কবি : না।

গোবু : (খুশী হইয়া) বেশ বেশ। তাহলে আর একটা খাসা কাজ হতে পারে। যদি বুঝিয়ে নিতে পারো, তবে দেখবে যে তোমার ছাত্রটিও রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

কবি : চেষ্টা করে দেখবো। কিন্তু তা' কি সম্ভব হবে, রাণী কি হোবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?

গোবু : দাঁড়াবে। হোবুকে ও দুই চোখে দেখতে পারে না। নিজেই তো শুনলে।

কবি : হ্যাঁ, শুনেছি। তবে বর্তমানে এই পন্থাতেই কাজ চলুক। এখন তা হ'লে আসি। নমস্কার।

গোবু : নমস্কার!

(কবির প্রস্থান)

গোবু : (স্বগত) যে রকম ঘুষ খেতে শুরু ক'রেছি, তাতে রাজা কেন রাজ্যও রসাতলে যেতে পারে। দেখা যাক্ কবিটাকে দিয়ে কাজ কতদূর এগোয়। (চিন্তা করিয়া) রাণীটা হাতে এসে পড়লেই আমার শান্তি। কবিকে তো লাগালাম কাজে, শেষটায় আমার পথের কাঁটা হয়ে না দাঁড়ায়। দেখি কি আছে আমার ভাগ্যে।

(প্রস্থান)

তিন

[সুয়োরাণীর বাড়ীর সামনে গোবুচন্দ্র হাঁ করিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। হনহন করিয়া কবি তাঁহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। সময় দ্বিপ্রহর।]

গোবু : (চমকাইয়া) কে—কে যায়? কবি নাকি?

www.pathagar.com

কবি : আজ্ঞে হ্যা (সামনের দিকে পা বাড়াইলেন)

গোবু : আরে দাঁড়াও—দাঁড়াও। বলি, চিনতেই পারছো না দেখছি।

কবি : (দাঁড়াইয়া) বলুন।

গোবু : আহা, কাছে এসো।

কবি : (অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাছে যাইয়া) বলুন।

গোবু : বলি, চ'লছে কেমন। চেহারাখানা তো দিব্যি নিমকিন হয়ে দাঁড়িয়েছে ক'দিনের ভেতর।

কবি : (স্বগত) স্বভাব যায় না ম'লে। (প্রকাশ্যে) দরকারী কথা থাকে তো বলুন।

গোবু : কাজের মানুষ হ'য়ে প'ড়েছে দেখছি। যাচ্ছো কোথায়?

কবি : রাণীকে পড়াতে।

গোবু : ছাত্রীটি কেমন?

কবি : বেশ বুদ্ধিমতী।

গোবু : আহা, সে কথা আমি জানি। বলি দেখতে-শুনতে কেমন? গড়ন-পেটন..

কবি : আপনি কি ইয়ার্কি ক'রছেন? এ সব কথা আর কোন দিন আমার কাছে ব'লবেন না।

(ক্রুদ্ধ অবস্থায় কবির অন্তঃপুরে প্রবেশ ও সুয়োরাণী শতভিষার সাক্ষাৎ লাভ)

শতভিষা : (কপট কলহের সুরে) আজ আপনার সাথে কোন কথা ব'লব না।

কবি : এই তো ব'ললে।

শতভিষা : না, আর ব'লব না।

কবি : (হাসিয়া) কেন?

শতভিষা : আপনি এত দেরী ক'রে এলেন কেন? আমার ব্যাকরণের পড়া কিছুতেই মুখস্থ হ'চ্ছে না।

কবি : তোমার ব্যাকরণ কি আমি মুখস্থ ক'রে দেব? প'ড়েছ তুমি, মুখস্থ তো করতে হবে তোমাকেই।

শতভিষা : (নিরুপায় কণ্ঠে) বুঝতে পারছিনে যে কিছুই। দ্বন্দ্ব বহুব্রীহি কি ছাই সব নামও মনে থাকে না। আপনার জন্যেই তো পড়া হ'ল না।

কবি : তা' না হয় নাই হ'ল কিন্তু আজ আবার হঠাৎ আপনি কেন?

শতভিষা : ব'লেছি তো কথা ব'লব না।

কবি : কেন কথা ব'লবে না? দোষ হ'য়েছে নাকি কিছু?

শতভিষা : দোষ হয়নি। এত দেরী ক'রে এলেন কেন?

কবি : গ্রাম থেকে ক'জন লোক এসেছিল, তাদের সাথে কথা শেষ করতে দেরী হয়ে গেল। পথে আবার দেখা হ'ল মন্ত্রীমশায়ের সাথে তোমার ঘরের সামনেই।

শতভিষা : (ক্রুদ্ধ সুরে) মন্ত্রী! কে,—ওই গোবুটা?

কবি : হ্যাঁ, তাতে হ'য়েছে কি?

www.pathagar.com

শতভিষা : (ভীষণ রাগিয়া) উল্লুকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে আমার ঘরের সামনে?

কবি : কেন, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বুঝি?

শতভিষা : সকালবেলায় দেখি শয়তানটা আমার জানালামুখো হয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখেই আমার মেজাজ খারাব হয়ে গেল। ঠাস করে ওর মুখের ওপর জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে এলাম।

কবি : (হাসিয়া) এখনো ঠিক সেই ভাবেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শতভিষা : (শিহরিয়া) মাগো, কী লজ্জার কথা! এমন বেহায়া মানুষও নাকি আবার হয় দুনিয়ায়।

কবি : (নিরীহ ভাবে) তোমাকে ভালোবাসে ব'লেই তো....

শতভিষা : (তর্জন করিয়া) খবর্দার, ও কথা বোলো না।

কবি : (নিরীহভাবে) তোমাকে ভালোবাসা কি অপরাধ?

শতবিষা : নিশ্চয়।

কবি : কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

শতভিষা : (হাসিয়া) বড়ো দুষ্টু তুমি। (একটু চিন্তা করিয়া) না তুমি ভালবাসতে জানো না। তুমি জানো শুধু বিদ্রূপ করতে।

কবি : কাকে বিদ্রূপ করলাম?

শতভিষা : কেন তুমি লেখনি।

প্রেমের কথা বোলো না আর প্রেম তো শুধু চর্ম রোগ,
দেহের সাথে যোগ আছে এর মনের সাথে নাইকো যোগ,
প্রেমের খোঁজে ঘুরেছি ঢের পাইনি আমি প্রেম যা খাঁটি
আজকালের এ প্রেমের নামে ভূতেরা খায় দাঁত কপাটি।
(অভিমান করিয়া) ভালোবাসাকে বিদ্রূপ করতেও তোমার বাধে না।

কবি : (হাসিয়া) কিন্তু আমি কি মিথ্যে কথা লিখেছি?

শতভিষা : (দৃঢ় স্বরে) একশোবার মিথ্যে, হাজারবার মিথ্যে।

কবি : (হাসিয়া) হয়েছে, হয়েছে। আচ্ছা, তুমিই বলো মহারাজ হোবুচন্দ্রকে তুমি ভালোবাসো কিনা।

শতভিষা : (স্পষ্ট স্বরে) না ভালবাসি না, ও আমাকে জোর ক'রে বিয়ে করেছে। ওকে আমি ঘৃণা করি, ওকে...

কবি : (পরিস্থিতি লঘু করার কণ্ঠে) তার ওপর যা ভুঁড়ি।

শতভিষা : (হাসিয়া) তার ওপর আবার কানে তুলো দিয়ে রাখে, যেন বুদ্ধি বেরিয়ে যেতে না পারে।

কবি : (হাসিয়া) তাহ'লে বোঝা গেল

ভুঁড়ি নাই যার, কানে তুলো দেয় না যে
মোর শতভিষা শুধু তার প্রেম যাচে॥

শতভিষা : (রাগ করিয়া) আমাকে রাগিয়ে মজা দেখছো তুমি?

www.pathagar.com

কবি : তুমি রাগো কেন, অনুরাগ করলেই পারো।

শতভিষা : (ভীষণ রাগিয়া) না না, কিছুতেই আমি আর থাকব না এখানে, তোমার সাথে আর একদিনও কথা বলব না জীবনে।

(ছুটিয়া পালাইয়া গেল)

কবি : (হাসিয়া) একদম পাগল। আর বেচারীর দোষই বা কী। প্রেমে পড়লে সকলেরই বুদ্ধি খারাব হ'য়ে যায়। আসলে প্রেম জিনিষটাই ঘোলাটে কুয়াশা। ঐ ঘোলা কুয়াশায় ডুবলে নিজেকে পর্যন্ত আর চেনা যায় না। এমনি মেয়েদের বুদ্ধি একটু কম, তার ওপর...যাক্‌গে এখন ওসব চিন্তা। (স্বগত) ওঠা যাক, এবার মোড়লগুলোকে প্রায় বাগিয়ে এনেছি। আর একটু এগুতে পারলেই কাজ শেষ হয়। মানুষের রক্ত চুষে খাওয়ার মজাটা হোবু গোবু দুইজনেই টের পাবেন তখন।

শেষের দিক

এক

[কয়েকজন মাতব্বর প্রজা ও মোড়ল গাবগাছের নীচে বসিয়া জটলা করিতেছিল। সময় অপরাহ্ন।]

বৃদ্ধ মোড়ল : কবি যা ব'লে গেল তা সকলেই বোধ হয় বুঝেছ। হোবুকে তাড়িয়ে যদি আমরা রাজ্য দখল ক'রতে পারি তাহ'লে আমরা হব রাজা। হোবুও থাকবে না, গোবুও থাকবে না আর তাদের হাজার রকম জুলুমও থাকবে না। কিন্তু হোবুকে তাড়াতে হ'লে আমাদের এক সাথে উঠে দাঁড়াতে হবে।

১ম মাতব্বর : তাড়াতে চাইলেই কি ওরা যাবে?

২য় মাতব্বর : আলবৎ যাবে।

১ম মাতব্বর : যদি না যেতে চায়?

৪র্থ মাতব্বর : না ব'ললেই হ'ল।

২য় মাতব্বর : রাজ্যের সকল প্রজা যদি ঠিক করে যে হোবুকে সিংহাসন থেকে নাবিয়ে দেবে, তাহ'লে কার বাবার সাধ্যি যে হোবুকে সিংহাসনে রাখে।

১ম মাতব্বর : না হে অত সহজ নয়, হোবুচন্দ্রের শ্বশুর বড়ো তাঁদোড় মানুষ। তার কাছে আমরা ঘোল খেয়ে যাবো।

২য় মাতব্বর : হ্যাঁ, লোকটা দারুণ ঘোড়েল। আগেকার রাজাকে ধর্মের নাম শুনিয়ে কাশী পাঠিয়ে ওই তো হোবুকে সিংহাসনখানা দখল করে দিয়েছিল? নইলে হোবুর ঘটে এমন বুদ্ধি নেই, যাতে ক'রে সে রাজা হ'তে পারে।

৩য় মাতব্বর : কিন্তু সে তো আজ ছ' মাস হবে গেঁটেবাতে বিছানায় পড়ে আছে।

১ম মাতব্বর : তুমি জান্‌লে কোত্থেকে?

www.pathagar.com

২য় মাতব্বর : হোবুচন্দ্রের চাকর নিতাইয়ের কাছ থেকে। সেদিন দেখি যে নিতাই য়্যা বড় এক কাঁদি বিচেকলা নিয়ে যাচ্ছে। জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাচ্ছ নিতে? নিতাই বললে যে মহারাজের শ্বশুর বিছানায় পড়ে আছেন গেঁটেবাতে, কবরেজ কলা খেতে বলেছে তাই নিয়ে যাচ্ছি।

৪র্থ মাতব্বর : তাহ'লে তো খুব ভালো হয়েছে। ব্যাটা এবার আর চালাকি করতে পারবে না।

১ম মাতব্বর : কেন পারবে না? গেঁটেবাত হয় মানুষের গাঁটে গাঁটে। মগজে তো আর হয় না। বরং শরীর অকেজো হ'লে মগজ আবার বেশী চলে।

৪র্থ মাতব্বর : তবে তো সর্বনাশ!

৩য় মাতব্বর : (হতাশ হইয়া) আমাদের কী হবে তাহ'লে?

বৃদ্ধ মোড়ল : (বিরক্ত হইয়া) কচু হবে এই রকম বেহুদা ব'সে বসে জটলা পাকালে।

২য় মাতব্বর : উপায় কিছু বলুন, নইলে অকারণে রাগ ক'রে লাভ কি?

বৃদ্ধ মোড়ল : ব'লেছি তো, আমাদের সকলকে এক সাথে মিলে সিংহাসন দখল ক'রতে হবে। আমরা এই রাজ্যের সকল বাসিন্দা...

৩য় মাতব্বর : গ্রামও তো কম হবে না, অন্তত এগারখানা গ্রাম আছে এই রাজ্যের ভেতরে।

বৃদ্ধ মোড়ল : হ্যাঁ, এই এগারখানা গ্রামের সকল বাসিন্দা একজোট হয়ে হোবুচন্দ্রের কাছে যেয়ে তাকে সিংহাসন ছেড়ে যেতে বলব। যদি সহজে যায় তবে ভালো, নইলে অন্য পথ দেখতে হবে আমাদের।

১ম মাতব্বর : এগারোখানা গ্রামের মানুষকে রাজি করিয়ে একটা দল বাঁধা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। তারাই বা রাজি হবে কেন?

বৃদ্ধ মোড়ল : রাজি হবে তাদের দরকারে, নইলে হোবু-গোবুর দাপটে দেশ সুদ্ধু সকলে পটোল তুলবে।

২য় মাতব্বর : তাছাড়া হোবুকে সরাতে পারলে সকলেই রাজা। কী মজা!

৩য় মাতব্বর : সকলেই রাজা হ'লে প্রজা হবে কারা?

বৃদ্ধ মোড়ল : তোমার মত বেকুব যারা।

৩য় মাতব্বর : এই অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

২য় মাতব্বর : না করলে তো ব'য়ে গেল।

৩য় মাতব্বর : আমি এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি।

২য় মাতব্বর : দেরী ক'রছ কেন?

বৃদ্ধ মোড়ল : আহা গোল কোরো না, চুপ করে বোসো। কাজের কথা শোন, এখন গ্রামে গ্রামে যেয়ে সব্বাইকে জানানো দরকার... (মাতব্বরদের মধ্যে গণ্ডগোল 'আমি পারব না' 'আমার সময় নেই' ইত্যাদি শব্দ) তোমাদের দিয়ে যে কোন কাজ হবে না—সে আমি আগেই জানতাম।.....

৩য় মাতব্বর : তা পারব। (চিৎকার করিয়া) ওরে ফটকে, হাবলা, গণেশ, মানকে শুনে যা তোরা

(কয়েকজন যুবকের দ্রুত গতিতে প্রবেশ)

www.pathagar.com

ফটকে : কী ব'লছো মামা?
হাবলা : খুড়ো ডাকছিলেন কেন?
গণেশ : যা বলবার আছে ব'লে ফ্যালো।
মানকে : শীগ্‌গির বলো।
বৃদ্ধ মোড়ল : (খুশী হইয়া) তোরা এই রাজ্যের এগারখানা গ্রামে যেয়ে সব মানুষকে জুটিয়ে আনতে পারবি?
ফটকে : পারব। কোন দরকার আছে নাকি? যাত্রা হবে?
বৃদ্ধ মোড়ল : না যাত্রা হবে না। হোবুচন্দ্রকে আমরা সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দেব। সেই ব্যাপারটা নিয়েই সলা-পরামর্শ ক'রতে হবে।
হাবলা : বাঃ, সেও তো এক মজার ব্যাপার। এক্ষুণি যাচ্ছি।
মানকে : আমিও যাব। কিন্তু একটা কথা। হোবু হারামজাদা ম'রলে কোন দুখ্‌খু নেই। দুয়োরাণীর বাবাও বড়লোক কিন্তু সুয়োরাণী বাঁচবে কি খেয়ে?
গণেশ : সুয়োরাণীকে দেখছিস্ নাকি মান্‌কে?
মানকে : দেখেছি, ভারি সুন্দর দেখতে, পেরতিমের মত। হোবু হারামজাদা বিষ খাইয়ে সুয়োরাণীর বাবাকে মেরে ফেলে জোর ক'রে ওকে বে ক'রেছিল। রাজ্য গেল সুয়োরাণী একেবারে না খেয়ে মরবে। আহা অমন চেহারা... একেবারে পরী!
ফটকে : তাহ'লে আর কাজ নেই যেয়ে।
২য় মাতব্বর : আরে, মাটি ক'রল দেখছি। সুয়োরাণী না খেয়ে মরলে তোদের কী?
৩য় মাতব্বর : অত রসে আর কাজ নেই। যাবি কিনা তাই বল্।
চারজন যুবক : (এক সাথে) না, যাবো না।
বৃদ্ধ মোড়ল : আচ্ছা বাবারা, আমার একটা কথা শোন্, তারপর যা হয় করিস্।
ফটকে : বলো।
বৃদ্ধ মোড়ল : তোরা যা ব'লেছিস তা খুবই ন্যায্য কথা, কিন্তু এটাও ভেবে দেখ, হোবু রাজা থাকলে যে দেশ শ্মশান হ'য়ে যাবে।
হাবলা : তাহ'লে সুয়োরাণীকে গদীতে বসিয়ে রাজ্য চালাও।
অন্য তিনজন যুবক : ঠিক ঠিক হাবলা খুব ভালো কথা ব'লেছে।
১ম মাতব্বর : (ক্ষেপিয়া) কী মেয়েমানুষের নীচে থাকবো! তার চাইতে মরণ ভালো!
অন্য তিনজন মাতব্বর : (একসাথে) আমরাও কোন মেয়েমানুষের নীচে থাকতে পারবো না।
(রাগ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল)
বৃদ্ধ মোড়ল : দেখলি তো বাবারা, কেউ মেয়ে মানষের নীচে থাকতে চায় না।
ফটকে : আমি থাকবো।
গণেশ : আমিও।
হাবলা : আমিও।
মানকে : আমি তো থাকবোই।
বৃদ্ধ মোড়ল : বেশ বেশ তোরা থাকিস্, কিন্তু সুয়োরাণীকে সিংহাসনে বসতে হ'লে হোবুকে তো সরাতে হবে।
চারজন যুবক : (একত্রে) তা' তো হবেই।

www.pathagar.com

বৃদ্ধ মড়ল : তবে তোরা গ্রামে গ্রামে যেয়ে খবর কর।

ফটকে : তা আগে বলোনি কেন? ওরে চল্ চল্ (দুড়দুড় করিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল)

বৃদ্ধ মোড়ল : (স্বগত) বয়সের দোষ! তা অমন হ'য়েই থাকে। রাজা গেলে রাণীকে সরাতে দেরী হবে না। আমিও উঠি এবার।

(প্রস্থান)

দুই

[হোবুচন্দ্রের অন্তঃপুর। মর্তমান কলা খাইতে খাইতে হোবুচন্দ্র মস্ত বড় কাঁদিটা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। সামনে দুই রাণী বসিয়া তাঁহার খাওয়ার তদারক করিতেছেন। সুয়োরাণীর চোখে অদম্য কৌতুক, দুয়োরাণীর চোখে শঙ্কা মিশ্রিত দৃষ্টি।]

দুয়োরাণী : মহারাজ, আর কলা খাবেন না।

হোবু : কেন খাবো না, মোটে বায়াত্তরটা খেয়েছি।

সুয়োরাণী (শতভিষা) : আপনি কতগুলো কলা একসাথে খেতে পারেন?

হোবু : (সহজভাবে) দু' কাঁদি কলা তো খুব সহজেই খেতে পারি। চেষ্টা ক'রলে আড়াই কাঁদিও খেতে পারি।

(হাসি চাপিবার জন্য শতভিষা মুখে শাড়ীর আঁচল চাপা দিলেন)

দুয়োরাণী : (মিনতি করিয়া) মহারাজ! আর কলা খাবেন না।

হোবু : (বিরক্ত হইয়া) কী প্যাঁকপ্যাঁক ক'রছো, খাবার জিনিস খাবো না কেন?

দুয়োরাণী : শরীর খারাব হ'তে পারে।

হোবু : শরীর খারাব হবে কেন? আদতে তুমি আমার খাওয়াটাই দু'চোখে দেখতে পারো না। তোমার নজর লেগেই আমার শরীর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। (দুয়োরাণী মুখ নত করিলেন, বাহিরে কার ডাক শোনা গেল।)

অজ্ঞাত কণ্ঠ : মহারাজ বাড়ী আছেন?

২য় কণ্ঠ : আরে, রাখো তোমার মহারাজ। বলি, হোবুচন্দ্র বাড়ী আছো?

হোবু : (ঘরের মধ্যে চোখ পাকাইয়া) কী এত বড় স্পর্ধা আমাকে নাম ধরে ডাকা হচ্ছে। এক্ষুনি হারামজাদাকে শূলে চড়াবো।

(রাগে গরগর করিতে করিতে উঠিয়া রাস্তার দিকের জানালা খুলিয়াই সভয়ে সাত হাত পিছাইয়া আসিলেন)

দুয়োরাণী : (আতঙ্কিত কণ্ঠে) কী হ'ল মহারাজ।

হোবু : (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) জানালাটা বন্ধ করে দাও তো।

শতভিষা : (বিস্মিত) কেন?

হোবু : (পূর্ববৎ হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বাইরে গাদা গাদা মানুষ এসে জমেছে, সকলের হাতে লাঠিসোটা, কারুর কারুর কাছে দা-কুড়ুল আছে। (মিনতি করিয়া) বন্ধ করে দাও না জানালাটা।

www.pathagar.com

শতভিষা : (আবদারের সুরে) আমার বুঝি ভয় করে না আর?

নেপথ্যে বহু কণ্ঠের আওয়াজ : হোবুচন্দ্র বেরিয়ে এসো, দেরী করছ কেন?

হোবুচন্দ্র : (সভয়ে) আমি কলা খাচ্ছি।

নেপথ্যে আওয়াজ : কলা খাওয়া বের করে দেব। এস, বেরিয়ে এস।

হোবু : (মিনতি করিয়া) যাও না দুয়োরাণী, ওদের তুমি ঠাণ্ডা করে এস। ওরা তোমাকে খুব মানে। যাও তুমি। পায়ে ধরছি তোমার।

(দুয়োরাণীর পায়ের দিকে হাত বাড়াইলেন)

দুয়োরাণী : (ব্যতিব্যস্ত হইয়া) কী করো, পাগল হ'লে নাকি? আমি যাচ্ছি।

(উঠিয়া জানালার ধারে গেলেন)

জনতা : (মিশ্রিত সুরে) আপনি কেন রাণীমা? রাজা মশায়কে পাঠিয়ে দিন।

দুয়োরাণী : আমার কাছেই বলো, কী চাও তোমরা? ('তুই বল' 'তুই বল' বলিয়া জনতার মধ্যে চাপা গুঞ্জনধ্বনি) চুপ করে রইলে কেন? তোমাদের মোড়ল কে?

বৃদ্ধ মোড়ল : (আগাইয়া গিয়া) আজ্ঞে আমি।

দুয়োরাণী : তবে তুমিই সকলের হ'য়ে বলো, কী চাই তোমাদের।

বৃদ্ধ মোড়ল : রাণীমা, আমরা অনেক চিন্তা করে দেখেছি যে, মহারাজ হোবুচন্দ্রের শাসনে আমরা ধনেপ্রাণে মরতে বসেছি...

দুয়োরাণী : থামলে কেন, ব'লে যাও।

বৃদ্ধ মোড়ল : আমরা মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে শাসনভার নিজেদের হাতে নিতে চাই।

(এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া হোবুচন্দ্র দুয়োরাণীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

জনতা : (উত্তেজিত স্বরে) ঐ যে ঐ যে হোবুচন্দ্র রাণীমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

(হোবুচন্দ্র কাটিয়া পড়ার চেষ্টা করিতেই)

অধিকতর নিকটবর্তী ব্যক্তির কণ্ঠস্বর : ফের পালানোর চেষ্টা ক'রছে।

জনতা : ধ'রে ফেল, ধ'রে ফেল..., পালাতে দিস্‌নে ব্যাটাকে...

(একজন লোক লাফ দিয়া খপ করিয়া হোবুর হাত ধরিয়া ফেলিল)

মোবু : (কাঁদিয়া উঠিয়া) আমি তোমাদের সক্কলের পায়ে ধ'রছি। আমাকে মারধোর করো না। তোমরা যা ব'লবে আমি তাই ক'রব।

ভিড়ের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি : নাকে খত দাও।

হোবু : (অসহায়ভাবে) হাত না ছাড়লে নাকে খত দেব কি করে?

আর এক ব্যক্তি : খবরদার হাত ছাড়িস্‌নে, হাত ছাড়লেই পালিয়ে যাবে।

অপর ব্যক্তি : জানালা গলিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে আয় ব্যাটাকে।

হস্তধারী ব্যক্তি : (রাগ করিয়া) দেখছো না, এত বড় লাশ কী জানালা দিয়ে বেরোয় যে টেনে বার ক'রবো।

www.pathagar.com

দুয়োরাণী : (কঠিন ভর্ৎসনার সুরে) কী শুরু ক'রেছ তোমরা। মহারাজের হাত ছেড়ে দাও। (হাত ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পলায়নোদ্যত হইলেন)

জনতা : (উত্তেজিতভাবে) ঐ যে ফের পালাচ্ছে।

দুয়োরাণী : (হোবুকে লক্ষ্য করিয়া কঠিন সুরে) দাঁড়ও এখানে! আমার পাশে দাঁড়াও। (হোবুচন্দ্র জড়োসড়ো হইয়া রাণীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।)

বৃদ্ধ মোড়ল : রাণীমা!

দুয়োরাণী : হ্যাঁ, এইবার তোমাদের কথার উত্তর দেব। কিন্তু তোমরা ভীষণ বেয়াদব হ'য়ে প'ড়েছ, তোমাদের এই রকম বেয়াদবির কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

বৃদ্ধ মোড়ল : মহারাজের অত্যাচার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে বলেই—

দুয়োরাণী : আচ্ছা, আমি তার ব্যবস্থা করছি।

বৃদ্ধ মোড়ল : আর ব্যবস্থার দরকার নেই রাণীমা। আমরা সব কিছু ঠিক করে এসেছি।

দুয়ারাণী : কী ঠিক করে এসেছো?

বৃদ্ধ মোড়ল : এখন থেকে আমরা আর কোন রাজার অধীনে থাকবো না, নিজেরাই পাঁচজনে মিলে শাসন চালাবো।

দুয়োরাণী : তোমরা তা পারবে না।

জনতা : না পারি মরব। হোবুচন্দ্রের অত্যাচারে তিলে তিলে মরার চাইতে সে মরা হাজার গুণ ভালো।

দুয়োরাণী : (স্বগত) না এদের ফাঁকি দেওয়া আমার শক্তির বাইরে, দেখি কিছু বাঁচানো যায় কিনা। (প্রকাশ্যে) তোমরা অধর্ম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করেছ। তোমরা ধর্ম মানো তা হলে?

জনতা : হ্যাঁ, মানি।

দুয়োরাণী : ধর্ম কোনদিন পরের জিনিস কেড়ে নিতে বলে না। তোমরা রাজ্য কেড়ে নিতে এসেছো কোন্ অধিকারে? রাজ্য তোমাদের নয়, রাজ্য মহারাজের।

জনতা : (অস্ফুট স্বরে) কিন্তু আমরা যে মারা যাচ্ছি। আমরা মরলে ধর্মই বা থাকবে কোথায়?

রাণী : তোমরা এক কাজ করো বরং..

জনতা : (ব্যগ্র কণ্ঠে) কী কাজ?

রাণী : তোমরা এই রাজত্ব আমাদের কাছে থেকে নগদ তিন লাখ টাকা দাম দিয়ে কিনে নাও।

জনতা : হ্যাঁ, সেটা খুব ভালো কথা।

বৃদ্ধ মোড়ল : তোরা থাম। (রাণীর প্রতি) কিন্তু অত টাকা যে আমাদের বেচলেও হবে না, রাণীমা।

www.pathagar.com

দুয়োরাণী : তাহ'লে প্রত্যেক বছর তিন হাজার টাকা ক'রে দিয়ে একশো বছরে শোধ ক'রে দিও, অবশ্য এতে তোমাদের একটা সুদও দিতে হবে প্রতি বছর।

বৃদ্ধ মোড়ল : তাতেও খুব কষ্ট হবে, কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তাই মেনে নিতে হবে তোমাদের।

(বিদ্যুৎ শিখার মত শতভিষা জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল)

শতভিষা : না না না, কোন শর্তই তোমাদের মানতে হবে না। ধর্মের অপব্যাখ্যা তোমাদের শোনানো হ'য়েছে। তোমরা বিশ্বাস করো যে ধর্ম মানুষকে মেরে ফেলতে আসেনি, মানুষকে বাঁচাতে এসেছে। রাজ্য তোমাদের। এর ওপর মহারাজের এক তিল অধিকারও নেই। তোমরা তোমাদের রাজ্য দখল করে তোমাদের ইচ্ছামত শাসন চালাও।

জনতা : জয়—রাণী শতভিষার জয়!

(জনতার প্রস্থান)

দুয়োরাণী : সুয়ো, তুই ক'রলি কি?

শতভিষা : ঠিকই ক'রেছি।

হোবুচন্দ্র : (বিরক্তির সাথে) কচু ক'রেছ। আমার যে এদিকে বারোটা বেজে গেল।

(সকলের প্রস্থান)

তিন

[মুকুটহীন মহারাজা হোবুচন্দ্র বিমর্ষমুখে মাটিতে বসিয়া আছে। তুলার পুঁটলি নিয়া নিতাই প্রবেশ করিল।]

নিতাই : মহারাজ, মন্ত্রীমশায় এই তুলোর পুঁটলি দিলেন। তাঁর বেয়াই বাড়ীর তুলো। এর ভেতর নাকি আছে বাতাসও সেঁধোতে পারে না।

হোবু : (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আর তুলোর দরকার নেই। রাজ্যই চ'লে গেল,—তা আর তুলো দিয়ে কি হবে? যখন রাজ্য ছিল, তখন বুদ্ধি আটকানোর জন্যে কানে তুলো গুঁজতে হ'ত। ও আর কি ক'রব এখন। তুই বরং নিয়ে যা। যদি কোনদিন রাজা-টাজা হতে পারিস তবে কানে গুঁজিস্। (নিতাই প্রস্থানোদ্যত হইলে, হ্যাঁরে, মন্ত্রী কোথায় একবার ডেকে নিয়ে আয় তো।

(নিতাইয়ের প্রস্থান ও গোবুর প্রবেশ)

গোবু : একী মহারাজ, আপনি মাটিতে বসে আছেন যে? আপনার মুকুট কোথায় গেল?

হোবু : (নিশ্বাস ফেলিয়া) জানো তো সবই।

গোবু : না কিছুই জানিনে, আমি তো সবে বেয়াই বাড়ী থেকে ফিরলাম। আপনার তুলো পেয়েছেন?

হোবু : (নিশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ পেয়েছি। কিন্তু এদিকে যে সর্বনাশ।

গোবু : কিসের সর্বনাশ?

www.pathagar.com

হোবু : (বিরক্তির সঙ্গে) তোমার বদ অভ্যেস আর গেল না। কোন কথা বললেই পাল্টা প্রশ্ন করা তোমার স্বভাব। ব'লছি সর্বনাশ। তা আবার বলে কিসের সর্বনাশ!

গোবু : (বিপন্ন কণ্ঠে) মহারাজ যদি বুঝিয়ে না বলেন, তাহ'লে আমি বুঝি কি করে? আর মহারাজ যদি আমাকে অবিশ্বাস ক'রে কোন কথা না বলেন, তবে আমার মত হতভাগা আর কে আছে? আমরা দুজনে একসাথে মানুষ হ'য়েছি, এক সাথে হুঁকো আর আফিম খেতে শিখেছি। আর আজ? যাক, সবই আমার অদৃষ্ট!

(ললাটে আঘাত করিলেন)

হোবু : না না মন্ত্রী, তুমি অমন করো না, তা'ছাড়া আসতে আসতে পথেই সব শুনতে পেয়েছ নিশ্চয়। আমার রাজত্ব আর এখন আমার নেই। মাটিতে না ব'সে আর উপায় কি বলো। (চিন্তা করিয়া উত্তেজিত স্বরে) কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে জানো? তুমিই দায়ী!

গোবু : (তাল গাছের উপর হইতে পড়ার মত বিস্ময়াহত কণ্ঠে) আমি? আমি এর জন্যে দায়ী?

হোবু : (উত্তেজিত স্বরে) আলবৎ তুমি দায়ী। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই তুখোড় বেহায়া হ'য়ে যায়, এ কথা আগে জানলে কি আমি আর সুয়োরাণীকে লেখাপড়া শেখাই! না হয় সে আমার মুখে চুমুই খেত না কিন্তু রাজ্য তো ছিল। লেখাপড়া শেখার ফলেই সুয়োরাণী রাজ্যটা উড়িয়ে দিলে।

গোবু : (উৎসুক কণ্ঠে) তিনি এখন আছেন কোথায়?

হোবু : কে?

গোবু : সুয়োরাণী।

হোবু : আছে কোথাও বাড়ীর ভেতরে। নেপালকে পাঠিয়েছি খোঁজ নিতে।

গোবু : রাজ্য নষ্ট হওয়ার পরেও কিভাবে তাঁকে আপনি বরদাশত করছেন?

হোবু : কী আর করি বলো, যুবতী স্ত্রী তায় আবার পরামাসুন্দরী, ছাড়তে তো পারি না!

গোবু : (স্বগত) ছাড়তেও পারেন না। বৌ-পাগলা অপদার্থ কোথাকার। এদিকে আমার যম-যন্ত্রণা।

(নেপালের প্রবেশ)

নেপাল : মহারাজ, রাণীমাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

হোবু : তুই ছিলি কোথায় এতক্ষণ? কোন সকালে পাঠিয়েচি তোকে সুয়োরাণীর খবর জান্‌তে, আর তুই এলি বিকেল পার ক'রে। হারামজাদা নাপিত। এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলি কোথায়? রাণী খেয়েছে? না, তাও জানিস্‌নে?

নেপাল : মহারাজ, রাণীমার খোঁজই পাওয়া গেল না। তা তিনি খেয়েছেন কিনা বুঝবো কি ক'রে?

হোবু : (গর্জন করিয়া) তার মানে তুই খুঁজিস্‌নি!

নেপাল : মহারাজ, শুধু রাজবাড়ীর নয়; আশেপাশে তিনখানা গ্রামে খোঁজ নিয়ে আমি এসেছি।

www.pathagar.com

হোবু : (আর্তনাদ করিয়া) তুই বলিস্ কি? সুয়োরাণী কী তাহ'লে আত্মহত্যা করেছে মনের দুঃখে? কুয়োটুয়োগুলো ভাল করে দেখ তো খুঁজে নেপাল। (মিনতি করিয়া) যা বাবা, দেরী করিসনে আর। তুই আজ কামিয়ে যা পেতিস তা না হয় আমি অমনি দেব।

নেপাল : আপনি অত ব্যস্ত হবেন না মহারাজ। সুয়োরাণী বেঁচেই আছেন।

হোবু : (চাঁদ হাতে পাইবার মত) কই? কোথায়? বল না ব্যাটা, সুয়োরাণী কোথায় আছে?

নেপাল : (বিরক্তির সাথে) এখন কোথায় আছেন তা আমি কেমন ক'রে বলব? মানুষ যতক্ষণ পালিয়ে থাকে, ততক্ষণ তার খোঁজই পাওয়া যায় না। আর খোঁজ পাওয়া গেলে তো পালানোই শেষ হয়ে গেল।

হাবু : সুয়োরাণী কি তাহ'লে পালিয়ে গেছে?

নেপাল : হ্যাঁ।

হোবু : তুই কার কাছে শুনলি?

নেপাল : মর্তমান গ্রামে আমার এক্ঘর জাতভাই আছে। তাদের বাড়ী যেয়ে একটা ছোকরা রাখালের কাছে শুনলাম যে, সুয়োরাণী সেই গ্রামের জঙ্গলের পাশ দিয়ে কবির হাত ধরে কোথায় যেন চলে গেছেন। আর যাবার সময়— (থামিয়া গেল)

হোবু : (চিৎকার করিয়া) থাম্লি কেন, বলে যা।

নেপাল : (মাথা চুলকাইয়া) রাণীমা কবিকে চুমু খাচ্ছেন আর কবি রাণীমাকে.....

হোবু : (বিকট চিৎকার করিয়া) চুপ্ চুপ্ হারামজাদা, আর বলিস্নে।

গোবু : (স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া আত্মবিস্মৃতভাবে) হায় হায়, আমার এতদিনের স্বপ্ন কবি ভেঙে দিল।

হোবু : (ভীষণভাবে চমকাইয়া) সে কী, তুমিও শেষটায় রাণীর প্রেমে ম'জেছিলে? যাক, আপদ চুকেছে বাঁচা গেল।

নেপাল : তাহ'লে কোন দুঃখ নেই।

হোবু : না, আমার কোন দুঃখ নেই।

গোবু : আমারও কোন দুঃখ নেই।

হোবু : তাহ'লে কি করা যায়?

নেপাল : নাচো।

হোবু : গাও।

গোবু : বাজাও।

নেপথ্যে সঙ্গীত

১ম কণ্ঠ : ছিল রাজত্ব, আর পাটরাণী
এ যাবত কেউ চায়নি ভাগা
আজ দুটোকেই কেড়ে নিয়ে হায়
দিয়েছে মানুষ বড্ড দাগা॥

২য় কণ্ঠ : আহা - সেটা কী ভালো॥

www.pathagar.com

১ম কণ্ঠ : এমন প্রহার খাবো তা কি আর
কোন দিন হায় ভেবেছি মনে?
২য় কণ্ঠ : আহা শেষটায় সারা দেশটায়
লাগলো আগুন আন্দোলনে,
১ম কণ্ঠ : ছড়া বাঁধা ছেড়ে উচিত ছিল কি
অকারণে কারু পিছনে লাগা॥
২য় কণ্ঠ : তাই নিভলো আলো॥
১ম কণ্ঠ : তবু প্রাণপণ করি আয়োজন
যদি ও আপদ খেদানো যায়।
২য় কণ্ঠ : আকাশে জমলে বৈশাখী মেঘ
বজ্রপতন ঠেকানো দায়॥
২য় কণ্ঠ : তবে অকারণ দুশ্চিন্তায়
ব্যর্থ বুঝি এ রাত্রি জাগা।
২য় কণ্ঠ : লাল—বাত্তি জ্বালো॥

শেষ

www.pathagar.com

আনারকলি
(গীতিনাট্য)

প্রথম দৃশ্য

ইরান : উৎসবের দিন
[সমবেত কণ্ঠের গান]

ইরানের গুলশান হল উচ্ছল
মেলে আঁখি নার্গিস : জাগে শতদল ॥
পাতায় পাতায় ঘাসে
শিশির কণিকা হাসে,
নিশীথের শবনম
হ'ল উচ্ছল ॥

শুরু হ'ল খোশরোজে খুশীর খেলা,
গোলাবের পাপড়িতে রঙের মেলা ॥
শোনে মন উন্মন
মৌমাছি গুঞ্জন।
এ খুশীর খোশরোজে
চির চঞ্চল ॥

সেহেলি ॥ কি কথা বলিস? শোন সেহেলি
সকলে যখন উঠেছে মেতে,
খোশরোজে তোর বাধা কি যেতে?
আনার ॥ লক্ষ বিপদ ঘিরেছে যারে
যেতে হবে যাকে এ দেশ ছেড়ে
এ খুশীর খেলা সাজে না তার।
সেহেলি ॥ কোন দূর দেশে যাবে সেহেলি
সে দেশে কি হায় দুঃখ নাই?
আনার ॥ কি আছে উপায় মজলুমের
আলোর ইশারা খুঁজে না পাই।
সেহেলি ॥ কাফেলার পথ নাই তো জানা,
তবু শুনবে না তুমি এ মানা
আমিও তোমার সঙ্গে যাব।
আনার ॥ দূর সুদূরের পথে কাফেলা
ডেকেছে আমাকে অস্ত বেলা,
বিদায় ইরান।—খোদা হাফেজ ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

www.pathagar.com

[দুই : কাফেলা]
[গান]

দিন রজনীর পথে চলে এই কাফেলা
নিত্য ভাসি আঁখি জলে এই কাফেলা ।।
দুঃখ রাতের বেসাত নিয়ে চল্‌ছে হায়
চলবে নিতুই পলে পলে এই কাফেলা ।।
রাতের ছায়া নামলে কাল দিনশেষে
খুঁজবে কি সুর তারার দলে এই কাফেলা ।।
চলার তালে হাজার পথের বাঁক ঘুরে
পাবে কি ভোর ফুল-ফসলে এই কাফেলা ।।
কেউ জানে না কোন্ সে বিজন দূর দেশে
ঠাঁই পাবে কোন্ আকাশ তলে এই কাফেলা ।।

[তিন : সীমান্তরক্ষী ফৌজের ছাউনি]

প্রথম রক্ষী ।। দাঁড়াও দাঁড়াও কাফেলা-সালার·!
হিসাবের শেষে
যেও দূর দেশে
হয় নাই শেষ গিরি-কান্তার।

কাফেলা-সালার ।। দূরে যাও, দূরে যাও....
এ কাফেলা নয় পণ্যের
এ কাফেলা নয় স্বর্ণের,
এ কাফেলা চলে তক্‌দির সন্ধানে।

দ্বিতীয় রক্ষী ।। কে ঐ রূপকুমারী
কেন নিয়ে যেতে চাও
বুঝিতে না পারি ;
ফিরে যাও কাফেলা-সালার।

কাফেলা-সালার ।। আছে আছে গিরি-কান্তার
পথ রেখা নাই ফিরিবার
যে নারী চলেছে সাথে
নিয়ে আঁখি নীর
তার দুরাশায় জাগে
তার তক্‌দির।

প্রথম রক্ষী ।। চ'লে যাও কাফেলা-সালার।
দুঃখের কাল মেঘে
হয়তো বা দেখা দেবে
ক্ষণিকের সুখ স্বর্ণাভা।

[কাফেলার প্রস্থান]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এক : হিন্দুস্তান]

[বাজার]

প্রথম সওদাগর ।। দাঁড়াও, দাঁড়াও এখানে দাঁড়াও থেমে
কাফেলা-সালার উট ছেড়ে এস নেমে।
দ্বিতীয় সওদাগর ।। ইরানের কোন্ সওদা এনেছ সাথে?
গালিচা?
শারাব?
খঞ্জর?
শামশির?
আনো নাই বাঁদী হাসিন খুব সুরাত?
কাফেলা-সালার ।। দূরে যাও, দূরে যাও...
এ কাফেলা নয় পণ্যের
এ কাফেলা নয় স্বর্ণের,
এ কাফেলা চলে তকদির সন্ধানে।
প্রথম সওদাগর ।। সুন্দরী নারী কে ঐ পরীর মত।
ওর পরিচয় দিয়ে যাও অন্তত।
কাফেলা-সালার ।। হৃদয় যদি না চিনে নেয় হৃদয়েরে
পারবে না কেউ চিনতে কখনো এরে।
প্রথম সওদাগর ।। এখানে পাবে না ছাড়া
যেতে হবে শাহী দরবারে।

[দুই : শাহজাদা সেলিমের কক্ষ]

প্রথম সওদাগর ।। শোন ফরিয়াদ বাদশাজাদা
চ'লেছিল দূরে এই কাফেলা
সাথে নিয়ে নারী অপরিচিতা।
কাফেলা-সালার ।। নহে লুণ্ঠিতা, অবগুণ্ঠিতা নারী
যে এসেছে তার তকদির সন্ধানে।
সেলিম ।। চিনেছি, চিনেছি আমি
আমার আত্মার
সকল রোশ্নি দিয়ে চিনেছি নারীকে,
খুঁজিয়াছি যারে আমি
এল সেই জোহরা সিতারা।
আনার ।। মন যার আশ্রয় পিয়াসী
চিনিয়াছো সেই অচেনারে
দূর যাত্রা পথে কাফেলার।
সেলিম ।। রহ নারী মন্জিলে আমার।।

www.pathagar.com

[তিন : মোগল হেরেম]
[কিছুদিন পর]

আনার ।। নিঃশেষে আমি দিয়েছি ছিল যা মোর
এখনো তোমার তৃষ্ণা কি মেটে নাই?
সেলিম ।। পিপাসা আমার বেড়ে যায় অবিরত
অন্তবিহীন মরু সাহারার মত,
চেয়োনা জানিতে অকারণে পিছু ডেকে
দাও আরো দাও রূপের সুরাহি থেকে।
আনার ।। সুপ্ত মনের পল্লবদল খুলি
যা ছিল আমার দিয়েছি তো সব তুলি।
সেলিম ।। মনে তবু উন্মনা উদাসিনী
কিছু দিলে আর কিছু বুঝি নাহি দিলে,
পেয়েছি তোমাকে মোগল হেরেমে, তবু
মন আছে তব আর কোন্ মনজিলে।
আনার ।। হয়তো বুঝেছ, হয়তো বা বোঝ নাই
শ্রান্ত জীবনে এবার জানতে চাই,
ক্লান্ত আমি এ মোগল হেরেমে আজ
ইরানী হাওয়ায় মুক্তিপরশ চাই।
সেলিম ।। কাছে এলে তবু ওগো বিদ্যুৎশিখা
চিরদিন তুমি র'য়ে গেলে প্রহেলিকা।

[সেলিমের প্রস্থান]

আনার ।। (পিঞ্জরের নিকটবর্তী হইয়া)
খাঁচার বাঁধন দিলাম খুলে
শোন হিরামন
ইরানী সেই তূতীর কানে
বোলো নিশুত রাতে
সেহেলি তার বন্দিনী আজ
মোগল হেরেমে।।

[খাঁচার দরজা খুলিয়া দেয়]
[রত্নার প্রবেশ]

রত্না ।। অপরূপ ইরানী তূতীরে
বন্দী কে ক'রেছে এনে এ বালাখানায়,
নারী আমি,
তবু আজ মন ফিরে চায়
পুরুষের রূপ ধরি জানাতে প্রার্থনা।
আনার ।। কে তুমি? কি চাও এখানে বল
বুঝিতে না পারি কিছু তার।
রত্না ।। আমি রত্না অচেনা তোমার।
কোন মায়াবিনী তুমি বিশ্বের সুষমা

www.pathagar.com

তনু দীপাধারে তব রাখিয়াছো জমা
ঘন অন্ধ নিশীথের উজ্জ্বল তারকা?

আনার ॥ অচেনা? অচেনা নহে, সেহেলি আমার
মুক্ত কর পথ মোর বাহিরে যাওয়ার,
শ্বাস রোধ হ'য়ে আসে মোগল হেরেমে।

রত্না ॥ কোস্‌নে ও কথা কোস্‌নে,
আত্মঘাতিনী হোসনে,
ওরে বন্দিনী এখানে যে কেউ
স্বপ্নে ও কথা বলে না;
ভুলেও ও পথে চলে না॥

আনার ॥ শুনবো না আমি শুনবো না,
শাহী তখ্‌তের আড়ালে মনের
রঙিন স্বপন বুনবো না,
মোগল হেরেমে শুধু অপমান,
মেলে না এখানে মানুষের প্রাণ,
পাথরের মত ঘিরে আছে হায়
জুলুমশাহী॥

[গুপ্তচরের উঁকি দিয়া প্রস্থান]

রত্না ॥ হায় হায় হায়
একি ভুল তুই করলি?
গুপ্তচরের কানে গেছে কথা,
সে তো বুঝবে না এই ব্যাকুলতা;
নিজের দোষে যে মরলি।

[চার : বাদশা আকবরের রংমহল]
[আকবর ও সেলিম]

আকবর ॥ পথ-প্রান্তে নেমে
কারে আনিয়াছো তুমি মোগল হেরেমে?
সে তোমার যোগ্য নহে, তুমি উর্ধ্বে তার।

সেলিম ॥ নহি আমি যোগ্য তার
বাদশা নামদার,
অনাদৃতা যে গোলাব ছিল গুলশানে
ফুটেছে সে এ জীবনে বিপুল সম্মানে।

আকবর ॥ মায়াবিনী সে তোমাকে টেনেছে বিপথে
গুপ্তচরী সেই নারী তুমি তা'জানো না।

সেলিম ॥ গুপ্তচরী নহে নারী,
বঞ্চিত বাসনা
করিয়াছে ওরে অন্যমনা!

www.pathagar.com

ইরানের হরিণী ও
শাহী মহলের কথা
কিছু শেখে নাই।

আকবর ।। মানে না যে মর্যাদা রাজার
পাবে সাজা, পাবে দণ্ড তার
মোগল হেরেমে তার
স্থান নাই, কোন স্থান নাই।

সেলিম ।। বিচারের এই প্রহসন !
বলদর্পী বাদশার
একি তিক্ত অবিচার
মুছে দেয় নিষ্পাপ জীবন ?

আকবর ।। এ আদেশ মোগল বাদশার,
এ আদেশ হুকুমত যার।

সেলিম ।। মানি না, মানি না আমি এই অবিচার।

আকবর ।। মূর্খ পুত্র। একি জানা নাই
বজ্রদৃঢ় আদেশ আমার ?
সিন্ধু যদি ফিরে যায়
ফিরিবে না তবু আর
এই দণ্ড মোগল বাদশার।
বিষপাত্রে মৃত্যু হবে তার।

সেলিম ।। দাও সেই বিষ পাত্র
নিঃশেষে করি আমি পান।

আকবর ।। প্রতিফল পাবে প্রতিদান
যদি আনো ধৃষ্টতা তোমার ;
শাস্তি পাবে সেই কুহকিনী
রাজরোষে বন্দিনী আনার।।

তৃতীয় দৃশ্য

[এক : রাত্রির শেষ প্রহর]

[কারাগার]

প্রথম প্রহরী।। সুবে-সাদিক হওয়ার আগে
রাতের চোখে যখন ঘুমঘোর
কান্নাতে কার উঠলো জেগে
এই নিশীথে ঘুমন্ত শহর ?

দ্বিতীয় প্রহরী।। এমন রাতে জাগে শুধু
ফকীর :—দীউয়ানা।

[সেলিমের প্রবেশ]

www.pathagar.com

সেলিম ।। না না না
নহি আমি, নহি দীউয়ানা।
প্রথম প্রহরী ।। জানো না কি তুমি রাহগির
মৃত্যু–কঠিন কারাগার
রাজরোষে হেথা বন্দিনী
শা'জাদার মাশুক আনার।
সেলিম ।। দেখ চেয়ে দেখ কোতায়াল
আমি সেই শা'জাদা সেলিম,
নিরাশার হিম–ছোঁয়া লেগে
আশা যার হ'য়ে গেছে হিম ;
খোল খোল জিন্দান দ্বার।
প্রথম প্রহরী ।। যে নিষেধ ছিল বাদশার
সে নিষেধ ভুলে যাব আজ,
মাশুকের দুয়ার শুনেছি
আশিকের পায়ের আওয়াজ।
দ্বিতীয় প্রহরী ।। চ'লে যাও শা'জাদা সেলিম
ফিরে এস প্রভাতের আগে,
কাক পাখী যেন নাহি জাগে।

[দরজা খুলিয়া দিল]

[দুই : কারাভ্যন্তর। স্তিমিতদীপ আনারকলির কক্ষ।]

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম ।। শেষ দীপ নিভিবার আগে
এসেছি আনার শেষ রাতে?
আনার ।। এসেছো, এসেছো এই রাতে?
নেভে নাই জোহরা সিতারা
ফোটে নাই গোলাব কুঁড়িরা
মরণের হিম সজ্জাতে।
এস এস তুমি এই রাতে।
সেলিম ।। ক্ষমা নেই যে পাপের
অপরাধী আমি সেই পাপে,
তিক্ত মোর অক্ষমতা
আনিয়াছি এ ব্যর্থতা ;
ঝরে ফুল সেই অভিশাপে।
আনার ।। মুছে নাও মনের ম্লানতা,
ব্যর্থ গ্লানি যাও ভুলে যাও,
শেষ নিমেষের পাত্র
পূর্ণ করি আজ তুলে দাও।
সেলিম ।। দীপশিখা নিভে যায় যাস
আমি সে ক্লান্ত শামাদান,

www.pathagar.com

গোলাবের দিন শেষে হায়,
কণ্টক-ক্ষত গুলশান
সুখ স্মৃতি সুদূরে উধাও।

[জল্লাদের প্রবেশ]

জল্লাদ ।। শোন শোন বাদশার ফরমান
মানেনি যে রাজাদেশ
বিষ পাত্রে হবে শেষ
বন্দিনী সে আনারের প্রাণ।

সেলিম ।। জল্লাদ খোল তলোয়ার।

[তলোয়ার কোষমুক্ত করিলেন]

জল্লাদ ।। রাখো তলোয়ার,
এ আদেশ বাদশার।

সেলিম ।। মানি না, মানি না আমি
মানুষের কোন অবিচার,
সে আদেশ হোক বাদশার।

জল্লাদ ।। বাদশার শোন ফরমান
রাজরোষে যাবে যার প্রাণ
পাবে না সে কোন সম্মান,
বন্দী তুমি রাজার কুমার।

[জল্লাদের ইশারায় কয়েকজন প্রহরী বিদ্যুদ্বেগে সেলিমকে বন্দী করিল]

জল্লাদ ।। (আনারের প্রতি) লহ লহ বিষ পাত্র
ক্ষণিকের অবকাশ নাই।

আনার ।। মুক্তি চাই, আজ মুক্তি চাই,
বিষপাত্রে নাই শঙ্কা নাই।
চিনেছিল দৃষ্টিতে যে জন
পারিল না কাটিতে বন্ধন ;
শেষ কথা তবুও জানাই ...

জল্লাদ ।। লহ লহ বিষপাত্র
ক্ষণিকের অবকাশ নাই।

আনার ।। দাও তবে, দাও তবে তাই
ছাড়িতে চাহে না মন
যে মনের বন্ধন
রেখে যাই ; তা'ও রেখে যাই।

জল্লাদ ।। জীবন তোমার নিভে যাক এই
জহরের পেয়ালাতে

[বিষপাত্র তুলিয়া দিল]

আনার ।। দাও জহরের পেয়ালা আমার হাতে।

[বিষপাত্র গ্রহণ করিল]

হায় এই অবেলায়
নিঃশেষ আশা ঝ'রে যায়,

www.pathagar.com

মুক্তিপিয়াসী প্রাণ পেল কি প্রতিদান
জহরের নীল পেয়ালায়।

[বিষপান করিয়া]

[তিন : আনার কলির মাজার]

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম ॥ মৃত্যুর সমাধি অতলে
সে আজ ফেলেছে হিমশ্বাস,
শিয়রে কাঁদিছে তার
সীমাহীন রাতের আকাশ।
নিরাশা শ্রান্ত মন
জাগে যার মরণ আঁধারে
জীবনের চাওয়া তার
কেঁদে যায় প্রিয়ার মাজারে ॥

যবনিকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গল্প

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মৃত-বসুধা

নদীর ঘাটে প্রাচীন অশথের তলায় বৈকালিক আসর বসে গ্রাম্য বৃদ্ধদের। যারা পা বাড়িয়েছে মৃত্যুর কোঠায়, যারা এসে পৌঁছেচে জীবনের সীমান্তে, সেই যাত্রীদের বিশ্রামের শেষ আসর এখানে। এখানে আসে না যুবকেরা, যারা প্রাণের প্রাচুর্যে বৃদ্ধদের জীর্ণতাকে বিদ্রূপ করতে পারে—পর্যাপ্ত তারুণ্যে এই নিষ্প্রভ বার্ধক্য-পীড়িত দলকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিতে পারে। দিনের পর দিন অসুখে ধুঁকতে ধুঁকতে অনিয়মিত সময়ে বৃদ্ধেরা এখানে এসে হাজির হয়, একই কথা আলোচনা করে বারেবারে। নতুন কথা বলা, নতুন পথে চলা এদের নিষেধ ; তাই পুরাতনের দিকে এদের নজর পড়ে বেশী। মনে জাগে তীব্র ঝটিকা-সঙ্কুল অতীত জীবন, অজস্র শক্তির অধিকারী একদল যুবকের অস্পষ্ট ছবি, জীবনের আনন্দ-মুহূর্তের পরিবর্তিত সুমিষ্ট স্মৃতি।

অনেকদিন আগে ঝড় উঠেছিল এদের জীবনে। সে-ঝড় সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেছে। তার দৌরাত্ম্য নাই, শক্তি নাই—এমনকি উপদ্রবের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আছে উদ্যমহীন শেষ অপেক্ষা। অতীতের ভুলের জন্য এরা অনুতাপ করে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বোঝে না যে সে-অনুতাপ বার্ধক্যের—পাপের নয়। যৌবন ছাড়িয়ে এসে ওদের যৌবন-আকুলতা অনুতাপের তিক্ততায় সমাহিত হয়েছে। স্থগিত-ঝঞ্ঝা অবসাদময় এ-জীবন। তবু একটা শান্তি অনুভব করা যায়। ঝড় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এক পশলা শান্ত বৃষ্টির পর। একটা শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে নীরব আশাহীন শ্রান্তিতে জীবনের শেষ অবসরের শিথিলতার মত। মৃত্যু আসছে স্খলিত পদে।

এদেরই দলের একজন—সোনারগাঁয়ের বৃদ্ধ রউফ সাহেব। তাঁর দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু, শ্বেত বসন যেন বার্ধক্যের ধূসর চিন্তা। তাঁকে দেখলে মনে ভক্তি আসতে পারে। অনেক ঝড়-ঝাপটা পাড়ি দিয়ে তাঁর জীবন সেই বন্দরে এসে লেগেছে। যেখান থেকে কৃষ্ণতার মৃত্যুচিহ্ন ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। মরণ-মোহানার আশাহীন সৈকতে দাঁড়িয়ে তিনি হয়তো আর কিছু দেখতে চান নাই। মৃত্যুর জন্যই হয়তো নীরবে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু সে মরণ যে এত পীড়াদায়ক তা কে জান্‌ত। মৃত্যু দম বন্ধ করে দিচ্ছে না, সুদৃঢ় আঙুলে যেন দম টেনে নিচ্ছে। হাঁপানি-কাশিতে যখন তিনি প্রবলভাবে কাশতে থাকেন, তখন এই কথাই তাঁর মনে হয়। মাঝে মাঝে হাঁপানি বড় কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। বুকের ভিতরটা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের মত সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য হয়ে যায় ; তারপর হঠাৎ আসে দমকা-ঝড়ের মত নিষ্ঠুর নিশ্বাস-বন্যা। বুকের শীর্ণ পাঁজরগুলো থরথর কাঁপতে থাকে সেই বেগে কালবৈশাখীর আঘাতে শুক্‌নো পাতার মত। কাশতে কাশতে শরীর নুয়ে পড়ে, মুমূর্ষু অশথ নুয়ে যায়—মৃত্যু-ঝড় তার টুটি টিপে ধরেছে। তারপর গলার কাছে চিড় খেয়ে গলগল করে হৃৎপিণ্ডের রক্ত বের হয়ে আসে--শুভ্র বসন, শ্বেত-শুভ্র শ্মশ্রু লাল টকটক রক্তে ভরে যায়, সমস্ত শরীর নির্জীব হয়ে পড়ে--ঝড়-বৃষ্টিতে দলিত সিক্ত ধরণীর মত মূর্ছাতুর। যাট বৎসর পার হয়ে এসে রউফ সাহেবকে অজস্র কষ্ট পেতে হচ্ছে। প্রকৃতির অত্যাচার কত অমানুষিক, সে-কথা বুঝতে তাঁর বাকি

www.pathagar.com

নাই। কিন্তু অভিযোগ করার মত সাহসই বা তাঁর কোথায়? অভিযোগ করবেন কার বিরুদ্ধে? সমস্ত যৌবন যিনি প্রমত্ত ঔদাসীন্যে পার হয়ে এসেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সেই কারণে যদি অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন, তাহলে অভিযোগ করার কোন কারণ নাই। তাঁর জীবন বর্তমানে প্রাচীন মৃত্তিকার মত শস্যহীন অনুর্বর। সেখানে ফুল ফোটে না। ফসল উৎপন্ন হয় না। তিনি তাকিয়ে থাকেন শূন্য আকাশের পানে শূন্যতর মন নিয়ে।

কিন্তু রউফ সাহেবের এক সময় অপরিমিত শক্তি ছিল, অসামান্য সৌন্দর্য ছিল। তিনি ভোগ করেছেন সে-জীবন পূর্ণ মাত্রায়। যতদিন তাঁর শক্তি ছিল, ততদিন তিনি ছিলেন অসংযমী, দুর্দান্ত! শক্তিহীন হয়ে তিনি হয়েছেন সংযমী, শান্ত। যৌবন তাঁকে আজঁড়ে ধরেছিল। শয়তানের হাতে বন্দী মানবের মত তিনি ছিলেন যৌবন-বন্দী অসহায়। যৌবনের নির্দেশেই তিনি উঠেছেন, বসেছেন, বাধাবন্ধকে তৃণের মত উপেক্ষা করে ছুটে চলেছেন। কিন্তু কোথায় গেল সেই শক্তি, আর কোথায় গেল দুর্জয় সাহস। মৃত্যুমুখী তাঁর বর্তমান জীবন ভীতত্রস্ত হয়ে পড়েছে। যৌবনের ভুলের জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন, কিন্তু তৃপ্তি পান না। তৃপ্তি পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এক ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে তিনি আকৃষ্ট হন অন্য জিনিসের দিকে। তাঁর প্রায়শ্চিত্তের অন্তরালে যে কাঁদে, সে লুপ্ত যৌবন-স্মৃতি। মৃত্যুর পর যদি ফিরে পাওয়া যেত অনন্ত যৌবন, অপরিমিত সৌন্দর্য-সান্নিধ্য! বার্ধক্যের তীরে দাঁড়িয়ে কে না চিন্তা করে? এবং এই চিন্তাই বাধা দেয় ক্ষমাপ্রার্থী প্রায়শ্চিত্তকে। মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হতে চায় না। ক্ষমা প্রার্থনা করে নতুন জীবন পেতে চায়। আকাঙ্ক্ষিত প্রার্থনা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। আর সেই আঘাতে মানুষ কাঁদে—যেন প্রায়শ্চিত্ত করেই কাঁদছে। জীবনের একটি ভুলকে মানুষ ঢাকা দেয় আর একটি ভুল দিয়ে।

রউফ সাহেব যখন এই সমস্ত কথা নিয়ে চিন্তা করেন, তখন তাঁর মনে একটা ছবি ভেসে ওঠে। জীবন একটা গতিশীল ছবি বৈকি! কিছুদিন আগেকার কথাকে বয়স এতখানি পিছিয়ে দেয় কেন? তিনি ত অনায়াসে সব কথা মনে করতে পারেন।

রউফ সাহেব তখন পূর্ণ যুবক। তাঁর দেহ ইস্পাতের মত দৃঢ় দেওদারের মত উন্নত-শীর্ষ। শক্তিশালী, দুঃসাহসী এবং সুপুরুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু সে-খ্যাতি আশে-পাশের লোকের কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর অবাধ চরিত্রহীনতার জন্য। তাঁর মত সিদ্ধহস্ত শিকারী ছিল না আর কেউ এ-অঞ্চলে। তাঁর ঘোড়া ছিল সবচেয়ে তেজী, ঘোড়সোয়ার হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর পর্যন্ত। তাঁর ছোট সংসারে সচ্ছলতার অভাব ছিল না। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত মনে স্বেচ্ছাচারিতা করে বেড়াতেন। অভিজাত বংশের ছেলে, তাঁর কাজে বাধা দেবার মত দুঃসাহস গ্রামের কারুর ছিল না। উপযুক্ত বয়সে তাঁর বিয়ে হলো, কিন্তু তিনি সুফিয়াকে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেলন না। সুফিয়া তাঁকে ভালবাস্‌ত প্রাণপণে, কিন্তু রূপমত্ত খোন্দকার সাহেবের মন তৃপ্তি পেত না তাতে। গভীর রাত্রে উঠে দরজা খুলে তিনি বাইরে চলে যেতেন, আর ভোর না হতেই ফিরে আসতেন। সুফিয়া বুঝতে পারত সব কথা ; অনেকদিক সে কেঁদেছে সে এর জন্য—কিন্তু রউফ সাহেবের ঘৃণিত নিশাযাপন কমেনি তাতে। তাঁর দৈহিক কামনা কোন বাধাতেই নিবৃত্ত হয়নি। অস্থির দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। যে-চঞ্চলতায় আঁধার থাকতে পাখি বাসা ছেড়ে উড়ে গিয়ে শিকারীর হাতে ধরা দেয়, সেই রকম আত্মঘাতী ভোগস্পৃহা তখন জেগেছিল তাঁর মনে। সুতরাং সুফিয়ার গৃহ-প্রেম ব্যর্থ হলো, তার ভালবাসা নিরুদ্বেগে খোন্দকার সাহেবের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে লাগলো।

www.pathagar.com

তাঁর পাপ-সহযাত্রী ছিল তাঁরই কয়েকজন দুশ্চরিত্র প্রজা। কতদিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি সিঁদ কেটে মুখে কাপড় দিয়ে কত মেয়েকে তারা চুরি করে এনেছে, লুণ্ঠন করেছে তাদের দেহ, পিষে ফেলেছে তাদের সকল আবেদন—আত্মরক্ষার দুর্বল চেষ্টা।

যে গল্পের মৃত-অঙ্কুর আমাদের মনে নতুন পত্রপল্লব বিস্তারের অপেক্ষায় আছে, তার সৃষ্টিও এই রকম একটি নারী-হরণে। মানুষের ভাগ্য নাকি নিয়ন্ত্রিত হয় একটা অপ্রতিরোধ্য অদৃশ্য আকর্ষণে। কখনো তার উপরে পড়ে অশুভ কালোছায়া, কখনো উজ্জ্বল আলোকণা। রাহেলার সাথে রউফ সাহেবের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন হয়তো তাদের দু'জনার জীবনেই এই অশুভ সঙ্কেতের ছায়াপাত হয়েছিল। সেই ছায়া-অন্ধকারে কিছুদিন যে বীভৎস নোংরামি চলেছিল, তার রূপ যখন বাইরে প্রকাশ পেল, তখন রউফ সাহেবের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

রাহেলার ব্যাপারে যতখানি নির্লজ্জতা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, জীবনে ততখানি নোংরামি তিনি আর কোনদিন করেননি। একদিন গভীর রাত্রে সেকালের প্রথামত ডাকাতির ছল করে তাঁর কয়েকজন প্রজা রাহেলার মুখে কাপড় পুরে যখন তাকে সোনারগাঁয়ে নিয়ে এল, তখন তাঁর মনে সামান্য একটু দাগও লাগেনি।

ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে রউফ সাহেব তার মুখের বাঁধন খুললেন ; তখন শিশুর মত সুকুমার ভয়বিবর্ণ রাহেলার মুখ দেখে তিনি একটু অবাক হয়ে গেলেন। রাহেলাকে এত কাছে থেকে তিনি কোনদিন দেখেননি। ওর মুখখানা আশ্চর্যরকম সরল। রউফ সাহেব দুর্বল বিস্ময়ে রাহেলাকে দেখতে লাগলেন। কিন্তু সে দুর্বলতা ক্ষণিক। সেদিনের রউফ সাহেব জানতেন যে, বাইরের সরলতার খোলস এঁটে যারা বসে থাকে অথবা প্রকৃতি যাদের পরিয়ে দেয়, তাদের ভোগপিপাসা অন্য কারুর চেয়ে কম নয়। রাহেলাকেও সেই দৃষ্টিতে দেখতে তাঁর দেরী হলো না। অতএব অন্যান্য নির্যাতিতাদের মত রাহেলার পরিচ্ছন্নতাও রউফ সাহেবের অতৃপ্ত যৌবনের পদতলে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেল।

গ্রামের লোকেরা পরদিন তাঁর এতখানি নির্লজ্জতা দেখে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু রউফ সাহেব কাউকে ভয় করেন না। তিনি রাহেলাকে বাড়ির মধ্যে এনে আটকে রাখলেন। যে দু'একজনের প্রতিবাদ খোন্দকার সাহেবের কানে এসেছিল, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হলো প্রচুর। গ্রামের মধ্যে কয়েকখানা ঘরপোড়ার পর সব প্রতিবাদ শীতল হয়ে গেল। মসজিদের মুন্‌শী সাহেবও বাদ গেলেন না এই আক্রমণ থেকে। একদিন আহত অবস্থায় তাঁকে প্রজ্জ্বলিত ঘরের নিচে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মস্‌জিদে তিনি রউফ সাহেবের নিন্দা করেছিলেন, এই তাঁর দোষ। রাহেলাকে যারা তার বাপের বাড়ি থেকে উদ্ধার করতে এসেছিল, তাদের কঙ্কাল হয়তো এখনো সোনাগাঁয়ের অথই বিলের মধ্যে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। তাদের ঘিরে আছে অসংখ্য ঝাঁজি, দাম আর তৃণদল। নিকটবর্তী পুলিশের কর্তারাও কিছু মোটারকম বখশিশ্ পেয়ে এ-বিষয়ে মন দেবার আর সময় পান নাই।

বাইরের ব্যাপারে এভাবে মিটে গেলেও, বাড়ির ভেতরে মিটল না অত সহজে। রউফ সাহেবের আত্মীয়-স্বজন বড় একটা কেউ ছিল না। মুরুব্বি-স্থানীয়া ছিলেন শুধু তাঁর বৃদ্ধা জননী। তিনি এবং সুফিয়া এতখানি মুষড়ে পড়লেন যে, বাইরে মুখ-দেখানো তাদের পক্ষে

www.pathagar.com

অসম্ভব হয়ে উঠলো। লজ্জায় শাশুড়ি-বধূও আর কথা বলতে পারতেন না—যেন অপরাধ তাঁদেরই। অবশেষে সুফিয়া একদিন সমস্ত লজ্জা শেষ করে দিলে কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে। সুফিয়ার মৃত্যুতে বৃদ্ধা শাশুড়ি আরও মর্মাহত হয়ে পড়লেন—না খেয়ে, কেঁদে এবং অনিদ্রায় ভুগে তিনি শেষ শয্যায় আশ্রয় নিলেন। রউফ সাহেবের সংসারে এই যে মরণ সংক্রমিত হলো এর গতি রুদ্ধ হয় নাই বহুদিন। কিন্তু সেদিকে তাকানোর সময় এবং জ্ঞান রউফ সাহেবের সে সময়ে তখন ছিল না। রাহেলাকে নিয়ে তিনি তখন প্রমত্ত।

স্নান-শুচি মানুষ দুর্গন্ধময় শবকে আলিঙ্গন করতে যতখানি ঘৃণা বোধ করে, তার চেয়ে অনেক বেশী ঘৃণা করত সে রউফ সাহেবকে। রাহেলার ঘৃণা অমানুষিক প্রেতের আবছায়া বিভীষিকার চেয়েও ভয়াবহ। তার সেই শিশুর মত মুখ, পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেখানে জেগেছে ছুরির মত ধারালো কঠোর রেখা, দুই চোখে ঝরছে অগ্নিদৃষ্টি। একজন মানুষের পক্ষে যতখানি ঘৃণা করা সম্ভব, ততখানি ঘৃণা সে রউফ সাহেবকে করে। তবুও তাঁর আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে সে যখন আবদ্ধ দেখে, তখন হয়ত তার স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে না। কিন্তু সে যেন কেমন করে সহ্য করে যায় এ-অত্যাচার। সে সহ্য করে, যে-ক্ষমতার ফলপুষ্পশোভিতা সুন্দরী ধরণী ভূমিকম্পের অন্তর্জ্বালা সহ্য করে, হয়তো সেই ক্ষমতায়। দিনরাত্রি সে মরণ কামনা করে, কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারে না। প্রথম প্রথম সে রউফ সাহেবকে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করত, কিন্তু তার ঘৃণা, অশ্রু, শারীরিক কোনটাই সে-ক্ষেত্রে সফল হয়নি। তারপর এল সে অসাড় হয়ে—তার সমস্ত ক্ষমতা দলিতা সাপের মত অসহায় হয়ে ভেঙে পড়ল। সে আর বাধা দিত না খোন্দকার সাহেবকে, কিন্তু তার সমস্ত শরীরের দুর্বলতা জ্বালা নিয়ে দুটি চোখ সব সময়ে জ্বলত, সংকুচিত হতো অপরিসীম ঘৃণায়।

কয়েক মাস পরে সে বুঝতে পারল যে, তার শরীরে আর একটা জীবন আশ্রয় নিয়ে তিলে তিলে বেড়ে উঠছে। সে জীবন আর কারুর নয়, পশু-প্রতীক রউফ সাহেবের। রউফ সাহেবও একদিন অনুভব করলেন এই ব্যাপার। রাহেলার জন্য তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। অসীম কামনার মধ্যে তিনি রাহেলাকে পেয়েছিলেন এবং সেই হিসেবে ভালোবেসেছিলেন। প্রচুর স্বেচ্ছাচারিতার পর তাঁর প্রদীপ্ত কামনায় একটু স্নিগ্ধতা এসেছিল কিনা , কে জানে! তিনি চেষ্টা করলেই অজাত শিশুকে নিশ্চিহ্ন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি অনাগত সন্তানের আগমন-সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তাঁর বর্বর বুকে জাগল স্নেহময় পিতা। তিনি ছুটলেন মুনশী সাহেবের কাছে—রাহেলাকে তিনি বিয়ে করবেন শুধু এই শিশুটির কল্যাণের জন্য।

কিন্তু নিয়তি প্রতীক্ষা করছিল। সেদিন গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল—রাহেলার ঘর থেকে অস্পষ্ট কান্নার একটা শব্দ আসছে। মনে হয় যেন শিশু কণ্ঠের কান্না—যে আসতে চায়নি, তাকে কেন জোর করে আনা হলো! রাহেলার কি সন্তান হয়েছে? তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে রউফ সাহেব গেলেন। এমন অসময়ে যে একটি শিশু আসবে, তার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। রাহেলার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি দেখলেন যে, সদ্যোজাত একটি শিশু মাটিতে লুটোচ্ছে। রউফ সাহেব তার ক্ষুদ্র-দেহ তুলে ধরলেন। তাঁর বুক কেমন যেন কাঁপছে! কিন্তু রাহেলা কোথায়? মুখের উপর বাতি তুল ধরতেই তিনি যে-দৃশ্য চোখে দেখলেন, সমস্ত জীবনে তা ভুলতে পারেন নাই। অন্ধকারে একা থাকলেই সেই ছবি ভেসে উঠেছে চোখের সামনে—একা একা চলতে গেলে মনে হতো যেন সেই ছায়া আসছে পিছনে পিছনে কঠিন অভিশাপ দিতে দিতে।

www.pathagar.com

শাড়ির আঁচল বেঁধে রাহেলা ঝুলছে শূন্যে ! তার অস্বাভাবিক দীর্ঘ-বিলম্বিত জিভ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরে পড়ছে, চোখ দুটি বিকট আকারে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে—তার সমস্ত মুখে জেগে আছে ভয়ঙ্কর মৃত্যু। মৃত্যু ভয়ঙ্কর, কিন্তু এত ভয়ঙ্কর যে, তার সঠিক বর্ণনা কেউ দিতে পারেনি। স্তিমিত আলোয় মৃত্যুর সেই রূপে দুঃসাহসী খোন্দকার সাহেবও মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না, তীব্র আর্তনাদ করে উঠে সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পেয়ে অনেক লোক ছুটে এল সেখানে। তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো বড় ঘরে। পরদিন প্রভাতে যখন তাঁর মূর্ছা ভাঙলো তখন রাহেলার লাশকে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। খোন্দকার সাহেব সে খবর শুনে উঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠতে পারলেন না—পাশ ফেরার সময় একটা বেদনা বিদ্যুতের মত সমস্ত শরীরে ঝিলিক মেরে গেলো, তিনি আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন। দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে গেল যে রউফ সাহেবের পক্ষাঘাত হয়েছে। মহকুমা থেকে ডাক্তার এসে বললেন যে, আকস্মিক ভয়ে পড়ে যাবার জন্যই তাঁর এই রোগ হয়েছে। অবশ্য যাবার সময় তিনি আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর, পানির মত টাকা খরচ ক'রে তিনি যখন চলবার শক্তি ফিরে পেলেন, তখন তাঁর যৌবন উবে গেছে কর্পূরের মতো। লাঠি না নিলে তিনি চলতে পারেন না। কব্জা দেহকে বহন করার ক্ষমতাও যেন তাঁর নাই ; শরীর আর বইতে পারছে না। শরীরের মতো তাঁর মনও দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে তারকা-পথ বেয়ে একদিন অসীম শক্তিতে ক্ষয়িষ্ণু উল্কা কক্ষভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছিল, আজ সে মাটির বুকে আশ্রয় চায়। তাঁর চরিত্রের সে-উগ্রতা আর নাই। এত নরম হয়ে পড়েছেন তিনি যে, লোকে তাঁকে দেখলে কৃপা নিশ্বাস ছাড়ে। উদ্ধত যুবকের মৃত্যু হয়েছে স্নেহশীল বৃদ্ধের ভঙ্গুর বুকে।

রাহেলার মেয়েটিকে পালন করছে বাড়ির বৃদ্ধ চাকরানি পাঁচীর মা। রউফ সাহেব মেয়েটিকে কিছুতেই চোখের আড়াল করতে পারলেন না। ছোট্ট মেয়েটা নৃত্যচটুল গতিতে সারা বাড়ি মুখরিত করে ঘুরে বেড়ায়। লোকজন বেশী না থাকলে সন্তর্পণে খোন্দকার সাহেব ডাকেন : লতিফা এদিকে আয় ! লতিফা আসে। কিন্তু রউফ সাহেব ভুলে যান, কেন তাকে ডেকেছিলেন। শুধু তার মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকেন।

বন্দুকটা মর্চে ধরে গেছে। আস্তাবলে নিঃসঙ্গ শক্তিমান ঘোড়াটা পা ঠুকে তাঁকে ডাকছে। আস্তে আস্তে উঠে তিনি ঘোড়ার কাছে যান। ঘোড়াটা অসহিষ্ণু চোখে তাঁর দিকে তাকায়। তার পা কাঁপে উত্তেজনায়—পথ তাকে ডাকছে, অবরুদ্ধ গতিবেগ তাকে পাগল করে তুলছে। রউফ সাহেব অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবেন। ঘোড়াটির মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেন। তার অধীরতা শান্ত হয়ে যায়, বড়ো বড়ো চোখ মেলে তার দিকে তাকায়—তাঁর কাঁধের উপর মুখ নিয়ে উষ্ণ নিশ্বাস টানে। যৌবনসঙ্গী সে ! রউফ সাহেব ঘোড়াটির ব্যবহারে সহানুভূতি পান।

কেটে গেলো কয়েক বৎসর রউফ সাহেবের জীবনের উপর চলমান বেগের কঠোর আঘাত দিয়ে। আরও শ্রান্ত হয়ে পড়লেন রউফ সাহেব। শরীর ভেঙে পড়লো অনেকখানি। লতিফা বেড়ে উঠলো বর্ষার লতার মতো সজীব পরিপূর্ণতা নিয়ে। কিন্তু যতোই বড়ো হচ্ছে, ততোই দুর্বিনীত কঠোর হয়ে উঠছে। রউফ সাহেব তাকে স্নেহ করেন অন্ধের মতো, কিন্তু

www.pathagar.com

লতিফা অত্যন্ত বিরক্ত তাঁর স্নেহে। বুড়ো মানুষের দুর্বলতা সে সহ্য করতে পারে না—তার সামনে এখন চলার, জীবন উপভোগ করার অধীর আকাঙ্ক্ষা। সে বৃদ্ধদের করুণা করে, কিন্তু সে-করুণা হয়তো অবজ্ঞা-মেশানো ঘৃণা। রউফ সাহেবের পরিবর্তন অচিন্তনীয়। যিনি একদিন কঠোর আনন্দে পাহাড়ী ঘোড়ার বল্গা টেনে, বর্শা ছুড়ে সবল হাতের বন্য আনন্দ পেতেন, এখন তাঁর সেই পরিবর্তিত দুর্বল হাত পরম স্নেহে লতিফাকে আদর করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তিনি লতিফার চুল বেঁধে দিতে চান, আদর করে ডাকেন—অদ্ভুত স্নেহমাখা তাঁর কণ্ঠ। কিন্তু লতিফা মুখ বাঁকিয়ে চলে যায়। রউফ সাহেব আহত হন অন্তরে। চুপচাপ একা একা বসে থাকেন। কিন্তু বেশীক্ষণ এভাবে থাকা চলে না। লতিফাকে দেখার জন্য, আদর করার জন্য তাঁর মন আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। লতিফা হয়তো বড়ো ঘরে ঘুমুচ্ছে। রউফ সাহেব আস্তে আস্তে সেখানে যান, লতিফার মাথায় গভীর স্নেহে হাত রাখেন। লতিফার ঘুম কখনো কখনো ভেঙে যায় ; ক্ষিপ্ত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে ওঠে, এখানে এসেছেন আবার ! আপনারা জন্য কি ঘুমুতেও পারবো না ? আর কখনো আমার কাছে আসবেন না। লতিফা রউফ সাহেবের দুর্বলতা কোথায় তা জানে এবং জানে যে, রউফ সাহেবকে যথেষ্ট আঘাত করলেও তিনি তাকে কিছু বলবেন না। লতিফার কঠোর আঘাতে রউফ সাহেব বেদনায় বিবর্ণ হ'য়ে যান। তাড়াতাড়ি বলেন, না মা, তুই ঘুমো। আমি একটু—ইয়ে—তোকে দেখতে—না না, তুই ঘুমো। কি বলতে কি বলেন—সমস্ত কথা জড়িয়ে যায়, ভুল হয়, তাড়াতাড়ি তিনি চলে আসেন ; লাঠি আনার কথা মনে থাকে না। দরজার সাথে মাথায় গুঁতো লেগে কেটে যায়, উষ্ণ অশ্রুর মতো লাল রক্ত ঝরতে থাকে। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগ সামলাতে গিয়ে শুক্‌নো পাতার মতো তিনি থরথর কাঁপতে থাকেন। কিন্তু অশ্রু বাধা মানে না। বৃদ্ধের স্তিমিত চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে কুয়াশা-রুদ্ধ ক্ষীণ আলোকের মতো।

লতিফাকে রউফ সাহেব ভয় করেন। কি যে একটা গভীর স্নেহ বসেছে লতিফার উপর ! রউফ সাহেবের ইচ্ছা করে যে, তাকে কোলে বসিয়ে আদর করেন, শিশু লতিফাকে যেমন আদর করতেন। লতিফার সে সময় কেমন বোকার মতো চেহারা ছিল, কোনো লাল জিনিস দেখলেই সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। নধর তক্‌তকে শরীর, ছোটো একটুখানি নাক, আর বড়ো বড়ো কালো চোখ। রউফ সাহেবের মন ওকে দেখে ব্যাকুল হ'য়ে উঠতো ! বুকের মধ্যে চেপে ধরার সাধ হতো। কিন্তু লোকের সামনে কেমন সঙ্কোচ বোধ হতো—তিনি সব সময় আদর করতে পারতেন না। লতিফার কাছে যে সময় কেউ থাকতো না, পাঁচীর মা তাকে দুধ খাইয়ে কাজে চলে যেতো, তখন হয়তো চারদিকে অতি সন্তর্পণে তাকাতে তাকাতে তিনি লতিফার কাছে আসতেন। লতিফার নাকের কাছে কাছে কান পেতে তার মৃদু কোমল নিশ্বাস শুনতেন। নিশ্বাস এত মৃদু যে মাঝে মাঝে শোনা যায় না। আবার হয়তো লতিফার হাত-পা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। মোমের মতো নরম, শীত রৌদ্রের মতো স্নিগ্ধ উষ্ণ লতিফার ছোটো ছোটো হাত-পা—ওকে দেখলে একটা পাখির মতো মনে হয়। রউফ সাহেব এক একটা ক'রে ওর হাত-পা নাড়েন। চোখ, মুখ, নাক ঠিক ওর মায়ের মতো হয়েছে—কিন্তু কতো কোমল ! লতিফার মুখে সে-ঘৃণার চিহ্নও নাই, যা ছিল রাহেলার—লতিফার মা'র মুখে। কি কঠোর কাব্যের ঘৃণাব্যঞ্জক রেখা জেগে ছিল লতিফার মা'র মুখে। এ-সব কথা মনে হলে এখনও তাঁর শরীর ভয়ে শিউরে ওঠে। রউফ সাহেবকে দেখলে সে-মুখ বিকৃত হ'য়ে সেতো—বিবর্ণ হ'য়ে যেতো। শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্র মুখের উপর মৃত্যুর

www.pathagar.com

ছায়া, কঠোর ভয়ার্ত রেখা ফুটে উঠত—যেন একটি মর্মর মূর্তির সুগঠিত সুন্দর মুখকে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে কুরে কুরে কেউ বিকৃত করে দিয়েছে। এত অসহায় ঘৃণা সে মুখে!

রউফ সাহেব এখন সে-কথা ভুলতে চেষ্টা করেন। সে মুখের কথা মনে পড়লে তাঁর ভয় হয়। মনে হয় যেন সেই কঠোর মুখ প্রতিনিয়ত তাকে অভিশাপ দিচ্ছে। সে-অভিশাপ এত ভয়ানক যে, তার জন্য চাওয়া যায় না। রউফ সাহেবের আর্তনাদ করে বলতে ইচ্ছে হয় : আল্লা আগেই আমাকে পঙ্গু করে দাওনি কেন? তাহলে তো এ পাপ করতাম না। রউফ সাহেবের আর্তনাদ বেদনা-ক্লিষ্ট, নিজের অমঙ্গল-কামী। যদি তিনি সম্পূর্ণ মোহ-অন্ধ না হ'তেন, তাহলে হয়তো রাহেলার মুখের সেই ঘৃণার ছাপ দেখে সরে আসতে পারতেন। কিন্তু সে চৈতন্য তখন তাঁর ছিল না। তাই তিনি সে ঘৃণা অনুভব করতে পারতেন না। লতিফার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয় যে, ওর মুখে রাহেলার ঘৃণার ছাপ পড়েনি। না, কোন কঠোর রেখা নাই। ফুলের মত স্বচ্ছ সরল মুখ নামিয়ে লতিফার মুখে চুমো খেলেন—লতিফা জেগে উঠল, বড়ো বড়ো চোখ মেলে একবার তাঁর দিকে তাকাল, তারপর হেসে হাত দু'খানি বাড়িয়ে দিল। রউফ সাহেব লতিফাকে বুকে তুলে নিলেন। সেখানেও মিশে থাকল পাখির শাবকের মত। খোন্দকার সাহেবের বুক দুলে দুলে উঠছে—পুরুষপিতার মাতৃরূপ!

লতিফার অসুখ করলে তাঁর চিন্তার শেষ থাকত না। রাত্রির মধ্যে অনেকবার উঠে ওকে দেখে আসতেন। পাঁচীর মা হয়তো ঘুমুচ্ছে আর লতিফা ছট্‌ফট করছে বিছানায় 'একটু পানি' : রউফ সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে দেখেন, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারেন না—ঘরে ঢুকে এক গ্লাস পানি গড়িয়ে লতিফার মুখে ধরেন। লতিফা পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রউফ সাহেব পা টিপে টিপে চলে আসেন। দু'একদিন রাত্রে লতিফাকে পানি খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন হয়ত পাঁচীর মা'র ঘুম ভেঙে যায়। গজগজ করে অস্পষ্টভাবে সে বকতে থাকে। খোন্দকার সাহেব ফিরে আসতে আসতে সব শুনতে পান। পাঁচীর মা বলছে, আর মরণ আর কি! জোয়ানকালে ঢলামি করে বুড়ো বয়সে সতী হয়েছেন! বেহদ্দ বেহায়া কোথাকার! রউফ সাহেব সব বোঝেন, কিন্তু মাথা নিচু করে চলে আসেন—লজ্জায় তাঁর মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। অথচ অসহিষ্ণু হ'য়ে পাঁচীর মাকে কিছু বলতেও তাঁর সাহস হয় না। তিনি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে পেতে নেন। নামাজ পড়ার সময় বলেন : আল্লা, তুমি লতিফার মাকে সুখী করো—ওর কোন দোষ নাই।

এইভাবে দিন যায়। পাঁচীর মা'র কড়া কথা শুনেও তিনি থাকতে পারেন না। আবার লতিফার কাছে যান—স্নেহে আদরে লতিফাকে ঢেকে ফেলেন। কোন কষ্ট যেন লতিফাকে সইতে না হয়। তাঁর জীর্ণ পাঁজরের দুর্বল স্নেহ নিজের ছায়ায় আশ্রয় রচনা করে। লতিফা তাঁর মধ্যেই বেড়ে ওঠে যেন বৃদ্ধ বিহঙ্গের পক্ষপুটে নবীন শাবক। সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছে লতিফা। তার সুগঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাহেলার মতো সুদৃশ্য হলেও সেখানে ফুটে উঠেছে একটা কঠোর তেজস্বিতা। রউফ সাহেবের যৌবন-রক্ত কামনা আবর্তে ঘুরে তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছে তার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে। সে কাউকে ভয় করে না, কারুর বাধা গ্রাহ্য করে না, স্নেহ স্বীকার করে না—নিজের ইচ্ছামত কাজ করে, রউফ সাহেব কিছু বললে ঝংকার দিয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

আজ সকালে রউফ সাহেবের পুরোনো রোগের টান উঠেছিল মারাত্মকভাবে। তিনি লতিফার কাছে ওষুধের শিশি চেয়েছিলেন। লতিফা মুখ ঘুরিয়ে বলে গেল : আমার সময় নাই। এক মুহূর্তে সেখানে না দাঁড়িয়ে লতিফা চলে গেল। ঘরের আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল সেই চলার আঘাতে। রউফ সাহেব মনে খুব কষ্টও পেলেন। প্রত্যাখ্যান সইতে কোনদিন তিনি অভ্যস্ত নন।

কিছুদিন পরের কথা। রউফ সাহেব লতিফার মধ্যে একটি পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন। ও-বাড়ির ফরিদের সাথে লতিফার অন্তরঙ্গতা শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। লতিফা খোন্দকার সাহেবের ভোগ-লিপ্সু যৌবন পেয়েছে উত্তরাধিকার-স্বত্বে! তার রক্তের প্রতি কণিকায় জাগছে যুবক রউফ সাহেবের অকুণ্ঠ উপভোগ-কামনা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রউফ সাহেবের বলার কিছু নাই—বলার কোন অধিকার তিনি রাখেননি বলেই। ন্যায়ের শাসন চালাতে গেলে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। তিনি কিছু বলতে পারেন না। অথচ দিন দিন তাঁর চোখের সামনে এমন অন্যায় ব্যভিচার আরম্ভ হল যে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, লতিফাকে কঠোর শাসনের মধ্যে আটকে রাখলেন। মানব-ধর্মের নিয়ম এই যে, নিজে আকণ্ঠ পাপে ডুবে থেকেও সে প্রিয়জনের সুন্দর পবিত্র-জীবন প্রার্থনা করে।

এইভাবে কয়েক মাস চলল। রউফ সাহেব তাড়াতাড়ি লতিফার বিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ও-রকম মেয়ের বিয়ে সহজে হয় না। লতিফা তার নিজের জন্ম-কথা রউফ সাহেবের অতিরিক্ত সতর্কতায় জানতে না পারলেও বাইরের অনেকেই সে কথা জানত। এদিকে রউফ সাহেবের শরীর ও অতিরিক্ত বাইরের খুব বেশি ভেঙে পড়ল। বিয়ের চেষ্টা তিনিও ভালভাবে করতে পারলেন না।

সেদিন সমস্ত রাত্রি অসুখের সাথে যুঝে পরিশ্রান্ত হয়ে রউফ সাহেব একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ পাঁচীর মার ডাকাডাকিতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। পাঁচীর মা হাঁপাচ্ছে। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে সে বললো যে, লতিফাকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। লতিফার ঘরের দরজা অনেক বেলা পর্যন্ত বন্ধ থাকতে দেখে যে ঘরে ঢুকে লতিফার খোঁজ নিতে গিয়েছিল, কিন্তু লতিফাকে সে-ঘরে পাওয়া যায় নাই। আশেপাশে খোঁজ করা হয়েছে, কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নাই।

রউফ সাহেব ধড়মড় করে উঠে বসলেন। তাঁর মাথা ঘুরছিল প্রবলভাবে। লতিফা চলে গেছে? কোথায় চলে গেছে—কেন চলে গেছে? রউফ সাহেব ভেবে কিছু পাচ্ছিলেন না। তাঁর হাত-পা কাঁপছে ঝিমঝিম করে, পৃথিবী দুলছে মাতালের মতো, আর তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড় হয়ে পড়েছে।

কিন্তু বেশি খুঁজতে হলো না। ও বাড়ি থেকে সে সময় খবর এল যে, ফরিদকেও সকাল থেকে খুঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সে একখানা দু'ছত্র চিঠি লিখে রেখে গেছে :

"আমাদের কেউ খোঁজ কোরো না, খুঁজে পেলেও আমরা ফিরে আসবো না। আইনত আমরা দু'জনেই সাবালক—অতএব আমাদের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তোমাদের কোনো লাভ নাই। ইতি—ফরিদ।" রউফ সাহেব সম্পূর্ণ চিঠিখানা পড়তে পারলেন না। পায়ের তলায় ঘরবাড়ি সব দুলছে—ভয়ঙ্করভাবে দুলছে। এত অন্ধকার চারদিকে
অসহায়তা! বৃদ্ধ আবার কিছু দিনের জন্য শয্যাশায়ী হ'লেন।

www.pathagar.com

আস্তে আস্তে আবার তিনি প্রকৃতস্থ হলেন, কিন্তু তাঁর চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেলো। কোনো কথা তিনি ভাল করে বুঝে উঠতে পারেন না। মুমূর্ষু পশুর মতো তাঁর চোখে মুখে অসহায় ব্যাকুলতার ভাব। কাঁদার ক্ষমতা পর্যন্ত তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তবু মাঝে মাঝে মন কেমন ওঠে—লতিফাকে কাছে পেতে চায়। লতিফার জিনিসপত্র নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করেন, যেন ওর মধ্যে লতিফার স্পর্শ আছে। শস্যহীন প্রান্তরের মতো ঘরবাড়ি অত্যন্ত শূন্য মনে হয়। কি কাজ তিনি করবেন তা বুঝে উঠতে পারেন না।

একদিন গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। কোনো সাড়াশব্দ নাই আশেপাশে। বাইরের স্তিমিত অন্ধকারে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা নিয়ে জ্বলছে অপরিমাণ জোনাকির আলো। ঝিঁঝিঁর শব্দও শোনা যায় না। একটা গভীর নিস্তব্ধতা বোবা বেদনার মতো বুকে-পিঠে তাঁকে চেপে ধরে। বদ্ধ ঘরের মধ্যেও নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। মনে হয় যেন তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে—সুফিয়া, রাহেলা, আরও অনেকে। চোখের সামনে ভাসে রাহেলার মৃত দীর্ঘ-বিলম্বিত ভয়াবহ দেহ। ভয়ে তাঁর শরীর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ঘরের মধ্যে তিনি আর থাকতে পারেন না। কাঁপতে কাঁপতে বাইরে চ'লে আসেন।

এমনি এক শীতে রাত্রে পৃথিবী যখন গভীর আলস্যে ঘুমুচ্ছে—রউফ সাহেবকে তখন নদীর ধারে দেখা গেলো। ভয়-বিবর্ণ তাঁর মুখ, কপালের পাশে ঘাম জেগেছে, শরীর কাঁপছে থরথর ক'রে। আস্তে আস্তে এসে তিনি অশথগাছের তলায় দাঁড়ালেন। শীতার্ত অশথগাছে একটি পাতাও নাই, শুধু কঙ্কালের মতো বিশীর্ণ তার দেহখানি দাঁড়িয়ে আছে। ওর ডালপালা থেকে উড়ে গেছে পাখিরা। যাদের কলকাকলিতে সারাদিন মুখরিত থাকতো নদীতট, তারা উড়ে গেছে। তারা বাসা বেঁধেছে অন্য কোনো দেশে গিয়ে। তাদের সংবাদ গাছটি জানে না—শুধু পীড়িত দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রউফ সাহেব ভাবছিলেন লতিফার কথা। সে কোথায় চলে গেছে, এখান থেকে কতদূর সে দেশ—সে কি একবারও তাঁর কথা ভাবে না? তিনি তো তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেননি, তবু সে কেন গেলো—পালিয়ে গেল কেন? লতিফা কি ভুলে গেছে তার শৈশবের কথা? মোমের মত উষ্ণ-নরম একটি শিশুর শিয়রে ব্যাকুল পিতার কথা কি তার একটুও মনে নাই? লতিফা, তুই ফিরে আয়—কেউ কিছু বলবে না তোকে। কিন্তু সে-কাতর ডাক শোনে না কেউ। পৌষ-রাত্রের শীত দুর্বল সে-ডাক সুখ-উজ্জ্বল বসন্তদিনের কানে গিয়ে পৌছোয় না, যেখানে যৌবন-সুন্দর দেহ নিয়ে লতিফা তার বন্ধুর বুকে ঘুমুচ্ছে।

লতিফা চলে গেছে এক বছর। শরীরে মনে দ্রুত ভাঙন লেগে এই এক বৎসরের মধ্যেই রউফ সাহেবের বয়স যেন আরও কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে। দেহে, মনে কোন রকম উৎসাহের লেশমাত্র আর তাঁর মধ্যে নাই! ক্ষুদ্র সম্পত্তি দেখাশুনার অভাবে কতক নীলামে চ'ড়েছে, কতক পরের হাতে পড়েছে। কিন্তু এসকল দিকে তাকানোর অধ্যবসায় রউফ সাহেবের আর নাই। বাড়ির চাকর-বাকর, লোকজনও সকলেই সরে পড়েছে। এখন বাড়িতে তিনি একা থাকেন। পাঁচীর মা এসে তাঁর রান্না করে দিয়ে যায়। পশ্চিম ঘরের পাশেই তাঁর যৌবন-সঙ্গী প্রাচীন ঘোড়াটা পড়ে থাকে—তার সহিস চলে গেছে, আস্তাবল ভেঙে পড়েছে। খোন্দকার সাহেব নিজেই তাকে খাবার দেন, যথাসাধ্য শুশ্রূষা করেন।

নদীর ধারে প্রাচীন বনস্পতির নিবিড় ছায়া-বিতানে বসে কয়েকটি বৃদ্ধ জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে আলোচনা করে। বৃদ্ধদের মধ্যে একজন বললো : রউফ সাহেব বোধ হয় আর

www.pathagar.com

বাঁচবেন না, অসুখ বড্ড বেড়ে গেছে। আহা, অমন জোয়ান, অমন সৌখিন লোক আমাদের সময় আর একজনও ছিল না। আজ তাঁর মুখে পানি দেওয়ার লোক নাই।

পীর আলী উত্তর দিল এক কোণ থেকে : নাঃ, বাঁচার আর কোনো আশাই নাই। সেদিন রউফ সাহেবকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে আর চিনতে পারেন না, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চিনলেন। সত্যি, বেচারার অবস্থা দেখলে কান্না পায়।

সকলেই রউফ সাহেবের বিপদে সহানুভূতি জানায়। রউফ সাহেবের উপর এখন আর কারুর ঈর্ষা নাই। সকলেই একটু কৃপা করতে চায় তাঁকে। তারপর উঠলো জমি-জমার কথা।

পীর আলী আফসোস করে বললো যে, তাঁর জমি-জিরাতগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ভালো ফসল হয় না। নদীর ওপারে একখানা শস্যহীন মাঠের দিকে সে আঙুল বাড়িয়ে বললে : ঐ মাঠে একসময় সব চাইতে বেশী ফসল হতো—এখন কিছুই হয় না।

সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে নদীর ওপারের মাঠটাতে। ধু ধু করছে অনুর্বর শস্যহীন মাঠ। মৃত্তিকার ঐ ধূসর করোটির উপর যে কোনোদিন শ্যামলতার চিহ্ন ছিল, এ কথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়।

কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার পর রউফ সাহেব আজ আবার উঠতে পেরেছেন। শুয়ে শুয়ে তিনি দেখছিলেন যে, ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে তাঁর ঘরের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। হয়তো ক'দিন ভালো খেতে পায়নি। রউফ সাহেব কোনোরকম টলতে টলতে ঘোড়াটির পাশে এসে দাঁড়ালেন। ঘোড়াটি একবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না—কাতর আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলো। রউফ সাহেব ঘোড়াটির অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন, কিন্তু ওর রোগ বেড়ে যাচ্ছিল দিন দিন, রোগ সারবে না বলেও আর কোনো চিকৎসক এখানে আসে না। তারা জানে যে, বিশেষ কিছু মোটা রকমের খরচ করার সামর্থ্যও তাঁর আর নাই। রউফ সাহেব কোনোরকমে ঘোড়াটির খাবার জোগাড় করে দিলেন, কিন্তু সে খেলো না, ও যেন শুধু রউফ সাহেবের পাশেই থাকতে চায়! রউফ সাহেব ঘোড়াটির গায়ে ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন, সে-ও নির্জীব আলস্যে তার মাথাটা রউফ সাহেবের পিঠের উপর তুলে দিলো। দুটি বিরুদ্ধ গোত্রের প্রাণীর নিকট-সান্নিধ্য বঞ্চিত জীবনের বাক্যহীন পরম সহানুভূতি।

রউফ সাহেব আজ অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘোড়াটির পাশে থাকলেন। পাঁচীর মা একবার তাগিদ দিতে এসেছিল : ঠাণ্ডা লাগবে, ঘরের মধ্যে যান। রউফ সাহেব অসহায়ের মতো ঘোড়াটির আরও একটু কাছে এসে বসেন। এর কাছে আর একটু থাকার জন্য প্রার্থনা করেন--শিশুর মতো মিনতি করে বলেন : না পাঁচীর মা, এখানে আর একটু থাকি—তারপর উঠে যাবো। মুখরা পাঁচীর মার মনেও সেই আবেদনের রেশ কেমন করুণ হয়ে বেজে ওঠে—তার চোখ ভিজে যায় সমবেদনায়। চোখ মোছার জন্য সে তাড়াতাড়ি সরে যায়। পাহাড়ের মতো সেই জোয়ান—তাঁর এই দশা! পাঁচীর মা'র মন রউফ সাহেবের জন্য কেঁদে ওঠে, অব্যক্ত বেদনায় তার বুক ভ'রে আসে। কয়েকবার কাশির আওয়াজ শুনে পাঁচীর মা বাইরে এলো। রউফ সাহেব অন্ধকারে ঘোড়াটির বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে আছেন। পাঁচীর মা তাঁকে জাগিয়ে দিলে তিনি কাশ্‌তে কাশ্‌তে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

"আজ আবার সেই রকম ব্যথা জেগেছে।" রউফ সাহেব কষ্টের সাথে নিশ্বাস টানতে টানতে বললেন। পাঁচীর মা শঙ্কিত হয়ে উঠলো। সে বুঝলো যে, তাঁর বুকে ঠাণ্ডা লেগেছে। সে কোনো উত্তর দিতে পারলো না। কয়েকদিন আগেই বুকে ঠাণ্ডা লেগে একবার তিনি মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা লাগার বিপদ যে কোথায় দাঁড়াবে, এ কথা সে বুঝতে পারছিল।

আস্তে আস্তে তাঁর রোগ অত্যন্ত বেড়ে উঠলো। পাঁচীর মা কয়েকদিন জেগে রউফ সাহেবের ডবল নিউমোনিয়ার সাথে প্রাণপণ সংগ্রাম করলো, কিন্তু ফল হলো না তাতে কিছুই।

সেদিন শেষ রাত্রির চাঁদ যখন দিগন্তের মুখে মুখ বাড়িয়েছে, তখন রউফ সাহেবের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে রক্ত বেরুতে লাগলো তীব্র ঝলকে ঝলকে। লাল টকটকে তাজা রক্ত হাতে উঠিয়ে নিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। যৌবনে এই রক্তে ছিল অপরিসীম প্রাবল্য, বহুবর্ষ নির্জীব থাকার পর তারা আবার প্রকাশিত হয়েছে। বেলাশেষে অস্ত যাবার সময় সারা আকাশ রক্তরঞ্জিত করে দিয়ে যেতে শেষ রশ্মির কোনো কার্পণ্য নাই।

অসহ্য বুকের বেদনায় তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না। শুধু ভয়ার্ত দৃষ্টি ঘুরছিল চারপাশে, সে-দৃষ্টি প্রতীক্ষমাণ কারুর জন্য অপেক্ষায় আছে। পাঁচীর মা ব্যাকুল হয়ে তাঁকে দেখছিল। কানের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো : কাউকে ডাকব? রউফ সাহেব উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁর দু'চোখ বেয়ে দু'টি ধারা নেমে এলো। ক্রমে ক্রমে তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। সমস্ত শরীরের উত্তাপ আর শক্তি নিয়ে যে যন্ত্র বেঁচেছিল তারা অসাড় হ'য়ে এলো। শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে কোনো রকমে তিনি একবার বললেন 'লতিফা', না লতিফা আসে নাই। তার আসার প্রয়োজন নাই।

ভোরের দিকে রউফ সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন চিরদিনের জন্য। বড়ো কষ্টময় তার নিঃসঙ্গ জীবন—ক্লান্তি অবসাদ আর নৈরাশ্যে ভরা—শেষ হয়ে গেলো নতুন দিন আসবার আগে।

পত্রঝরা ছায়াবিরল বনস্পতির নিচে সেই বৃদ্ধদের আসর বসে। কিন্তু তাদের দল ছোটো হয়ে এসেছে—নতুন বৃদ্ধেরা সেই দলে মিশবার চেষ্টায় আছে। নদীর পরপারে সেই মাঠখানি সম্পূর্ণ শস্যহীন হয়ে হাহাকার করছে। বোধ হয় ওখানে আর শস্য ফলবে না কোনোদিন। বসুধা ওখানে মৃত—উৎপাদিকা-শক্তিহীন।

বিবর্ণ

জীবন, আলো আর আ-দিগন্ত মুক্তি।

নগর-প্রান্তের অট্টালিকাশ্রেণীর ক্রূর ইঙ্গিতে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ আকাশের বীজাণুময় ধুমাচ্ছন্নতা কখনো এই তিনটি জিনিসের প্রার্থনা করে কিনা জানি না। কিন্তু দিনের প্রথম সূর্য আর শেষ রাত্রির চাঁদ দিগন্ত অতিক্রম করার সময় আকাশের এই বিবর্ণ যবনিকাকে যখন

www.pathagar.com

আলোকিত করে তুলতে ব্যর্থ চেষ্টা করে, তখন ঠিক ঐ তিনটি জিনিসের একটু সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যই হাসিনার রক্তের প্রতি কণিকা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

বিবর্ণ আকাশ আর বিবর্ণ আশাহীন মন—এদের মুক্তি কামনা নিয়েই আমার এই গল্পের সূত্রপাত।

উষ্ণ অন্ধকারের বায়ুহীন আবেষ্টনে রক্ষিত অকালে তুলে আনা ফলের বাইরের আবরণ যেমন পেকে ওঠে, কিন্তু ভিতরের অংশ পরিণত হবার শক্তি হারিয়ে ফেলে—তেমন মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেও হাসিনা তার বুকের আনন্দ সেই হাসির অনুপাতে অতি দ্রুত হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু এইটুকু হাসিনার পরিচয় নয়।

হাসিনাকে চেনে আড়িয়াল খাঁ নদী—পাঁচ মাইল প্রসারের মধ্যে যার উদ্দামতা নিয়তির মতো দৃঢ় হস্তে হাসিনার ললাটে পরাজয়-টীকা পরিয়ে দিয়েছে।

অনেকদিন আগে আড়িয়াল খাঁর তীরে সাবেকী আমলের প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়ির বারান্দায় বসে আড়িয়াল খাঁর সাথে হাসিনার পরিচয় হয়। ভাটি পথে হাটুরিয়া দল নদীর স্রোতে প'ড়ে তীব্র বেগে উধাও হয়ে যেত আর বর্ষাকালে দিগন্ত মথিত করে ঘোলাপানির ঢেউ বিরাট অজগরের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে তীরে এসে প্রবল বেগে আঘাত ক'রতো। মধ্যনদী দিয়ে তলোয়ারের মত চকচকে স্থির ধারাল প্রবাহ ব'য়ে যেত। কিন্তু দূরে বসে তার গতি অনুভব করা যেত না। সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো সেই বিশাল স্রোত মৃত্যুর ভ্রূকুটির মত দুই তীরের বাড়ি আর গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকত। মৃত্যুর মতই সকলেই সেই স্রোতকে ভয় করত।

গল্পের প্রথমাংশকে নদীর স্রোতের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বলে মনে হবে। সত্যিকারের গল্প শুরু হবে আর একটু পরে—মৃত্যুর হিমস্পর্শ যখন আড়িয়াল খাঁ নদীকে দুইচরের বাঁধুনির মধ্যে কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে আমাদের চোখ থেকে অনেক—অনেক দূরে।

হাসিনার বিয়ের পর অনেক রাত্রিতে একদিন নদীর গর্জন শোনা গেলো—বুভুক্ষু অজগরের সংক্ষুব্ধ গর্জন। বাহিরের মহল ভাঙলো, খাসমহল ভাঙলো, অন্দরের মহল ভাঙলো—অতি দ্রুত বিপর্যয়ের মধ্যে। নদীর ভাঙন হঠাৎ শেষ হয়ে গেলো!

এবার শুরু হলো মৃত্যুর খেলা। হাসিনার স্বামী নিজাম নদীর মতো প্রাণবত্তা হারিয়ে নদীর তীরেই যেদিন নিঃশেষ হয়ে গেলো, আড়িয়াল খাঁর কাজ শেষ হ'ল ঠিক সেই দিন।

অবশেষে মুমূর্ষু নদী তার তরঙ্গের আঘাতে হাসিনাকে সরিয়ে দিল অনেক দূরে। আকাশ যেখানে বিবর্ণ, আড়িয়াল খাঁর মত সুবিস্তৃত পরিসর যেখানে পাওয়া অসম্ভব, সেই অভিশাপের বুকে।

এবার গল্পের আরম্ভ। এতক্ষণ যা বলেছি তা পূর্বাভাস, ধোঁয়াটে আর কুয়াশাচ্ছন্ন। এ কথাগুলোর প্রয়োজন অল্প। কিন্তু এই ভাঙনের সাথে গল্পের সম্বন্ধ অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে যাচ্ছে বলে আমাকে এই কথাগুলো বাধ্য হয়ে বলতে হলো। নদী ভেঙেছে তার দু'কূল, ঘর-বাড়ি, আর ভেঙেছে হাসিনার মন, প্রশস্ত করেছে মনের ব্যাপকতা। নদীর প্রভাব এইটুকু।

কলকাতার বদ্ধ ঘরে শুয়ে হাসিনারও এই কথা মনে হয়। আড়িয়াল খাঁর ভাঙনের একটি আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য জেগে ওঠে তার মনে। অন্দর মহল ভেঙে যাবার পরে হাসিনারা নদীর

www.pathagar.com

বুকে শুয়ে আছে বোটের উপরে। গাছপালার প্রতিবন্ধকতা নাই। তাদের চিহ্ন বিলুপ্ত করেছে আড়িয়াল খাঁ। চারপাশে শান্ত ঘষা কাঁচের মতো স্রোতহীন নদী নিস্তরঙ্গ নীরব। এমন সময় দূরের অন্ধকারকে স্বচ্ছ করে জেগে উঠলে দ্বিতীয়ার হলুদ রঙের চাঁদ। আকাশ আর পৃথিবীর অসীম মুক্তি। আড়িয়াল খাঁ তার সর্বনাশ করে শিখিয়েছে এই মুক্তির আনন্দ যার জন্য হাসিনা সব বিলিয়ে দিতে পারে। একটু আলো চাই, একটু আলো চাই, আর কিছুর দরকার নাই জীবনে।

কিন্তু মুক্তি পায়নি সে ; আমাদের গল্পের উপাদান সেই না-পাওয়ার আকাশ। এখানে সীমাবদ্ধ বিবর্ণ, শুধু মাঝে মাঝে সেই বিবর্ণ আকাশ থেকে উল্কা ছুটে হয়তো আড়িয়াল খাঁর বিস্তৃত বালুচরে। হয়তো আরো দূরে—মৃত্যুপারে নিজামের বিস্তৃততর দেশের অভিমুখে।

বদ্ধ ঘরে সমস্ত রাত্রি গুমোট গরমে আধঘুমে কাটিয়ে হাসিনা ভোর হবার একটু আগে কোনো রকমে নিজের জীর্ণ শরীরটাকে টেনে তুলল ; পাশে তার মা ঘুমোচ্ছেন আর তার পাশে হাসিনার মেয়ে অসাড় হয়ে আছে ঘুমের কোলে। হাসিনার একটু ইচ্ছা করে, মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে আরো একটু ঘুমোয়, চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। ক্লান্ত শরীর বিছানার উপর ভেঙে পড়তে চায়। কিন্তু আর শুয়ে থাকা চলে না। উঠতেই হবে, অনেক কাজ। অনেক নিষ্পেষণ সারা দিন তার উপর দিয়ে চলবে। মেয়েটাকে একটু আদর করতেও ভয় হয়, পাছে রেগে ওঠে।

আর ঘরের মধ্যেও সত্যি থাকা চলতো না, এত গরম এত বদ্ধতা সেখানে। হাসিনা বারান্দার এসে দাঁড়ায় রেলিং ধরে। উপরে বিবর্ণ আকাশে একটি তারারও প্রাণসংকেত নাই। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে ঝাপসা প্রশ্বাস বেরিয়ে আকাশের নীলকে বিষাক্ত আবরণে ঢেকে ফেলেছে। দম বন্ধ হয়ে আসে। সেখান থেকে উঠে এসে নামাজ পড়ার সময় চোখের পানিতে তার বুক ভেসে যায় : "একটু মুক্তি দাও খোদা !"

তার সারা দিনের কাজের বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। হাসিনা ভুলে গেছে তার বিগত দিনের আর্থিক সচ্ছলতার কথা। কিন্তু বাড়ির অন্য সকলকে ভোলেনি। তাই হাসিনা যতই সকলের মন জুগিয়ে চলতে চায়, ততই তাকে আঘাত সহ্য করতে হয়। হাসিনা দুঃখিত হয়, কিন্তু দোষ দেয় না কাউকে।

মাঝে মাঝে মা ক্ষেপে ওঠেন, মেয়ে রেগে যায় ; মধ্যে পড়ে হাসিনা—ঝগড়ার সমস্ত বিষ তাকে বুকে পেতে নিতে হয়।

মা বলেন : আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কার জন্য এত কষ্ট সইব? ঘর-বাড়ি আমার নাকি যে এত কষ্ট সইব !

সত্যই বৃদ্ধার কষ্ট হয়, এ কথা সে জানে। তবু আর কি সে করতে পারে? সমস্ত শরীর যতোখানি কুলোয়, কষ্টই তো সে সহ্য করে। তবুও কেন ওরা এই রকম বলে।

হাসিনার সমস্ত রগ নিঙড়ালে খুব সামান্য রক্তই পাওয়া যাবে। তার এই রক্ত নিঃশেষ হয়েছে ওদের জন্যেই। এখনো তো তার মাথা ধরে আছে। হাড়ের মধ্যে একটা বেদনা ছুরির মতো কুরে কুরে দাঁত বসাচ্ছে। এ-কথা তো সে বলতে পারে। একটু বিশ্রাম নিতে পারে। কিন্তু চাকর-বাকরের রান্না একবারের জন্যও কারুর মুখরোচক হবে না বলেই তো সে প্রাণপণ চেষ্টা করে রান্নাঘরে বন্ধ হয়ে আছে।

www.pathagar.com

এই সমস্ত ঝগড়া-ঝাটিতে তার মন একেবারে ভেঙে পড়ে, ঘর-বাড়ি ছেড়ে একটু বাহিরে বেরিয়ে প'ড়তে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বাধা পড়ে। হাসিনার প্রলুব্ধ মনের সামনে দিয়ে একটা দিগন্ত-প্রসারী মুক্তি ব'য়ে যায়, তার পায়ের তলাকার পৃথিবী দুলতে থাকে সেই নেশায়! প্রাত্যহিক বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণে ঘূর্ণমান পৃথিবীর বুকে সেই আনন্দ যেখানে-সেখানে জেগে ওঠে। হয়তো সে বেশী দূরে নয়। পাঁচ মিনিট চললেই সামনের পার্কে সবুজ ঘাসের মধ্যে সেই আনন্দের বীজ ছড়ানো রয়েছে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু হাসিনার মনে হয়, সেই আনন্দ যেন তার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চলে গেছে অনেক—অনেক দূরে। যেখানে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—এই রান্নাঘর, এই কাজের ব্যস্ততা ছেড়ে।

বারেবারে এই কথা ভেবে সে নিরাশ হয়ে পড়ে—তবু লোভ ছাড়তে পারে না। তার বড়খোকা এসে আবার এই লোভ বাড়িয়ে দিয়ে যায়। সে তাকে নিয়ে যেতে চায় অফুরন্ত জীবনের স্বচ্ছ আবহাওয়ায়।

সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে কোনোরকম নাকে মুখে কিছু দিয়ে যখন হাসিনা উঠে দাঁড়ায়, তখন তার মেয়ে এসে গম্ভীর হয়ে বলে : "আমার ফ্রক সেলাই করে দাও"।

কি ভেবে হাসিনা খুশী হয়ে উঠে বলে : "হ্যাঁ দেব—যদি আমার মুখে একটা চুমু দাও।"

এই বলে নিজেই ওর মুখে চুমু খেতে যায়!

"আ—নানী, দ্যাখ না মা কি করে", বলে চেঁচিয়ে রেগে উঠে মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে যায়।

মন খুলে কথা বলারও উপায় নাই। আদর-যত্ন পাওয়া তো দূরে থাক সাথীহারা ডাহুকীর মতো ওর চোখ সজল হয়ে ওঠে ; কোলের কাছে সেলাইকল টেনে নিয়ে হাসিনা সেলাই করতে বসে। অনবরত দ্রুত গতিতে চাকা ঘুরতে থাকে যেন ঋতুচক্রের দ্রুত পরিক্রমা। কলের সাথে কাজ করতে করতে বারেবারে হাসিনা ঘড়ির দিকে তাকায়—তিনটে, চারটে, সাড়ে চারটে।

হাসিনার মুখ খুশিতে ভরে যায়। দেওয়াল পঞ্জিকার মস্ত লাল অক্ষরটা আর ঘড়ির কাঁটা দুটো ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হোস্টেল থেকে এবার ওর খোকা আসবে। মাঝে মাঝে সে আসে, আজ তার আসার দিন।

হাসিনার নিঃসঙ্গ জীবনে ওর খোকা সাগরই একমাত্র আনন্দ।

হাসানের জন্মের এক মাস পরে হাসিনার মনে হয়েছিল আড়িয়াল খাঁ নদীর কথা। বর্ষার উচ্ছৃঙ্খল নদীর উদ্দামতা শেষ হয়েছে প্রশান্ত বুকে। হাসিনার খোকার চোখেও সমুদ্রের সেই প্রশান্তি। হাসিনা তাই ওর খোকা হাসানকে সাগর বলে ডাকে।

সাগর হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। মা'র কাছে আসার সুযোগ তার কম। এই বাড়িতে এসে সেও বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। তরুণ মনে সমুদ্র-স্বপ্ন। বদ্ধ ঘরের চারখানা ওয়াল তাকে পীড়া দেয়। তার কাজও অনেক। প্রত্যেক দিন আসার ইচ্ছা থাকলেও মার কাছে সে সব সময় আসতে পারে না।

হাসান এসে বসল তার মায়ের কোল ঘেঁষে।

সেলাইকল বন্ধ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

হাসিনা অভিমান করে বলে : "এতক্ষণে এলি তুই? কে আসতে বলেছিল? যেখানে ছিলি সেখানেই যা।"

"যাব?" হাসান দুষ্টুমি করে বলে।

হাসানের মাথা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ওর মা বলে : "হ্যাঁ, যা।"

"মা চলো" তোমাকে খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। তোমার শরীরটা বসে বসে নষ্ট হয়ে গেল যে! চলো আজ যাই।"

হাসিনা চমকে ওঠে প্রত্যাশিত আনন্দে। "বেড়াতে যাব কোথায়? পাগলা, কত কাজ আমার।"

"না-না, কাজ-টাজ নয়। ওরা কাজ করবে। তুমি চলো।"

বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে ওর মনটা ঝড়ের মত দুলছে। কত দিন কত যুগ যেন সে মাটির উপর দিয়ে হাঁটতে পায়নি। শিশুর মত ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আকাশ আর পৃথিবীর অসীম মুক্তির মধ্যে ও বেড়াবে। হাসিনার ক্লান্ত দেহটা প্রজাপতির মতো লঘু হয়ে ওঠে এক নিমেষে। দিন-রাত্রির সমস্ত গ্লানি হাসিনা ভুলে যায়।

আকাশে মেঘ করে আসে। হাসান বলে : "তাই তো মেঘ করে এল।"

"বেশ তো! বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বেড়াব। চমৎকার হবে।"

হাসিনার মনে জাগে তার শৈশবের কথা। আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙনে দুই পাশের ধানক্ষেতে প্রথম বর্ষণে মাটির সোঁদা গন্ধ। খুশিতে তার মনটা আরো লঘু হয়ে যায়। ছোট মেয়ের মত আব্দার করে বলে' "আমি কিন্তু অনেক ঘুরব। তুই আবার হোস্টেল হোস্টেল করিস্ না যেন। সমস্ত মাঠ হেঁটে বেড়াব ভিজে ভিজে! জানিস্ সাগর, ছোট বেলায় আমার হাঁটার অভ্যাস ছিল—তিন মাইল, চার মাইল হেঁটেছি। আচ্ছা আজ কতখানি ঘুরবি!"

"তুমি যতখানি পার ততখানি। তারপরে গাড়ি করে চলে আসব।"

"না-না, বদ্ধ গাড়িতে নয়, আমি হেঁটে আসব।"

"আচ্ছা তাই এসো।"

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসানের বড় মায়া হয়। আহা বেচারী! আট্‌কে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে। আর তাছাড়া ওর সাথে ভালো ক'রে কেউ মেশেও না। আজকে ওকে নিয়ে সে অনেক ঘুরবে। হোস্টেল-সুপারিনটেন্ডেন্ট বকবে—বয়ে গেল তাতে!

"সাগর, খাবি আয়।"

"আমি খেয়ে এসেছি মা।"

"খেয়েছিস না খেয়েছিস! ওই তো তোর ক্ষিদে পেয়েছে।"

"মা তুমি তো বেশ লোক! আমার ক্ষিদে পেয়েছে কিনা, তুমি জানলে কি ক'রে?"

"আচ্ছা, হয়েছে। এবার আয়, আমার সাথে খাবি।"

হাসানকে কোলের কাছে টেনে ওর মা খেতে বসে। কিন্তু সমস্তই হাসানের মুখে তুলে দেয়।

"মা, তুমি খাচ্ছ না। আমি খাব না তা'হলে।"

www.pathagar.com

"নারে পাগল, এই যে আমি খাই।"

কিন্তু ওর খাওয়া হয়ে ওঠে না। হাসানের ধমক শুনে বলে : "খুব ভাল লাগছে খোকন! খেতে পাচ্ছি না।"

শিশুর মত খুশি হয়ে উঠেছে হাসিনা। যেন একটা পুতুল পাবার লোভে ছোট্ট খুকি নাওয়া-খাওয়া ভুলেছে।

ওর মা'র এই বেড়ানোর লোভ দেখে হাসানের মন আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। ভাবে যদি ওর অবসর থাকত তা'হলে প্রত্যেকদিন মাকে বেড়াতে নিয়ে যেত।

হাসিনা ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞেস করে : "কখন যাবি?"

"তুমি যখন বলো। সন্ধ্যার পরে গেলেই ভাল হয়।"

"হ্যাঁ, তাই ভাল। আমি এখন গোসল করে ফেলি।"

স্নান সেরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসিনা দেখতে লাগল, আকাশের বিবর্ণতা ঢেকে গেছে গভীর কাজল রঙের মেঘে। হেমন্ত-গোধূলির মতো নরম ও শীতল ছায়া প'ড়েছে পৃথিবীর উপরে। বুক জুড়িয়ে যায় সেই ছায়াতে।

হাসিনা ভাবে, সন্ধ্যা হ'তে আর কত দেরি?

বঞ্চিত জীবনে হঠাৎ পাওয়া একটা অপ্রত্যাশিত মুক্ত সন্ধ্যা আসবে বহুদিন পরে। প্রভাতের পাখির মত আনন্দে হাসিনার মন দিশাহারা হয়ে যায়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় না। হাসিনার মা আপত্তি করেন : "বাড়িতে কাজ বাকি আছে।"

হাসান বলে : "আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি মা।"

হাসিনার মা বিরস মুখে বলেন : "না, তোমার যাওয়া হবে না, এত রাত্রে মেঘ-বৃষ্টির মধ্যে বেড়ান কেন?" বৃদ্ধার নির্মম ঔদাসীন্য হাসিনার মনের আগ্রহ ঔৎসুক্য বহুদিনের একটি আকাঙ্ক্ষাকে থেঁৎলে মাড়িয়ে মাটির সাথে বিলীন করে দেয়।

এক মুহূর্তে ভেঙে পড়ে হাসিনার সকল আনন্দ! সাগরও বিমূঢ় হয়ে যায়। কিন্তু আর কি বলা যেতে পারে! প্রতিবাদ করলেই তো একটা প্রলয়কাণ্ড বেধে ওঠে। হাসিনার আনন্দোজ্জ্বল মুখ নিমেষের মধ্যে শবের মতো পাণ্ডুর হয়ে যায়। চৌকির উপর নিজেকে সামলে নিয়ে কোনরকমে বসে, হতাশ করুণ কণ্ঠে হাসিনা বলে : "খোকন, তুই হোস্টেলে যা।"

মায়ের মুখের দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হাসান চলে যায়। পাথরের মতো একটা ভারি বেদনা তার বুকে জমা হয়ে ওঠে। সারা বিকেল ঘরের বাইরে যাবার জন্য মার উল্লাসের কথা মনে পড়ে। ছোট খুকির মতো আগ্রহে মা সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বসেছিল! কিন্তু এতখানি আগ্রহকে একটি অকারণ আপত্তির তলায় নিষ্পিষ্ট হ'য়ে যেতে দেখে তার সমস্ত মন নিরাশ বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। হাসান তাড়াতাড়ি পথে নেমে আসে।

আকাশে যখন কাজল মেঘ কেটে গেছে, সেখানে জেগে উঠেছে নির্মম ঔদাসীন্যের কঠোর বিবর্ণতা!

www.pathagar.com

অন্তর্লীন

কল্পনাবিলাসী শাহ্‌রিয়ার। বন্ধুরা বলে যে জানার চেয়ে অজানার প্রতি তার বেশী আকর্ষণ। অজ্ঞাত তিমিরে পথ পিপাসু তার হৃদয়।

শাহ্‌রিয়ারকে কেউ বলে নাস্তিক, কেউ বলে অহঙ্কারী। শাহ্‌রিয়ার নিজের মতের উপর দৃঢ় আস্থা রাখে, কিন্তু সে সত্যি নাস্তিক বা অহঙ্কারী নয়। শারীরিক কামনাকে সে সহজ এবং প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে, কিন্তু সে অসচ্চরিত্র বা অসংযমী নয়।

সাধারণ লোকের মত সে পরীক্ষায় পাশ করলে চাকুরি পেলে এবং অবশেষে বিয়ে করলে। বিয়ে করার মধ্যে তার কোন রোমাঞ্চ ছিল না, ছিল না অতিরিক্ত লোভ বা আসক্তি, তবুও সে একদিন বিয়ে করল—জীবনকে সুন্দর করার জন্য। বিয়ে করার প্রয়োজন তাই সে বিয়ে করল। শারীরিক কামনা তার ছিল না, এ কথা বলা চলে না। কিন্তু জীবনের তেত্রিশ বছর সে একা কাটিয়ে এসেছে। আরো তেত্রিশ বছর একা কাটাতে তার বিশেষ আপত্তি ছিল না। শাহ্‌রিয়ার স্বীকার করে না যে এই পার্থিব আনন্দের মধ্যে অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক জীবন প্রতীক্ষা করছে। তার কাছে ফুল ফোটানো মুখ্য এবং ফল ধরানো গৌণ কাজ। ফুল ফোটানোর প্রয়োজনীয়তা আছে ফল ধরানোর জন্য, এ কথা সে অস্বীকার করে না। কিন্তু সে ফুল ফোটানোকেই বড়ো মনে করে, ফল ধরানোকে নয়। নরনারীর মিলন সমাজ নির্দিষ্ট করেছে বিবাহের মধ্যে। নরনারীর সুকুমার মিলনই তার প্রধানত কাম্য, সন্তান উৎপাদন সেখানে গৌণ কাজ।

সুতরাং সে বিয়ে করতে আপত্তি করল না। এবং আস্তে আস্তে বিয়ের গোলমাল শেষ হোলো—শেষ হোলো নববধূর সলজ্জ সান্নিধ্যের অস্বস্তি। আগেকার অনাস্বাদিত জীবন নিয়ে সে আবার চলতে লাগল পূর্বনির্দিষ্ট পথে কর্মব্যস্ততায় আর জ্ঞানানুশীলনে।

রিহানাকে তার ভাল লেগেছে। না লাগার কোন কারণ ছিল না। রিহানা সুন্দরী ও শিক্ষিতা। শাহ্‌রিয়ার আনন্দ পায় তার সান্নিধ্য, তার ভালবাসার একান্ত নির্ভর আন্তরিকতায়। শাহ্‌রিয়ার যখন অফিসে যায়, তখন রিহানা তার পকেটে ফুল গুঁজে দেয়; বেলাশেষে যখন ক্লান্ত হয়ে সে ফিরে আসে তখন রিহানা তাকে স্বাগতম জানায় মাধুর্যের সন্ধ্যাস্বপ্নে। পথিক শাহ্‌রিয়ারের জীবনে রিহানা নীড়ের স্বপ্ন জাগিয়েছে।

বিয়ের পর তাদের সম্মিলিত জীবন পরস্পরকে আশ্রয় করে সুদীর্ঘ আনন্দের স্রোতে ভেসে চললে বহুদিন। পাঁচ বৎসর কেটে গেলো। তারপর এলো শ্রান্তি, রিহানার মনে জাগলো অবসাদ। শাহ্‌রিয়ার একদিন আবিষ্কার করলো যে রিহানার মনে কষ্টদায়ক পীড়া এসেছে, সে তার নিখুঁত সাজানো সংসার নিয়ে সুখী হ'তে পারছে না।

শাহ্‌রিয়ারের বাহুবেষ্টনে থেকে রিহানা তৃপ্ত নয়। সে চায় নিজের সৃষ্টি দিয়ে নিজকে আবদ্ধ রাখতে। তার ভীরু দুর্বল বুক ব্যাকুল স্নেহচ্ছায়ায় কি যেন খুঁজে ফেরে। শাহ্‌রিয়ার বুঝতে পারল রিহানার কামনা। রিহানা চায় সন্তানের মা হতে। শাহ্‌রিয়ারের দেহ কণিকা দিয়ে তার শিল্পীমন একটি শিশু সৃষ্টি করতে যায়। শাহ্‌রিয়ার অস্বীকার করে রিহানার প্রার্থনা। সে

www.pathagar.com

আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় পালিত ; সে চায় না যে পৃথিবীর জনসংখ্যা অনাবশ্যকভাবে মারাত্মকরকম বেড়ে যায়। দেহের দাবি অব্যাহত রেখে সে ভেসে যেতে চায় জীবনের স্রোতে। রিহানা শিক্ষিতা—রিহানা বোঝে না এ কথা। কেন যে বোঝে না, শাহ্‌রিয়ারও তা ঠিক করে উঠতে পারে না।

সেদিন ওরা দু'জন সিনেমায় গেলো। একটি শিশুকে নিয়ে সংসার আনন্দের মধুস্রোতে ভেসে চলেছে—এইটুকু ঘটনা। রিহানা সেই ছবি দেখে হঠাৎ অতৃপ্ত হয়ে উঠলো। প্রশ্নের পর প্রশ্নে সে শাহ্‌রিয়ারকে ব্যস্ত করে তুললো : "দ্যাখো, কেমন চমৎকার ছেলে! কেমন তাকাচ্ছে ওর মায়ের মুখের দিকে। উঃ, বাপটা কি নিষ্ঠুর! মোটে একটা চুমু খেল।" অসহিষ্ণু রিহানা। সন্তানের জন্য একি উগ্র কামনা তার!

কিছুদিন পরে রিহানা তার মামার বাড়ি গেলো। নানা কাজের জন্য শাহ্‌রিয়ারের যাওয়া হ'য়ে উঠলো না। রাত্তিরে সে ঘুমোতো একা, রিহানার জন্য সে-সময় তার মন বড়ো অস্থির হয়ে উঠতো। চাকরের ডাকাডাকিতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলো। টেলিগ্রাম এসেছে : টেলিগ্রাম এসেছে। 'রিহানা মরণাপন্ন। তাড়াতাড়ি এস।'

শাহ্‌রিয়ার গেলো। রিহানার জন্য সমস্ত পথে তার চিন্তার অন্ত ছিল না। যখন রিহানার মামাবাড়ি পৌঁছলো, তখন সকাল হয়েছে, ক্রমবিবর্ধমান আলোক উজ্জ্বলতর উঠছে। ঘাসের শিশিরে তখনো জেগে আছে পূর্বরাত্রির স্মৃতি। রিহানা বোধ হয় তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। শাহ্‌রিয়ারকে দেখে সে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলো। ওঠার ক্ষমতা তার ছিল না, তবু সে কি দুর্দম চেষ্টা! শাহ্‌রিয়ার নিচু হয়ে তাকে শুইয়ে দিল। ভাবলো, হয়তো সেরে যেতে পারে। ডাক্তার কিন্তু তার নেপথ্যে বলে গেলেন যে, এই প্রাণ-শক্তির নেভ্‌বার পূর্ব লক্ষণ।

শাহ্‌রিয়ার ছোটো শালাকে জিজ্ঞেস করলো : "কেমন করে পড়ল সিঁড়ি থেকে?" "ঐ বেলগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতেন সারাদিন"—শালা বললো : "অন্যমনস্ক হয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেছেন।" রাত্রে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। আর একটি ছায়া—শাহ্‌রিয়ারের শরীরের দীর্ঘ ছায়া জাগছিল দেয়ালের গায়ে। রিহানা তার ভাঙা হাতখানি শাহ্‌রিয়ারের কোলের উপর রাখলো। ঘরের স্নিগ্ধ আলোটি পর্যন্ত নরম হ'য়ে এলো সেই মুহূর্তের স্পর্শে।

শাহ্‌রিয়ার জিজ্ঞাসা করলো : "ওদিকে কেন চেয়ে থাকতে?" শাহ্‌রিয়ারের কোলের কাছে আরো নিবিড় হয়ে মিশে রিহানা উত্তর দিল : "তুমি এতদিন কেন এলে না?" তার স্বরে অভিমানের সুর মাখানো। রিহানার চুলে আঙুল ডুবিয়ে শাহ্‌রিয়ার বললো : "শুধু আমার জন্য? ঠিক করে ব'ল—দুষ্টামি কোরো না।" রিহানা লজ্জায় মুখ লুকোলো ; তার রোগ-ধূসর পাণ্ডুর মুখে লেগেছে নবারুণের রক্তিম ছোঁয়া। কম্পিত কণ্ঠে সে বললো : "না, সেজন্য শুধু নয়। বেলগাছে কাকের বাসায় দুটো বাচ্চা হয়েছে, তাই দেখতাম।" শাহ্‌রিয়ার স্তব্ধ হয়ে গেলো। সে এতদিন অমার্জনীয় ভুল করে এসেছে। সে জানতো যে নারী ও পুরুষের দৈহিক কামনা একইরকম। কিন্তু দৈহিক ক্ষুধার উপরও যে নারীর মনে সন্তানের জন্য আর একটি ক্ষুধা আছে সে কথা পুরুষ হয়ে সে জানতে পারেনি। অবশ্য নারীর সন্তান কামনা তার চোখে

www.pathagar.com

মহৎ নয়। সে জানে প্রভুত্বকামী প্রকৃতির অন্যান্য কৌশলের মতো নারীর অন্তরে সন্তান কামনা জাগানোও আর একটি প্রয়োজনীয় কৌশল।

প্রকৃতির সেই ধূর্ত চেষ্টায় রিহানার অন্তরে ক্ষুধিত জননী জন্মগ্রহণ করেছে। সে বঞ্চিত করেছে রিহানাকে তার সেই সন্তান কামনা থেকে—রিহানার জীবনে সবচেয়ে বড়ো সাধ সে অপূর্ণ রেখেছে। আর সময় নাই। রিহানার আয়ু নিভে আসছে। শাহ্‌রিয়ারের মনে হ'ল যে একটি নারী-জীবন শুধু তারই ঐ নির্মম অবহেলার পরম আনন্দ থেকে বঞ্চিত হোলো। তখন আকাশে জ্বলছে অগণিত তারা। শাহ্‌রিয়ার ভাবতে লাগলো অর্থহীন দৃষ্টিতে, সেই দিকে তাকিয়ে।

রাত্রি যখন গভীর হয়ে এলো, হাসনাহেনার গন্ধ যখন বেদনার দূর স্মৃতির মতো ভারি হয়ে উঠলো, তখন রিহানা অজ্ঞান হয়ে পড়লো—সে ভুল বকতে শুরু করলো। রাত্রির অন্ধকারে যতক্ষণ সে বেঁচে ছিল, ততক্ষণ বিবাহের মধ্যে সে শুধু সন্তানের কথাই বলেছে :

"ওই দেখ কেমন সুন্দর ছেলে !"

"তোমার দিকে তাকাচ্ছে ক্যামন দ্যাখো না গো।"

"ওকে একটু চুমু দাও না—মোটে একটা চুমু দিলে ?"

"তোমরা বড় নিষ্ঠুর !"

প্রদীপ নিভে গেল শেষরাত্রে।

নিভে গেল সন্তান কামনার একটি উজ্জ্বল প্রার্থনা।

দশ বৎসর পরের কথা।

শাহ্‌রিয়ারের অজস্র যশ ও সম্মানের পরিবৃদ্ধির সাথে সাথে তার শরীর ভেঙে পড়েছে আশ্চর্যভাবে। জীবনের যে সম্পদ সে একদিন পরম অবহেলায় পথের দু'পাশে ছিটিয়ে এসেছে—জীর্ণ পাদুকার মতো ফেলে দিয়েছে, তার জন্য আজকে উঠেছে লালায়িত হয়ে।

রাত তখন দুটো। শাহ্‌রিয়ার হিসাব দেখছিল। কাজ করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে বাইরে এলো। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে তখন অজস্র তারার ফুল ফুটছে। একটি সুগন্ধ ফুলের গাছ থেকে তীব্র গন্ধ ছুটে আসছে। শাহ্‌রিয়ারের হঠাৎ মনে পড়ে গেলো অনেকদিন আগেকার রিহানার মৃত্যু-রাত্রি। সেদিনও এমনি তারা উঠেছিল। অন্ধকার আকাশের তলায় [illegible] মন রিহানার জন্য আকুল হয়ে উঠলো।

রিহানার মৃত্যুর পর তার এই দশ বৎসর কেটেছে দুর্নিবার মানসিক [illegible] একদিনের জন্যও সে শান্তি পায়নি।

কর্মজীবনের প্রতি মুহূর্ত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে দূর দূরান্তরে। অজস্র পরিশ্রমে তার শরীর রুগ্ন হ'য়ে পড়েছে। তার পরিবর্তে সে পেয়েছে অর্থ, খ্যাতি, আরও অনেক কিছু—যাতে করে মানুষ সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে গর্ব করতে পারে। কিন্তু শাহ্‌রিয়ারকে শান্তি পায় না তাতে। রিহানা তাকে ঘরে ডেকেছিল, দিয়েছিল প্রচুর আনন্দ। তার মৃত্যুর সাথে সাথেই সমস্ত মুছে একাকার হয়ে গেছে। শুধু একজনের বিচ্ছেদ তাকে প্রতিনিয়ত আহত করছে।

তবু একটি কারণে মাত্র একটি কারণে শাহ্‌রিয়ার রিহানাকে ক্ষমা করতে পারেনি এতদিন। রিহানার সন্তান কামনাকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করেছে রবাবর। নারীর সন্তান কামনা শুধু দৈহিক ক্ষুধা নয়, তার চেয়েও দুর্বল প্রবৃত্তি। নারীর স্নিগ্ধ রূপ এইজন্য ভালো যে জীবন-

www.pathagar.com

পথে নারী পুরুষের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। কিন্তু নারীর সন্তান-কামনা থেকে সন্তান জন্ম-দেয়া পর্যন্ত দীর্ঘ অধ্যায়টি শাহ্‌রিয়ারের কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত মনে হয়।

কিন্তু শাহ্‌রিয়ার আশ্চর্য দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলে নিজের মধ্যে। তার চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে সে আলোর স্বপ্ন দেখতো লাগলো। তার অভাবনীয় আকস্মিক পরিবর্তন স্বপ্ন দেখলো একটি সন্তানের—কর্মঠ জ্ঞান-দীপ্ত সন্তান। শাহ্‌রিয়ার সন্তান চায়! কোথায় সুপ্ত ছিল এই পিপাসা, কোন্ বিস্মৃতির বুকে অন্তর্লীন ছিল এই পরম তৃষ্ণা! মরুপথে চলতে চলতে যে বারিধারার কোনো সম্ভাবনা মনে জাগেনি, তারই স্নিগ্ধরূপ দেখা দিল দূরে—যখন এক-পা চলার আর ক্ষমতা নাই। পুরাতন সমাধির যুগে নতুনের জন্ম দেওয়ার সে কি দুরন্ত পিপাসা! শাহ্‌রিয়ার বাঁচতে চায় তার সন্তানের মধ্যে! সে তার মৃত্যু চায় না। যুগযুগান্তর ধরে যে বিপুল জীবনধারা খরস্রোতে বংশ-পরম্পরায় তার বুকে নেমে এসেছে, সে চায় না যে সেই স্রোতধারার পরিসমাপ্তি অকস্মাৎ যেন তার মধ্যেই হয়ে যায়। এই দুর্দান্ত স্রোত বয়ে যাক্ তীব্র বেগে, নেমে যাক্ প্রবল আকর্ষণে অনাগত ভবিষ্যতের জীবন-চিহ্নিত ধূসর উপত্যকায়। শাহ্‌রিয়ার শিল্পী হ'তে চায় না, চায় স্রষ্টা হ'তে, নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে অবলুপ্ত হয়ে যেতে চায় না, পৌরুষের বর্বরতা নিয়ে গর্বোদ্ধত স্মৃতি জাগিয়ে সে বেঁচে থাকতে চায়। রিহানার সাথে সমস্ত নারী জাতির সাথে—তার প্রভেদ এইখানে।

তখন এপ্রিল মাস। ছায়াপথ বেয়ে গতিময় উল্কা বিপুল বেগে এসে পৃথিবীতে ভেঙে পড়েছে—সে চলার গতিরোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। শাহ্‌রিয়ার অনুভব করতে পারে তার শিরায় শিরায় একদিন যৌবন-স্রোতের গতিবেগ অমনি অপ্রতিরোধ্য ছিল। আজ সে-স্রোত শিথিল হয়ে এসেছে, সে রক্ত আর কিছুদিন পরে জমে যাবে মৃত্যুর স্পর্শে। শাহ্‌রিয়ার প্রতি ধমনীতে শুনতে পেলো সেই অপমৃত্যুর ক্রন্দন। তাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেতে হবে। কি বিপুল নৈরাশ্য সমস্ত আকাশের আলো নিভিয়ে আনছে—কালো শবাচ্ছাদন বস্ত্রের মতো আকস্মিক মেঘে তারাগুলো ঢেকে যাচ্ছে। সে বুঝলো যে সুদূর দিগন্তের উজ্জ্বল আলোর প্রতীক্ষা করার সময় আর তার নাই। গভীর নৈরাশ্যের চাপা আর্তনাদ তার শরীর দুর্বল হ'য়ে এসেছে।

বহুদিন আগেকার একটি বঞ্চিত রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে রিহানার অতৃপ্ত কামনা অনুভব করে সে বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়লো।

যে পুতুল ডলির মা

[১]

যে মেয়েটার পুতুল খেলার ঝোঁক ছিল সব চাইতে প্রবল, সে এখন পুতুল ছোঁয় না। পুতুল-খেলার দিনগুলির কথা এখনো তার মনে পড়ে এবং সাথে সাথে হাসি পায়। সে হাসি বিজ্ঞজনোচিত, কিন্তু তার মধ্যে যে ফাঁকি আছে সে কথা সে নিজেও বুঝতে পারে না।

www.pathagar.com

[২]

ডলি স্কুল থেকে ফিরে আসে। আট ন' বছরের মেয়ে। দুষ্টু আর চঞ্চল। মিশনারী স্কুলে সে পড়ে। ঠাকুরকে বলে ট্যাগোর। একশ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ডলি ফিরে আসে যেন কিছুই হয়নি। সিঁড়ির ধাপ গুনতে গুনতে ডলি দোতলায় উঠে আসে—ওয়ান, টু, থ্রি...।

ডলির মা ওর পা ফেলার সাথে চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। দরজার কাছে ছুটে যেয়ে আদর ক'রে চুমো খান। আর সাথে সাথে ডলি খেপে ওঠে। আদর করাটা ওর সহ্য হয় না। চেঁচামেচি ক'রে এক সুটকেস বই ফেলে দেয় যেখানে খুশি, তারপর শুরু হয় হাত পা ছোঁড়া'র তাণ্ডব।

পাগলী মেয়ে! না আছে কথার ঠিক, না আছে কাজের। মুখ হাত পা ধুয়েই ডলি পুতুলের খোঁজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। সুটকেসটা পড়ে থাকে একপাশে। লাল রংয়ের বড়ো পুতুলটায় পরিচর্যার ও নিবিষ্ট হ'য়ে পড়ে। ওটা ডলির খোকা। ডলির খোকা দুটি। দ্বিতীয় খোকাটির উপর আপাতত ডলির আগ্রহ নাই। কারণ খোকাটি কাঠের পুতুল নয়—রক্তমাংসের এবং তার রং মিশমিশে কালো। ডলি তাকে বলে—মামা।

পুতুলের পরিচর্যার অত্যন্ত নিবিষ্ট দেখে ডলির মা উঠে আসেন, স্কুলের পোষাক খুলে দিতে চেষ্টা করেন। ডলি অপ্রসন্ন মুখে ঘাড় নাড়ে, পুতুল ছাড়ে না। ডলির মা'ও নাছোড়বান্দা, তিনিও ডলির চুল নিয়ে খেলা করেন। ডলি আরক্ত মুখে পুতুলের কাছে ঝুঁকে পড়ে আরো নিবিড় হ'য়ে। ও যেন বলতে চায়—আমি এখন যাব না, পুতুলের কাছে থাকবো। ডলির মা এ কথা বোঝেন—তাঁর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। কিন্তু ডলির রক্তমাংসের কালো জোয়ান খোকা ডলির মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে যে তাঁর মুখেও সেই কথাটা ফুটে উঠেছে—'আমি যাব না, ডলির কাছে থাক্‌ব।'

সারা দুপুর কেটে যায় ডলির দৌরাত্ম্যে। সারা বাড়ির প্রাণ ফুটে উঠেছে ওর কথায়, সমস্ত আনন্দ জেগেছে ওর বলায়। ডলিকে জব্দ করার জন্য ডলির বিয়ের কথা ওঠানো হয়। ডলি চুপ করে থাকে। বিয়ের কথায় লজ্জা পেয়ে চুপ করেছে—ওর মামা ভাবে। খুশি হ'য়ে সকলকে বলে : বিয়ের কথায় ডলি চুপ করেছে।

পুতুলের চিরুনি দিতে দিতে অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে ডলি উত্তর দেয় : বিয়ের কথা বললে গোলমাল করতে নানা বারণ করেছেন, তাইতে।

"হ্যাঁ তাইতে", ডলির মামা ওর কথা বলার রূপ দেখে হেসে ওঠে প্রগল্‌ভ কণ্ঠে। ডলির মা আর যে ক্রিশ্চান মেয়েটি ওদের বাড়ি আসে—তারাও হেসে ওঠে সেই সাথে সাথে।

"একদম পাগলী"—ডলির মা হাসতে হাসতে বলেন।

"বিয়ের কথায়—" অসমাপ্ত কথা শেষ হয় না, হি-হি ক'রে রেণুবালা ডেভিড হেসে ওঠে।

রেণুর দিকে মুখ ফিরিয়ে ডলি ওকে খ্যাপাতে চেষ্টা করে :

রেণুবালা ডেভিড

আরো মাথায় এক ইঁট।

ডলির মা ডলিকে কোলে টেনে আদর করার চেষ্টা করেন। ডলি ঘরের কোণে পালিয়ে যায়। সেখানে যেয়ে পুতুলটাকে আদরে আর চুমোয় ছেয়ে ফেলে। পুতুলটার যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকতো তাহ'লে সে এই অতি উগ্র আদরের প্রতিবাদ করতো।

সামান্য খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

[৩]

কিন্তু অন্যসব জিনিসের মতো এই খেলার পিছনেও একটা কাহিনী আছে। খুঁজে দেখলে তার আদি পাওয়া যায়, যদিও অন্ত তার নাই। কতো ঝড়ের রাতে এই খেলা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনায় নির্জীব হ'য়ে গেছে, কিন্তু বাসন্তী জ্যোছনায় আবার তারা সাম্‌লে উঠেছে। প্রথম উদয়ের তখন বর্ণ-বৈচিত্র্যও,—ডলির মা'র মনে এখনো সেই সব কথা জাগে ছবির মতো...

সারা দিন নদীর ধারে ঘুরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে যে মেয়েটি পেঁপের ডাঁটা দিয়ে খেজুর রস চুরি করে খেতো, মা'র আদর এবং গালাগালির অভাব যার কোনোদিন ছিল না, তার ছিল এক বাক্স পুতুল—রঙের বৈচিত্র্যেও এবং বেঁটে, মোটা, সরু, ঢ্যাঙা আকৃতিতে পাড়ার মধ্যে তারা অতুলনীয়। তার নিজের প্রাণের চাইতে প্রিয়তর এই পুতুলগুলোকে সে হাতছাড়া করতে পারতো না একটি দিনের জন্যও। ওদের ঘুম পাড়াতে যেয়ে যে ঘুম-পাড়ানি সুর তার কণ্ঠে জেগে উঠলো সে সুর এখনো থামেনি, কিন্তু অত আদরের কাঠের পুতুলগুলি একদিন ঢাকা প'ড়ে গেছে সেই সুরের আড়ালেই। পৃথিবীর বুকে তখন আর একটি রক্তমাংসের পুতুলের আগমন সম্ভাবনা।

তখন তার বিয়ে হ'য়ে গেছে। জীবনের অসাবধান মুহূর্তগুলি ভ'রে উঠেছে অশেষ আনন্দে। সে যেন নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন। হেনার গন্ধে, প্রভাতের রঙে জীবনের সুরসম্ভারে তারা পরিপূর্ণ।

এখানেও সেই একই কথা।

তারপর—এক দুর্যোগের রাতে তার সাথীর শেষ নিশ্বাস মিশে গেলো অতল আঁধারে। বাসা-বাঁধা আনন্দ ভেঙে প'ড়ল। আবার যখন সে চোখ মেললো তখন তার সামনের দুর্যোগ কেটে গেছে, আকাশে জেগেছে দীপ্ত দিনের আলো—অনাবৃত কঙ্কালের নগ্নতার মতো অসহ্য। তবু সেই অসহ্য চোখ ঝল্‌সানির মধ্যে একটা আশ্চর্য আনন্দের সন্ধান পাওয়া গেছে, যে আনন্দটুকু না থাকলে হয়তো জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠতো। সে আনন্দ ডলি—জীবনের পরিবর্তিত পটভূমির নতুন পুতুল—তার বুকে আছে আনন্দ, মুখে আছে কথা।

[৪]

ডলি এসে ঝাঁকুনি দেয় মা'কে, "দাঁড়িয়ে আছো যে চুপ ক'রে—এই মা।" ডলির মা যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে ফিরে আসেন। তাইতো, বেলা প'ড়ে গেছে। সূর্যের পেছনে আলো এসেছে ম্লান হয়ে. সেই অনাবৃত দীপ্তির বীভৎসতা এখন আর নাই। তাকালে দেখা যায় যে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি পরম শ্রান্তিতে ছড়িয়ে প'ড়েছে সুদূরের পথে পথে।

[৫]

ডলি এতক্ষণে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে, "চুপ ক'রে আছো যে! তোমার মুখ অতো শুক্‌নো কেন মা? মামা চলে গেছে অনেকক্ষণ। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে প'ড়েছ, তাই আর আসিনি, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ—পায়রা? বলো না—বলো না।" দস্যি মেয়ে হাত ধ'রে নাড়া দেয় জোরে জোরে।

"আরে দাঁড়া, পাগ্‌লী কোথাকার"—ডলির মা ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন।

www.pathagar.com

[৬]

কেন জানি না সেদিন ভিড় ক'রে উঠছিল যত সব পুরানো কথা। অনেকদিনের কথা, যাদের তলিয়ে যাওয়া উচিত ছিল বিস্মৃতির অন্ধকারে, তারাই ভেসে উঠতে লাগলো রাশি রাশি তারার মতো। রাত্রির পড়া পড়তে বসেছে ডলি : পোয়েট্স কর্নার। পাতলা মিষ্টি সুর স্বচ্ছ বৃষ্টিধারার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। আর ডলির মা সেদিকে তাকিয়ে আছেন, ভাবছেন অর্থহীন কাহিনীর দূরাস্তৃত স্মৃতি।

পুতুল খেলার প্রভাত যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন ও এলো আনন্দ-উজ্জ্বল দিনে। আদর ক'রে নাম রাখা হলো পুতুল—তারপর ডল—অতি আদরে হ'লো ডলি। ও বড়ো হ'য়েছে কিন্তু ওর মার কাছে সেই ছোটো পুতুল ডল-ই আছে। একটা পুতুল যে আর একটা পুতুল নিয়ে খেলা শুরু ক'রেছে এ কথা তাঁর মনেই হয় না। ডলির প্রত্যেকটা কাজ তাঁর নিজের হাতে করা চাই। সারাদিন ওর চিন্তা। রাত্রির স্বপ্নও ডলি ভরে রাখে।

"মা ঘুমোবে না, রাত হ'য়ে গেল যে।"

"হ্যাঁ মা, এবার ঘুমোব।"

"বাইরে মেঘ ক'রেছে, জানলা বন্ধ ক'রে দাও।"

জানলা বন্ধ হ'লে ডলি আবদার করে—"আলো নিভিও না, আমার কাছে শুয়ে থাকো।"

"দস্যি মেয়ে"—স্নিগ্ধ হাসিতে তার মুখ ভ'রে ওঠে। ঘরের মধ্যে যখন আলো জ্বলছে বাইরে তখন উঠেছে ঝড়ের তাণ্ডব। বদ্ধ ঘরে থেকেও তার আভাস পাওয়া যায়। সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছে নগর-পথ। হয়তো রাশি রাশি কাগজের টুকরো উড়ছে। কাগজের খণ্ড বিক্ষিপ্ত টুকরো শূন্যপথে ঘুরে মরছে। ওরা যেন মানুষের অতৃপ্ত প্রতিলিপি। তৃপ্তিহীন জীবনের অকারণ বোঝা ব'য়ে ঘুরে মরছে।

ডলির মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু ডলির কথা তখনো তাঁর মনে জাগছে। ছোট্ট ডলি—পুতুলের মতো যে রঙিন, পাখির মতো যার কথা, রামধনুর মতো যার হাসি, সেই ডলি। ডলি ঘুরে বেড়ায় ফ্রক পরে প্রজাপতির মতো, আকাশের চাঁদ যার কপালে টিপ দিয়ে যায়, সূর্যমামাকে ধরার জন্য যে হাত বাড়ায়, সেই ডলি। ঘুমের আবেশে ডলির কথা ছায়ার মতো ভেসে আসে।

হঠাৎ কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে যেন যায়। ডলি যেন কাছে নেই।

"ডলি, ডলি কই?"—আর্তস্বরে ডেকে তিনি জেগে ওঠেন।

"এই যে মা, এই তো শুয়ে আছি"—ডলি হাত ধ'রে টানে। পরম স্বস্তির সাথে তিনি ডলিকে বুকে টেনে আনেন।

ডলিও তার পুতুলের স্বপ্ন দেখছিল, অবশ্য দুঃস্বপ্ন নিশ্চয়ই। তার চকোলেট টফি পটাপট খেয়ে ফেলেছে পুতুলটা। ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে ডলির মাথা সব কিছু বুঝতে পারে না—হাত বাড়িয়ে পুতুল খোঁজে। পুতুল কিন্তু ব'সে আছে নানীর টেবিলের নিচে।

সমস্ত গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে, ঘরের দরজা জানলা বন্ধ, আলো জ্বলছে। ডলির মা উঠে জানলা খুলে দেন, বাইরের এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। ঝড় থেমে গেছে, চাঁদ উঠেছে আকাশে।

www.pathagar.com

এক গ্লাস পানি খেয়ে যখন তিনি পান খাবার চেষ্টায় আছেন তখন ডলি উঠে এলো।

"কিরে পানি খাবি?"

"না, পুতুল।"

ঘুমভাঙা ভারি চোখ ডান হাতের তলায় ডল্‌তে ডল্‌তে ডলি তার লাল পুতুলটাকে বিছানায় নিয়ে আসে। ডলির মা পান খেয়ে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েন। ডলির কোলে পুতুল শুয়ে থাকে, ডলির মার কোলে ডলি ঘুমোয়।

খোলা জানালা দিয়ে আসছে জ্যোছনা, আর নিচের মস্‌জিদের হাস্‌নাহেনার গন্ধ। মৃদু বাতাস সুরভিত হ'য়ে উঠেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে পড়ে। সুপ্তির নীলাঞ্জন বুলিয়ে শান্তি নেমে আসে।

ওদের মনে তখন জীবনের স্বপ্ন।

ডলি স্বপ্ন দেখে তার লাল পুতুলের। ডলির মা-ও স্বপ্ন দেখেন একটি পুতুলের—সে পুতুল ডলি। তাঁর ঘুমন্ত মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে হাসি দেখার কেউ সেখানে থাকে না।

যদি তার চোখে দৃষ্টি থাকতো, যদি থাকতো ঘুমন্ত হাসি দেখবার চোখ-ঝলসানো আলো, তবে ডলির পুতুল তার মাতামহীর (?) দুর্বোধ্য হাসি দেখে অবাক হ'য়ে যেতো।

প্রচ্ছন্ন নায়িকা

শেষ রাত্রি। ক'লকাতার একটা বড়ো রাস্তার পাশে সারি দেয়া বিরাট গাছগুলোর উপরে অন্ধকার ঝুলছে। আকাশে তারার স্তব্ধ সংকেত, নিচে পিচের আচ্ছাদনে ঢাকা পৃথিবীর একটা বিচ্ছিন্ন অংশ গ্যাসের অস্পষ্ট আলোর দুর্বোধ্য সংশয়ে শঙ্কিত।

হারুন সেই পথ দিয়ে চলায় সময়ে একবার উপরের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামালো। মাটির দিকে তার দৃষ্টি আবদ্ধ, পিছনে দুখানা হাত নিজের চাপে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে! সামনে কতকগুলো ভিক্ষুক অভিশপ্ত জীবের মতো জটলা ক'রেছে। দূর থেকেও তাদের গায়ের নোংরা গন্ধ পাওয়া যায়। তাদের অশ্লীল, অভব্য কথার ইতরামি শোনা যায়। হারুন এখানে এসে থমকে দাঁড়ালো দেখে কতকগুলো ভিখারী হেসে উঠলো; ভিক্ষা চাইলো না। মানব-চরিত্রে ওদের অভিজ্ঞতা আছে। ওরা জানে যে, এতো রাত্তিরে যারা বেড়ায় তারা হয় চোর না হয় মাতাল—'পুলিশের লোক'কে ওরা চেনে।

হারুনকে ওরা অতি অনায়াসেই মাতাল ঠাউরে নিল।

কে একজন ওদের মধ্যে বলে উঠলো: "শালা, মাতাল..." বাকি অংশ অশ্রাব্য।

বিদ্যুতের মতো একবার ওদের দিকে তাকিয়ে হারুন আবার শ্লথ গতিতে চলা শুরু করলো। প্রথমে ওর ইচ্ছা হয়েছিল দুই পায়ে ভিখারীদের মুখ থেতো করে দিতে। কিন্তু নিমিষের মধ্যেই নিজেকে সামলে নেয়া ওর পক্ষে কঠিন হ'লো না।

কিন্তু আবার তার গতিতে বাধা পড়লো। এত রাত্রে চারজন লোক একটা শব নিয়ে যাচ্ছে। পথের দু'পাশের অস্পষ্ট আলোর মধ্যে এই দলটাকে এতো ভয়াবহ দেখাচ্ছিল যে,

www.pathagar.com

হারুন তার সমস্ত শরীরের মধ্যে সেই ভয়ের প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়ে শিউরে উঠলো। এই নির্জন রাস্তায় কিছুক্ষণ আগে যে ভিখারীদের মুখ গুঁড়ো ক'রে দেয়ার ইচ্ছাকে ও জোর ক'রে সামলে নিয়েছিল তাদের মধ্যেই আবার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাকে হারুন জোর ক'রে চেপে রাখলো। নিজের এই অহেতুক ভয় দেখে ওর নিজেরই লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির হতে হারুন কিছুতেই পারলো না। আজকের রাতটা বিশেষ করে ওর মনে গভীরতর দাগ ফেলেছে। সে দাগ মুছে ফেলবার শক্তি ওর নাই। হারুনের বলিষ্ঠ ভয়াল প্রকৃতির নিভৃত ফাটলে এই রাত্রির শিকড় স্থায়ী আসন করে নিল। বারেবারে তার মনে এই কথাটাই জাগতে লাগলো : যেমন করেই হোক, এই বিকৃত জীবন আর অপমৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচতে হবে। গভীর রাত্রির সেই শবদেহের সাথে অপমৃত্যুর কোনো সংযোগ আছে কিনা সে জানে না, তবু কেন জানি তার মনে অপমৃত্যুর কথাই তোলপাড় হয়ে উঠছিল।

হারুনের এই প্রথম নৈশভ্রমণ নয়। এর আগেও বহু বিনিদ্র রাত্রি ওর পথে কেটেছে। কিন্তু আজকের এই নৈশঅভিজ্ঞতার কটু অনুভূতি ওকে অস্থির করে তুললো।

এই রকম রাত্তিরে ঘুরে বেড়ানোর পিছনে হারুনের চরিত্রের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। অনায়াসে বলা যায় যে, ওর-বয়সী সাধারণ তরুণদের সাথে হারুনের একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা কি, তা সহজে ধরা যায় না। সহজ অবস্থায় হারুন অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির, অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু আর একটা দিক আছে যেখানে হারুন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। তারুণ্যের প্রথম স্তর থেকেই হারুনের চরিত্রে এই দুয়ের বিপরীতমুখী স্বভাব দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠেছে। তাই দিনের বেলায় সে অত্যন্ত সহজ ও মিশুক, আর রাত্তিরে গভীর ভাবপ্রবণতার আবছায়ায় রহস্যময়। নভেল পড়ার ফাঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে বিপ্লবী রাশিয়ার, জীবন-দৃষ্টান্ত হারুনের ভাবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গীকে কাজের নেশায় মাতাল করে তুলেছে। অথচ হাতে কোনো কাজ নাই। সাংসারিক কোনো বিষয়ই কিছুতেই মধুর হয়ে ওঠে না। সব সময় তার মনে হয় একটা কিছু কাজ চাই, এমন করে বেঁচে থাকলে তার চলবে না। নিজের অকর্মণ্য পঙ্গুতায় সে নিজেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আর তার পরেই টেবিলের আলো নিভে যায়, সমস্ত রাত কলকাতার বিভিন্ন পথে হারুনের অসংখ্য পায়ের ছাপ পড়ে।

দিন কয়েক সে বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে অনেকগুলো সভাসমিতিতে এবং অনুষ্ঠানে যাতায়াত শুরু করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেই সকল জায়গার হাততালির ফাঁকি এবং নেতাদের পিঠ চাপড়ানির ফাঁকা আওয়াজের নিষ্ক্রিয় অর্থ বুঝতে পেরে সে বিরক্ত হয়ে চলে এসেছে। জীবনের দিক দিয়ে হারুন বিশ্বাসঘাতক নয় এবং কারুর প্রবঞ্চনাও সইতে পারে না।

এই রকম করে যত দিন যাচ্ছিল হারুনের অসহিষ্ণুতা ততোই বেড়ে উঠছিল। বন্ধুমহলেও তার যাতায়াত কমে আসতে লাগলো। এখন সে বাড়িতেই থাকে। তার কামরায় কেউ যেতে সাহস পায় না। ক্রমে ক্রমে এই স্বেচ্ছা-নির্বাসিত অকর্মণ্য জীবন তার পক্ষে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলো। পড়াশুনার মধ্যে এখন সে শুধু খবরের কাগজ পড়ে। চারিদিককার অনাচারের সংবাদ তার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আর সে নিজের অক্ষমতায় অস্থির হয়ে সমস্ত ঘরময় পায়চারি করে বেড়ায় ; নিচের তলার অধিবাসীদের সেই শব্দে ঘুম হয় না। তারা রেগে গালাগালি করে। কিন্তু হারুনের কানে সে কথা ঢুকতে পারে না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার পায়ের আওয়াজ শোনা যায়, তারপর সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে যেন দিক্‌ভ্রান্ত স্টেপের বুনো-ঘোড়া।

www.pathagar.com

এমন করে কতোদিন কাটতো বলা যায় না, কিন্তু একদিন অত্যন্ত আকস্মিক একটা ঘটনায় হারুনের জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। সেদিন রবিবার। দুপুরবেলায় হারুন শুনতে পেলো, কে যেন তাকে ডাকছে। জানলা খুলতেই পরিষ্কার নকীবের আওয়াজ শোনা গেলো। হারুন দ্বিরুক্তি না করেই নিচে নেমে গেলো।

বহুদিন পরে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ। সুতরাং যথামাত্রায় সকলরকম সংবাদ আদান-প্রদান হয়ে যাওয়ার পর নকীব বললো : "এই শোন্।"

হারুন শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এই একটিমাত্র বন্ধুর কথাই সে শুনতো ও তার নিজের কথা শোনাতো। অতএব সে বললো : "বল।"

"হাসিস না আগে থেকেই।"

"না, পরে হাসব", হারুন হেসে উত্তর দিলো।

হারুনের নৈশভ্রমণ, ভাবাবেগ, মুক্তির স্বপ্ন এবং সভা-সমিতি, অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার ব্যর্থতার কথা একমাত্র নকীবই জানতো। হারুনকে অত্যন্ত খুশি দেখে সে বুঝতে পারছিলো না যে হারুন তার আদর্শে আগেকার মতোই আস্থাবান আছে কিনা। নিঃসংশয় হবার জন্য সে অত্যন্ত আনাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করে বললো : "আচ্ছা হারুন, তুই কি এখনো কাজ করতে চাস্?"

"কেন", হারুন বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো।

"তোকে দেখে তা তো মনে হয় না—তুই এত খুশি হয়ে আছিস। কিন্তু তাই বা কি করে বলি, তোর পায়ের দাপটে নিচের লোকের তো ঘুমই হয় না।"

হারুন এতক্ষণে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে বললো : "দেখ্ মানুষকে তোরা অতি সহজে বুঝতে চাস্। আমার পায়ের শব্দে নিচের লোক জাগলেই তোরা মনে করিস্ আমি সকর্মক, রাত্তিরে পথে পথে ঘুরে বেড়ালে মনে করিস্ আমি খুব কাজ করছি। কিন্তু আমি সে কেন অস্থির হয়ে উঠি তোরা তা বোঝার চেষ্টা করিস্ না, আমি তা করাতেও চাই না। কিন্তু এ কথাটা অন্তত তুই মনে রাখিস্ যে, আমি চিরকাল চাইব। এখন আমি কোনো কাজই করতে পারছি না, তার কারণ আমি সুযোগ পাই না। কিভাবে কাজ আরম্ভ করবো, তাও জানি না। অথচ কোনোরকম কাজ না করতে পেরে আমি যে কিরকম কষ্ট পাচ্ছি তা..."

হারুন তার অসমাপ্ত যুক্তিহীন কথার মধ্যে থেমে গেল। নকীব খুব মন দিয়ে শোনে নাই। তবু হারুনের কথার আন্তরিকতায় সে কোনোরকম প্রতিবাদ করলো না। অনেকদিন থেকেই সে হারুনকে চেনে। এত বড়ো বলিষ্ঠ মন তাদের কারুর নাই। অথচ আশ্চর্য লাগে যে হারুন খুব উদার নয়—কাউকে এমনকি সে নিজেকেও ক্ষমা করতে পারে না যদি সামান্য দোষ খুঁজে পায়। কিন্তু হারুনের মধ্যে ভাব-বিলাসিতা আছে প্রচুর পরিমাণে, তবু তার মধ্যে নমনীয়তা নাই। নকীব ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। হারুন যে কেন কাজ করতে চায়, সে বোঝে না নকীব এ কথা মনে করে না যে যারা সভায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তারাই দেশসেবার একমাত্র অধিকারী। তবু যার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানি বেরোয় না, সে কেন মানুষের কাজ করবার জন্য এত অধীর হয়ে ওঠে।

হারুন যখন কথা বলছিল তখন নকীব এই কথাগুলোই ভাবছিল? হারুনের কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ সে চুপ করে থাকলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো :

www.pathagar.com

"দেখ হারুন, তুই যে সকল কথা বলিস্, আমি ঠিক বুঝি না—তোকেও আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু সে কথা যাক্। আজ তোর কাছে যে-কথা আমি বলতে এসেছি এবার তা বলবো। তুই তো আগে অনেক সভা-সমিতিতে অনেক নেতার কাছে গেছিস—আজ তোকে আমি এক ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাব..."

"না, না, তার কিছুই দরকার নাই।" হারুন উত্তর দিল। তারা স্বর উত্তপ্ত। একটু চুপ করে থেকে সে বললো : "তুই তো জানিস্ সে আমি প্রবঞ্চনা সইতে পারি না। এত সভা-সমিতিতে ঘুরলাম, এত নেতার কাছে গেলাম, সকলেই আমাকে ফাঁকি দিল। কোনো নেতার কাছে আর আমি যাব না।"

কিন্তু নকীব আজ নাছোড়বান্দা, হারুনের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই বললো : "হারুন, তুই চল্। সত্যি বলছি ওয়াজেদ সাহেব তোকে ফাঁকি দেবেন না। যারা কাজ করতে ভয় পায় অথচ নেতার সম্মান চায়, তারাই প্রবঞ্চনা করে ফাঁকি দেয়। ওয়াজেদ সাহেব কাজ করেন কিন্তু নেতা হতে চান না। ফাঁকি দেয়াকে তিনিও অত্যন্ত ঘৃণা করেন।"

"ওয়াজেদ সাহেব? কই তাঁর নাম তো শুনিনি। তিনি কি করেন?" হারুন জিজ্ঞাসা করলো।

নকীব সশ্রদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল : "ওয়াজেদ সাহেব জীবনের বেশীরভাগ সময় কাটিয়েছেন জেলে, নাম করার চেষ্টা কোনোদিন করেননি। চেষ্টা করলে হয়তো তিনি সবচাইতে বেশী নাম করতে পারতেন। কারণ দেশের টাকা চুরি করার তাঁর বিরাট সুযোগ ছিল। আমাদের অনেক নেতাই এরকম বিশ পঞ্চাশ হাজার মেরেছেন। ওয়াজেদ সাহেব অন্তত কয়েক লাখ টাকা মারতে পারতেন, কিন্তু মারেননি। এ খবরটা আমি ভালো করেই জানি। আর সেইজন্যই তোকে সেখানে নিয়ে যাবো। তুই দেখিস্ ওয়াজেদ সাহেব কি রকম কাজের লোক।"

হারুন জিজ্ঞাসা করলো : "খুব গম্ভীর, অহঙ্কারী লোক নন?"

"এত ভয় কেন তোর?" নকীব আবার হেসে উঠলো!

"তুই দেখিস, এত ভদ্র, এত অমায়িক ওয়াজেদ সাহেব। কেউ ভাবতেই পারে না যে তিনি কাজ ক'রতে পারেন। কিন্তু তুই এত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রছিস কেন?"

হারুন বললো : "দেখ আমি যাদের সাথে কাজ করতে চাই তাদের সাথে আত্মীয়-বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে চাই—তাদের কাছ থেকেও সেই রকম ব্যবহার পেতে চাই। অবশ্য এতটা না হলেও চলে কিন্তু একটা আত্মীয়তার বাঁধন থাকলে ভারি চমৎকার হয়।"

নকীব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো : "আচ্ছা ওঠ্। তোর পায়ের যা দাপট ছাদ ভাঙবি কবে। আত্মীয়তার মাকড়সার বাঁধন কি তোর টিকবে? ওঠ্, ওয়াজেদ সাহেবের কাছে চল্।"

হারুন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর নকীবের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো : "নকীব বখাটে হয়ে পড়েছিস।" নকীবও সেই হাসিতে গলা মিশিয়ে দিল। পথে পা দিয়েই নকীব বলল : "তাড়াতাড়ি চল্।"

"কেন, এত তাড়া কিসের?"

"যা বল্‌ছি তাই কর! ওয়াজেদ সাহেব হয়তো এখন বাড়িতে থাকতে পারেন। দুপুর বেলায় খেতে আসেন। কিন্তু আজ বড় দেরি হ'য়ে গেছে। আচ্ছা চলতো, তারপর যা হয় হবে।"

www.pathagar.com

হারুন জিজ্ঞসা করল : "তিনি কি শুধু দুপুরেই বাড়ি আসেন? বিকেল বেলায় কি করেন? মাঠে দেখা হতে পারে না?"

হারুনের প্রশ্নে নকীব অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

"আরে না না, তিনি থাকেন না। ভোর না হ'তে বেরিয়ে পড়েন। কোনদিন রাত একটায়, কোনোদিন দুটোয় ফেরেন। দুপুরে গিয়ে খান, কোনদিন খাওয়াও হয় না। তোমার মত সুবিধাবাদী নন তো যে খেয়ে খেয়ে মেঝেয় পা ঠুকে নিচের তলায় লোকের ঘুম ভাঙাবেন।"

হারুনকে শ্লেষ দিয়ে বললেও হারুন খুশি হ'ল। সে একজন সতিকারের কাজের মানুষ খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেছে। আস্তে আস্তে ওয়াজেদ সাহেবের উপর তার বিশ্বাস জেগে উঠেছিল। অনেক জায়গায় প্রতারিত হয়ে তার মনে মানুষকে বিশ্বাস করার শক্তি কমে এসেছে। আজ একজন মানুষকেও বিশ্বাস করার ভরসা পেয়ে বহুদিন পরে সে সত্যিসত্যিই খুশি হয়ে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ নীরবে চলার পর হারুন হঠাৎ বলে উঠল :

"নকীব, তোর সাথে তো ওয়াজেদ সাহেবের অনেক দিনের জানাশোনা।"

"হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে?" নকীবের মুখে জিজ্ঞাসা ফুটলো।

"তুই তো ওয়াজেদ সাহেবের কাজ জানিস্?"

"কিছু কিছু জানি।"

"তবে তুই কাজ করিস্ না কেন?"

"আমি কাজ করি না এইজন্য যে", নকীব আস্তে আস্তে ব'লে যেতে লাগলো : "ওয়াজেদ সাহেবের সাথে কাজ করার শক্তি আমার নাই। আর তাছাড়া আমার কাজ করবার সাহসও নাই। তুই এত লাফাচ্ছিস, কিন্তু কাজে নেমে দেখ তোর ভাব-বিলাসিতার সাথে সত্যিকার কাজের কতখানি পার্থক্য। আমি সেই পার্থক্য দেখবার সুযোগ পেয়েছি, সেইজন্যই আমি এত ভয় পাই। অবিশ্যি আমাদের দেশে অনেক সৌখিন কর্মী আছেন। তাঁদের ক্ষুরে আমি মাথা মুড়াতে চাই না। ওঁরা কাজের চাইতে অকাজের সৃষ্টি করেন বেশী পরিমাণে। ও রকম সৌখিন কর্মী হতে আমার বিবেকে বাধে, আর ওয়াজেদ সাহেবের সাথে কাজ করতেও আমার শক্তিতে কুলোয় না। সেইজন্য কোনোরকম কাজই আমি করি না।"

কলকাতার মধ্য অঞ্চলে একটা প্রাচীন বাড়ি। তার প্রত্যেকখানা রঙচটা ইটে সময়ের জীর্ণ স্বাক্ষর। একপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে, উপরে যেন মুমূর্ষু যক্ষ্মারোগীর হৃৎপিণ্ডমুখী শীর্ণ বুকের হাড়ের অসজ্জিত সংস্থাপন। নগ্ন ইটের বুকে মাঝে মাঝে সিমেন্টের ধ্বংসশেষ টুকরো দেখা যায় অনাদৃত পূর্ব সমৃদ্ধির মতো।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় হারুন নকীবের মুখের দিকে তাকালো : "এটা ওয়াজেদ সাহেবের বাড়ি নাকি?" এ বাড়িতে অভ্যস্ত নকীবের মুখের নিষ্কম্প উত্তর বের হয়ে গেল, "হ্যাঁ, ওয়াজেদ সাহেব আর কয়েকজন ভদ্রলোক এই বাড়িটা ভাড়া করে থাকেন।"

"কিন্তু ওয়াজেদ সাহেবের ফ্যামিলি?"

"পাগল হলি নাকি : বউ নাই, তার ফ্যামিলি! সারা জীবন কাটালো হয় জেলে না হয় পুলিশ পাহারায়—বিয়ে করবেন কখন? অবশ্য ইচ্ছা থাকলেই হ'তে পারতো। কিন্তু যতো দিন তাঁর কাজ শেষ না হয় ততো দিন বিয়ে করবেন না।" তারপর উল্লসিত হ'য়ে বললো :

www.pathagar.com

"কিন্তু আমরা ওয়াজেদ সাহেবকে তার আগেই বিয়ে দেবো। এখন তিনি কতকগুলো ব্যাপারে খুব ব্যস্ত আছেন, এই কাজগুলো একটু ঠিক হলেই।"

"কিরে নকীব, এত আনন্দ কেন, ঘটক হবি নাকি?" হারুনের কণ্ঠে আমোদের সুর।

"না, তা নয়। তবে এখন আমরা ওয়াজেদ সাহেবের দেখাই পাইনে, কাছে ঘেঁষা তো দূরে থাক্। বিয়ে হ'লে এটা আর হবে না।" তারপর গলার সুর আরো নামিয়ে বল্লো : "দেখ, সারা জীবন ওয়াজেদ সাহেব কষ্ট করেই মরলেন, এখন যদি খানিকটা বিশ্রাম না পান তা'হলে আর বেশীদিন উনি বাঁচবেন না। অথচ ওঁর মৃত্যুতে যে কতো বড়ো ক্ষতি সে কেবল আমরাই জানি। সত্যিকারের কর্মী আর দরদী বন্ধু হিসাবে ওয়াজেদ সাহেব ছাড়া এ পর্যন্ত আমি আর কাউকেই দেখিনি।"

হারুন তার কথা শোনার জন্য আরো ব্যগ্র হয়ে উঠছিল। কিন্তু নকীব আর কিছু বললো না। সে মুখ বন্ধ করেই উপরে উঠতে লাগলো, মনে হলো সে যেন কি ভাবছে।

সিঁড়ির ডান দিকে একখানা ছোটো ঘরে ওয়াজেদ সাহেব শুয়ে ছিলেন। নকীব আশ্চর্য হ'য়ে বললো : "আপনি দুপুরবেলায় শুয়ে আছেন এই প্রথম দেখ্লাম।"

ওয়াজেদ সাহেব অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠে বললেন : "এই একটু জ্বর হ'য়েছে, এক্ষুণি বেরিয়ে যাব।"

নকীব কপালে হাত দিয়ে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো, "একটু জ্বর? একশো তিনের কম নয়।'

"ও কিছু না, সেরে যাবে। ওরকম প্রায়ই হয়। ও কথা থাক্গে।" তারপর হারুনের দিকে তাকিয়ে বললে : "বসুন, কোথায়ই বা বস্বেন?"

হারুনকে সেই আসবাবহীন ঘরের মধ্যে বসানোর জন্য ওয়াজেদ সাহেব রীতিমতো অস্থির হ'য়ে উঠলেন। হারুন বিছানার একপাশে বসে কুণ্ঠিত হয়ে বললো : "আপনি কেন অত ব্যস্ত হচ্ছেন?"

"আপনার কথা আমি নকীব সাহেবের কাছে শুনেছি।"

হারুন নকীবের দিকে তাকিয়ে দেখলো তার মুখে সস্মিত দৃষ্টি। "নকীবটা খুব ওস্তাদ হ'য়ে পড়েছে!" মনে মনে এই কথাটা আউড়ে নিয়ে ওয়াজেদ সাহেবের দিকে সে ফিরে বললো : "আমার সাথে এত ভদ্রতা করছেন কেন? আমার সাথে কেউ আপনি কথা বলে না, আপনিও বলবেন না।" হারুনের কণ্ঠ অভিমান-ক্ষুব্ধ।

"আচ্ছা বেশ, আপনি বলবো না, কিন্তু দরকারি কথা বলবো।" ওয়াজেদ সাহেব এই খ্যাপাটে তরুণের কথায় খুশী হয়ে উঠলেন।

"দেখ, আমাকে এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে আমি নিজেই তোমাকে নিয়ে যেতাম। আমরা একটা নতুন মেয়েদের সমিতি করেছি। তুমি কিছুদিন ওতেই কাজ করো। কাজটা একটু শক্ত হবে, তবু চেষ্টা ক'রে দেখ।"

হারুন বিস্মিত হয়ে উঠলো, "মেয়েদের দিয়ে কি কাজ হবে? আমার তো মনে হয় না মেয়েরা পরিবর্তন আন্তে পারবে। উলের কাঠিই যাদের একমাত্র ভদ্র অস্ত্র, বড়জোর মাছ-কাটা বঁটি পর্যন্ত যাদের অস্ত্রগতি তাদের নিয়ে...।"

হারুনকে থামিয়ে ওয়াজেদ সাহেব আহত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "তুমি জানো না, হারুন তাই ও রকম ক'রে বলছো। মেয়েদের তো পঙ্গু ক'রেছি আমরাই। ওরাও সবরকম অস্ত্র

www.pathagar.com

ধরতে পারে এ আমি নিজে বহুবার দেখেছি। আর অস্ত্র না নিলেও মেয়েরা অন্যভাবে পরিবর্তন আনতে পারবে। জীবনে আমি অনেক অত্যাচার সয়েছি, আমার শরীর এখন ভেঙে পড়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ের উপর যে অত্যাচার হয়, সে বোধ হয় আমার উপর অত্যাচারের চাইতে খুব বেশী কম নয়।"

ওয়াজেদ সাহেব চুপ করলেন। কিন্তু এই সামান্য কথাতেই তাঁর বুকের বেদনার্ত অংশের সহানুভূতি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠলো।

হারুন এতক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকায়নি, শুধু কথাই বলে যাচ্ছিল। এবার ভালো ক'রে দেখলো। এই লোকটার সাথে এই বাড়ির সিঁড়ির সাদৃশ্য আছে। চওড়া হাড় দেখে বোঝা যায় এর কব্জির শক্তি। অত্যাচারে বিবর্ণ পোড়া রঙের আড়ালে দেখা যায় সুন্দর সুকুমার তনুর ইতিহাস। প্রশস্ত ললাটে বুদ্ধির ছাপ আর বহু ঝঞ্ঝায় অনমনীয় মেরুদণ্ড। মাত্র একবার তাকিয়েই হারুন ওয়াজেদ সাহেবের উপর একটা আকস্মিক অপ্রতিরোধ্য স্নেহ-শ্রদ্ধায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার মনে হ'লো যে এই লোকটার সহ্য শক্তি এবং ঔদার্যের পিছনে একটি হৃদয় আছে, যার বিস্ফারিত আবেগ ঢাকতে ঢাকতে সমস্ত শরীর বিবর্ণ জীর্ণ হয়ে পড়েছে, মাথা গুঁড়ো করে দিলেও সেখানকার সন্ধান কেউ পাবে না, অথচ আন্তরিক সহানুভূতির সামান্য স্পর্শে সেই বিরাট হৃদয় অশ্রুতে টলমল করে ওঠে।

কয়েক মিনিট সমস্ত ঘরখানা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকলো। ওয়াজেদ সাহেব একখানা সাদা কাগজের উপর কি যেন লিখে একটা খামে পুরলেন।

ওয়াজেদ সাহেবই ঘরের স্তব্ধতা ভাঙলেন : "হারুন, এই চিঠিখানা নিয়ে যাও। মহিলা-সমিতি চেনো বোধহয়। ওখানকার সেক্রেটারি সালেমা সাহেবাকে দিয়ো।" তারপর নকীবের দিকে ফিরে বললেন : "আচ্ছা নকীব সাহেব, তাহ'লে এখন ওঠা যাক, কি বলেন?"

"আপনার যে জ্বর।"

"ও কিছুই নয়।"

"আপনার কাছে অন্যের সব জিনিশই কিছু মূল্যবান, শুধু নিজের ব্যাপারেই কিছু নয়।" ওয়াজেদ সাহেব জুতো পায়ে দিতে দিতে হেসে উঠলেন।

সালেমা সাহেবার সাথে সেদিন দেখা হলো না, তিনি বাড়ি ছিলেন না। চিঠিখানা সে একজন চাকরকে দিয়ে বলে এলো : "কাল সকালে আসবো।"

তার পরের দিন সকালবেলা। ঘুম ভাঙার পরেই সে সালেমা সাহেবার সাথে দেখা করার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। ওর বুকে একটা ঔৎসুক্য জেগেছে, একটা নতুন আশা। এই নারীপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ কিছু জানা না থাকলেও একটা কাজ পাওয়া যাবে, এটাই ওর কাছে একটা আনন্দের জিনিশ হ'য়ে দাঁড়ালো।

তারপর সূর্যের রং সামনের মসজিদের মিনারে সোনালি হ'য়ে ওঠার সাথে সাথেই হারুন প্রস্তুত হয়ে নিল।

খবর পেয়েই সালেমা সাহেবা নেমে এলেন। পাতলা সাদা থান পরনে। সমস্ত শরীরে পড়ন্ত যৌবনের স্নিগ্ধ ছাপ। হারুন হাত তুলে আদাব করলো। প্রথমেই কথা বললেন সালেমা সাহেবা : "তুমি হারুন" ওজু ভাই তোমাকে পাঠিয়েছেন? এতটুকু ছেলে তুমি কি কাজ করবে, এঁ্যা?" সালেমা সাহেবা খুব খুশি হয়ে উঠছিলেন। হারুনকে এতটুকু ছেলে বলায় সে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেও বললো : "হ্যাঁ, ওয়াজেদ সাহেবই আমাকে পাঠিয়েছেন।"

www.pathagar.com

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তার মনের গুমোট কেটে গেলো। সালেমা সাহেবার সস্নেহ কথা এবং প্রচুর হাসিতে সে'ও খুব খুশি হয়ে উঠলো।

আসবার সময় গায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললো : "আমি তাহলে শীগ্‌গির আসছি।"

"হ্যাঁ, তাই এসো।"

বাড়ি ফেরার পথে হারুন ভাবতে ভাবতে এলো : সালেমা সাহেবা তো কাজের কথা পাড়লেন না, অন্য কথাই বললেন। ওজু ভাইয়ের সাথে ওর পার্থক্য আছে ; ওজু ভাইকে দেখলেই কাজের লোক মনে হয়, অথচ সালেমা সাহেবা যেন মজলিস জমাতে চান।

প্রথম সাক্ষাতের পর প্রায় এক মাস চলে গেছে। এখন হারুন ঘন ঘন সালেমা সাহেবার কাছে যায়। তাঁর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে এবার কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু কাজের কথা কিছুই হয় না। সালেমা সাহেবার সাথে গল্প ক'রে আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে সময় নষ্ট হওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজই হয় না। তবু এ সময়টা বড় আনন্দে কেটে যায়। সালেমা সাহেবার সাথে হারুন মন খুলে মিশতে পারে, বন্ধুমহলে এমন হয় না। তারা ঠাট্টা করে, সমালোচনা করে, কিন্তু সালেমা সাহেবা অত্যন্ত একাগ্রচিত্ত শ্রোত্রী।

কথা হয় ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে। সালেমা সাহেবা নিজের জীবন-কাহিনী শোনাতে ভালোবাসেন। হারুনের যে শুনতে ভালো লাগে, তা নয়, তবু তাঁকে খুশী করার জন্য মাঝে মাঝে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করে।

"আপনি কত দিন এই প্রতিষ্ঠানে আছেন?"

সালেমা বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন : "কয়েক বছর হয়ে গেছে। উনি মারা যাবার পর থেকেই এই সমিতি গড়ে তুললাম। ওজু ভাইয়ের সাথেও এই সূত্রে আলাপ হলো। ওজু ভাই-ই প্রথমে আমাকে চিঠি লেখেন। ওঁর ধারণা যে, এই সমিতির মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশে একটা প্রেরণার সৃষ্টি করা যাবে। তারপর থেকে ওজু ভাই যতদিন কলকাতায় আছেন ততদিন এই সমিতিকে সাহায্য করছেন।"

অল্প কথাবার্তার পর সেদিন হারুন উঠে পড়লো : "যাই এখন।"

সালেমা বেগম অনুনয়ের স্বরে বলেন : "কাল এসো।"

পথ দিয়ে চলতে চলতে হারুন সালেমা বেগমের কথাই ভাবছিল। এই ভদ্রমহিলার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে তার জীবনের স্রোত মন্থর হয়ে পড়েছে। আগেকার সেই দুরন্ত খ্যাপামি নাই, অত্যন্ত শান্ত হয়ে এসেছে তার জীবন। তবু ভালো লাগে, কাজ না করতে পেরেও তার এই জীবন ভালো লাগে। মানুষের কাজ করার পিছনে আছে কোনো না কোনো রকমের ক্ষুধা কিংবা অভাব। হারুনের জীবনেও অভাব আছে—সে অভাব দৈহিক নয়, মানসিক। তার সঙ্গীহীন জীবন কোনো একটা কাজের ভিড়ে আত্মবিস্মৃতি কামনা করতো। এ সংবাদ তার নিজেরই অজানা ছিল। সালেমা বেগম তাঁর সেই সঙ্গীর অভাব মিটিয়েছেন অনেকখানি। হারুনের জীবন-স্রোতে সেই তৃপ্তিতেই মন্থর হয়ে এসেছিল অনেকখানি। এ-কথা হারুন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না যে, এই সঙ্গ-তৃপ্তি তার মুখে বিরাট কথার সৃষ্টি করছে। সালেমা বেগমের জীবনেও এর ব্যতিক্রম হচ্ছিল না। ফলে দেখা গেল যে, তাদের সমিতির কাজ আগামী দিনের আশায় পরিত্যক্ত হয়ে প'ড়ে থাকছে, নিজেদের ব্যক্তিগত আলাপ আর গল্পেই ওদের আজকের দিনটা ভরপুর থাকে।

www.pathagar.com

ওয়াজেদ সাহেবের সাথে হারুনের আজকাল খুবই কম দেখা হয়। তিনি যখন এখানে আসেন হারুন তখন থাকে না এবং হারুন যখন এখানে থাকে তখনো এই নিয়মের পুনরুক্তি হয়। সুতরাং হারুন একদিন ঠিক করলো যে খুব ভোরে গিয়ে ওয়াজেদ সাহেবের সাথে দেখা করবে।

পরদিন সকালে হারুনের সাথে ওয়াজেদ সাহেবের দেখা হলো সিঁড়ির মুখে।

হারুন বলে উঠলো : "বাঃ, এত সকালে কোথায় যাচ্ছেন?"

"একটু দরকার আছে খিদিরপুরে, চলো না আমার সাথে একটু।"

"চলুন।"

পথে হাঁটতে হাঁটতে ওয়াজেদ সাহেব বললেন, "সালেমা সাহেবা তো তোমার উপর খুব খুশি হয়ে উঠেছেন। আমার সাথে সেদিন ওঁর দেখা হয়েছিল। বললেন : তোমার মতো একটা ছেলে যদি ওঁর থাকতো!"

হারুন নিরুত্তর। মনে মনে সে অবাক হয়ে উঠলো। সালেমা বেগমকে তো অনেকটা বান্ধবীর মতোই মনে হয়, হঠাৎ তাঁর সন্তান লোভ! হারুন প্রথম দিন দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে সালেমা বেগম যতখানি মজলিশের লোক, কাজের লোক ততখানি নন। তবু ওয়াজেদ সাহেব কেন যে ওঁর উপর একটা বড়ো কাজের ভার দিয়েছেন সে-কথা হারুন বুঝে উঠতে পারে নাই।

হারুন মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে ওয়াজেদ সাহেবের দ্রুতগতির সাথে পা মেলাচ্ছিল। ওয়াজেদ সাহেবই আবার কথা আরম্ভ করলেন : "সারাজীবন কষ্ট করে আসছেন, তুমি ওঁর কাছে সময় পেলেই যেয়ো, তোমাকে দেখে খুব খুশি হন।"

হারুন এ-কথার কোনো উত্তর দিয়ে বলে উঠলো : "আপনি ওঁকে এত বড় একটা কাজের ভার দিলেন? কেন, উনি কি পারবেন?" তার মনে জাগছিল সময়ের অপব্যবহারের কথা।

ওয়াজেদ সাহেব হেসে উঠলেন : "যদি না-ও পারেন তবে পারার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সমাজে প্রচুর যোগ্য মানুষ কোথায় যাঁরা কাজে করতে পারেন? আমি তুমিই কি ঠিক কাজ করতে পারছি? সালেমা বেগম যে কাজ করতে পারবেন এ আমি বিশ্বাস করি। ওঁর শক্তি আছে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় উনি লেখাপড়া শিখেছেন যা এ-দেশের মেয়েদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। তাছাড়া এই সমিতিটাও ওঁর চেষ্টাতেই দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনমতো সহায়তা পেলে এই প্রতিষ্ঠান যে কার্যকরী হয়ে উঠবে এতে আমার কোনো সন্দেহই নাই।"

খিদিরপুরের রাস্তায় ওয়াজেদ সাহেবকে রেখে হারুন ফিরে এলো।

সারাদিন সে একটা কথাই ভাবলো : সালেমা বেগম তাকে ছেলের মতো দেখেন। এর মানে কি সে বুঝতে পারছিল না। অবশ্য হারুন এমন কোনো পরিচয় পায়নি যাতে করে সে সালেমা বেগমের সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাবতে পারে। বরাবর যতদিন তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছে, বন্ধুর মতো ব্যবহারই সে করেছে। সহকর্মী হওয়ার সুযোগ এ পর্যন্ত তার হয়নি। কারণ সালেমা বেগম কোনো কাজ করবার সুযোগই তাকে দেননি ; বরং এ-কথাই তার মনে হয়েছে সে কাজের কথার চাইতে সালেমা বেগম ব্যক্তিগত আলোচনাই বেশী করতে চান, অবশ্য গল্পচ্ছলে। তবু এই মা হওয়ার কথাটাই তাকে বেশী করে ভাবিয়ে তুলছিল।

www.pathagar.com

অনেকক্ষণ ধরে এই কথা ভেবে ভেবে সে কোনো কুলকিনারা বের করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বার্নার্ড শ'র একখানা বই খুলে বসলো, কিন্তু কিছুতেই মন বসলো না।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে সে উঠে দাঁড়ালো। সালেমা বেগমের বাড়ি। রাস্তায় বিদ্যুৎ জ্বলছে। ঘরে ঢুকতেই সালেমা বেগম অভ্যর্থনা করলেন : "এস হারুন, এস।" হারুন কোনোরকম না ভেবেই হঠাৎ বলে উঠলো : "ওয়াজেদ সাহেবের কাছে আপনি আমার মত একটা ছেলের জন্য আফসোস জানিয়েছেন।"

উত্তর যেন প্রস্তুত ছিলে আগের থেকেই। সালেমা বেগম বললেন, "হ্যাঁ, বলেছিই ত। মেয়েদের জীবনে মাতৃত্বের চাইতে বড়ো সার্থকতা কি থাকতে পারে!" শেষের কথাগুলো এত পরিষ্কার আর এত দ্রুত যে হারুন কিছুতেই কথাগুলোকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে পারছিল না—মনে হচ্ছিল যেন এ পুঁথির ফাঁকা আওয়াজ।

হারুন বললো : "না, তা ঠিক নয়। মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক উভয়েই তো মানুষ, মানুষের কাজ মহত্ব...।"

সালেমা বেগম তার অসমাপ্ত কথায়ই প্রগল্‌ভ কণ্ঠে হেসে উঠলেন : "যাক্, যাক্, ওসব কথা বাদ দাও—কাজ আর মহত্ত্ব। ওজু ভাইও ঐ কথা বলেন। তুমিও আবার ঐ কথা আরম্ভ করেছো?"

কিন্তু হারুনের দ্বিধান্বিত সুর : "আমরা যে এখানে আসি..."

"কাজ করবার জন্য।" সালেমা বেগম অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পদপূরণ করলেন।

হারুন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তার কথায় যে সালেমা বেগম দুঃখিত হবেন এ-কথা সে বুঝতে পারেনি। "এখন তাহলে উঠি", এই বলে সে উঠে দাঁড়ায়।

"কাল সকালে এসো, আমার এখানে খাবে।" সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সালেমা বেগমের কথাগুলো তাকে সজাগ করে দিল।

তার পরের দিন হারুনের ঘুম ভাঙলো দেরিতে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত সালেমা বেগমের অভিমান-ক্ষুণ্ন কথাগুলো তার বুকে বিঁধেছে। একটা অনাস্বাদিত স্নেহ হারুনের মন থেকে উৎসারিত হয়ে অজ্ঞাতে ছড়িয়ে পড়ছিল এই প্রভাতের সূর্য-উৎসের মত, তার কেন্দ্র সালেমা বেগম। হারুন আজ সকালে এই নিঃসঙ্গ বিধবা মহিলার সন্তানহীন জীবনের বেদনা অনুভব করে একটা বিষণ্ন সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সে জানে যে সালেমা বেগমের যে সামান্য আয় আছে তাতে তাঁর একরকম করে চলে যায়। তবু তাঁর মনের ক্ষুধা (মানসিক ক্ষুধার কথা সে আজ প্রথম জেনেছে) মেটানোর কেউ নেই। তাঁর আত্মীয়েরা এই বাড়িতে থাকলেও যেন অনেকখানি দূরে থাকেন। তাঁদের চাল-চলন হারুনের পছন্দ হয় না। অবশ্য তাঁরাও হারুনের সাথে মেশেন না।

হঠাৎ কাল সন্ধ্যার "কাল এখানে এসো" এই কথাটা মনে পড়তেই সে জুতো প'রে দাঁড়ালো। পর মুহূর্তেই তাকে দেখা গেল রাস্তার একপাশ ঘেঁষে সে চলেছে। মাটির দিকে দৃষ্টি তার নিবদ্ধ।

"হারুন, এত তাড়াতাড়ি চললে কোথায়?"

"আপনি যে এখানে?" ওয়াজেদ সাহেবকে দেখে হারুন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলো : চলুন, আপনিও আমার সাথে যাবেন।"

www.pathagar.com

"কোথায়?"

"চলুন না, তারপর বলছি।"

"আগে বলো।"

"সালেমা সাহেবার বাড়িতে।"

"আমার যে কাজ আছে, আমি একটু..."

"কাজ পরে হবে, এখন চলুন।"

ওয়াজেদ সাহেব এই খ্যাপার হাত এড়াতে না পেরে রাজি হলেন : "চলো।"

খানিকক্ষণ চলার পর হারুনের কি মনে হলো, হঠাৎ বলে উঠলো : "আপনাকে আমি ওজু ভাই বলে ডাকব।"

ওয়াজেদ সাহেব হেসে বললেন : "বেশ।"

হারুনের এই কাছে টানার সরল আগ্রহ দেখে ওয়াজেদ সাহেব আনন্দিত হলেন। কিন্তু বাইরে কিছুই প্রকাশিত হলো না। ওয়াজেদ সাহেব সেই ধরনের লোক যাদের মুখে প্রকৃতির হাতে-গড়া আচ্ছাদন আছে। আচ্ছাদন খোলস নয়, পাথরের মতই সে আচ্ছাদন দৃঢ় মনের সমস্ত ভাবাবেগ নির্বিকার ঔদাসীন্যে ঢেকে রাখতে পারে। আর হারুনের স্বভাব ঠিক তার বিপরীত। প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তন তার মুখে স্পষ্ট ছায়া ফেলে। দুটোই সত্যি—খোলস নয়, প্রকৃতির হাতে-গড়া এদের স্বভাব। সে স্বভাবকে ঢাকবার চেষ্টা এরা করে না।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। সালেমা সাহেবার হাতে মশলা বাটার চিহ্ন। "ওমা, তোমরা দুজনেই এক সাথে এসেছ!" তাঁর কণ্ঠে একটা আনন্দের উচ্ছ্বসিত আভাস। "ঐ ঘরটাতে একটু বোসো, আমি দশ মিনিট পরেই আসছি। ওজু ভাই, আবার কাজ কাজ করে উঠে প'ড়ো না যেন।" লীলায়িত ভঙ্গীতে তিনি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

দশ মিনিটের বদলে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যখন তিনি ঘরে ঢুকলেন তখন তাঁর দুই হাতে ঘরে তৈরি করা খাবার। "তোমাদের জন্য করলাম।"

"কেন করলেন?" ওয়াজেদ সাহেব একটু উত্তপ্ত স্বরে বলে উঠলেন : এ সুর তাঁর ব্যতিক্রম।

"তোমরা খাবে না?" অভিমান-আহত কণ্ঠে সালেমা বেগম জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি খাব না।"

"কেন?"

"কেন আবার কি? আমি এলেই আপনি খাওয়াবেন? আমি এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে কয়েকটা কাজের ব্যাপারে। অবশ্য হারুনই আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে—নইলে বোধহয় কাল আসতাম। কিন্তু আপনি খাবার আনলেন কেন?"

"কাজ আর কাজ!" সালেমা সাহেবা ব্যথিত কণ্ঠে বললেন : "তোমাদের সাথে কি কাজ ছাড়া অন্য কথা বলতে পারবো না? সামান্য কিছু খাওয়াতে পারবো না?"

ওয়াজেদ সাহেব একটু বিপন্নভাবে উত্তর দিলেন : "দেখুন, আপনাকে কোনো রকমভাবে সাহায্য করতে আমরা পারি না অথচ আপনার খরচ..."

"থাক, আর আমি শুনতে চাই না। হারুন, তুমিও খাবে না?"

www.pathagar.com

"না।"

সালেমা সাহেব সমস্ত খাবার জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অবরুদ্ধ অশ্রুর ধারা নেমে এলো। ক্রন্দন-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন : "আমি যদি তোমাদের মা হতাম তাহলে কখনো তোমরা এ-রকম করতে পারতে না।" উচ্ছ্বসিত অশ্রু সামলাতে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন।

এ ঘরে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ওয়াজেদ সাহেব হারুনকে বললেন : "তুমি এখন এখানেই থাকো, আমি উঠি। আজ সারাদিন আমাকে ঘুরতে হবে।"

ওয়াজেদ সাহেব উঠে চলে গেলেন। হারুন অভিভূত হয়ে বসে থাকলো। তার কথা বলবার শক্তিও ছিল না। সে শুধু ভাবছিল : "একি হল?" ওয়াজেদ সাহেবের ব্যবহার তার কাছে আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল।

ঘরের মধ্যে একা বসে হারুন ভাবতে লাগলো। শার্শির ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো এসে তার মুখে অবসন্নভাবে পড়েছে, ঘরের মধ্যে কেমন একটা বেদনাদায়ক নিস্পন্দ ভাব। আর পাশের ঘরে সালেমা বেগম। হারুনের এ-কথা মনে পড়তেই (হয়তো এ মনে পড়ার মধ্যে একটা গভীর বিশেষত্ব ছিল) নিজেকে সামলে রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো। হারুনের মনে হলো এ মেয়েটা কিছুই চায় না সংসারের, শুধু চায় সকলকে আদর করে কাছে টানতে, চায় একবার মা ডাক শুনতে। হারুন পাশের ঘরে যাবে কিনা ভাবছিল এমন সময় সালেমা বেগম নিজেই এ ঘরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ বর্ষণশ্রান্ত মেঘের মত অশ্রু-মলিন। হারুন আর থাকতে পারলো না, ব্যগ্রকণ্ঠে সে বলে উঠলো : "মা, আমার খাবার দাও।"

সালেমা বেগম আরো কাছে স'রে এলেন। হারুনের মাথার উপর হাত রেখে স্নিগ্ধ স্বরে ডাকলেন : "আয়!"

সালেমা বেগম নিজের হাতে হারুনকে খাইয়ে দিলেন।
দিতে দিতে আদরভরা কণ্ঠে বললেন : "আমার বাবা, মানিক আমার।"

হারুন পুলকিত হয়ে উঠলো।

যেন চোখের সামনে থেকে একটা বিরাট বাধা উঠে গেছে, হারুনের মনে হতে লাগলো। অত্যন্ত স্বস্তিকর পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়লে মানুষ যেমন উচ্ছ্বসিত আনন্দে ছড়িয়ে পড়তে চায় হারুনেরও তেমনি মনে হচ্ছিল।

সারাদিন ওরা অবিশ্রান্ত কথা বলে গেল। এ যেন আর এক হারুন, গভীর রাত্রির পথভ্রান্ত কর্মোন্মাদ হারুন নয়। এ হারুন শিশু। যৌবনের উচ্ছল আবর্ত থেকে যেন দৈব অনুগ্রহে ছিটকে পড়ছে শৈশবের সোনালি পটভূমিতে।

"হারুন, আমার কোলে শুবি?" সালেমা বেগম ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

কেমন বাধো বাধো ঠেকলেও হারুন কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। সালেমা বেগম ওর উচ্ছৃঙ্খল চুলের মধ্যে হাত বুলোতে লাগলেন।

"আচ্ছা মা, তুমি খুব মা হতে চাও—নয়?" হারুন বোকার মত জিজ্ঞাসা করলো।

"হ্যাঁ, চাই।"

www.pathagar.com

"কেন? মা হয়ে বড়ো হতে চাও—না? সেদিন তো বলছিলে মা হওয়ার চাইতে বড় আর মেয়েদের কিছু নাই।"

"থাম, বোকা ছেলে কোথাকার!" সালেমা বেগম আদরের ধমক দিয়ে হারুনকে চুপ করালেন। হারুন শিশুর মতই অবাধ্যতা আরম্ভ করলো। এ যেন একটা নতুন জীবন—আনন্দের না আমোদের সে কথা বুঝতে না পারলেও তার খুব ভাল লাগছিল।

সন্ধ্যায় সে বেরিয়ে পড়লো প্রত্যেক দিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

ক্রমে ক্রমে এই নতুন জীবনে হারুন অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। নিশীথ-অভিযানের যে শিকড় তার মনের ফাটলে জটিল জ্বালার সৃষ্টি করেছিল তা বুঝি এখন নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির পথে। হারুন এর আগে কোনোদিন নিজের সম্বন্ধে ভাবে নাই। যখন সে নিসঙ্গ জীবনের অন্তর্দাহে অস্থির হয়ে পড়েছে তখনই তার পায়ের দৃঢ় ছাপ পড়েছে পথে-বিপথে। যন্ত্রণা ভোলার সেই একমাত্র উপায় ছিল। কিন্তু এখন সে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। সালেমা বেগম এখন তাকে জড়িয়ে সংসার পাততে চান, একটা বৌমা তাঁর চাই। নতুন সংসার, মা বউ। হারুন বুঝি এবার 'কর্মখালি'র বিজ্ঞাপন পড়বে।

ওয়াজেদ সাহেবের সাথে আবার দেখা হলো সালেমা বেগমের ওখানে। তাঁর হাতে কতকগুলো কাগজ। ওয়াজেদ সাহেব বলছিলেন : "কয়েকটা জেলায় আমাদের নারী-সমিতির শাখা খোলার কথা ছিল। কয়েকজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা এদিকে খুব উৎসাহ দেখাচ্ছেন। তাঁরা বলছেন যে কলকাতার অফিস থেকে কিছু সাহায্য পেলেই তাঁরা কাজ আরম্ভ করবেন।"

হারুন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে এই কথাগুলো শুনে চমকে উঠলো। তাইতো! নারী-সমিতির কাজ তো কিছুই হচ্ছে না! একথা সে একেবারে ভুলে ছিল।

সালেমা বেগম এমন সময়ে অনুযোগের সুরে উত্তর দিলেন : "ওজু ভাই, তুমি এসেই কাজের কথা আরম্ভ করো। সেদিন সেই যে না খেয়ে চলে গেলে তারপর আর দেখা নাই। যাক্ আজ আর খেতে বলছি না, অমনি একটু বোসো, দুটো কথা বলি।" তারপর পিছনে তাকিয়ে হারুনকে দেখে বললেন : "এই যে খোকাও এসেছিস্?"

ওয়াজেদ সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন : "খোকা!"

"হ্যাঁ, হারুন! ও আমাকে মা বলে, জানো না! তুমি তো বলবেই না জানি।"

ওয়াজেদ সাহেব অল্প একটু হাসলেন।

তাঁর হাসি দেখে হারুন ক্ষুণ্ন হলো। কাজ ছাড়া কি মানুষের সম্বন্ধ নাই? "কেন আপনি মা বলতে পারেন না?" হারুনের কথায় আহত অভিযোগ।

ওয়াজেদ সাহেব হারুনের অভিমান দেখে আবার হেসে উঠলেন।

ওয়াজেদ সাহেবের হাসিতে যেন অবিশ্বাসের চিহ্ন।

সালেমা বেগম ব্যথিত কণ্ঠে বললেন : "ওজু ভাই, তুমি হাসছ কেন বল ত। হারু আমার খোকা, ও আমাকে মা বলে। এতে হাসির কি আছে?"

"খুশি হয়ে হাসছি।" ওয়াজেদ সাহেব সংক্ষেপে উত্তর দেন।

"খুশি না ছাই! তুমি কি মনে করেছ আমি জানি। আমি মা হতে পারি না, এই কথা তুমি ভাবছ—নয়? কিন্তু পেটে ধরিনি বলেই যে মা হতে পারব না তার কি মানে আছে! কসম

www.pathagar.com

খেয়ে বলতে পারি, জীবনে কোনদিন কোন পাপ করিনি, কাউকেই ফাঁকি দেইনি—হারুনকেও মা হয়ে ফাঁকি দেব না। তোমরা কি ভাব আমাকে বলো তো! বলো তো!!" অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে এই কথাগুলো বলে তিনি আর চোখের পানি সামলাতে পারলেন না।

ওয়াজেদ সাহেব অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। হারুন একপাশে কাঠের মত অনড় হয়ে বসে থাকলো। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, পালাতে পারলে সকলেই বাঁচে অথচ ওঠবার শক্তি কারুর নাই।

কিছুক্ষণ পরে সালেমা বেগম উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, কি যেন তিনি বলতে চান : "তোমরা যাই ভাব না কেন, আমি একথা জোর করে বলবো যে আমার শুচিতা..."

ওয়াজেদ সাহেব লজ্জিত হয়ে বাধা দিলেন, "এ সব কি বলছেন! মানুষের শুচিতা অশুচিতা বলে সে সব সামাজিক কথা আছে, আমি তা স্বীকার করি না—বলাও পছন্দ করি না।"

সালেমা বেগম ক্রন্দন-স্ফুরিত কণ্ঠে বললেন : "স্বীকার করো না বলেই তুমি এরকম অবিশ্বাস করো। কিন্তু আমি বলবোই, আমার শুচিতা কোনদিন নষ্ট হয়নি, প্রথম বয়সে বিধবা হয়েছি কিন্তু—"

ওয়াজেদ সাহেব অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠলেন : "এ-সব কথা আর ব'লে দরকার নাই। আপনি কেন এত করে সাফাই গাইছেন? এতে যে আরো সন্দিগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমি হেসেছিলাম হারুনের পাগলামিতে। আপনি তাতে কেন ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন? ও সব কথা আর বলবেন না—বলার কি দরকার?"

অত্যন্ত উত্তেজনার সাথে কথা বলার পর, নতুন কিছু বলবার শক্তি সালেমা বেগমের আর ছিল না। তিনি অসাড় হ'য়ে বসে থাকলেন।

হারুন বুঝি আর একটা দিগন্ত খুঁজে পেয়েছে, সেখানে শুচিতার অপূর্ব সমাবেশ। সংযম শান্ত হেমন্তের আকাশ হারুনের চোখের সামনে! কথা কাটাকাটির এত বিসম্বাদের আঁচড় তার মনে লাগতে পারেনি সালেমা বেগমের একটা কথায়—আমি শুচি, পবিত্র, অসংযমী নই। কোনোদিন যা সে ভাবেনি, ভাবতে পারেনি তাই একে একে তার সামনে ফুটে উঠছে মুক্তদল পদ্মের মত। একদিন ছিল ওরা একটা সামান্য আচ্ছাদনে ঢাকা, তারপর পাপড়ি খুলতে লাগলো একটার পর একটা, সবশেষে মৃণালের কোন গহন থেকে বেরিয়ে এলো একটা অতি মৃদু শুচিস্নিগ্ধ গন্ধ! হারুনের মুখের উপর আনন্দের রঙ খেলতে লাগলো।

ওয়াজেদ সাহেব উঠে যাবার সময় হারুনের এই অভিভূত অবস্থা দেখে একটা নিশ্বাস গোপন করলেন।

নিস্তব্ধ ঘরে দুইজন। কারুর মুখে কোনো কথা নাই। অবশেষে সালেমা বেগম উঠে হারুনের কাছে এলেন। ওর মাথাটা বুকে চেপে ডাকলেন, "বাবা, মানিক।"

"মা!" হারুনের স্বর উদ্বেলিত।

আর কিছু বোধ হয় বলবার ছিল না। বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ মাথা রেখে হারুন জিজ্ঞাসা করলো : "ওজু ভাইকে তুমি অত কথা বললে কেন?"

"ওজু ভাই যে আমাকে অবিশ্বাস করেন হারু!"

www.pathagar.com

"কিন্তু শুচিতা ও সংযমের সাথে মাতৃত্বের কি সম্বন্ধ?" হারুনের জিজ্ঞাসা কুটিল নয়, যন্ত্রের মত ও যেন কি বলে যাচ্ছে, নিজেই জানে না।

"আছে বৈকি হারু। ওর চাইতে বড় কলঙ্ক কোনো মায়ের নাই। ঐ কলঙ্ক যে-কোনো মা'কেই মাথা উঁচু করতে দেয় না।"

"তুমি বুঝি মা হয়ে বড় হতে চাও?" হারুন হেসে উঠলো।

"পাগল আমার কি যে বলে!" হারুনের মাথা আরো জোরে তিনি বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন।

এ যেন স্বপ্ন। হারুন স্বপ্ন দেখতে লাগলো। ওজু ভাইয়ের সাথে তার মা'র কথা কাটাকাটি ও ঝগড়ার মন্থনে যে নতুন জীবন বেরিয়ে এল সে যেন তার অমৃত। তার নিজের এই পবিত্র মাধুর্যের সুধা কেমন স্তরে স্তরে সাজানো ছিল তা কি সে কখনো আগে ভাবতে পেরেছে? একটা পার্কের নিভৃত অংশে বসে সন্ধ্যার সময় সে এই কথাগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করছিল। ক্রমে ক্রমে জনবিরল পার্কে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়লো, মধ্যে পুকুরটার উপর আলোর দোলানি। হারুনের মনও স্বপ্নে আনন্দে দুলতে লাগলো। তার মা নিজের মুখেই স্বীকার করেছে, সে পবিত্র। পুকুরটার চারপাশ দিয়ে মনের আনন্দে সে প্রায় নেচে ফিরছিল।

ওয়াজেদ সাহেবের সাথে পরদিন দেখা। তিনি বললেন : "হারুন, সমিতির কাজ যে কিছুই হচ্ছে না। এদিকে সব জায়গা থেকেই খুব তাগিদ আসছে। তোমার মাকে বোলো।" তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

সালেমা বেগমকে একথা জানাতেই তিনি বললেন : "তুই ওজু ভাইকে ধরে আনলি না কেন?"

হারুন অপ্রতিভভাবে উত্তর দিল।

"বোকা ছেলে আমার। যা বলা যায় তার বেশী কিছু করতে নাই।"

"হুঁ।" হারুন অভিমান করতেও শিখেছে।

"আচ্ছা মান করতে হবে না আর, আমার কাছে আয়।" হারুন এল না দেখে তিনি নিজেই উঠে এলেন।

"ওমা! এত ধুলো কেন মাথায়? শার্টটা আবার ছিঁড়ে গেছে। কোনদিকেই তোমার খেয়াল থাকে না।" উত্তর শোনবার প্রতীক্ষা না করে তিনি ব্রাশ দিয়ে হারুনের চুল ঝেড়ে দিলেন। তারপর বসলেন হারুনের জামা সেলাই করতে।

দিনগুলো টুকরো কাগজের মত ওড়ে। কোথাও যেন তারা বাধা নাই। হারুন ভুলেছে তার দুঃসহ অগ্নিতপ্ত জীবন সালেমা বেগমের আদরে আর স্নেহে। সমিতির কাজ করার কথা তার এখন মনে হয় শুধু ওয়াজেদ সাহেবের কথা উঠলে! সেই সময় মনে হয় যেন এতদিনে সে সত্যি সত্যিই কাজে ফাঁকি দেয়া আরম্ভ করেছে। জোর করে সে উঠে পড়ে : "মা, আমি ওজু ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি।"

"হর্ ফেরাউনকো এক এক মুসা", সালেমা বেগম ঠাট্টা করে বলেন : "ওজু ভাই তোমার মাথা খেয়েছে।" হারুন লজ্জিত হয়ে বসে পড়ে। খানিকক্ষণ মন খুঁত খুঁত করে, কিন্তু আবার সেই মনের উদ্বেগ মুছে যায়।

www.pathagar.com

সালেমা বেগমও আর পারতপক্ষে আজকাল ওজু ভাইয়ের কথা তোলেন না। তাঁর ভয় পাছে হারুন তাঁকে ভুল যায়—ওয়াজেদ সাহেবের সাথে কাজ করে। তিনি তো জানেন, ওয়াজেদ সাহেবের কি সর্বনাশী কাজের নেশা—নিজের সমস্ত সুখসুবিধা দুই পায়ে দলে এই লোকটার যন্ত্রের মত কাজ করবার কি দুর্দমনীয় শক্তি। কিন্তু আবার হাসিও পায়, লোকটা যেন বোকা—বলদের মত খাটতেই জানে, জীবনের, আনন্দের, নেতৃত্বের সুযোগ নিতে পারে না! সালেমা বেগম ওয়াজেদ সাহেবকে ভয়ও করেন, আর বোকা ভেবে নিজে মনে মনে আনন্দ পান। হারুনকে জানাতে সাহস হয় না। হারুন তো বোকা। ওয়াজেদ সাহেবকে ওর সামনে ছোট্টো করলে ক্ষেপে যাবে, হয়তো আর আসবে না তাঁর কাছে। এত শ্রদ্ধা করে ওয়াজেদ সাহেবকে যে হারুনের উপরে সালেমা বেগমের রাগ হয়। মনে মনে তিনি ওয়াজেদ সাহেবকে হিংসা করেন।

পর পর কয়েকদিন ওয়াজেদ সাহেবের সাথে হারুনের দেখা হলো সালেমা বেগমের বাড়িতে। তিনি প্রায়ই আসছেন এখানে, আগে বড় একটা আসতেন না।

"হারুন, আমাদের কাজ কিন্তু কিছু হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি যে করে হোক কাজ আরম্ভ করতে হবে।" তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে এই কথাগুলো বলেন, যেন এই শেষ মুহূর্ত, এর পর সময় পাওয়া যাবে না।

সালেমা বেগম প্রগল্‌ভ হাসিতে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। গল্প করতে চান, কিন্তু ওয়াজেদ সাহেবের মুখে শুধু একটা কথা : "বড় দেরি হয়ে গেছে, আর দেরি করা যায় না।"

হারুনকে নিয়ে তিনি আজকাল প্রায়ই বেরিয়ে যান, কাজের কথা খুঁটিনাটি পর্যন্ত গুছিয়ে বলেন। যদি দলে কেউ না থাকে, তবে কি করে কাজ করতে হবে বুঝিয়ে দেন।

হারুন ক'দিন তাঁর সাথে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে উঠেছে। তবু তার মনে আনন্দ ; এতদিনে সত্যিকার কাজ আরম্ভ হবে।

সালেমা বেগম হারুনের উপর রাগ করেন : "কি চেহারা হয়েছে ছেলের, দ্যাখো। খাওয়া নাই, ঘুমোনো নাই, দেশ উদ্ধার করছেন। যা খুশি তাই করো, পাজি ছেলে কোথাকার!"

এক একদিন তিনি কেঁদে ফেলেন : "আমার কথা তুই শুনবি না।" তাঁর রাগ ওয়াজেদ সাহেবের উপরে, কিন্তু সেই রাগ তিনি দেখান হারুনকে।

হারুন ব্যস্ত হয়ে বলে : "তুমি কেঁদো না মা! আর মাত্র ক'দিন, তারপরেই আমাদের সমিতির কাজ আরম্ভ হবে।"

"ছাই হবে।" উদ্‌গত অশ্রু মুছতে মুছতে তিনি উত্তর দেন।

সমিতির কাজের জন্য ঘোরার সময় হারুন প্রায়ই সালেমা বেগমের কথা ভাবে। এত সরল?

হারুনের বুক অব্যক্ত স্নেহে ভরে যায়। কাজটা ঠিকভাবে চললেই আমি মার কাছে থেকে আর একটুও নড়বো না। আমি গেলে বড্ড কষ্ট পায়।

সারা কলকাতা সেদিন তারা ঘুরলো। কয়েক জায়গা থেকে টাকার যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলো কাজ আরম্ভ করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। বিকেলবেলায় ওয়াজেদ সাহেব বললেন : "হারুন, চলো গঙ্গায় যাই।"

www.pathagar.com

গঙ্গার ঘাটের ঠিক উপরেই একটা প্রাচীন গাছ। শাখায় শাখায় ক্ষতচিহ্ন, তারই মাঝখানে নতুন পাতার সম্ভাবনা। সামনে কয়েকটা প্রকাণ্ড স্টীমার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হালের চাকায় সমুদ্রের লোনা জলের চলন্ত স্পর্শ। কিন্তু এখন এরা বিশ্রান্ত। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ওয়াজেদ সাহেব, বিশেষ করে হারুন, অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ঘাসের উপর সে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে সে আস্তে আস্তে বললো : "দেখুন, ওজু ভাই, আমরা কাজের জন্য যতখানি ব্যস্ত হয়ে উঠি না কেন, আমাদের সমিতির অনেকেই এ নিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।" সমিতির অনেককে মানে সে শুধু সালেমা বেগমকেই জানতো। তাঁরই নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের কথা হারুনের মনে হয়েছিল। এ পর্যন্ত কোনোদিন সে তাঁকে কাজের জন্য ব্যস্ত হতে দেখেনি। তিনি হারুনের সাথে বাজে কথাতেই সময় কাটান। অবশ্য সে সব কথা হারুনের ভালো লাগে। মা'র আদরযত্ন সবই সে পছন্দ করে কিন্তু সমিতির কাজে তিনি যেন ফাঁকি দেন।

ওয়াজেদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন : "সমিতির কার কথা বলছ?"

"মা'র কথাই বলছি। দেখুন, ওজু ভাই, উনি শুধু মা হতেই পারেন কিন্তু আমার মনে হয় কাজ করার শক্তি ওঁর নাই।"

"না, না, তুমি কি বলছ", ওয়াজেদ সাহেব দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে বললেন : "আমাদের সমাজে ওঁর মত কাজের মেয়ে আর একটাও নাই, ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু শুধরে নিতে হবে সেই ত্রুটিকে। আমি বিশ্বাস করি ওঁর শক্তি আছে।"

এই ব্যাপার নিয়ে আর কোনো কথা হলো না। গঙ্গার ঘাট থেকে ফেরার সময়ে ওয়াজেদ সাহেব হারুনকে একতাড়া কাগজ দিয়ে বললেন : "এগুলো তোমার মা'র কাছে রেখে দিও, কাল সন্ধ্যায় তোমার বাড়িতে আমি যাব, তখন এইগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে। পার তো কাল সকালে তুমি এগুলো প'ড়ে গুছিয়ে রেখো। আজ আমার সময় নাই, নইলে আজকেই আমি এগুলো ঠিক করে রাখতাম। আমাদের প্রাথমিক কাজ আরম্ভের সব কিছু এর মধ্যে আছে। আগামী পরশু থেকে আমরা কাজ আরম্ভ করব।"

এত তাড়াতাড়ি যে সমিতির কাজ আরম্ভ হবে এই আনন্দের সংবাদটা তার মাকে জানিয়ে দেয়ার জন্য হারুন গাড়িতে উঠে বসলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সালেমা বেগম একা বসেছিলেন, তাঁর হাতে কতকগুলো কাগজপত্র। হারুনকে দেখে তিনি সেই কাগজগুলো সামনের ছোট সুটকেসটায় রেখে দিলেন।

"মা, আমাদের কাজ পরশু দিন থেকে আরম্ভ হবে, এই তার কাগজ", হারুন আনন্দে ডগমগ করছিল : "এগুলো রেখে দাও।" হারুন কাগজের তাড়া তার হাতে দিল। ছোট সুটকেসটায় কাগজগুলো রাখতে রাখতে তিনি বললেন : "তোমার সাথে আমি কথা বলব না।" এ যেন ছোট একটা মেয়ের আড়ি।

হারুন তার মার অভিমান দেখে অত্যন্ত মজা পাচ্ছিল।

সত্যি সেদিন সালেমা বেগম অনেকক্ষণ কথা বললেন না। হাতে করে খাইয়ে দিলেন, চুল পরিষ্কার করে সিঁথি কেটে দিলেন, কোনো কথা বললেন না।

হারুন শেষকালে না থাকতে পেরে বলে উঠলো : "তুমি একটা বোকা মা।"

"হুঁ আমি বোকা, নিজে খুব চালাক"—সালেমা বেগম কথা বলার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

www.pathagar.com

"চালাকই– তো।"

"হুঁ চালাক, সারাদিন এলেন না, নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, যাও, তুমি ওজু ভাইয়ের কাছেই যাও।"

এখন থেকে তাঁর কাছেই থাকবে এই কথা দিয়ে হারুন মাকে খুশি করালো। তারপর অনেকক্ষণ আদর খেয়ে সে বাড়ি ফিরে এলো।

রাত্তিরে কিছুতেই তার ঘুম আসছিল না, পরশুদিন কাজ আরম্ভ হবে, তারপরু সে তার মার কাছে থাকবে। এই দুটো আনন্দ এক সাথে মিশে তাকে আজ রাত্তিরে অস্থির করে তুললো। সে তার মার কথাই ভাবছিল বারবার। এত সরল, স্বচ্ছ শুচি তার মা, আবার কেমন ছোট্ট মেয়ের মত আদুরে, দেরি করে গেলে আবার অভিমান করে। হারুন তার মায়ের অভিমান–ক্ষুব্ধ শিশুর মত রূপ কল্পনা করে হেসে উঠলো।

বারান্দা দিয়ে একটা চাকর যাচ্ছিল। সে উঁকি দিয়ে বললো : "মিয়া, কার সাথে কথা বইল্যা হাস্‌তি লাগছেন।"

"দুর ব্যাটা গাধা।" হারুন তাকে খুশি হয়েই ধমক দিল।

পরদিন সকাল। আকাশের বুকে সূর্যের প্লাবন। চৈত্র মাসের প্রথম সবুজ পল্লব ভোর বেলার শীতল বাতাসে শিউরে ওঠে। পালকের মত হালকা মন নিয়ে হারুন বিছানা থেকে উঠলো। সাথে সাথে তার দুটো কথা মনে পড়লো ; মা আর ওজু ভাইয়ের কাগজ। মুখ হাত ধুয়ে খেতে খেতে সে ভাবলো একবার সমিতির কাগজগুলো দেখলে মন্দ হয় না, ওজু ভাইও কাল বলে দিয়েছেন, মার সাথেও অমনি একবার দেখা হয়ে যাবে। সালেমা বেগমের বাড়ির কড়া নাড়লে চাকরানি হেসে দরজা খুলে দিল : "মা তো বাড়ি নাই।"

"এত সকালে কোথায় গেল?" "কি জানি গাড়িতে চড়ে কোথায় গেলেন, আপনার কিছু দরকার আছে?" "হ্যাঁ, সুটকেসটার মধ্যে কাগজ ছিল।" "নিয়ে যান না।" চাকরানীর উপস্থিত বুদ্ধিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে সে সুটকেস খুলে দেখলো সমস্ত কাগজ অগোছান হয়ে প'ড়ে আছে। সব কাগজগুলোই সে তুলে নিল, মার গুলোকে আর এখন নয়, দুপুরে ফেরৎ দিলেই হবে।

আজ এই চৈত্রপ্রভাতের সোনালি হাসির আড়ালে হারুনের জন্য কঠোর বজ্র লুকোনো ছিল। সেই বজ্র পড়লো তার অত্যন্ত অসতর্ক স্বপ্নমুগ্ধ মুহূর্তে।

সমিতির কাগজের তাড়ার মধ্যে ক'খানা সুসজ্জিত নীল রঙের খাম। হারুন কৌতূহলী হয়ে সে খামগুলো খুলে ফেলেছে। ক'খানা ছোট ছোট চিঠি যেন বিয়ের প্রতিলিপি!

প্রথম চিঠিতে তার মার হাতের লেখা :

দেবতা আমার,

আপনাকে আমি সব দিয়েছি, আমার স্বামী বেঁচে থাকতেও আপনি আমার দেহ মন পেয়েছেন, উপভোগ করেছেন, তবু কি আপনার তৃপ্তি হলো না, আপনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন, তা হয় না ; কারণ আমি অন্যকে কথা দিয়েছি, তবু আপনি আমার সব পেয়েছেন পাবেন, আর কি চাই দেবতা?

ইতি—আপনার সালেমা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় চিঠি...একজন পুরুষের হাতে লেখা :

মাননীয়াসু,

আপনি আমার কাছে আর চিঠি লিখবেন না। প্রিয়তম এবং তুমি এ সমস্ত সম্বোধন আমি শুনতে চাই না। আপনি আমাকে যেভাবে প্রতারিত করেছেন তাতে আপনার সাথে আমার আর কোনরকম দৈহিক বা অন্য কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। আমি তা চাই না। আপনার দেহ উপভোগ করব মন বাদ দিয়ে, এ আমায় দিয়ে হবে না। এই আমার শেষ চিঠি।

ইতি—আবুল।

তৃতীয় চিঠিও একজন পুরুষের :

জীবনময়ী রাণী আমার,

তুমি যে আমার হতে চেয়েছ এর চাইতে বড় সৌভাগ্য পৃথিবীতে আমার হতে পারে না, বেহেশতেও বুঝি এর আনন্দ নাই। চুমু নাও, আমার চুমু নাও !

ইতি—তোমার সালাম

চতুর্থ চিঠিখানার উপর মা'র হাতের সালামের ঠিকানা লেখা :

ভিতরে একখানা ছোট্ট চিঠি :

প্রিয়তম,

এ জীবন তোমাকেই দিলাম, তুমি নাও, আমার সব নাও, দস্যুর মত আমাকে উপভোগ করো।

— তোমার চিরদিনের সালেমা।

চিঠিগুলোর টুকরো হারুনের চোখের উপরে জ্বলতে লাগলো। এক দৃষ্টিতে সে চিঠিগুলোর তাকিয়ে আছে। ওরা যেন মৃত্যুবাণ—চারদিক থেকে একসঙ্গে এসে বিঁধছে। চৈত্রপ্রভাতের সোনালি স্নিগ্ধ রৌদ্র দিগন্তের বুকে লেলিহ রসনা মেলে নেচে ফিরছে।

"উহ্।"

হারুনের মুখ দিয়ে মাত্র একটি শব্দ বেরিয়ে এলো। আর কিছু বলবার শক্তি তার নাই। দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে সে নিশ্চল হয়ে বসে আছে। বাইরের তপ্ত আকাশের মতো তার মনের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নি-নৃত্য। এত ছলনাও মানুষ করতে পারে ; মনে মনে সে একবার ভাবলো। কি বিশ্রী এই মেয়েমানুষটা ! তার মনে পড়লো ওজু ভাইয়ের সাথে মা'র না ছিঃ সালেমা বেগমের শুচিতা নিয়ে প্রবল তর্ক। মনে পড়লো সালেমা বেগমের নিজের শুচিতা-সমর্থনের চেষ্টা যেন দেবীর মতো মাতৃত্ব ঊর্ধ্বে উঠতে চান। দুই চোখে সে মধ্যাহ্নের অগ্নিবর্ষণ করে ভাবতে লাগলো। সারাদিন তার কাটলো চেয়ারের উপরে, গতিহীন তার মন, সমস্ত শরীর অসাড়। পশ্চিম সূর্য ঢলে পড়ে তার মাথায় আগুন ঢালছে সেদিকে তার লক্ষ্য নাই। একটা কথাই সে বারেবারে ভাবছে কেন অমন করে সালেমা তাকে ভোলালেন, সে তো নিজে কোনোদিন জানতে চায়নি তাঁর শুচিতার কথা, তবু কেন বারবার অমন নিজের পবিত্রতার কথা শোনালেন। তাঁর মায়ের মতো ব্যবহার সে কি শুধু প্রবঞ্চনা? হারুনের কব্জি

www.pathagar.com

শক্ত হয়ে এল, তার আবদ্ধ হাতের মুঠো, রক্ত-রঙিন চোখ জ্বলে উঠলো, সে সালেমার কাছে শুনবে, হ্যাঁ, জোর করে শুনবে কেন তিনি ওকে ঠকালেন শুচিতার নাম করে, মাতৃত্বের নাম করে।

সূর্য আরো ঢ'লে পড়েছে, পৃথিবীর উপরে একটা অল্প-শীতল বাতাস। হারুন চলতে চলতে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার মনে এখন আগেকার মতো অত উত্তাপ নাই, বুকের ভিতরটা যেন অশ্রুতে মলিন হয়ে পড়েছে, তবু সে যাচ্ছে। এখন তার বুক ফেটে কান্না পাচ্ছে, সে বলতে চায় : "কেন মা তুই অমন করে ভোলালি? সালাম সাহেবের সাথে তুই যাস্‌নে, ওতে আমাদের সাথে মাথা নিচু হয়ে যাবে, যা করেছিস আর করিস না।" হারুন পাগলের মতো কথাগুলো আওড়াতে আওড়াতে চললো। তার বুকের ভিতরে সালেমা বেগম এমন গভীর হয়ে বসে গেছেন যে তাঁকে উপড়ে ফেলার শক্তি হারুনের নাই। হারুন শুধু ভাবছিল সব ঠিক-ঠাক করে নিতে হবে ; মাকে ছেড়ে বাঁচবো কি করে?

মাত্র ক'টা ঘণ্টা তবু মনে হয় যেন বহু যুগের ব্যবধান। হারুনের মনে হচ্ছিল সে যেন কতদিন তার মাকে দেখেনি। সিঁড়ি বেয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল। বেলা শেষের সূর্য এরি মাঝে অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে।

সিঁড়ির ডান পাশের ঘরে গলার আওয়াজ। মা'র গলা নয়? হারুন উৎকর্ণ হয়ে ভেজানো দরজা একটু ঠেলে দিল। একজন ফর্সা লম্বা লোক শুয়ে আছেন কাৎ হয়ে, ব্যাকব্রাশ করা চুল, আর তার পাশে? খোদা, একি করলে আজ!!

হারুনের পায়ের রক্ত বিদ্যুতের বেগে ঘুরতে ঘুরতে মস্তিষ্কে উঠে এল যেন একটা রাইফেলের বুলেট ঘুরতে ঘুরতে তার হৃৎপিণ্ডে ঢুকছে, দৃঢ় সবল বল্লমের মতো ওর সমস্ত চেতনা এক মুহূর্তে জেগে উঠে নিমেষের মধ্যেই ভেঙে পড়লো। সমস্ত মুখে রক্তের ছায়াও নাই, যাদুঘরের স্পিরিটের মধ্যে রাখা আদিযুগের সরীসৃপের মতো ওর ধূসর চেহারা। হারুন বুঝতে পারলো, এখনই হয়তো তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অতি কষ্টে নিচে নেমে সে হাঁকলো : "গাড়ি।"

হারুন যে কি করে বাড়ি এসেছে তা সে নিজেই জানে না।

সন্ধ্যা সময় মনে হলো কে যেন তাকে ডাকছে : "হারুন, হারুন।" অনেক দূরের থেকে যেন সেই ডাক ভেসে আসছে, হারুন বালিশের উপর থেকে মাথা উঠাবার জন্য বুঝি চেষ্টা করলো।

ওয়াজেদ সাহেব এসেছিলেন সন্ধ্যার সময়ে কাগজ নেয়ার জন্য। হারুনকে বিছানার উপর শুয়ে থাকতে দেখে তিনি ভাবলেন বুঝি অসুখ করেছে। কাছে এসে ওয়াজেদ সাহেব বিস্মিত হয়ে গেলেন। এ কি চেহারা হয়েছে হারুনের! মানুষ বলে চেনা যায় না, রুক্ষ চুলে, বিবর্ণ মুখে যেন মৃত্যুর ছাপ।

মাথায় পানি ঢেলে অনেকক্ষণ পরে তিনি হারুনকে অনেকটা সুস্থ করে তুললেন।

"কি হয়েছে তোমার হারুন?"

হারুন উঠে বসেছিল। হাত বাড়িয়ে চিঠির গুচ্ছ দেখিয়ে দিল।

"এ সব তুমি পেলে কোত্থেকে?" ওয়াজেদ সাহেব উত্তেজিত স্বরে বললেন।

"সুটকেসের মধ্যে ছিল এই কাগজগুলোর সাথে।" হারুনের স্বর আবার সবল হয়ে উঠেছে তার রক্তে প্রতিহিংসার দ্রুত পরিক্রমা। ওয়াজেদ সাহেব নিজেকে সামলে নিলেন।

www.pathagar.com

"এখন কেমন বোধ করছ হারুন?"

"ভাল।"

"হারুন, এই চিঠিগুলো প'ড়ে তুমি অমন হয়ে পড়েছিলে?" ওয়াজেদ সাহেব ম্লান হাসি হাসলেন, "কিন্তু অত দুর্বল হ'লে আমাদের চলবে কি করে ভাই, এই সব আঘাতে যদি আমরা ভেঙে পড়ি তাহলে আর সকলের কি অবস্থা হবে?"

"আপনার কি মনে কষ্ট লাগে না।"

ওয়াজেদ সাহেব হাসলেন : "এই চিঠিগুলো নয় এর সমস্ত কাহিনীই আমি আগে জানতাম। সালেমা বেগম বিয়ে ক'রছেন তা-ও অনেক আগেই জেনেছি, তাই তো বরাবর তাঁর শুচিতার কথায় আমি হাসি সামলাতে পারিনি। আমার কষ্ট হয় কিনা জিজ্ঞাসা ক'রছ? হারুন তুমি তো জানো আমার ঘর নাই, সংসার নাই, কাজের পিছনেই আমার জীবন কাটল, তুমি বুঝতে পারবে না কাজ নষ্ট হ'লে আমার কতখানি কষ্ট লাগে। সালেমা বেগমের ঐ চিঠির ব্যাপারে আমি তত কষ্ট পাইনি, কারণ আমি জানতাম ক্ষুধিত মানুষের স্বভাব, কিন্তু উনি যে বিয়ে ঠিক করেছেন তাতে আমাদের সমস্ত কাজ থেকে উনি দূরে স'রে যাবেন, হয়তো নারী সমিতিই উঠে যাবে। কি বিরাট সম্ভাবনা ওঁর মধ্যে ছিল তা তোমরা জানো না। তবু যতটা হয় কাজের জন্য আমি পরশু দিনের মধ্যেই কাজ আরম্ভ ক'রব ভেবেছি। হারুন তুমি ঠিক হ'য়ে নাও কালকেই তোমাকে কাজের বন্দোবস্ত করতে হবে, পারবে না? কষ্ট হচ্ছে খুব আমি জানি, তবু সালেমা বেগমকে বাদ দিয়ে আমাদের কাজ চলে না।"

"ওঁর ওখানে আমি যেতে পারব না, কিছুতেই পারব না। আমি আরো দেখেছি নোংরা মেয়েমানুষ।" হারুনের স্বর দৃঢ়, উত্তপ্ত।

"কেন?" ওয়াজেদ সাহেব ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

হারুনের মাথার রক্ত চড়ছিল, সে আজ বিকেলের সমস্ত ঘটনা অনর্গল ব'লে গেল। বলা শেষ হ'লে দাঁতে দাঁতে চেপে জিজ্ঞাসা করলো : "এর পরও আপনি সেখানে আমাকে যেতে বলেন? এত বড় ছলনা যে করতে পারে তাকে আমি কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে পারি না।" হারুনের সামনে জাগছিল সালেমা বেগমের বীভৎস নগ্ন মূর্তি—যেন মায়াবিনী, রক্ত শুষে খেতে পারে!

হারুনের কথায় পুরুষটির চেহারা : ফর্সা, লম্বা, ব্যাকব্রাশ করা চুল। সালাম সাহেব তো নন। সালাম সাহেবকেও তাহ'লে বিয়ের কথা দিয়ে সালেমা বেগম তাঁকে ঠকাচ্ছেন। হারুনকে এ কথা তিনি জানালেন না। হারুনের কাছে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন : "তুমি একটু শুয়ে থাকো ভাই, আমি আস্‌ছি।" ওয়াজেদ সাহেব হারুনের জন্য ঘুমের ওষুধ আনতে গেলেন। ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে দেখেন হারুন নাই। ওয়াজেদ সাহেব উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন : "কোথায় গেল হারুন, কি কাণ্ড করে বসবে?" তাড়াতাড়ি তিনিও নেমে গেলেন।

রাস্তায় নেমে হারুনের প্রথমেই মনে হয়েছিল সালেমা বেগমকে খুন করার কথা। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটা মোটর তীরের মতো তার সামনে দিয়ে চলে গেল। এই যন্ত্রগতির আশ্বাসে হারুনের রক্ত আরও দ্রুত হ'য়ে উঠলো। সালেমা বেগমের বাড়িতে যেয়ে হারুন দেখলো, তিনি নেই। "একজন ফর্সা ভদ্রলোকের সাথে কি কাজে গেছেন", চাকরানিটা হেসে বললো।

www.pathagar.com

দাঁতে দাঁত চেপে হারুন বললো : "আচ্ছা, আবার দেখা হবে।" তারপর সে মাতালের মতো টলতে টলতে দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়ে পথে নেমে এলো। হারুনের স্নায়ু ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে, পাশ দিয়ে একটানা গাড়ি চ'লে যায়, হারুন অস্থির হ'য়ে ওঠে। চৌরঙ্গী পার হবার সময় সে লক্ষ্য করলো অসংখ্য নরনারীর স্রোত। মুখে রঙ, মেকী মেয়েমানুষদের সাথে পুরুষদের অকুণ্ঠ আলাপ দেখে সে জ্বলতে লাগলো। "ওরা সব পারে", মনে মনে সে ভাবলো, "কুকুরের চাইতে নোংরা ওরা, সব জানোয়ারের চাইতে ছোট, নীচ।" চৌরঙ্গীর চারপাশের সারিধরা আলো তার চোখের সামনে অগ্নি-দাহনের মতো বোধ হ'তে লাগলো।

গঙ্গার ঘাটে একটা গাছের নিচেয় বসে হারুন উপরের দিকে তাকালো, কপালের দুপাশের রগ যেন আগুনের শিখায় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে, চারিদিকে কেমন যেন একটা গতি তরঙ্গ তার মনে হ'তে লাগলো। আকাশের সমস্ত তারা যেন ছুটে চলেছে। এ তার স্নায়বিক উত্তেজনা।

তার মনে হ'ল যেন কালপুরুষের শাণিত তরবারি কটিবন্ধ ভেঙে গঙ্গায় ধসে পড়েছে।

"এই যে হারুন, এখনো আছো দেখছি।" ওয়াজেদ সাহেব পাশে এসে বসলেন। "কেন অত ভাবছ?"

"আপনি ভাবছেন না?" হারুন আজ ওয়াজেদ সাহেবের কাছেও দুর্মুখ হ'য়ে উঠেছে।

"না," ওয়াজেদ সাহেব দৃঢ় কণ্ঠে বললেন : একটা মেয়ের নোংরামি নিয়ে ভাবলে আমাদের চলবে না। তুমি চলো আমার সাথে।" ওয়াজেদ সাহেব হারুনকে হাত ধরে টেনে তুললেন। তাঁর স্নেহের শক্তিকে হারুন এড়াতে পারলো না।

চলতে চলতে ওয়াজেদ সাহেব বললেন : "একদিনের ব্যাপারেই তুমি এতটা অবসন্ন হ'য়ে পড়েছ আর আমি কতদিন ধ'রে সহ্য করছি তুমি তার কি জান? সালেমা বেগম আমাকে বোকা মনে করতেন, আমি তাতেও আহত হইনি। পুরুষের মহত্ত্ব ব'লে একটা জিনিশ আছে, আমার তা কেন থাকবে না? তবু আমি দুঃখ পাই, যে অথর্ব পুরুষটাকে উনি বিয়ে করছেন সে ওর সমস্ত জীবনের কাজ করবার শক্তিকে নষ্ট করে দেবে। তার কিছু টাকা আছে আর স্তাবকতা করার শক্তি আছে। সালেমা বেগম এতেই ভুলে গেলেন! আমার এইজন্যই দুঃখ হয়।"

ওয়াজেদ সাহেব হারুনকে নিয়ে বাড়ি এসে খেতে বসলেন। জোর করে হারুনকে খাইয়ে বললেন : "আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। খবরদার নেমো না।"

হারুন শুয়ে পড়লো। ঘুম আর আসে না। সমস্ত দিনের বীভৎস প্রেতমূর্তি জ্বলতে লাগলো তার চোখে। ওয়াজেদ সাহেবের সান্ত্বনার কথা মনে পড়ে কিন্তু তর্কে বুকের ভিতরকার ঘা শুকোয় না। এপাশ ওপাশ করতে হারুন শুনতে পেলো বারোটা বাজছে তারপর একটা তারপর দুটো। ঘড়ির কাঁটায় পা ফেলে তালে তালে মহাকাল নিজেকে এই রাত্রির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। দূরে একটা তারা, কেমন যেন করুণ মনে হয়, একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

হারুন একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। মনে পড়লো তার সাথে সালেমা বেগমের প্রথম দিনের দেখা—তারপর একে একে সমস্ত ঘটনাটা অখণ্ড হয়ে তারা চোখের সামনে

www.pathagar.com

জেগে উঠলো। সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসছে—হারুনের দুই চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নামতে লাগলো।

বাইরে অন্ধকারে পাথরের মূর্তির মতো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ওয়াজেদ সাহেব হারুনের কান্না দেখতে লাগলেন। তাঁর নিজের বুকের সমস্ত বেদনাকে মানবতার আদর্শে নিষ্পিষ্ট করার চেষ্টায় বারবার তিনি বিফল হচ্ছিলেন। শান্ত দৃঢ় তাঁর মূর্তি।

অনেকক্ষণ পর হারুনের সমগ্র অশ্রু নিঃশেষ হয়ে গেলে ওয়াজেদ সাহেব তার কাছে এসে দাঁড়ালেন : "আজ সে জিনিশ নিয়ে আমরা দুঃখ পাচ্ছি একদিন না একদিন এ দুঃখ সফল হবেই।"

শেষ রাত্রির বাতাস গভীর হয়ে ঘরে ঢুকলো। হারুনের ক্লান্ত শরীরে চোখের পাতায় ঘুমের প্লাবন—বিস্মৃতির প্রথম প্রলেপ।

www.pathagar.com

উপন্যাস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সিকান্দার শা-র ঘোড়া

এ কোন দেশ ?

কালো, মোটাসোটা এবং নাদুশনুদুশ...

পোষমানা, বন্য নয় মোটেই ....

সিকান্দার শা' পিঠে বসে বলেন : এইও ঘোড়া হঠ, হঠ...ঘোড়া এগিয়ে যায় একটু দ্রুতবেগে, তারপর তার গতি শ্লথ হ'য়ে পড়ে। সিকান্দার শা রেগে ওঠেন : এইও হঠ, হঠ। ঘোড়া বিনা-প্রতিবাদে আবার এগুতে থাকে, হাঁটুর চামড়া ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায়, হাতের তালুও অক্ষত থাকে না। মুখে কান্নার চিহ্ন, কিন্তু কাঁদবারও সাহস হয় না। কারণ সিকান্দার শা' হয়তো উত্তম-মধ্যম লাগাতে পারেন, হয়তো চুল ধ'রে টান দিতে পারেন ; হয়তো মাথায় গাঁট্টা মারতে পারেন।

মা এসে পড়ায় বাঁচোয়া। ঘোড়ার অবস্থা দেখে তিনি যে ভাবে রূপায়িত হন তাতে তাকে রাগে ফেটে-পড়া ছাড়া অন্য কিছু বলা কঠিন, এই সিকান্দার, ও' না তোর বড় ভাই..

সঙ্গে সঙ্গে মার হাতের এমন একটা চড় সিকান্দারের কর্ণমূল স্পর্শ করে যাতে তার মাথার মগজ পর্যন্ত বে-সামাল হবার উপক্রম। তবুও সে নামতে চায় না। কেন না, সিকান্দার সে। অগত্যা মাকে এমন শক্তি প্রয়োগ ক'রতে হয় যাতে সিকান্দার শা'কে পর্যন্ত রীতিমত শায়েস্তা হ'য়ে ঘোড়ার পিঠের মায়া ত্যাগ করা আশু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

অতঃপর ঘোড়ার দিকে ফিরে মা কটূক্তি করেন : তুমি একটা গাধা, আস্ত গাধা, ছোট ভাইয়ের সাথেও তুমি পারো না।

রুস্তম মাথা নীচু করে শোনে। সিকান্দারের জন্য তার মন কেমন করে, সে যে গাধা নয় একথা বলার জন্যও মন কেমন উসখুস করে কিন্তু বলতে সাহস পায় না।

পিতৃহারা সন্তান দুটিকে নিয়ে মার উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। বিশেষ ক'রে রুস্তমের জন্য তাঁকে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। ও বোকা, ভাবালু কেমন যেন একটু নির্বোধ, তাইতে মার টানও ওর উপর অত্যন্ত প্রবল। কি জানি সিকান্দার, শুধু সিকান্দরই নয়, সুযোগ পেলে পাড়ার অন্যান্য ছেলেরাও ওর পিঠে কখন চেপে বসে ! মার কান্না পায় : এমন বোকা ছেলেও মানুষের হয় ! কাছ-ছাড়া ক'রতে তাঁর ভয় হয়। তবুও দূর শহরে থেকে মামার তাকিদ আসে : রুস্তম বড় হ'য়ে যাচ্ছে, ওকে পাঠিয়ে দাও, আমার কাছে থেকে ও পড়াশুনা ক'রবে।

অবশেষে একদিন রুস্তমের যাওয়া ঠিক হ'য়ে যায়। কাল সকালে, খুব সকালে কাক পাখী ডাকারও আগে তাকে রওনা হ'তে হবে। কোথায় অনেক দূরে, যেখানে তুমি কোন দিন যাওনি সেই আজব শহরে... কলকাতায়।

বাড়ী থেকে ক-মাইল দূরে স্টীমার স্টেশন, রুস্তমের পক্ষে শীতের রাত্রে অত পথ চলা সম্ভব নয়। ছোট মামা সিরাজ তাই রুস্তমকে সাইকেলের পিছনে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই এক কুটুম বাড়ী যেয়ে উঠল, স্টীমার ঘাট থেকে খুব বেশী দূর নয়।

www.pathagar.com

অজানা জায়গায় এসে রুস্তমের কেমন যেন ভয় করে, মা কাছে নাই, সিকান্দার নাই। এ আবার কেমন দুনিয়া। কেউ পিঠে চ'ড়ছে না। কারুর কাছ থেকে বকুনি শোনা যাচ্ছে না। এ বড় আশোয়াস্তির ব্যাপার, এমন তো আগে ঘটেনি! হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। ছোট মামা ডাকছেন : এই রুস্তম ওঠ, স্টীমার ছেড়ে যাবে।

তখনো তার চোখে ঘুমের নেশা। মামার পিছনে পিছনে পা বাড়ায় সিকান্দার শা'র ঘোড়া, কোথায় তা সে জানে না। পায়ের নীচে স'রে যায় মটরশুঁটির ক্ষেত, আকাশে কুয়াশা। মামা ঠক্-ঠক্ করে : কী শীত রে বাবা।

রুস্তম বিস্মিত হয়ে অনুচ্চস্বরে বলে, কই শীত কোথায়?

মামার উত্তর যেন তৈরীই থাকে : তুমি আস্ত একটা গাধা, মাঘ মাসের শীতেও তোমার শীত লাগে না!

চারদিক নিস্তব্ধ, মাঠের উপর মাঘের দিগন্ত-বিস্তৃত ঘন কুয়াশা মামাকে দেখাচ্ছে ভাজা কই মাছের মত কুঁকড়ে যাওয়া, অদ্ভুত।

এই হাসিস কেন, মামা ধ'মকে ওঠেন। — রুস্তম থেমে যায়। ধমক খেয়ে নয়। কুয়াশা ভেদ ক'রে আলো আসছে এত তীব্র আর এত প্রসারিত যে সমস্ত মাঠকেই এক সাথে চেনা যায়, এমনকি ইচ্ছা ক'রলে শুঁটি পর্যন্ত তোলা যায় পায়ের নীচে থেকে। কিন্তু মামা চেঁচিয়ে ওঠেন, এই দৌড়ো দৌড়ো, স্টীমার ফেল ক'রব।

হঠাৎ হুইসিল বেজে ওঠে। ঘুমন্ত মাঠ, আকাশ এবং নদীর সঙ্গে সে'ও শুনতে থাকে সেই গম্ভীর আওয়াজ সমস্ত মন দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে। দিনের উজ্জ্বল আলোয় তারা ট্রেন ধ'রল। হৈ-চৈ ভীড়, গরম চা, পান-বিড়ি তামাক। — অভিভূত হ'য়ে সে গাড়ীতে ওঠে; বিস্ময় আর সীমা মানে না।

সিকান্দার শা'র ঘোড়া এক জামানা পার হ'য়ে আর এক জামানার সীমান্তে পা ফেলছে। সেখানে রেল-সড়ক আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত, নিমেষে নিমেষে টেলিগ্রাফের খুঁটি পার হ'য়ে যায়; আর সব চাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার ঐ ফিঙেটা, ঠিক তাদের পাশের বাসিন্দা ফিঙের মতই দেখতে, তেমনি নির্ভীকভাবে ল্যাজ দুলোচ্ছে; তার পরম আত্মীয়।

অনেক পথ — অনেক মানুষ — অনেক ইস্টিশনে, অবশেষে গাড়ীটা : এ কোথায় ঢুকছে? মস্ত বড় বাড়ী, মস্ত বড়। মা'র কাছে শোনা দেও-য়ের বাড়ীর মত। কিন্তু নির্জন নয়, গমগম ক'রছে : শিয়ালদা-স্টেশন। দৈত্যের বালাখানা!

তারপর যা ঘটল, তা আর বলা যায় না। ওকি? ট্রাম! ওকি? বাস! ওকি? ফিটন! ওকি? রিকশ। মানুষ? এত মানুষ! বাড়ী? এত বাড়ী? রুস্তমের চোখে বন্য-তুরঙ্গের সেই আদি-জিজ্ঞাসা। বিস্ময় নয়, বিস্ফারিত দৃষ্টি : এ কোন দেশ?

সীমানা

বড় মামা ফরিদ-সাহেব খুব কড়ালোক। আদব-কায়দা লেহাজ ও তমিজের ব্যাপারে এত কঠিন যে রুস্তমের ঢিলে-ভাব দু'দিনের মধ্যেই আঁটোসাঁটো হ'য়ে ওঠে। মামী সৌখিন, সর্বদাই ক্রিম এবং স্নোর প্রতি আসক্ত। তবু বড়মামাকেই ভালো লাগে। অত কাঠিন্যের মধ্যেও যে একটা নিবিড় মমতা আছে, তা রুস্তমও সহজেই বুঝতে পারে। কেমন ক'রে পারে তা বলা

www.pathagar.com

যায় না—যে বোধশক্তিতে পাখী শাল গাছকে তার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য উপযুক্ত মনে করে, হয়তো সেই বোধশক্তির ফলেই। সবচাইতে অদ্ভুত মামার চোখ, যা দেখে সে সবচাইতে ভয় পায়, আর যা দেখে সবচাইতে সে নির্ভর করার শক্তি পায়। কেন পায় সে বলতে পারে না।

কিন্তু মামী এত পরিষ্কারভাবে থাকেন আর এত পরিষ্কার তাঁর রঙ, আর এত মিহি তাঁর আওয়াজ তবু তাকে বাজের মতই ভয় করে সে। মামা তাঁকে চড় মারেন, কত জোরে পিঠ তা অনায়াসেই বুঝতে পারে যখন সওয়ারী-বওয়া পিঠও বেঁকে যায়। মামী তাকে আঙুল দিয়েও ছুঁতে চান না। তবু কেন জানি মামাকেই ভালো লাগে তার। আর একটি প্রাণী আছে নার্গিস। তারই বয়সী মামার একমাত্র মেয়ে। টিকালো নাক তার যেমন সোজা, কথাবার্তাও তার তেমনি সোজা আর চড়া, চড়া গায়ের রঙের মতই।

নার্গিসের হাবভাব দেখে রুস্তম তার কাছে এগুতেই সাহস পায় না। সে যে ভাল ঘোড়া হতে পারে, এ-কথা বলাও তার সাহসে কুলোয় না। প্রত্যেক দিন সকালে বই-শ্লেট নিয়ে নার্গিস স্কুলে যায়। একা, সম্পূর্ণ একা। পথে এত গাড়ী, এত ঘোড়া—নার্গিস ভয় পায় না? সাহস ক'রে একদিন সে নার্গিসকে এই কথা জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলা। নার্গিস তার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি, শুধু মুখ দিয়ে উচ্চারণ ক'রেছিল : ফুঁ!

তারপর তার লীলাচপল গতির দিকে তাকিয়ে থেকে রুস্তমের মনে হ'য়েছে ওকে সে দৌড়ে ধ'রতে পারে কিনা। কিন্তু না, সে পারে না। যে মামী তাকে আঙুল দিয়েও ছুঁতে চান না, যে নার্গিস তার সাথে কথা বলার জন্য দৌড়ে আসে না, সেই মামী আর সেই নার্গিসই তাদের মধ্যে এমন একটা আড়াল টেনে দিয়েছে যা রুস্তমের কাছেও সীমা-নির্দেশ ব'লে ধরা পড়তে দেরী হয় না মোটেই।

দিন কয়েক পরেই মামা নিয়ে গেলেন রুস্তমকে স্কুলে ভর্তি ক'রতে। কিন্তু ছেলেটা এত নিরেট আর এত অন্যমনস্ক যে, সবচাইতে নিচু শ্রেণীতে ভর্তি করা ছাড়া অন্য উপায় দেখা গেলো না। নার্গিস তার সমান বয়সী, সে পড়ে ক্লাস থ্রিতে। মামী যখন খবরটা শুনলেন, তখন তার মুখে এমন একটা হাসি ফুটে উঠল যা দেখে রুস্তম এই প্রথম বুঝতে পারলো যে, আনন্দ প্রকাশ করা ছাড়াও আর এক রকম হাসি আছে : তুমি যদি কাউকে ঠকাতে পারো তাহ'লেই তোমার মুখে সেই হাসি ফুটবে। নতুন বই-পত্তর কেনা তার কাছে ভালোই বোধ হচ্ছিল, কিন্তু সেই ভালো লাগাটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে এল যখন মাস্টারেরা পড়া জিজ্ঞাসা ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। এ এক বিপদ। কাল যা শুনেছো আজ ঠিক সেইমত উত্তর দিতে হবে। এ কেমন ক'রে সম্ভব?

কিন্তু কেমন ক'রে সম্ভব সে-কথার উত্তর দিতে মাস্টারদের বেত আদৌ জানে না। অত্যন্ত অনুগত কিন্তু জোরালোভাবে পিঠের উপর ওঠা-নামা ক'রতে থাকে। কেউ কেউ আরো বেশী উৎসাহী, মাথায় গাঁট্টা মারেন, টেবিলে মাথা ঠুকে দেন!

ঐ সময় তার মায়ের কথা মনে পড়ে, তাকে ঘোড়া ক'রে গাঁট্টা মারার অপরাধে মা সিকান্দারকে কেমন ক'রে শাস্তি দিয়েছেন, কেমন ক'রে অন্য বাড়ীর দুষ্টু ছেলেদের তাড়িয়ে দিয়েছেন ; আর তখনি তার দু'চোখ ফেটে পানি আসে। ধমক খাওয়ার ভয়ে সে তাড়াতাড়ি আস্তিনে চোখের পানি মুছে ফেলে। তারপর এক সময় স্কুলে ছুটি হ'য়ে যায়। কলরব ক'রতে ক'রতে ছেলেরা যে যার বাড়ীর দিকে ছুটতে থাকে। শুধু সে-ই মন্থর পায়ে হাঁটতে থাকে।

www.pathagar.com

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে একদিন সে রাস্তা হারিয়ে ব'সলো। অনেকক্ষণ হাঁটার পর যখন তার এই রাস্তা হারানোর কথা মনে প'ড়লো তখন সে এত ভয় পেয়ে গেলো, যে কাঁদবার শক্তিও আর তার থাকলো না। অনেক ঘোরাঘুরির পর সে রাস্তার চৌমাথায় এসে দাঁড়ালো, সন্ধ্যার কাকের কণ্ঠে কেমন যেন একটা আর্ত-বিভীষিকা। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাস জ্বলছে। পাগলের মত সে দৌড়তে থাকে। হঠাৎ কার ধাক্কা খেয়ে সে একপাশে ছিটে পড়ে। আ হা হা লাগল—ব'লে যে লোকটি তাকে তুলে ধরলো রুস্তম যেন এতক্ষণ তাকেই খুঁজছিল। সে কেঁদে ওঠে।

লেগেছে খোকা?

আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। —রুস্তমের সোজা জওয়াব।

তোমার নাম কি, কোথায় থাক, কোন্ রাস্তায়?

রুস্তম সব কথার মুখস্থ উত্তর দেয়। কথাগুলো মামাই তাকে শিখিয়েছিলেন একদিন, স্কুলের খাতায়ও অপটু হাতে সেগুলো সে টুকে রেখেছিলো।

ভদ্রলোকের সাথে রুস্তম যখন বাসায় ফিরে এলো, তখন সে দেখে বিস্মিত হলো যে তার এত বড় অন্তর্ধানে একমাত্র মামা ছাড়া আর কারুর কিছু ভাবান্তরই হয়নি। না মামীর, না নার্গিসের। শুধু মামা তাকে দেখে ছুটে এলেন এবং এতদিন যা করেননি তাই তিনি ক'রলেন। রুস্তমকে তিনি সটান কোলে তুলে নিলেন।

মামীর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, তিনি শুধু ব'ললেন, হ'য়েছে, খাবে এসো। আশ্চর্য, মামা এখনও খাননি! তার জন্য তো শুধু মা-ই না খেয়ে থাকতো!

দিন কেটে যায় একভাবে!

হঠাৎ পরিবর্তন এলো একটি নতুন ছেলের সাথে পরিচয় হ'য়ে। বয়সে সে অনেক বড়, নাম ফিরোজ। একদিন তাকে অনেকগুলো ছবি দেখালো। অদ্ভুত সব ছবি। কোনটা ফুলের, কোনটা গাছের, এমনকি আম গাছের! ফিরোজের বড় ভাই ছবি আঁকে, তারই দেরাজ থেকে চুরি ক'রে আনা। তারপর সে দেখালো কয়েকটি মেয়ের ন্যাংটো ছবি, রুস্তমের তা ভাল লাগলো না।

এ বুঝি খুব গরীব মানুষের ছবি—সে জিজ্ঞাসা করে।

দূর, তুই খুব বোকা।—ফিরোজ উত্তর দেয়।

এতে বোকামির কী হলো বুঝতে না পেরে রুস্তমও রেগে ওঠে।

[ক্রমশ]

www.pathagar.com

পরিশেষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জীবনপঞ্জি

১৯১৮ জন্ম : ১০ই জুন ; গ্রাম : মাঝআইল ; মাগুরা, যশোর। পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র। পিতা : খানসাহেব সৈয়দ হাতেম আলী। মাতা : রওশন আখতার। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান।

১৯২৪ মাতার মৃত্যু।

১৯৩৭ 'রাত্রি' শীর্ষক প্রথম কবিতা প্রকাশিত হ'লো মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ্ [বাহার]-সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৪৪)। এ-মাসেই 'পাপ-জন্ম' কবিতাটি প্রকাশিত মোহাম্মদ আকরম খাঁ-সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী'তে। প্রথম গল্প 'অন্তর্লীন' প্রকাশিত 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৪৪)। অন্যান্য প্রকাশিত গল্প : 'বিবর্ণ', 'মৃত বসুধা', 'যে পুতুল ডলির মা', 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা', লিখলেন ১৩৪৪-৪৬ সময়পরিসরে। প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা নিজ গ্রামের পাঠশালায়। পরবর্তীতে কলকাতা মডেল এম. ই. স্কুল ও বালিগঞ্জ হাই স্কুল অধ্যয়নশেষে এ-বছরই খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ। বালিগঞ্জ স্কুলে সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। স্কুল-জীবনে শিক্ষক হিশেবে সংস্পর্শ লাভ করলেন কবি গোলাম মোস্তফা, কথা-সাহিত্যিক আবুল ফজল ও কবি আবুল হাশিমের। শিক্ষক আবুল ফজল কলকাতা যাচ্ছেন শুনে হুইটম্যান-এর "লীভ্স অব গ্রাস" আনার জন্যে অনুরোধ করেন। সাহিত্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো কবি আহসান হাবীব, কথাশিল্পী আবু রুশদ, কবি আবুল হোসেন প্রমুখের সঙ্গে। কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী — এঁদের পেলেন শিক্ষক হিশেবে। এ-সময় বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো কবি-র গুচ্ছ-কবিতা।

১৯৩৮ এফ. আহমদ নামে 'ব্যায়ামশিক্ষক মোহাম্মদ জনাব আলী' শীর্ষক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত ('মাসিক মোহাম্মদী', আশ্বিন ১৩৪৫)। কবি-দার্শনিক আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল-এর ইন্তেকাল। কবি লিখলেন ইকবাল-কে নিবেদিত কবিতা 'স্মরণী'। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন-সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্র 'সওগাতে' প্রথম কবিতা 'আঁধারের স্বপ্ন' (পৌষ ১৩৪৪)। ১৯৪৭ (১৩৫৪) পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সওগাতে' নিয়মিত লিখছেন।

১৯৩৯ আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, দর্শনে অনার্স নিয়ে বি. এ.-তে ভর্তি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফতেহ লোহানীকে পেলেন বন্ধু হিশেবে। শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

www.pathagar.com

১৯৪১ স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. ক্লাসে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি। 'কাব্যে কোরআন' শিরোনামে 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে' বেশ কিছু সূরা-র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশিত। ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কবি-র মতাদর্শগত পরিবর্তন। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন।

১৯৪২ খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ। বিয়ে উপলক্ষে কবি লিখলেন 'উপহার' শীর্ষক একটি কবিতা, প্রকাশিত হলো 'সওগাতে' (অগ্রহায়ণ ১৩৪৯)। জাতীয় জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম আক্রান্ত হলেন অনারোগ্য ব্যাধিতে।

১৯৪৩ কলকাতা আই. জি. প্রিজন অফিসে চাকরিতে যোগদান। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে'র সপ্তম অধিবেশনে কবি আবৃত্তি করলেন 'দল-বাঁধা বুলবুলি' ও 'বিদায়' শীর্ষক কবিতা। শুরু হলো "সাত সাগরের মাঝি", "সিরাজাম মুনীরা", "কাফেলা" প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্গত কবিতার রচনা। ফররুখ এ-সময় রচনা করে চলেছেন ১৩৫০-এর মন্বন্তর বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ।

১৯৪৪ কবি-র কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" প্রকাশিত। সুকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "আকাল"-এ সংকলিত 'লাশ' শীর্ষক কবিতা। আই. জি. প্রিজন অফিসের চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন কলকাতা সিভিল সাপ্লাই অফিসে। পিতা সৈয়দ হাতেম আলীর মৃত্যু : ১০ নভেম্বর ১৯৪৪।

১৯৪৫ পি. ই. এন.-আয়োজিত রাইটার্স কনফারেন্স-এ 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অগ্রণী নায়ক কাজী আবদুল ওদুদ ফররুখ-কাব্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন। আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চে" সংকলিত হলো কবিতাত্রয় 'শিকার', 'হে নিশানবাহী ও 'সাত সাগরের মাঝি'। সংকলনের ভূমিকায় গুরুত্ব লাভ করলো ফররুখ-কাব্যপ্রসঙ্গ। যোগ দিলেন 'মাসিক মোহাম্মদী'তে। একটি অপ্রীতিকর ঘটনার দরুন প্রায় বছরখানেক পর 'মাসিক মোহাম্মদী' অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

১৯৪৬ "আজাদ করো পাকিস্তান" কাব্য-পুস্তিকা প্রকাশিত। সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লিখলেন দাঙ্গা-বিরোধী গুচ্ছকবিতা। কলকাতা বেতারে আবৃত্তি করলেন 'নিজের রক্ত' শীর্ষক কবিতা। প্রসঙ্গত, আকাশবাণী-র 'গল্পদাদুর আসরে'ও কবি অংশগ্রহণ করতেন। জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে অল্প কয়েক দিন চাকরি করেন।

১৯৪৭ 'মাসিক মোহাম্মদী' অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দানের পর থেকে কবি বেকারজীবন যাপন করছেন। এ বছরেই কবি আবদুল কাদির-রচিত 'নবীন কবি ফররুখ আহমদ' নিবন্ধটি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত

www.pathagar.com

হয়। কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন শ্বশুরবাড়ি — দুর্গাপুর, যশোরে। 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত ('সওগাত', আশ্বিন ১৩৫৪)। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। দেশবিভাগ।

১৯৪৮ কলকাতা থেকে সপরিবারে ঢাকায় চ'লে এলেন। ঢাকা বেতারে অনিয়মিত শিল্পী হিশেবে যোগদান। বেতারের প্রয়োজনে কবি এখান থেকেই নিয়মিত গান রচনা শুরু করলেন। আধুনিক, দেশাত্মবোধক, হাম্‌দ, না'ত প্রভৃতি গানের পাশাপাশি কথিকা, নাটিকা, গীতিনাট্য, গীতিনকশা — এসব রচনাও শুরু। পঞ্চাশের দশক থেকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 'কিশোর মজলিশ' পরিচালনা শুরু। গদ্যনাটিকা "রাজ-রাজড়া" প্রকাশিত (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত — মুনীর চৌধুরী প্রমুখ এই নাটকে অভিনয় করেন)। শুরু হলো ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন।

১৯৫১ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ইকবাল-জয়ন্তী অনুষ্ঠান বর্জন, তরুণ লেখকদের আমন্ত্রণ না-করার প্রতিবাদ।

১৯৫২ "সিরাজাম মুনীরা" প্রকাশিত। ঢাকা রেডিওর 'নিজস্ব শিল্পী' হিশেবে বহাল হলেন। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সালাম, জব্বার, রফিক, শফিকের শাহাদাতের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে, ঢাকা বেতারেই প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত। সোচ্চার হলেন ফররুখ। ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' অংশগ্রহণ।

১৯৫৩ ফররুখ আহমদ-কে (পনেরো জন শিল্পীসহ) ছাঁটাই করা হলো। বেতারশিল্পীদের সতেরো দিন-ব্যাপী ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে ফররুখ (অন্যান্য শিল্পীসহ) চাকরিতে পুর্নবহাল।

১৯৫৭ সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। ঐ উপলক্ষে কবিতা ও গান রচনা।

১৯৫৮ ঢাকা বেতার থেকে "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্য প্রচারিত। এই নাটক প্রযোজনা করেন ও নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন খান আতাউর রহমান।

১৯৬০ প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফেরমেন্স' লাভ করলেন। এ-বছরই বাংলা একাডেমীর পুরস্কার প্রাপ্তি (কবিতা) ও একাডেমীর 'ফেলো' নির্বাচিত। বাংলা একাডেমী উদ্‌যাপিত নাট্য-সপ্তাহে "নৌফেল ও হাতেম" মঞ্চস্থ।

১৯৬১ কাব্যনাট্য "নৌফেল ও হাতেম" প্রকাশিত। এ সময়ে সরকারি সফরে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলা ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে ঢাকা হলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা-বাসরে প্রাণ-ঢালা সংবর্ধনা পেলেন কবি। ফররুখ সাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ। কবি-র কবিতা আবৃত্তি করলেন শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ

www.pathagar.com

মনিরুজ্জামান, বদরুল হাসান, সালমা চৌধুরী, শবনম মুশ্‌তারী প্রমুখ। আবদুল আহাদ পরিচালিত কবি-রচিত সংগীত-বিচিত্রা অনুষ্ঠিত। সংবর্ধনা-বাসরে কবি-কে প্রদত্ত মানপত্র পাঠ করলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

১৯৬৩ "মুহূর্তের কবিতা" প্রকাশিত। এ-বছরেই ফারুক মাহমুদ-সম্পাদিত "ধোলাই কাব্য" সংকলনগ্রন্থে কবি-র ছদ্মনামে লেখা ব্যঙ্গ-কবিতা সংকলিত। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে চর্যাপদ থেকে ফররুখ আহমদের কবিতা পর্যন্ত আবৃত্তির আয়োজন করা হয়েছিলো। এতে কবির 'ডাহুক' কবিতাটি আবৃত্তি করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

১৯৬৫ শিশু-কিশোর কবিতাসংকলন "পাখীর বাসা" প্রকাশিত। পাক-ভারত যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি রচনা করলেন 'জঙ্গী জোয়ান চলো বীর', 'শহীদের খুন-রাঙা কাশ্মীর', 'জেহাদের ময়দানে চলো যাই' প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক গান।

১৯৬৬ "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশিত। এ-বছরই "পাখির বাসা" কাব্যের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার ও "হাতেম তা'য়ী" কাব্যের জন্য আদমজী পুরস্কার পেলেন। শেষবারের মতো ঢাকার বাইরে, অগ্রজ সৈয়দ সিদ্দিক আহমদের সঙ্গে দেখা করতে ফরিদপুর গেলেন। ফিরে এসে লিখলেন 'বৈশাখ', 'পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাটে' প্রভৃতি সাড়া-জাগানো কবিতা। দেশপ্রেমের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রদত্ত 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

১৯৬৮ শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ "হরফের ছড়া" প্রকাশিত।

১৯৬৯ শিশু-কিশোর কাব্যগ্রন্থ "নতুন লেখা' প্রকাশিত। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত গবেষণাগ্রন্থ "কবি ফররুখ আহমদ" প্রকাশিত। প্রখ্যাত শিল্পী মোস্তফা আজীজ এ-বছর (২৯ জুলাই) কবি-র একটি পোর্ট্রেট আঁকলেন। দেশব্যাপী উনসত্তরের গণআন্দোলন শুরু।

১৯৭০ ছড়াগ্রন্থ "ছড়ার আসর" (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হ'লো। দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিক কাল ব্যাপী কবি ঢাকা বেতারের সঙ্গে সম্পৃক্ত রইলেন। এ বছরই ঢাকা বেতারের মুখপত্র পাক্ষিক 'এলানে'র (বর্তমান 'বেতার বাংলা') নবেম্বর (প্রথম পক্ষ) ১৯৭০ সংখ্যার প্রচ্ছদ ও প্রসঙ্গকথায় কবি ফররুখ আহমদ প্রসঙ্গ গুরুত্ব লাভ করলো। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৯৭১ কবি ঢাকা বেতারে শেষবারের মতো কবিতা আবৃত্তি করলেন। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

১৯৭৩ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে চাকরিক্ষেত্রে কবি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। এ সময়ে 'ফররুখ আহমদের কি অপরাধ' ('গণকণ্ঠ', ১ আষাঢ় ১৩৮০) শীর্ষক তীব্র-তীক্ষ্ণ প্রতিবেদন লিখলেন আহমদ ছফা। এই প্রতিবেদনের

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে পুর্নবহাল।

১৯৭৪ সামাজিক ও দৈনন্দিন নানাবিধ কারণে কবি-র মন ও শরীর ভেঙে যায়। এ-বছর জুন মাসে (আষাঢ় ১৩৮১) লিখলেন তাঁর সর্বশেষ কবিতা : দুর্ভিক্ষ বিষয়ক কবিতা '১৯৭৪ (একটি আলেখ্য)'। এ-ছাড়া লিখলেন হামদ, নাত, গাদ্দাফী প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ কবিতা, তরজমা করলেন মাওলানা শফিউল্লাহ (দাদাজী)-কে নিবেদিত একটি দীর্ঘ উর্দু কাসিদা। ১৯ অক্টোবর, শনিবার সন্ধেবেলা ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় ইন্তেকাল।

১৯৭৫ "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" প্রকাশিত।

১৯৭৭ একুশে পদক।

১৯৮০ স্বাধীনতা পুরস্কার।

১৯৮৪ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১৯৪৪-৭৪

(কবিতা)

১. সাত সাগরের মাঝি। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫২। তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৭৫। চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৯০।
২. আজাদ করো পাকিস্তান। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৬।
৩. সিরাজাম মুনীরা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৫২।
৪. নৌফেল ও হাতেম। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৬৫। তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৬৭। চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৬৯।
৫. মুহূর্তের কবিতা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৮।
৬. হাতেম তায়ী। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৬।

(শিশুসাহিত্য)

৭. পাখীর বাসা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫।
৮. হরফের ছড়া। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৬।
৯. নতুন লেখা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৯।
১০. ছড়ার আসর (১)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭০।

(পাঠ্যবই)

১১. নয়া জামাত (প্রথম ভাগ)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৫০।
১২. নয়া জামাত (দ্বিতীয় ভাগ)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৫০।
১৩. নয়া জামাত (তৃতীয় ভাগ)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৫০।
১৪. নয়া জামাত (চতুর্থ ভাগ)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৫০।

১৯৭৫-৯৬

১৫. ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫।
১৬. হে বন্য স্বপ্নেরা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৬।
১৭. নয়া জামাত। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮।
১৮. ফররুখ-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৯।
১৯. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০।
চিড়িয়াখানা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০।

www.pathagar.com

২১. কাফেলা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৭।
২২. হাবেদা মরুর কাহিনী। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮১।
২৩. সিন্দাবাদ। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩।
২৪. কিস্‌সা কাহিনী। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪।
২৫. ফুলের জলসা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫।
২৬. তসবিরনামা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬।
২৭. মাহফিল (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭।
২৮. ফররুখ আহমদের গল্প। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০।
২৯. ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১।
৩০. নির্বাচিত কবিতা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯২।
৩১. দিলরুবা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪।
৩২. ফররুখ আহমদ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৫।
৩৩. ফররুখ আহমদ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার

[কবি ফররুখ আহমদ প্রচলিত অর্থে পত্রিকায় যে-ধরনের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়, তার বিষয়ে বিরূপ ছিলেন। ফলে, বিপুল খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়নি বলতে গেলে। আমাদের জানামতে, কবির এই একটিমাত্র মুদ্রিত সাক্ষাৎকারই পাওয়া যায়। এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিলো 'বই' পত্রিকার জুন ১৯৬৮ সংখ্যায়। 'বই' পত্রিকার প্রতিনিধি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। সাক্ষাৎকার গৃহীত হয় কবি-র ইস্কাটনস্থ সরকারি বাসভবনে।]

দীর্ঘকাল যাবৎ আপনি কবিতায় নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। আপনার সদ্য পুরস্কার পাওয়া "হাতেম তা'য়ী" কাব্যও এইরকম পরীক্ষার ফল বলে সুধীমহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। আপনি নিশ্চয় খুব পড়াশোনা করেন, তাই না?

আমি যদি বলি যে, পড়াশোনা চিন্তা-ভাবনার পাট এখান থেকে প্রায় উঠেই গেছে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বিস্মিত হবেন।

তা হবো বৈকি।

কথাটা বিস্ময়কর হলেও মর্মান্তিকভাবে সত্য।

আপনি বড় অদ্ভুত কথা বলছেন দেখি।

অদ্ভুত কথা নয়। কাজের পরিচয় ফল দেখেই পাওয়া যায়।

কিরকম?

দুনিয়ার আরো দশটা উন্নত দেশের চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক অথবা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অবদানের তুলনা ক'রে দেখুন, খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আমাদের পড়াশোনার বহর আর বিদ্যার দৌড় কতটুকু। আমাদের চিন্তাভাবনার পরিধি কতটুকু, সে কথা বুঝতেও দেরি হবে না।

পড়াশোনার সঙ্গে আপনি কেন বারবার চিন্তা-ভাবনার কথা বলছেন?

আমি স্বাধীন চিন্তার কথা বলছি।

কেন?

স্বাধীন চিন্তাভাবনার সঙ্গে গ্রহণ-বর্জন, হজম-বদহজমের যোগ আছে বলেই।

বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আমাদের পড়াশোনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে সায় দিতে পারছি না।

কেন?

অনেকেই আমাকে একথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে না পড়লে তাঁদের ঘুম হয় না। একথা কি মিথ্যে?

ডাহা ভাঁওতাবাজি। ঘুমানোর জন্য কেউ পড়াশোনা করে না। সত্যিকারের জ্ঞানান্বেষী পাঠক তো নয়-ই।

www.pathagar.com

তবে কি মানুষ না ঘুমানোর জন্য পড়াশোনা করে?

যে মানুষ পড়াশোনা করে সে শুধু নিজেই জেগে থাকে না, অন্যকেও জাগায়, তাতে জাতি জাগ্রত হয়ে ওঠে। যারা ঘুমানোর জন্য পড়াশোনা করে, তারা পাঠকই নয়।

তাহলে আপনি আমাদের পাঠক সম্প্রদায়কে সত্যিকারের পড়ুয়া মনে করেন না?

যারা ঘুমানোর জন্য পড়ে তাদেরকে আমি পাঠক মনে করি না।

আর লেখক সম্প্রদায়কে?

যে সব লেখকের স্বকীয়তা আছে, যাঁদের চিন্তাভাবনায়, প্রকাশভঙ্গিতে মৌলিকতা আছে তাঁদেরকে আমি সত্যিকারের লেখক বলে মনে করি।

আমাদের দেশে কি এরকম লেখকের সংখ্যা বেশি?

কোনো দেশেই এরকম লেখকের সংখ্যা বেশি নয়।

তাহলে আপনি আমাদের দেশের সাধারণ লেখক অথবা পাঠক সম্প্রদায়কে বাজে ব'লে মনে করেন?

কোনো মানুষকেই আমি বাজে বলে মনে করি না, শুধু হামবড়া দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষকেই আমি বাজে মনে করি।

আপনি আমাদের লেখক ও পাঠকদের সম্পর্কে চিন্তা করেন কি?

নগণ্য হলেও নিজে যখন এক-আধটু লেখার চেষ্টা করি তখন ও বিষয়েও কিছু চিন্তা করি বৈকি।

আপনি যেভাবে চিন্তা করেন, জানাবেন কি?

উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে এইসব সাধারণ পাঠকই হয়ে উঠবে অসাধারণ পাঠক, নকলনবীশ হবে সত্যিকারের ভালো লেখক!

এটা কি আপনার কাব্যিক উচ্ছ্বাস?

না, প্রাঞ্জল গদ্যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি।

সর্বসাধারণের পড়াশোনার জন্য আপনি কিরকম পরিবেশ চান?

সাধারণ পাঠাগার।

পাঠাগার কি আমাদের নাই?

আছে, কিন্তু সংখ্যায় খুব কম। এতো কম যে বলতেও লজ্জা বোধ হয়।

আপনার কথা মেনে নিলাম। মনে করুন, কোনো অলৌকিক উপায়ে রাতারাতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাগার স্থাপিত হ'লো, কিন্তু তাতেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

না, নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে।

কিসের সমস্যা?

বইয়ের। লেখকের। প্রকাশকের।

সে কিরকম?

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পাঠক সম্প্রদায়কে পরিচিত করতে হ'লে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সে চেষ্টা করতে হবে, এক্ষেত্রে বইয়ের অভাব কেন হবে, আশা করি তা আপনাকে খুলে বলতে হবে না।

www.pathagar.com

কিন্তু লেখকের অভাব হবে কেন?

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা এই যে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। কাজেই লেখকেরও অভাব হবে না কোনোদিন। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। তৈরি কাক অনেক পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে শহরে অনেক কাক মৌজুদ থাকে। কিন্তু তৈরি লেখক অতটা সহজ পাওয়া যায় না, শহরেও খুব বেশি লেখক মৌজুদ থাকে না। কাজেই মৌলিক রচনার কথা বাদ দিলেও তরজমা করার মতো যোগ্য লোকের তখন অভাব হবে। আর যে সমস্ত বই লেখা বা তরজমা করা হবে, তারও প্রকাশক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আপনার শেষের কথাটি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এখনো কি আমাদের সমাজে প্রকাশনা একটা বড় সমস্যা?

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সমাজের এটা চিরন্তন সমস্যা। এই সমস্যার জন্যই ছোটো একখানা বর্ণপরিচয় থেকে শুরু ক'রে বিশ্বকোষ জাতীয় বিরাট গ্রন্থের ব্যাপারে আমাদের পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয়েছে।

আগেও কি এই সমস্যা ছিল?

আগেও ছিল। আপনারা বোধহয় জানেন — যে নজরুল ইসলামকে নিয়ে আমরা এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি সেই নজরুল ইসলামের প্রায় সব বই-ই-প্রকাশ ক'রেছিলেন অমুসলিম প্রকাশক। মাত্র দু'চারখানা বই প্রকাশ করেছিলেন কোনো কোনো মুসলিম প্রকাশক ; তাও শেষ অবস্থায়।

নজরুল ইসলাম কি তাঁদের কাছে থেকে উপযুক্ত মূল্য পেয়েছিলেন ?

তা আমি জানি না।

এটা তো দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেকার ঘটনা।

হ্যাঁ।

তখন হয়তো মুসলিম প্রকাশকদের অবস্থা খারাপ ছিল।

ধরে নিলাম আপনার কথাই ঠিক। এখন আর সে অবস্থা নাই। অনেক প্রকাশকই এখন বিত্তের অধিকারী। ধন-দৌলতের মালিক। অনেক বাড়ি, গাড়ি, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স এখন তাঁদের সৌভাগ্যের খবর দিচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগা লেখকদের অবস্থা তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। লেখকদের অর্থনৈতিক সমস্যার মতো সৎ গ্রন্থ প্রকাশের সমস্যাও প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

আপনি কি শুধু লেখকদের দিকটিই তুলে ধরছেন না? আমার তো বিশ্বাস যে প্রকাশকরাই এখন লেখকদের সবচাইতে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রছেন না নিজেরা পরিপুষ্ট হচ্ছেন?

লেখক সম্প্রদায় কি একেবারেই বঞ্চিত হচ্ছে?

পুরাপুরি বঞ্চিত হচ্ছেন বললে হয়তো বাড়াবাড়ি হবে কিন্তু অধিকাংশ লেখকই যে তাঁদের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছেন না এ কথা ঠিক। তার প্রমাণ বই-এর ব্যবসা করে প্রকাশক বড় হলে তার সঙ্গে লেখকেরও তো হওয়া উচিত, কিন্তু কোনো লেখকই তেমন হননি আজ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

প্রকাশনা একটা নতুন শিল্প হিশেবে এদেশে গড়ে উঠেছে, দেনা-পাওনার ব্যাপারে প্রকাশকের ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছুটা থাকতে পারে, কিন্তু লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক উন্নয়নের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করি।

দেখুন, এই প্রসঙ্গে ছেলেবেলায় পড়া একটা ফারসি গল্প হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মুখতাসার গল্পটা বলব।

বলুন।

ইরানের এক দরবেশ ছিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় আধমণ রুটি খেয়ে সারারাত এবাদতবন্দেগী করতেন।

আধমণ?

হ্যাঁ, আধমণ। গল্পলেখক এই আধমণ রুটি খাওয়ার উল্লেখ করে ব'লছেন যে, আধমণ রুটি খেয়ে সারারাত এবাদত-বন্দেগীতে না কাটিয়ে দরবেশ যদি আধখানা রুটি খেয়ে সারারাত ঘুমিয়ে কাটাতেন তাহ'লে কি চমৎকার ব্যাপারই না হ'ত। অর্থাৎ বিশ-তিরিশ জন লোক খেয়ে বাঁচতো।

আধমণী দরবেশের যে কাহিনী আপনি শোনালেন সে কথা আমাদের সকল প্রকাশকের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। প্রকাশকেরা শুধু নিজেদের উদরপূর্তিই করেন না। পৃষ্ঠপোষকতা ও সৎকাজও করে থাকেন।

তা হয়তো করে থাকেন। কিন্তু লেখকের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা ঠিক সময়ে মিটিয়ে দিলেই লেখক সম্প্রদায়ের সঙ্গে গোটা সমাজেরও উপকার করা হত। লেখকরাও নিশ্চিত মনে লেখাকে পেশা হিশেবে গ্রহণ করতে পারতেন।

লেখাকে পেশা হিশেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আপনি এত আগ্রহশীল কেন?

পেশা হিশেবে গ্রহণ না করলে এ যুগে লেখকের এবং লেখার অস্তিত্ব রক্ষা প্রায় অসম্ভব বলেই আমি লেখাকে স্বাধীন সম্মানজনক পেশা হিশেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

দুনিয়ার সব দেশেই কি লেখকেরা লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন?

দুনিয়ার সব দেশের খবর আমি বলতে পারি না , তবে অধিকাংশ উন্নত দেশের লেখকেরাই লেখাকে শালীন, সম্মানজনক পেশা হিশেবে গ্রহণ করেছেন।

এর তো খারাপ দিকও আছে?

আছে। লেখক যদি নিজের বিবেক বিক্রি করে অর্থপিশাচের ভূমিকায় নেমে লিখতে বসেন তাহলে সেটা ব্যক্তির জন্যেই নয়, সমাজের জন্যেও মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। কিন্তু খারাপ দিকটার কথাই আপনি আগে ভাবছেন কেন?

না, ও কথা আমি ভাবিনি। আমি এমন কয়েকজন লেখককে দেখছি যাঁরা বিত্তশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা ছেড়ে দিয়েছেন।

আমাদের দেশে লিখে বিত্তশালী হয়েছেন?

না, লিখে নয়। নানারকম ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে।

তাই বলুন। তা উত্তর তো আপনি নিজেই দিলেন।

www.pathagar.com

একজন বয়স্ক পত্রিকা-সম্পাদকও কিছুকাল আগে আমাকে বলেছেন যে, যতদিন লেখক দরিদ্র থাকেন ততদিন নাকি তিনি ভালো লিখতে পারেন। কথাটা কি সত্য?

কথাটার উত্তর সরাসরি নিজে না দিয়ে আমি আপনাকে আবার অনুরোধ করবো দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকাতে। সচ্ছল অবস্থান দরুন সে সব দেশের লেখকেরা ভাল লিখতে পারছেন, বেশি লিখতে পারছেন — আমরা পারছি না।

পত্রিকা-সম্পাদকের কথার উপর আমি কোনো গুরুত্ব দিইনি।

না দিয়ে ভালোই করেছেন। কারণ অভুক্ত অবস্থায় থাকলে পত্রিকা-সম্পাদকের ঐ দারিদ্রবিলাস থাকতো না সে আমি নিঃসন্দেহ।

লেখাকে পেশা হিশেবে গ্রহণ করার পক্ষে এটি তাহলে আপনার বড় যুক্তি?

লেখাকে পেশা হিশেবে গ্রহণ করার সবচাইতে বড় লাভ এই যে, লেখক লেখাপড়ায় সব সময় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। রুজি-রোজগারের ধান্দায় লেখককে যদি অকারণে ঘুরতে না হয় তাহলে সত্যিকারের প্রতিভাবান লেখক অনেক বেশি কাজ করতে পারেন বা পারবেন বলেই আমার দৃঢ়বিশ্বাস উন্নতমানের লেখার জন্যে এই পরিবেশ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

যতদিন এই পরিবেশ সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন কি লেখক সম্প্রদায় লেখাপড়া বাদ দিয়ে বসে থাকবেন?

তা যে থাকবেন না তা আপনি নিজেও জানেন। কিন্তু বিনাচাষের ফসল যে কি হয় তার নমুনা তো আপনারা আমাদের লেখা থেকেই পাচ্ছেন।

আচ্ছা, একটা কথা আবার আপনাকে জিগ্‌গসে করব, যদি কিছু মনে না করেন।

অত সংকোচ বোধ করছেন কেন, সরাসরি বলে ফেলুন।

আলোচনার শুরুতে আপনি ও কথাটা বললেন কেন, লেখাপড়া চিন্তা-ভাবনার পাট এখান থেকে প্রায় উঠেই গেছে। কথাটা আমার কাছে যেন কেমন বোধ হচ্ছে।

অর্থাৎ অপ্রিয় সত্যকে মেনে নিতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সত্যকে না মেনে উপায় কি বলুন। একটা স্বাধীন, গতিশীল জাতির লেখক হিশেবে যেভাবে পড়াশোনা করা দরকার সেভাবে যে আমরা পড়াশোনা করি না, করছি না, অথবা করতে পারছি না, সেটা তো আমাদের কাজের নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। নিজেদের ব্যর্থতার কথা আর কিভাবে বলব?

আমরা যাঁরা লেখাপড়াকে দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রম হিশেবে গ্রহণ করেছি তারা যদি না পড়ি তাহলে এদেশের সাধারণ পাঠক জন্মাবেই না। অতএব সেদিকে চেয়ে দেশের ও বিষয়টা একবার চিন্তা করুন!

একথা বলতে গিয়ে আপনি অত মন-মরা হয়ে গেলেন কেন? আমি বরং আমাদের দেশের একশ্রেণীর পাঠকের খবর দিতে পারি, যাঁরা বয়সে প্রাচীন আর উচ্চশিক্ষিত, তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সারা জীবন পড়ছেন, এমনকি ডিটেকটিভ নভেল কি ঐ ধরনের অন্যান্য বই পড়ে কাটাচ্ছেন। এসব পাঠক সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

গদ্যে আর উত্তর কি দেই, এর উত্তর দিতে হয় পদ্যে।

তাই দিন।

www.pathagar.com

অবাক হলাম দাদুর হাতে
দেখে চুষিকাটি,
ঘোরেন তিনি মারবেল আর
নিয়ে দুধের বাটি।

কেমন, হ'ল তো? এই যে চির-নাবালক দাদুর পড়শোনা দেখলে অবাক হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

নাবালক কেন, জোয়ানও হতে পারেন।

তা পারেন, তবে এ বিষয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু এ কথাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সৎ পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

আপনার কথা সত্য হোক, এটাই দোয়া করি। তবে এ কথাটা আমাদের জানা আছে, যে, আজাদী পাওয়ার পর আমরা এমন এক উৎকট ভব্যতার শিকারে পরিণত হয়েছি, যেখানে কার্পেট-বিছানো ড্রয়িংরুমের একপাশে দামি শেলফে রেক্সিনে বাঁধানো অনেক অনেক বই সাজানো থাকে। কোনোদিন সে সব বইয়ের পাতা খোলা হয় না। সেখানে শুধু আলোচনা হয় হাল ফ্যাশানের বাড়ি-গাড়ি আর শাড়ি সম্পর্কে।

লেখকদের উপরেও এখন ঐ তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করছেন, যার ফলে কঠিন শ্রম-সাধনার পথ ছেড়ে অনেক লেখক বাড়ি-গাড়ির স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছেন।

আপনার বুঝি এখানো বাড়ি-গাড়ি কিছুই হয়নি।

আমার নয়, আমাদের কথা বলছিলাম।

আশা করি, এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো কথা হবে।

তবে সেটা যেন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান না হয়।

কেন?

সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আমার পেশা নয়॥

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপরিচয়

হে বন্য স্বপ্নেরা

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭৬॥ কবি-পরিকল্পিত॥ সম্পাদক : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী॥ প্রকাশক : মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি সংসদের পক্ষে॥ মুদ্রক : বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা॥ প্রচ্ছদশিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী॥ মূল্য : ৮ টাকা। পৃষ্ঠা : ৫৩॥ ভূমিকা : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী॥

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী "হে বন্য স্বপ্নেরা" বইএর ভূমিকায় লেখেন :

"হে বন্য স্বপ্নেরা" এই নামে ফররুখ আহমদ একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন। নির্বাচিত কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী চৌদ্দ পনের বৎসর। পাণ্ডুলিপি সমর্থিত এই সংবাদটি কিছুটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এই সময়সীমার মধ্যে রচিত অপরাপর অনেক কবিতা অন্যত্র, যেমন "সাত সাগরের মাঝি" এবং "সিরাজাম মুনীরা" কাব্য দুটিতে জায়গা পেয়েছে। যে কবিতাগুলি একেবারেই উন্মেষ-পর্বের সেগুলি ঐ দুটি কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যাবে না। "হে বন্য স্বপ্নেরা" নামে পরিকল্পিত বইএর জন্য প্রস্তুত সূচিপত্রগুলিতে—একাধিক সূচিপত্র পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে—এই প্রাথমিক কবিতাগুলিরই প্রাধান্য। বস্তুত ১৯৪৩-এর পরবর্তী কোন কবিতাই আমি শনাক্ত করতে পারিনি। তালিকায় আছে অথচ খোঁজ মিলছে না, এমন বেশ কিছু কবিতা আপাতত ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেল। এতে ক্ষতি যাই হোক—একটা লাভের দিকও আছে : সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে সময়ের দূরত্ব না থাকায় তাদের মধ্যকার আত্মীয়তা হয়তো বেশি ধরা পড়েছে।

যে সব কারণে কোন কবির প্রাথমিক রচনা সঞ্চয়নযোগ্য বলে গণ্য হয় তার সবগুলিই এই কাব্যে বর্তমান। প্রথমত, সেই কবিকে অবশ্যই একজন অসামান্য কবি হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেই কবিতাগুলির একটা স্বকীয় মূল্য থাকতে হবে। এবং তৃতীয়ত, ঐ কবির পরিণত রচনার সাথে এ-সব কবিতার একটা যোগসূত্র থাকতে হবে।

ফররুখ আহমদ যে একজন অসামান্য কবি এ বিষয়ে অনেকের মতো আমিও নিঃসন্দেহ। পরবর্তীকালের কবিরা এবং পাঠকেরা কেউ কেউ তাঁর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়েছেন প্রধানত এ কারণেই যে তিনি এমন এক ভাবাদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন যা তখনকার কাব্যে উপজীব্য হিসেবে অনেকটা পিছনে পড়ে গিয়েছিল ; এবং কিছুটা এ কারণেও যে তাঁর কবিতার গঠনে, ভাষায় ও ভঙ্গিতে বাংলা কবিতার শেষতম গতিপ্রকৃতির তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। যে কথাটা বলার অপেক্ষা রাখে সে হল, তাঁর করা ও না করার মধ্যে ফররুখ আহমদ নিজের শক্তিই ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। মুখ্য কবির সাথে গৌণ কবির প্রভেদ বহু প্রকারের। তার মধ্যে একটা বড়ো প্রভেদ

www.pathagar.com

এখানে : মুখ্য কবি তাঁর সমকালের ভঙ্গি কিছুটা আত্মস্থ করেন, কিছুটা সৃষ্টি করেন, কিন্তু তিনি যতোই এগুতে থাকেন ততোই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিটাই অভ্রান্তভাবে ফুটে ওঠে। গৌণ কবি সমকালীন ভাষা ও ভঙ্গির বৃত্তে পুরোপুরি আবদ্ধ, সমকালীনতার বিচারে তিনি অনেক বেশী প্রতিনিধিস্থানীয়। সমকালীনতাই তাঁর প্রধান শক্তি ও দুরপনেয় দুর্বলতা। মুখ্য কবির পরিচয় তাঁর স্ববৃত্ত রচনায়, গৌণ কবির পরিচয় তাঁর কাল-লগ্নতায়।

ফররুখ আহমদের প্রাথমিক রচনায় যে লক্ষণগুলি ধরা পড়বে, এবং তা আবশ্যিকভাবেই পড়বে, সে হল তারুণ্য ও নাগরিকতা,—নাগরিকতা মেজাজের নয়, দৃশ্যপটের। সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগের আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, ফররুখ আহমদ কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার বাইরে বেশী দিন কোথায়ও থাকেননি। এ-সব কবিতার গায়ে সূক্ষ্মভাবে ঐ সময়কার কলকাতার গন্ধ লেগে আছে—বামপন্থী রাজনীতির সুর, কখনো অস্পষ্ট, কখনো বা স্পষ্টতর ; এবং অল্পকাল পরেই পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কালো হাওয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কলকাতায় শুধু যে মৃত্যুর পদধ্বনি ছিল তাই নয়, একটা যুগান্তরের হাওয়া বয়ে গিয়েছিল প্রবল বেগে। বামপন্থী রাজনীতির সাথে ফররুখের যোগাযোগ ঘটেছিল, তবে তা কতোটা স্থায়ী হয়েছিল বলা যায় না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কল্পনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন একটা ঘনীভূত রূপ পেয়েছিল, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় যে মতবাদের স্পষ্টতা ও তীব্রতা, সমর সেনের কবিতার মহানগর যে রুগ্ন হলুদ আলোয় দৃশ্যমান—এর কোনোটাই ফররুখের বেলায় সত্য নয়। বরং এসব কবিতার নিবিড় নিপুণ ধ্বনি ও ছন্দের আনন্দ মনে করিয়ে দেয় আর একজন বামপন্থী কবির কথা, যিনি ফররুখেরই সমবয়সী—সুভাষ মুখোপাধ্যায় :

১. সুদীর্ঘ দিন রাত্রির মাঝে গোধূলির অবসর
তবু তো স্বপ্ন এলো।
হালকা হাসির বুকে পুঞ্জিত মন্দার-মেঘভার
তারি মাঝখানে অবসাদ এলো জানি না তো কতবার
শ্রান্তি রশ্মি মেলো।
হায় পূর্ণিমা পাণ্ডুর রাতে প্রথম বিরহী চাঁদ
অমাবস্যার নিরাশ আঁধারে খোঁজে তারে উন্মাদ।

[নাটকীয়]

২. এখন শহর ঘুমায়েছে, রাত শেষ
রাত শেষ নয় এখন অনেক রাত
(পাণ্ডুতা দূরে— ?) ম্লান বিদ্যুৎ আলো
কুয়াশার মেঘে প্রভাতের ভুল হয়,
জীবনে এখন চূড়ান্ত পরাজয় ;
কারখানা দৃঢ় পেশীও শিথিল ঘুমালো।

[সমস্যা]

এসব কবিতায় ইতস্তত ছড়ানো ছবি ও বক্তব্যগুলিকে একত্র করলে যে কবির প্রতিকৃতি ফুটতে শুরু করে সে এক তরুণের যার ভাষা রোমান্টিকতায় আপ্লুত বামপন্থীর ভাষা, এবং যে রাতের শহরে পাণ্ডুর চাঁদের উপর চোখ রেখে গ্যাসের আলোয় পথ চলে।

www.pathagar.com

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, হে বন্য স্বপ্নেরা-র কবি বারবার রাত্রির প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন। ঐ পংক্তিটি এখনও আমার কাছে বিস্ময়কর : 'কারখানা দৃঢ় পেশীও শিথিল ঘুমালো।'

'ঘুমালো'র যে অতিরিক্ত মাত্রা, তাই যথেষ্ট ছিল, পরপর পাঁচটি নিয়মিত পংক্তির পরে, যদিও একই ধরনের কাজ বিষ্ণু দে-ও করছিলেন এ সময়। পংক্তিটির মধ্যে একটা উত্তক্তকর অস্পষ্টতাও এর আকর্ষণ বাড়ায়, 'শিথিল' শব্দটার বিশেষ অবস্থানের জন্যই হয়তো হবে। ওটা কি বিশেষণ না ক্রিয়াবিশেষণ কে বলবে। 'কারখানা দৃঢ় পেশী'-র কথাই জানতেন এই নাগরিক কবি, এই নগরগন্ধী কবিতায় সেটা হয়তো তেমন বড়ো কথা নয়। কিন্তু পংক্তিটি কেমন দৃঢ়ভাবে শুরু হয়ে মাঝপথে শিথিল হয়ে পড়ল কিছুটা, এবং কেমন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে শেষ হল, যে অনিশ্চয়তার চিত্রায়ণ শেষ রাত্রির কুয়াশা-ঘেরা শহরের বর্ণনায় এবং যে বর্ণনায় নগরচিত্রের সঙ্গে মনের দৃশ্যপট একাকার হয়ে মিশে গেছে।

এই কোমলতার চর্চা, এই আলো-আঁধারির পল্লীতে আনাগোনা, একেবারেই স্থায়ী হয়নি। প্রথম পর্বের কবিতার মধ্যেই ধরা পড়েছে ফররুখের কাব্যে যা পরবর্তীকালে একটা স্থায়ী লক্ষণ হিসেবে দেখা যায় — নির্মিতির দিকে ঝোঁক, বলিষ্ঠ উচ্চারণের দিকে প্রবণতা, এবং কল্পনার দূরচারিতা। এই পর্বেই তিনি সনেটের আঙ্গিককে আত্মস্থ হয়েছেন। 'শিকার', 'জোয়ার', 'নাবিক', 'পাথরের দিন' ও 'ঘুম'-এর মতো দৃঢ়বদ্ধ সনেট লিখেছেন, ভাষায় সঞ্চার করে দিয়েছেন এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কান্তি :

বিদ্যুৎ বন্যার বহ্নি বুকে পুরে হাঙরের মত
মেঘেরা চলেছে ডুবে আকাশের গহীন নদীতে,
নিঃশব্দ সঞ্চারে, জ্বলে অগ্নিগর্ভ পাহাড়ের মত
বিপুল প্রত্যঙ্গ, আর অবরুদ্ধ কোটি ধমনীতে
জাগে এক চাপা ঝড় ঘনীভূত বাষ্পের ধোঁয়ায়।

[শিকার]

বাক্যবন্ধের এই দৃঢ়তার কথা মনে রেখেই অনেকে ফররুখের উপর মাইকেলের প্রভাব কিছুটা বাড়িয়ে দেখেছেন। মাইকেলের প্রতি তাঁর আসক্তি সুবিদিত, কিন্তু মাইকেলের পংক্তি ছিল চৌদ্দ মাত্রার পয়ার, ফররুখের সনেটে (এবং অন্যত্রও) পংক্তি আঠারো মাত্রার। পয়ারে ও দীর্ঘ পয়ারে যতোই মিল থাক না কেন, এদের চলনে একটা মৌল প্রভেদ ঘটে যায়, যে প্রভেদ দ্রুততার সাথে মন্থরতার। মাইকেলের দ্রুত ভঙ্গির সাথে, দৃঢ়তার একটা বিরল যোগাযোগ ঘটেছিল, সেটা যে অনেকটা পয়ারের সহজাত গুণে, আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। ফররুখের কৃতিত্ব এখানেই — এবং এটা তাঁর প্রাথমিক কবিতায় স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে — যে দীর্ঘ পয়ারের মধ্যে তিনি শুধু ঋজুতাই নয়, শুধু ধ্বনির ঐশ্বর্যই নয়, প্রয়োজনমতো আনতে পারেন দীর্ঘশ্বাসের আকুতি, জাগাতে পারেন শব্দের তরল কল্লোল :

কোথায় অনেক দূরে নামিয়াছে বৃষ্টির কোমল
সজল সহানুভূতি—কোথায় জমেছে যেন মেঘ

www.pathagar.com

দূর বহুদূর হতে বাতাসের সাথে সেই জল
স্বপন আশ্বাস আনে। কবে তুমি দেখা দেবে মেঘ?

[প্রতীক্ষা]

"হে বন্য স্বপ্নেরা"য় মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার নেই তা নয়, তবে তা সীমিত ও দ্বিধাগ্রস্ত। অক্ষরবৃত্তের জগতে কবি শুরুতেই এবং সহজেই তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই কাব্যের পাতায় পাতায় তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। মাত্রাবৃত্তের সমুদ্রেও তিনি তাঁর জাহাজ ভাসিয়েছিলেন, তবে তা তখনই নয়। যদিও ফররুখের সাড়া জাগানো কবিতাগুলির অধিকাংশই মাত্রাবৃত্তে রচিত — 'সিন্দবাদ', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি', 'পাঞ্জেরী', 'সাত সাগরের মাঝি' — তবু তাঁর সমগ্র সৃষ্টির দিকে তাকালে সন্দেহ থাকে না যে অক্ষরবৃত্তই তাঁর নিজস্ব চলন, এই ছন্দেই তাঁর কবিতা বারবার আবর্তিত।

"হে বন্য স্বপ্নেরা" কবিতাগুচ্ছে ভাবনাগত ঐক্য এদের রোমান্টিকতায়। যদিও বিপজ্জনক এই বিদেশী শব্দটির ব্যবহার তবু স্বীকার করতে দোষ নেই আমরা এই শব্দটিকে প্রেমের আকুলতার সমার্থক না হলেও, আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুলতা, অনিদ্রা, অস্থিরতা ইত্যাকার হৃদয়জাত আক্ষেপ ও বিক্ষোভের সমার্থক বলে বহুকাল ধরে গণ্য করে এসেছি। ফররুখ এই রোমান্টিকতার মধ্যে ইতিমধ্যেই জীবন সম্বন্ধে এক গভীর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সুর সংযোগ করেছেন। ইতিহাসের পথে চিরযাত্রী মানুষের কথা ভেবেছেন। প্রেতপুরীর প্রেত জনতার কালো মিছিলে খুঁজে বেড়িয়েছেন, মানুষ কই। বস্তুত এখানেই, এ সময়েই বিভিন্ন কবিতায় তিনি জীবন-মৃত্যুর প্রসঙ্গে বারবার আন্দোলিত যা তাঁর পরবর্তীকালের কবিতায় মূল প্রসঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। চতুষ্পার্শ্বে মৃত্যুর ছবি, তিনি হাত বাড়িয়েছেন জীবনের দিকে, সমুদ্রের দিকে, আকাশের দিকে, ইতিহাসের দিকে, পুরাণের দিকে :

জরাগ্রস্ত এ মাটির ভিতরে বাহিরে কালো দাগ
যেন এক কালো মৃত্যু প্রত্যেক অসাড় অবয়বে।
সন্ধ্যার ঔজ্জ্বল্য মিছে। দিগন্তে হারালো রক্তরাগ
এখন তিমির প্রান্তে হাহাকার করি ওঠে সবে।

[কালো দাগ]

নগর বারবার তাঁর চোখে মৃত্যুর পটভূমি হয়ে দেখা দিয়েছে (ফুটপাথ, কারখানা, যন্ত্রপীড়া এই বদ্ধঘর) ; দুর্ভিক্ষ, যাকে তিনি বলেন 'শাসনসৃজিত সর্বনাশ', সে তো মৃত্যুরই আর এক নাম, তারও চোখে চোখ রেখে কথা বলেছেন ; দেখেছেন :

পুরানো সমাধিস্তম্ভ পার হয়ে কারখানা, প্রাচীন দেয়াল।
বিশীর্ণ ক্ষুধার ছায়া, কৃষাণের ক্লান্ত দেহ, শ্রমিক-কংকাল,
নুয়ে পড়া শ্রান্ত মূর্তি শ্রমজীবী কেরাণীর, বুভুক্ষু নিখিল —

[প্রেক্ষণ]

এই 'অপঘাত' নিজের চেতনার গভীরে গ্রহণ করেছেন যদিও, তবু মৃত্যুকে শেষ সত্য বলে মানতে পারেননি। 'পরিপ্রেক্ষিতে' যে কথাটা উচ্চ ঘোষণায় বলা হয়েছে, তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় অন্যান্য অনেক কবিতায়। 'হে বন্য স্বপ্নেরা' নামের কবিতায় কবির মনে প্রশ্ন :

www.pathagar.com

এই রাত্রি দীর্ণ করি আসিবে কি দীপ্তফলা সূর্যের লাঙল?

'পরিপ্রেক্ষিতে' সেই প্রশ্নই রূপান্তরিত হয়ে গেছে প্রত্যয়ে :

তবু মন, ওরে মোর মন
কান পেতে শোনো তুমি জীবনের বিপুল স্পন্দন।
তুমি জানো এ মৃত্যুর চিরবন্ধ্যা রুক্ষ মরুতল,
দীর্ণ করি যেতে পারে অনায়াসে আমার লাঙল।

জীবন-মৃত্যুর এই প্রাথমিক প্রসঙ্গই ফররুখ কাব্যে স্থায়ী প্রসঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে পরবর্তী কালের কাব্যেও — যদিও প্রভেদ ঘটেছে রূপের ও রূপকের। যে রোমান্টিকতা ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গে আবর্তিত, তা ফররুখের নয়। যে রোমান্টিকতা ব্যষ্টিজীবনের দিকে প্রসারিত, যে রোমান্টিকতা 'শিকল-ছেঁড়া প্রমিথিউস'-এর কবির, ফররুখ সেই ধারার কবি-পরিচয়ে দেখা দিয়েছেন এই প্রাথমিক কবিতাগুচ্ছেই।

কবি বেঁচে থাকলে "হে বন্য স্বপ্নেরা" গ্রন্থাকারে কি রূপ নিত, বলা যায় না। পাণ্ডুলিপির মধ্যে এক কোনে একটা ছোট্ট বক্তব্য পাওয়া গেছে : এই বইএ আমার প্রথম বয়সের কবিতাও সংকলিত হলো। 'দুর্ভিক্ষের কবিতা' এবং 'মৃত্যু-পরিক্রমা' নামক দুটি স্বতন্ত্র বিভাগে যথাক্রমে তেরোশো পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ ও সর্ব ভারতীয় দাঙ্গা উপলক্ষে রচিত কয়েকটি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে। অন্যান্য কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে সুরের সমতার দিকে লক্ষ্য রেখে।

দুঃখের বিষয়, এই একই ফুলস্কেপের ভাঁজ করা পৃষ্ঠায় যে তালিকা তার মধ্যে বিস্তর কাটাকাটি। এবং অন্যত্র যে-সব তালিকা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে প্রথম বয়সের কবিতাগুলিই বরং পুনরাবৃত্ত। 'পরবর্তী কবিতা' ও 'প্রাথমিক কবিতা'র শ্রেণীকরণ, যা তিনি নিজেই এক জায়গায় করেছেন এবং দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু বিষয়ক কবিতাগুলিকে ঐ নিয়মে একত্রীকরণ — বর্তমান সংকলনে এই নীতিগুলি অভ্রান্তভাবে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। শুধু যে বিভিন্ন তালিকার মধ্যে সমন্বয় অসাধ্য, তাই নয়, বিভিন্ন অভিপ্রায়ের মধ্যেও অস্থিরতা দেখা যায়। সেজন্যই সম্ভব হয়নি।

এই সংকলনের অন্তর্গত অনেকগুলি কবিতাই অল্পবিস্তর বিভিন্ন পাঠে পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপির বর্তমান অবস্থায় এর মধ্যে কোন পাঠ শেষতম সুতরাং গ্রহণযোগ্য, নির্ণয় করা কঠিন। এই অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য কাজ একদিন কাউকে না কাউকে করতে হবে। যে কবি কবিতা নির্মাণে পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁর আদর্শ সম্পাদকের জন্য অনেক পরিশ্রম অপেক্ষা করছে। ভিন্ন পাঠ দেখানো গেলেও, কোনটি আগের ও কোনটি পরের, এবং 'চূড়ান্ত পাঠ' আদৌ আছে কিনা, সহজ হবে না এ সব প্রশ্নের মীমাংসা।

কয়েকটি উদাহরণে কথাটা পরিষ্কার হবে — ('ক'-মুদ্রিত পাঠ, 'খ'-পাঠান্তর)

১. পৃ.-৯ পং ১৫ ক. তৃপ্ত নহে সে সোনালী ভোগলিপ্সাতে।
খ. তৃপ্ত নহে হে সেনানী ভোগলিপ্সাতে।

উভয় পাঠেই পংক্তিটি ছন্দছুট—অবশ্য এই কবিতাটি অপরিণত বয়সের রচনা।

২. পৃ.-১১ পং ১০ ক. (নিভৃত) মূর্তি বুঝি
খ. মানুষের মূর্তি বুঝি

www.pathagar.com

৩. পৃ.-১৮ পং ২১ ক. তারাফুল ফোটানো সে কোন নলবনে ভীর মেঘের
খ. তারাফুল ফোটানো সে কোন নলবনে গহীন মেঘের

৪. পৃ.-১৯ পং ২৫ ক. আর পাশে তমিস্রা প্রচ্ছায় রাত্রির তরঙ্গ বয়ে যায়
খ. আর পাশে নিঃশব্দ পাখায় রাত্রির তরঙ্গ বয়ে যায়

৫. পৃ.-৩৭ পং ১৪ ক. অজস্র সংঘাত, স্বেদ স্বপ্ন মোহ উন্মত্ত তুফান
খ. অজস্র সংঘাত, স্বেদ স্বপ্ন মৃত্যু উন্মত্ত তুফান

মুদ্রণ একেবারে নির্ভুল করা সম্ভব হয়নি। স্বতন্ত্র তালিকায় সেগুলি দেখানো হ'ল।

এই গ্রন্থ প্রকাশে মুহম্মদ ফাওজুল কবির খানের উৎসাহ ও উদ্যোগ সবার আগে উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁকে আমার ধন্যবাদ। কবিপত্নীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ প্রয়োজনীয় পাণ্ডুলিপি তিনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। যাঁদের অর্থানুকূল্যে এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হল তাঁরা সবাই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ বিভাগ অসম্ভব দ্রুততার সাথে মুদ্রণ কাজ সমাধা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

*

১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে "হে বন্য স্বপ্নেরা" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো। তার আগে ১৯ অক্টোবর ১৯৭৬ সালে ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি সংসদ-কর্তৃক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় 'পাঞ্জেরী' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিলো। এই পেপারব্যাক সংকলনে ফররুখ আহমদের "হে বন্য স্বপ্নেরা"-র ৪৯টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছিলো। 'পাঞ্জেরী' সংকলনটির ভূমিকা লিখেছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন কালাম মাহমুদ, আর এতে স্থান পেয়েছিলো সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের 'ফররুখ আহমদের কবিতা' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ।

কাফেলা

ইসাকেডা প্রকাশনা ৭৪॥ ইফাকা প্রকাশনা ৬২০॥ প্রকাশক : অধ্যাপক এ. এস. এম. ওমর আলী, সহকারী পরিচালক, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ। বায়তুল মুকাররাম (তেতলা), ঢাকা ২॥ প্রথম সংস্করণ : রমযান ১৪০০/ শ্রাবণ ১৩৮৭/ আগস্ট ১৯৮০॥ মুদ্রক : হাবীবুর রহমান, জুয়েল প্রিন্টার্স, ৬২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১॥ মূল্য : ৮ টাকা মাত্র॥

KAFELA (Caravan : A collection of Poems on Islamic Renaissance) : Written By Farrukh Ahmad and Published by Islamic Cultural Centre, Dacca Division, Dacca 2. Islamic Foundation Bangladesh. Price : Taka Eight only.

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আবাসিক পরিচালক আবদুল গফুর ২৫ জুলাই ১৯৮০ চিহ্নিত তারিখে 'আমাদের কথা' শীর্ষক প্রকাশকের জবানিতে বলেন :

নজরুলোত্তর বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি, ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ "কাফেলা"। "কাফেলা" নামের একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের স্বপ্ন কবি লালন করেছেন সেই ১৯৪৫-৪৬ থেকে। কবির আজীবন-লালিত এ-

www.pathagar.com

স্বপ্ন তাঁর জীবদ্দশায় পূরণ হয়নি, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে! আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো শুকরিয়া, বিলম্বে হলেও অবশেষে কবির এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। এ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি-পরিবার এবং কবির অকৃত্রিম অনুরাগী, বিশিষ্ট কবি-সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমরা যে সহযোগিতা পেয়েছি, সে জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। "কাফেলা"-র আদর্শ আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে নব-জাগরণের চেতনায় উদ্দীপিত করে তুলুক, আজকের এ শুভ-মুহূর্তে এটাই আমাদের প্রধানতম কামনা।

ভূমিকায় মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ লিখেছিলেন :

ফররুখ আহমদ "কাফেলা" নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বাসনা তাঁর মনে আ-মৃত্যু লালন করে গেছেন। এই বাসনার জন্ম হয়েছিল বিভাগ-পূর্বকালে, ফররুখ আহমদের কাব্য-সাধনার প্রায় প্রাথমিক-পর্বেই। এক-অর্থে "কাফেলা" কবির প্রথম কাব্য-গ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"র সমসাময়িক ও সহযাত্রী ; প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ বিভাগ-পূর্বকালে ১৯৪২-৪৩ সালের দিকেই "কাফেলা" ও "সাত সাগরের মাঝি"র পাণ্ডুলিপি কবি তৈরি করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, হয়তো দ্বিতীয় চিন্তার ফলে, ফররুখ আহমদ "কাফেলা"র পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত কিছু কবিতা নিয়ে তৈরি করেন তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "সিরাজাম মুনীরা"র পাণ্ডুলিপি।

"কাফেলা" ও "সিরাজাম মুনীরা" প্রসঙ্গে "ফররুখ-রচনাবলী"র গ্রন্থপরিচিতিতে আমরা বলেছি, 'ফররুখ আহমদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "সিরাজাম মুনীরা" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলীও রচিত হয় বিভাগ-পূর্বকালে ১৯৪৩-৪৪ সালে। কবির 'পাণ্ডুলিপি'তে দেখা গেছে, তিনি "কাফেলা" নামে যে-গ্রন্থের সূচিপত্র তৈরি করেছিলেন তাতে "সিরাজাম মুনীরা"র অনেক কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন :

১. কমলিওয়ালা
২. সিরাজাম মুনীরা
৩. ১ম খলিফা
৪. ২য় খলিফা
৫. ৩য় খলিফা
৬. ৪র্থ খলিফা
৭. হযরত বেলাল
৮. আওলাদ
৯. কাফেলা
১০. আখরোট বনে
১১. ইশারা
১২. সনেট

উপরোক্ত তালিকার অন্তর্গত 'আওলাদ', 'আখরোট বনে' ইত্যাদি কবিতা "সাত সাগরের মাঝি"র অন্তর্ভুক্ত হয়। "সাত সাগরের মাঝি" ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ—প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে ১৯৪৪ সালে, বাংলা ১৩৫১ সালে। এই

www.pathagar.com

কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুচ্ছের রচনাকাল ১৯৪৩–৪৪। কলকাতার নওরোজ পাবলিশিং হাউস থেকে ফররুখ আহমদের "কাফেলা", "ঘুঘু-সংবাদ" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিতও হয়েছিল। সম্ভবত পরবর্তীকালে ফররুখ আহমদ "সিরাজাম মুনীরা" নামে আলাদা কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নেন, যদিও বিভাগ-পূর্বকালে এটি প্রকাশিত হয়নি। "সিরাজাম মুনীরা"র অন্তর্গত কবিতাবলীরও রচনাকাল ১৯৪৩–৪৬ সাল। "সিরাজাম মুনীরা" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে ; তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ, ঢাকা থেকে।

ফররুখ আহমদের "কাফেলা"র রচনা ও প্রকাশনা-সম্পর্কে উপরোক্ত পটভূমি জানা দরকার ; কেননা, বর্তমান গ্রন্থে যে-সব কবিতা স্থান পেয়েছে, সেগুলো বিভাগ-পূর্ব এবং বিভাগ-পরবর্তীকালের রচনা। উল্লেখ্য, ফররুখ আহমদ তাঁর জীবদ্দশায়ই বর্তমান কাব্য-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং এতে ১৯৪৩–৫৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত কবিতাবলী স্থান দেন। ইতিপূর্বে "কাফেলা" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও, এই পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত কিছু কিছু কবিতা আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" (প্রথম প্রকাশ : ১০ জুন ১৯৭৫) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রন্থের 'প্রবেশক'এ তিনি লিখেছেন :

> "কাফেলা" শীর্ষক পাণ্ডুলিপি থেকে পাঁচটি কবিতা গৃহীত হ'লো। এর কবিতাগুলি এই: [১. কাফেলা ;] ২. ঈদের স্বপ্ন ; ৩. মেঘনা তীরের চাষীকে ; ৪. বর্ষায় ; ৫. পদ্মা; ৬. আরিচা-পারঘাট ; ৭. বৈশাখ ; ৮. ঝড়।

উপরোক্ত কবিতাবলীর মধ্যে একমাত্র "কাফেলা" কবিতাটিই বিভাগ-পূর্বকালের রচনা, বাকিগুলো বিভাগ-পরবর্তীকালের। বর্তমান গ্রন্থে কবি-নির্বাচিত যে-সব কবিতা সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যেও অনেকগুলি বিভাগ-পূর্বকালের এবং বিভাগ-পরবর্তীকালের রচনা। কবি-নির্মিত "কাফেলা"র পাণ্ডুলিপিই এই গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে, তবে বোধগম্য কারণেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই পাণ্ডুলিপি থেকে ৪টি কবিতা বাদ দেয়া হয়েছে। তবে, "ফররুখ-রচনাবলী"তে হয়তো এ-সব কবিতাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

"কাফেলা"র অন্তর্গত কবিতাবলী-কে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ১. মুসলিম ইতিহাস-পুরাণ, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যভিত্তিক কবিতা ; ২. স্বদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা, মাটি-মানুষকেন্দ্রিক কবিতা। তবে, ফররুখ আহমদের কবিতার যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসে বক্তব্য বিষয় ফুটিয়ে তোলা, রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার ; তা "কাফেলা"র অন্তর্গত কবিতাবলীতেও দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভবযোগ্য। মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব-জাহানের পটভূমিতে রচিত কবিতাবলীতে যেমন, তেমনি বাংলাদেশের পটভূমিতে রচিত কবিতাবলীতেও এ-ব্যাপারটি লক্ষ্য ও অনুভব করা যাবে। এ-গ্রন্থের অন্তর্গত নদী-নিসর্গ, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতীক-রূপেই ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে, এবং তিনি আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসেই তা রূপায়িত করেছেন।

একালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও, "কাফেলা" ফররুখ আহমদের পরিকল্পিত প্রাথমিক-পর্বের গ্রন্থাবলীরই অন্যতম। তবে সেকালে প্রকাশিত হলে হয়তো এর কবিতা-সূচি অনেকটা অন্যরকম হতো এবং বিভাগ-পরবর্তীকালে লেখা অনেক কবিতাই এর

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ মিলতো না ; ফলে ফররুখ আহমদ তাঁর স্বদেশের মাটিতে, ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিতে, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশেও যে গভীরভাবে নোঙর বেঁধে রেখেছিলেন তা এ-গ্রন্থের অনেক কবিতা পড়ে উপলব্ধি করার ও অনুভবের সুযোগ মিলতো না। এ-দিক থেকে বর্তমান গ্রন্থের বিলম্বিত প্রকাশও অনেকটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। দুঃখ শুধু এই, কবি স্বয়ং তাঁর প্রিয় পাণ্ডুলিপি "কাফেলা"র গ্রন্থরূপ দেখে যেতে পারলেন না। গ্রন্থটির প্রকাশোপলক্ষে কবির অমর স্মৃতির প্রতি জানাই অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা।

"ফররুখ রচনাবলী" : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত, 'গ্রন্থ-পরিচিতি' দ্রষ্টব্য।

"কাফেলা" গ্রন্থের শেষাংশে একটি 'তথ্য-নির্দেশিকা' যুক্ত হয়েছিলো। সেটি এই :

"কাফেলা"র অন্তর্গত কবিতাবলীর প্রথম প্রকাশকাল ও পত্র-পত্রিকার নাম যথাসম্ভব নীচে দেওয়া হলো :

১. কাফেলা (মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ ১৩৫০)
২. কাফেলা ও মনজিল (মনজিল, ১০৭০)
৩. তায়েফের পথে (মাসিক সওগাত, শ্রাবণ ১৩৫০)
৪. মদীনার মুসাফির
৫, খলিফাতুল মুসলেমিন (সওগাত, ভাদ্র ১৩৫১)
৬. এজিদের ছুরি (সাপ্তাহিক কৃষক, ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৫)
৭. বেলাল (সাপ্তাহিক কৃষক)
৮. আলমগীর (অপ্রকাশিত)
৯. কোন্ বিয়াবানে (মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ় ১৩৫২)
১০. নতুন সফর
১১. নতুন মিনার
১২. চতুর্দশপদী
১৩. দুই মৃত্যু (মনযিল)
১৪. হে আত্মবিস্মৃত সূর্য (মুকুতি, ১৩৪৯)
১৫. জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে
১৬. বৈশাখ (পাকিস্তানী খবর)
১৬. ঝড়
১৮. বর্ষায় (পাকিস্তানী খবর)
১৯. পদ্মা (ঐ)
২০. আরিচা-পারঘাটে (মনজিল, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮)
২১. দ্বীপ নির্মাণ (মীনার, ১৯৫৮)
২২. সৃষ্টির গান (মোহাম্মদী)
২৩. স্বর্ণ-ঈগল (দ্যুতি, ১৩৫৮)
২৪. ইনকিলাব (মাসিক মোহাম্মদী, ১৯৪৬)
২৫. কিস্‌সাখানির বাজার (পাকিস্তানী খবর, ১৯৬৮)
২৬. পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে (মাহে-নও)
২৭. ঈদের স্বপ্ন (মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২)
২৮. ঈদের কবিতা, (তাহজীব?)
২৯. নয়া সড়ক (নয়া সড়ক, বার্ষিকী, ১৯৪৮)

www.pathagar.com

৩০. শেরে বাংলার মাজারে (পূবালী)
৩১. শিকল (স্বাধীনতা)
৩২. বিরান সড়কের গান (সওগাত, মাঘ ১৩৫২)
৩৩. ইবলিস ও বনি আদম (মাসিক মোহাম্মদী ও পৃথিবী, ১৩৬৯)

১৯৮৭ সালে ফররুখ আহমদের "কাফেলা" বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। মূল্য : ২০ টাকা।

হাবেদা মরুর কাহিনী

ই. ফা. প্রঃ নং ৯১৭॥ গ্রন্থাগার নং : বাংলা কাব্য ৮৯১.৪৪১॥প্রকাশক : শেখ তোফাজ্জল হোসেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৬৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা॥ প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮১/ভাদ্র ১৩৮৮/জেলকদ ১৪০১॥ মুদ্রণে : খেয়ালী প্রেস। ১৯/২০, সৈয়দ হাসান আলী লেন, বাবুবাজার, ঢাকা॥ বাঁধাইকার : গোল্ডেন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস। ১৩/৯, আহসান মঞ্জিল, নবাব বাড়ী, ঢাকা ॥ মূল্য : ১০ টাকা ॥

Habeda Morur Kahini—(The episode of the Habeda desert)—poetry) written by Farrukh Ahmed in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka to celebrate the commencement of 1401 Al-Hijra. Price Taka TEN. US Dollar 1.00

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশের প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক আবদুল গফুর লিখেছেন 'আমাদের কথা'য় :

"হাবেদা মরুর কাহিনী" বাংলা কাব্যে ইসলামী রেনেসাঁর বিশিষ্ট রূপকার ফররুখ আহমদের একমাত্র গদ্য-কাব্য। ছন্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার ও আঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষা ফররুখ আহমদের কবি-কর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও ফররুখ আহমদ যে বেশ কিছু গদ্য-কবিতাও লিখেছেন, এবং সেগুলো যে বেশ রসোত্তীর্ণ হয়েছে, সে খবর অনেকেই রাখেন না। "হাবেদা মরুর কাহিনী" প্রকাশের মাধ্যমে ফররুখ-প্রতিভার এই নয়া দিগন্তের ওপর আলোকসম্পাত করা হয়েছে।

ফররুখ আহমদ আজীবন ইসলামী রেনেসাঁর স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে সমসাময়িক সমাজের দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা-সৃষ্ট নৈরাজ্যে তাঁর মনে যে গভীর মর্মজ্বালা দানা বেঁধেছিল, তারই কাব্যিক অভিব্যক্তি ঘটেছে এ গ্রন্থটিতে। কবি তাঁর হতাশা-ক্লিষ্ট অন্তর নিয়ে সমসাময়িক সমাজকে দেখেছেন নিরেট নিষ্প্রাণ গদ্য-পৃথিবী রূপে, তাই তাঁর চিরাচরিত অন্ত্যমিলযুক্ত, ছন্দোধ্বনিময় কবিতার ধারা থেকে সরে এসে ব্যতিক্রমধর্মী আঙ্গিকে গদ্য-কবিতায় রচনা করেছেন "হাবেদা মরুর কাহিনী"।

ফররুখ আহমদের এই অনন্য কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে বাংলা কাব্যরস পিপাসুদের পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে আমরা রহমানুর রহিমের দরবারে অশেষ শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

ভূমিকায় মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ লেখেন :

ফররুখ আহমদের "হাবেদা মরুর কাহিনী" গদ্য-ছন্দে লেখা একটি 'রূপক' কাব্য। কবিতায় রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের তাৎপর্য, এবং এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের প্রচেষ্টা ও

www.pathagar.com

সাফল্যের পরিমাপ করতে হলে, একথা প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, কবিতায় রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার কবির গভীর জীবনবোধ এবং জীবন-দৃষ্টির পরিচায়ক। কিছুটা দার্শনিক মনের অধিকারী ও জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে বক্তব্য-প্রবণ না হলে, রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের দিকে কবি-মন তেমন ঝুঁকতে চায় না ; বক্তব্যের রূপকাশ্রিত এবং প্রতীকী উপস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য থেকে যায় উপলব্ধি ও বোধের অগোচরে।

বস্তুত, অনুভূতি, উপলব্ধি, স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-আর্তিকে যারা সরল উপস্থাপনায় এবং নিছক বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরে পরিতৃপ্তি বোধ করেন না, তারা গভীরতা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রূপক ও প্রতীকাশ্রয়ী হন। ব্যক্তিমনের প্রকাশে যেমন, সার্বজনীন মনের প্রকাশে এবং জাতীয় চৈতন্যের রূপায়ণেও তেমনি, অনেক কবিকেই রূপক ও প্রতীকের শরণ নিতে দেখা যায় ; কারো কারো সৃষ্টিতে রূপক এবং প্রতীক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের মতো হয়ে দাঁড়ায়, যেমন চিত্রকল্পের মধ্যেও উপমা অন্তর্লীন বা সঙ্গোপন থাকে, তেমনি রূপক-প্রতীকও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ছাড়াও, পরস্পর অন্তরিত হয়ে থাকে।

ফররুখ আহমদের কবিতায়ও রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার আছে। তাঁর রচিত খণ্ড কবিতায় যেমন, তেমনি কাহিনীকাব্যে এবং নাটকেও প্রতীকের ব্যবহার দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভবযোগ্য। তাঁর "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থে নাবিক, নদী-সমুদ্র ও প্রত্যাশিত বন্দর রূপ পেয়েছে ইতিহাসের পটে, আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসে ও উজ্জীবনী প্রেরণায়। 'সিন্দবাদ'-এর প্রতীকে তিনি ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষাই ভাষা দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি উপজীব্য ও বক্তব্য বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে না এনে রূপ-প্রতীকের মাধ্যমে পরোক্ষ-পদ্ধতিতে রূপায়িত করার বিশেষ কবি-কৌশল ও শিল্পরীতি অবলম্বন করেছেন। ফলে, নাবিক, সমুদ্র, নিশান, পাখি, পাঞ্জেরী ইত্যাদি একটি আদর্শ-উজ্জীবিত ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক মানবগোষ্ঠীর নতুন ও প্রত্যয়ী আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশ্রান্ত সন্ধানী, সমুদ্রবিজয়ী নাবিক 'সিন্দবাদ' ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে 'মুসলিম সমাজ ও মুসলিম চেতনা, মুসলিম গৌরব ও অভিযানের প্রতীক, 'হেরা' পর্বত অনুপ্রেরণার উৎস, আদর্শ ভূমি ও স্বর্গের প্রতীক—যেখানে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ঐশী আহ্বান লাভ করেছিলেন।' (সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃ. ৫০)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাব্যেই পাখি একটি বহুল-ব্যবহৃত প্রতীক ও রূপক। বাংলা সাহিত্যেও যুগে যুগে পাখি রূপক ও প্রতীক হয়ে ভাষা পেয়েছে। সেই প্রাচীন কবিতা ও আদি গীতিগাথার কথা না হয় বাদই দেয়া যাক, আঠারো শতকের মরমী কবি লালন ফকির যখন উচ্চারণ করেন :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়!
ধরতে পারলে মনো-বেড়ি দিতাম তাহার পায়,—

তখন এর রূপকী ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা চেতনায় আঘাত হানে, মুগ্ধ করে। আধুনিক কালের কবিরাও ব্যক্তিসত্তার প্রতীকে, অজানা ও রহস্য-নিবিড় মনের রূপকে এবং আরও নানাভাবে পাখিকে দেখেছেন, বিচিত্রধর্মী কবিতা লিখেছেন। ফররুখ আহমদের কবিতায়ও পাখি একটি প্রধান প্রতীক। তিনি যখন 'ডাহুক'-এর প্রতীকে মুক্ত-মানুষ ও আত্মার কথা

www.pathagar.com

বলেছেন এবং শৃঙ্খলিত সত্তার জন্যে আহাজারী করেছেন, তখনও কাব্য-সৌন্দর্যের উদ্বোধনের পাশাপাশি সমকালীন জীবনচেতনাও বাঙ্ময় হয়েছে।

কীটসের মতো 'পাখি'কে মুক্ত-আত্মার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন ফররুখ আহমদ 'ডাহুক' কবিতায়। কীটসের নাইটিঙ্গেল যেমন পয়েজি বা শিল্পকলার নামান্তর, ফররুখ আহমদের 'ডাহুক' তেমনি মুক্ত-আত্মার প্রতীক—মুক্তিপিয়াসী মনের সংগ্রামের সঙ্গে মুক্ত-আত্মার একটা তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে 'ডাহুক' কবিতায়। পার্থক্য সম্ভবত এই যে, কীট্স নাইটিঙ্গেলকে আবহমান কালের পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন, আর 'ডাহুক' একটি বিশেষ সময়-পরিস্থিতিতে ইতিহাসের পটভূমিকায় চিত্রিত। প্রত্যক্ষভাবে কোনো উল্লেখ না থাকলেও বৃটিশ-পরাধীনতা যুগের মর্মবেদনা এবং উপমহাদেশের মানুষের মুক্তিকামী মনের প্রতিফলন আর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও যে এতে বাঙ্ময়, তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

একালে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার শুধু মানস-সঙ্কট, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, উপলব্ধি, জীবনচেতনা ও অন্বেষার মধ্যেই সীমায়িত নেই, তার এলাকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। ফররুখ আহমদের অনেক কবিতায়ও এর পরিচয় মেলে। ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী আদর্শ ও জীবনদর্শনে বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিকতায়ও তিনি ছিলেন স্থিরপ্রত্যয়ী, মুক্তিসন্ধানী। ফররুখ আহমদ বলতেন, তিনি 'ডাহুক'কে নিঃসঙ্গ সাধকের জিকির এবং তার সাধনার সাফল্যের প্রতীক হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। ডাহুক রাতভর ডাকতে-ডাকতে গলায় রক্ত তুলে ডিমে তা ছড়িয়ে দিয়ে উম দিলেই নাকি বাচ্চা ফোটে। সাধকের সাধনা এবং সাফল্যও অনেকটা ঐ রকমই।

ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য এবং তাৎপর্য যাই হোক, ফররুখ আহমদের কাব্যসাধনায় 'প্রতীক'এর ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। তিনি তাঁর সনেটে এবং সনেট-সিকোয়েন্সেও 'পাখির' প্রতীকে এ-যুগের যন্ত্রণা এবং গ্লানিবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন, 'নদী'র প্রতীকে রূপায়িত করেছেন গতিময় জীবন ও আদর্শের উজ্জীবন। বস্তুত ফররুখ আহমদের বহু কবিতায় নদী-নিসর্গ এসেছে জীবনের প্রতিরূপ, এবং প্রাণ-সত্তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক আর উজ্জীবন প্রেরণা হয়েই। শুধু খণ্ড কবিতায় এবং সনেটেই নয়, দীর্ঘ কবিতায় ও কাহিনী-কাব্যেও ফররুখ আহমদের কবিতায় রয়েছে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার। "হাতেম-তায়ী" কাব্যে 'নুররেজ' ফুলের প্রতীকে বর্তমান সভ্যতার অন্ধত্ব ঘুচানোর পথ-নির্দেশ করেছেন তিনি। এ-কাব্যে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক ক্ষেত্রে।

দুই

'রূপক' ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে বলতে গেলে, ফররুখ আহমদের বর্তমান কাব্যগ্রন্থ "হাবেদা মরুর কাহিনী"র (যা কবির জীবদ্দশায় ছিল অপ্রকাশিত) উল্লেখ অনিবার্যভাবেই করতে হয়। খণ্ড কবিতায় আখ্যান-কাব্যে এবং নাটকে ফররুখ আহমদ নানাভাবে 'প্রতীক' ও রূপকের ব্যবহার ঘটিয়েছেন, কিন্তু সে-সব ছন্দোবদ্ধ রচনায়ই ব্যবহৃত, গদ্যে কিংবা গদ্য-ছন্দের কবিতায় নয়। "হাবেদা মরুর কাহিনী" শুধু রূপক কবিতা কাব্যই নয়, গদ্য-ছন্দে রচিত অনেকগুলি কবিতার সমষ্টি। খণ্ড কবিতা হলেও,

www.pathagar.com

ভাব ও বক্তব্যের দিক থেকে পারস্পরিক অন্বয়ধর্মী ও অন্তরিত সম্পর্ক আছে এসব কবিতায়। বইয়ের পাণ্ডুলিপির 'ভূমিকা'য় ফররুখ আহমদ লিখেছেন :
'রূপকথার 'হাবেদা মরুর' অন্য নাম 'হাওয়ার ময়দান'। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে ঐ মাঠের সওয়ালে। "হাবেদা মরুর কাহিনী" গদ্যে লেখা রূপক কবিতা। ঈসায়ী উনিশ শো সাতান্নর শেষভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশ শো আটান্নর প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর ঈদ-উল-আজহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতা লেখা হয়। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল।' [কবির হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এবং 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে সাপ্তাহিক 'আজ' পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখ আহমদের 'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব; ´ র্যক ব্যঙ্গ-কাব্যেও তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র মীর জাফরের জবানীতে তদানীন্তন শাসক-শোষক ও অন্যান্য সমাজবিরোধী 'নীতিবিদদের' তীব্র সমালোচনা করেছেন। আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ও প্রবহমান পয়ারে রচিত এই দীর্ঘ ব্যঙ্গ-কাব্যটি পত্রিকায় প্রকাশের পর তাঁকে নাকি তদানীন্তন কর্তৃপক্ষীয় কেউ কেউ 'কম্যুনিস্ট কবি' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন, এমনকি সে-আমলে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশও নাকি লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল।

তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থায় দুর্নীতি, অব্যবস্থা, আদর্শহীনতা আর হতাশা দেখে আদর্শবাদী ও সমাজসচেতন এবং মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদের মন কতটা বেদনার্ত হয়েছিল, তার পরিচয় আছে "হাবেদা মরুর কাহিনী"র অন্তর্গত রূপকাশ্রিত কবিতাগুচ্ছে। একটি কবিতার উদ্ধৃতি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

মনে হয় বন্দী হয়ে আছি
ক্লেদ-পঙ্কিল এক দুঃসহ বন্দীখানায়
(বাগগর্দ হাম্মামের মতই যা ভয়াবহ)
শান্তির চিহ্ন নাই যেখানে
শুধু মধ্যরাত্রে শোনা যায় শয়তানের অট্টহাসি
মানুষ বেঁচে আছে কিন্তু মুর্দার শামিল।
এদের চলা-ফেরা, ওঠা-বসা
সব কিছুই নিষ্প্রাণ,
জড় পদার্থের মত
ঠাণ্ডা,
অনুভূতিহীন।
বিদেশী মুসাফিরের যদি কেউ এখানে আসে
চমকে ওঠে। বলে : এ কোন জমিনে এলাম?
(যদি কেউ বলে : জিন্দেগানীর পথ
খোলা আছে এখনো
এরা তখন তাকায় বিকারের রোগীর মত
ঘোলাটে, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে
হয়তো বিশ্বাস করে না)

www.pathagar.com

কারণ সত্যিকার মুক্তির পথে
চায়নি কেউ এদের নিয়ে যেতে,
চেয়েছে কাহিনীর সেই প্রতারক হাজ্জামের মত
শুধু ভুলিয়ে রাখতে মিথ্যা প্রবঞ্চনায়।
জীবনকে এখন আমরা দেখছি
সেই অতন্দ্র রোগীর মত
রাত্রির দীর্ঘ প্রহর যার সামনে কেটে গেছে
স্বপ্নহীন আর শান্তিহীন,
ভোরের আলোকেও যে শুধু দেখছে
অন্ধকারের তিক্ত বিভীষিকা।

এই 'হাবেদা মরুর' প্রতীকে স্বদেশের তৎকালীন অবস্থাই যে বিধৃত, তা বুঝে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রূপক ও প্রতীক–এর বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা বিশেষ দেশ, সময় এবং বক্তব্যকে ধারণ করলেও, গভীরতর ও ব্যাপকতর ব্যঞ্জনার কারণেই তা অর্জন করে অনেকটা সার্বজনীনতা। আসলে, 'হাবেদা মরু' প্রাণহীনতা, রুক্ষতা, হতাশা, অন্ধকার এবং বিভীষিকারই প্রতীক, এবং এ-কারণেই এর রূপকাশ্রিত উপস্থাপনাও ব্যাপকতর ও সার্বজনীন আবেদনের অধিকার রাখে।

ফররুখ আহমদ যেমন কীটসের মতো 'পাখির' প্রতীকী ব্যবহার করেছেন, তেমনি তিনি টি.এস. এলিয়টের মতো "হাবেদা মরুর কাহিনী"তে নিয়েছেন প্রতীক ও রূপকের আশ্রয়। এলিয়টের "ওয়েস্ট ল্যান্ড" বা 'পোড়োজমি,' 'ফাঁপা মানুষ' আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অবক্ষয়ের আর বন্ধ্যাত্বেরই প্রতীক। যদিও তিনি যুগ-সমস্যায় পীড়িত ও হতাশায় দীর্ণ মানুষকে ভবিষ্যতের আশা-আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন উজ্জীবন ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়ী রূপ অঙ্কন করতো গিয়ে টি. এস. এলিয়ট মৃত্যুর আতঙ্কে অস্থির ও হতাশায় দীর্ণ মানুষকে অবলোকন করেছেন, আত্মার নিপীড়নে পর্যুদস্ত 'ফাঁপা' মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন—কিন্তু ক্ষণ-মুহূর্তের জন্যও হতাশাকে বরণ করে নেননি। জীবনের প্রতি অনিঃশেষ আশাবাদ, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান এবং সর্বোপরি মননশীল অনুপ্রাণনা তাঁকে জীবনের সঞ্জীবনী-উৎসের দিকে টেনে নিয়ে গেছে—বন্ধ্যাভূমিতেও তিনি মৌসুমী ফসলের প্রতীক্ষা করেছেন।

ফররুখ আহমদেও আছে অনিঃশেষ আশাবাদ এবং আদর্শ-উজ্জীবনের, নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। 'হাবেদা মরুর' প্রতীকে এবং এই রুক্ষ ও প্রাণহীন ভূমির রূপকী-উপস্থাপনায় স্বদেশের একটি বিশেষ সময়-সন্ধিক্ষণের হতাশাময় আলেখ্য তুলে ধরলেও আশাবাদী কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্ব-শান্তির কথা, সর্বমানবের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা :

যেন বঞ্চিত বনি আদমের এই দীর্ঘশ্বাস
রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে,
যেন এই তৃষাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ
আবার হতে পারে
সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত

www.pathagar.com

দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে
দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে।

ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, এবং শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই এটা সম্ভব, ঐতিহ্যবাদী ও মানবকল্যাণকামী কবি ফররুখ আহমদের এই গভীর এবং আন্তরিক বিশ্বাসও ভাষা পেয়েছে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে। প্রত্যক্ষভাবে যেমন, নানা প্রতীক এবং রূপকের মাধ্যমেও তা অভিব্যক্ত হয়েছে।

তিন

ফররুখ আহমদের কবিতায় প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার যেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, তেমনি তাঁর রচনায় আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এবং ছন্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারও বিশেষ উল্লেখনীয়, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। সৃজনধর্মী কবিরা আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে যেমন, বক্তব্য প্রকাশের জন্যও তেমনি নতুন ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ইত্যাদি নির্মাণ করে নেন, নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ছন্দ-নিপুণ এবং রূপদক্ষ কবি ফররুখ আহমদ ছন্দোবদ্ধ কবিতায়ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন ধরনের ছন্দে এবং আঙ্গিকে রূপায়িত করেছেন তাঁর বক্তব্য, ভাবনা-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তাঁর কবিকর্মের বৃহত্তর অংশই ছন্দোবদ্ধ রচনা, এবং কাব্য-আঙ্গিক নির্ভর। কিছু কিছু গদ্যছন্দের কবিতা লিখলেও "হাবেদা মরুর কাহিনী"ই একমাত্র গদ্য-কাব্য।

কবিতার ছন্দ নিয়ে ফররুখ আহমদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাঁর গদ্যকবিতা সম্পর্কে ইতিপূর্বের এক আলোচনায় লিখেছিলাম,[১] 'অন্ত্যমিলযুক্ত, ছন্দোধ্বনিময় কবিতা রচনাতেই ছিল তাঁর বিশেষ-প্রবণতা। তাঁর গদ্য-কবিতা, মুক্তছন্দের কবিতা (ফ্রি-ভার্স) প্রায় নেই বললেই চলে। যতদূর জানি, তিনি ছদ্মনামে কিছু গদ্যকবিতা লিখেছিলেন।...কবিজীবনের শুরুতে তিনি কোনো গদ্য-কবিতা কিংবা মুক্ত-ছন্দের কবিতা লিখেছিলেন কিনা, জানি না। তবে মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত :

মাধবী বিতানের পাশে তার ছায়া-বিতান।
তবু সে ফুটলো না মধুরাতে বসন্তের বিহ্বলতায়
সঙ্গী বসন্ত যেদিন লুটে পড়ল
অন্তিম নিঃশ্বাসে, সেদিন
থেকেই বুঝি তার মনে সত্যিকারের
অশ্রুর পরাগ জমতে
আরম্ভ করেছে। সঙ্গীহীনা সে এক কেতকী।
[আঁধারের স্বপ্ন]

---

১ সাহিত্য ও সাহিত্যিক : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ [পৃ. ১৮৮-৮৯]

www.pathagar.com

১৩৪৫ সালের পৌষ সংখ্যা (১৯৩৮) 'সওগাত'এ প্রকাশিত এই সুদীর্ঘ কবিতাটি গদ্য-ছন্দে রচিত এবং এতে কোনো 'পংক্তি-শেষের অন্ত্যমিল'ও নেই। কিন্তু কবিতাটির অনেক পংক্তিই সুনির্দিষ্ট ছন্দে, মাত্রায় ও পর্বে ভাগ করা যায়। যদিও সর্বত্র একই নিয়ম-রীতি এবং মাত্রা ও পর্বের অনুসরণ নেই। কবিতাটিতে শেষের দিকে আশ্চর্যজনকভাবে পংক্তি-শেষের 'মিলও' দু'য়েকটি এসে গেছে। এইসব স্তবক পুরোপুরি ছন্দে সমর্পিত :

তোমার বুকের গন্ধে যখন ঘুমিয়ে ছিলাম একা
তোমার মনের কোণে,
পেলব তোমার পাপড়ি দলে সবার অগোচরে
ছিলাম সঙ্গোপনে।
কোন্ সুদূরের স্বপন-মায়ার কাজল-ঘুমের মোহে
জানতে পারিনি তা
আজকে দেখি উঠছে ফুটে আমার মনের কোণে
তোমার মনোলিখা।
বাদল রাতে তোমার গীত অশ্রু রুধির ধারা
শুনছি জেগে একা,
আমার মনের গান যে মেশে তোমার মনের ছায়ে
মেলে মনের লেখা।

[আঁধারের স্বপ্ন]

এই কবিতার গদ্যাংশে ও পদ্যাংশে, কবির জীবনের প্রাথমিক-পর্বের রচনা বলেই, ভাষা ও রীতিভঙ্গীর দিক থেকে রাবীন্দ্রিক-প্রভাবের পরিচয়ও মেলে। কিন্তু কবিতায় এমন গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি সংস্থাপন ফররুখ আহমদের অন্য কোনো কবিতায় রয়েছে কিনা, জানি না। তবে তাঁর বহু কবিতাতেই স্তবক-বিশেষে ছন্দের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিষয় ও বক্তব্যের চারিত্র্য অনুসারে, উচ্চারণের ভিন্নতার প্রয়োজনে, তিনি কবিতায় নানা ছন্দ ও স্তবক-বিন্যাস কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, বিভিন্ন রূপের পারস্পরিক সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। কবিতায় আকস্মিকতা কিংবা নাটকীয়তার আশ্রয় তাঁর বহু কবিতায়ই অনুভবযোগ্য। পরিবেশ রচনা এবং পাঠকদের মানসিক প্রস্তুতির জন্যেই যেন তিনি কবিতায় মূল বক্তব্যের অবতারণার আগে এক ধরনের আকস্মিক-উন্মোচন ঘটিয়েছেন। "হাবেদা মরুর কাহিনী" পড়তে গিয়েও এটা উপলব্ধি করা যাবে।

গদ্য-কাব্য তথা গদ্য-ছন্দের কবিতা রচনায় ফররুখ আহমদ কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, তা ছান্দসিক-সমালোচক এবং সুধী পাঠকদের বিবেচনার বিষয়। তবে, গদ্য কবিতা তথা গদ্য-ছন্দের কবিতার চারিত্র্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত, এই মূল্যায়নে সহায়ক হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, সাধারণ পাঠক অন্ত্যমিলকেই প্রধানত কবিতার ছন্দ বলে ধারণা করে থাকেন, এবল অন্ত্যমিলবর্জিত হলেই, সাধারণভাবে কবিতা গদ্যকবিতা বলে গণ্য হয়। প্রথাগত রীতিতে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনুসৃত হলেও অন্ত্যমিল না থাকলে কবিতা 'গদ্যকবিতা' অভিধায় সাধারণত চিহ্নিত হয়।

কবিতার ছত্রান্তে, যে-কোনো বর্ণের পারস্পরিক ধ্বনিগত মিলকেই, সেই সুদূর অতীতে কবিওয়ালার যুগে যেমন, একালেও তেমনি কবিত্বশক্তির প্রকাশ হিসাবে সাধারণ্যে

www.pathagar.com

গণ্য করা হয়। কাব্যপাঠ ও উপভোগের এই ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণা থেকেই সাম্প্রতিককালের পাঠক পর্যন্ত অন্ত্যমিলহীন ছন্দোবদ্ধ যে-কোনো কবিতাকেই গদ্যকবিতা হিসাবে গণ্য করতে কুণ্ঠিত হন না, তারা ভুলে যান যে, গদ্য-কবিতারও এক ধরনের ছন্দ এবং ছন্দ-স্পন্দ রয়েছে, আর ছন্দ-নিপুণ কবি ছাড়া সার্থক গদ্য-কবিতা লেখাও সম্ভব নয়।

সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতির অধীনে ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনেকটা প্রথাবদ্ধ রীতিতে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়, এবং সেক্ষেত্রে সামান্যতম বিচ্যুতিকেও ছান্দসিকেরা ছাড়পত্র দিতে চান না ; কিন্তু 'ফ্রি-ভার্স' বা গদ্য-কবিতা রচনার সুবিধা এই যে তাতে ঐসব ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা নেয়া চলে ; ফ্রি-ভার্সের প্রতি কবিদের ঝোঁকে উৎস সম্ভবত এটাই। ফররুখ আহমদও সম্ভবত বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার জন্যেই "হাবেদা মরুর কাহিনী"তে এই স্বাধীনতা নিয়েছেন, অবলম্বন করেছেন গদ্যছন্দ। ছন্দোবদ্ধ রচনার একঘেয়েমি পরিহার করার, এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনেও হয়তো তিনি এই রীতি অবলম্বন করে থাকবেন। হতাশা, জীবনের রুক্ষতা এবং প্রাণহীনতার প্রতীকায়ণ আর রূপকাশ্রিত উপস্থাপনাই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে নিরেট গদ্যছন্দ অবলম্বন এবং আবেগরহিত, লাবণ্যহীন ভাষা ব্যবহার অস্বাভাবিক কিংবা বিচিত্র কিছু নয়।

অবশ্য 'বহিরাচারী ছন্দমাপকে' বর্জন করলেও, গদ্যকবিতায়ও শব্দের অন্তরাশ্রয়ী যে ছন্দ এবং পরস্পর বন্ধনে যার দ্যোতনা—সেই ছন্দকে বর্জন করা সম্ভব নয়, এবং বর্জন করলে, করতে গেলে, কাব্যছন্দের মুক্তি তো দূরের কথা, কাব্যসৃষ্টি হওয়াই অসম্ভব। কারণ প্রচলিত ছন্দের চারিত্র্য এবং পরিমাপ অনুসরণ না করলেও, প্রত্যেকটি শব্দের এবং সে-সবের ধ্বনিগত পরস্পর বন্ধনের যে একটি ধ্বনিগত সুসাম্য, মিল এবং দ্যোতনা আছে এ-সম্পর্কিত সচেনতা মুক্তছন্দের অনুসারী কবির জন্যেও অপরিহার্য। "হাবেদা মরুর কাহিনী"তে যখন আমরা পড়ি :

কিন্তু এখানে
এখানে এই অমিল, ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে
কাঁকর-বিছানো মাঠে,
বালুরুক্ষ বিয়াবানে
আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরুর মাঠের
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে।

তখন অন্ত্যমিলহীন, এই গদ্য-উচ্চারণও মনে ছন্দের দ্যোতনা জাগায়। মুক্তছন্দের কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও শব্দ-নির্বাচনের ব্যাপারে অমনোযোগ কিংবা অসতর্কতা কবিতার সুশৃঙ্খল অন্তর-প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। কারণ, গদ্যকবিতার ছন্দ যদিও সুনির্দিষ্ট কিংবা নিরূপিত ছন্দ নয়, তা'হলেও ছন্দস্পন্দ (রিদম) এবং যাকে বলা যেতে পারে ছন্দের অন্তঃপ্রবাহ কিংবা চোরাস্রোত, তা-ও শব্দ-নির্বাচনের এই অসতর্কতা ও অমনোযোগের কারণে বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফররুখ আহমদের মতো শব্দ-সচেতন, ভাষা-ব্যবহারে দক্ষ কবির ক্ষেত্রেও যে এমনটি না ঘটেছে, এমন নয়।

www.pathagar.com

"হাবেদা মরুর কাহিনী"তেও তিনি বক্তব্য প্রকাশের অবারণ ঝোঁকে অনেক অ-কাব্যিক ও নিতান্ত গদ্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কবির বদলে হয়ে উঠেছেন বক্তা। যিনি লিখেছেন এমন অনুপম আকর্ষণীয় স্তবক :

বিষণ্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে
কাল জেগে উঠেছিল
এক মজানদীর কাহিনী
(উচ্ছল পারার মত আকাশের সেই আর্শি—
মুখ দেখতো যাতে
সংখ্যাহীন তারা আর চাঁদ,
পাল তুলে যেত দূরের নৌকা
উদ্দাম স্রোতে ভাসমান রাজহাঁসের মত
সে নদী এখন গেছে শুকিয়ে,
তার বালুবক্ষে এখন ঘুরে বেড়ায়
তপ্ত হাওয়ার শ্বাসে
বহু যুগ আগেকার এক বিগত দিনের কান্না।)
আর মনে হয়েছিল
এখনো সে নদী পারে বাঁচতে
এখনো সে পারে ফিরে পেতে
তার বহমান তরঙ্গ
উদ্দাম গতিবেগ
প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস ;
যদি সে খুঁজে পায়
শুধু তার মূলের ঠিকানা।

তিনিই সকল রূপক, প্রতীক ও কাব্যের আড়াল ছিন্ন করে আত্মসমালোচনার আঘাত হেনে একেবারেই গদ্যাত্মক ও অ-কাব্যিক ভাষায় বলেছেন এই উপলব্ধির কথা :

যেদিন থেকে আমরা নিয়েছি
ঈমানের পরিবর্তে বে-ঈমানী
একতার পরিবর্তে অনৈক্য,
আর শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা
(কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা)
শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই
আমাদের চূড়ান্ত দুর্গতি।

মনে রাখতে হবে, 'ফ্রি-ভার্স' বা গদ্য-কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী গদ্যাত্মক হয়েও থাকে অনেকখানি কাব্যধর্মী এবং এই চারিত্র্যের কারণেই উল্লেখিত বিশেষ রীতির কবিতা 'গদ্য-কবিতা' এই অভিধায় চিহ্নিত। ছন্দোবদ্ধ এবং পদ্যবন্ধের কবিতায় যে-ধরনের শব্দ-নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হয়, অনিবার্য কারণেই তার কিছুটা অলঙ্কৃত ও প্রসাধিত চারিত্র্য থাকে—থাকে কাব্যগন্ধী লাবণ্যের ছটা। ফররুখ আহমদের ছন্দোবদ্ধ এবং অন্ত্যমিলযুক্ত

www.pathagar.com

কবিতায় কবিত্বময় ইমেজোচ্ছল ভাষার উজ্জ্বল পরিচয় আছে। 'সিন্দবাদ' প্রতীকে তিনি যখন উচ্চারণ করেন :

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক ;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

*

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী !
খুরের হলকা—ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে,
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী...
তুফানের মাঠ পাড়ি দেওয়া তার একী দুরন্ত নেশা।

তখন বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্যদীপ্ত ভাষার বন্ধনে এবং ছন্দ-ধ্বনিময় বাকপ্রতিমার এক অনুপম আলেখ্যই অঙ্কিত হয়, বাঙময় হয়ে ওঠে। নিরূপিত ও সুনির্দিষ্ট ছন্দে এ-ধরনের কাব্যগন্ধী, লাবণ্যময় এবং বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্য-দীপ্ত ভাষা ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বিধিবদ্ধ, কিন্তু গদ্য-কবিতায় শব্দ-নির্বাচন ও ভাষা-ব্যবহারের প্রশ্নে এমন রীতিবদ্ধতা অপরিহার্য নয়, এ-কারণেই গদ্য-কবিতায় শব্দ-নির্বাচন ও ব্যবহারের স্বাধীনতা কিছুটা বেশি। কিন্তু তবুও, যেহেতু গদ্য-কবিতা মূলত কবিতাই, এবং ভাষার ক্ষেত্রে ঘরোয়া-আলাপচারী ভঙ্গী ব্যবহারের অবকাশ এতে বেশি, আর গদ্য হলেও, এই কবিতায়ও ছন্দের চোরাপ্রবাহ রয়েছে, সে-কারণে সাধারণত ছন্দ-নিপুণ কবির হাতেই গদ্য-কবিতাও প্রাণবান এবং সজীব হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একালের অনেক আধুনিক কবির রচনায়ই এর পরিচয় আছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলতে গেলে, কবিতার ভাষার যে 'অভব্য বস্তুতন্ত্র' তাতেও ছন্দঃস্রোত প্রবাহিত ; এবং শব্দের 'ক্যাডেন্স' অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ মূলত বক্তব্যের ও সে-অনুসারে উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনিত। অনিরূপিত ছন্দোবদ্ধ কবিতায় শব্দের এই ক্যাডেন্স অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ প্রাধান্য পায় না, কারণ সেখানে মাত্রানুযায়ী শব্দ উচ্চারিত হয় বলে এবং ভাবযতি অনুসারে ছেদ পড়ে বলে, পূর্ণ এবং অপূর্ণ পর্বে ছন্দই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে ; কিন্তু গদ্য-ছন্দের কবিতায় শব্দের ক্যাডেন্স বা স্বরপ্রবাহই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গদ্যছন্দের প্রকৃতি অনেকখানি অন্তর্নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনা মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দে বোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাপ বোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে অলংকার-শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখে না যে যেহেতু গদ্য সহজ সে-কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।'

ফররুখ আহমদ তাঁর কবি-জীবনের বৃহত্তর অংশই ব্যয় করেছেন পদ্যছন্দের চর্চায় এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি রেখেছেন দক্ষতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর। শুধু ছন্দের বিভিন্নরূপ এবং

www.pathagar.com

বৈচিত্র্যধর্মী ব্যবহারেই নয়, কবিতার অন্ত্যমিলেও এই দক্ষতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর আছে। গদ্যকাব্য আলোচ্য "হাবেদা মরুর কাহিনী"তে তিনি ছন্দের প্রথাবদ্ধ রীতি এবং মনোটনি অর্থাৎ একঘেয়েমী ভেঙেছেন। তিনি যখন উচ্চারণ করেন :

কাফেলা এসে দাঁড়ালো
হাওয়ার মাঠ দশ্‌তে হাবেদায়...
জিন্দেগীর সবুজ নিশানা হারিয়ে
খাঁ খাঁ করছে যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া ময়দান,
যেখানে পোড়া মাটি রঙ ফসলের শূন্য মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গুমরে উঠছে রাত্রিদিন

কাফেলা এসে দাঁড়ালো সেই রুক্ষ বিয়াবানে
সবচেয়ে প্রাণবন্ত চারাগাছ
যে মাটিতে মাথা তুলে
কুঁকড়ে শুকিয়ে মারা গেছে
যে মরা গাছের শুকনো ডালে দেখেছি
ঝড়ো সন্ধ্যায় হিংস্র জ্বীনের নর্তন।

তখন এই গদ্যকবিতায়ও স্বরপ্রবাহ, ধ্বনি-দ্যোতনা এবং ছন্দের চোরাস্রোত অনুভব করা যায়। কিছু-কিছু শব্দের স্থানান্তর ঘটিয়ে, দু'য়েকটি শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে এবং যতি, মাত্রা পর্ব ইত্যাদির নব-বিন্যাসে এই গদ্যাংশকেও রূপান্তরিত করা যায় পদ্য-ছন্দে। যেমন :

কাফেলা দাঁড়ালো এসে। সেই
অচেনা হাওয়ার মাঠ। দশ্‌তে হাবেদায়...
জিন্দেগীর। সবুজ নিশানা যত। হারিয়ে সুদূরে
খাঁ খাঁ করছে আজ। যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া। ময়দান
যেখানে রয়েছে যত। পোড়া মাটি রঙ আর।
ফসলের। ঢের শূন্য। মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে। গুমরে উঠছে কেঁদে।
শুনি রাত্রিদিন।

ভাষা ও ছন্দের সুদক্ষ রূপকার ফররুখ আহমদ যদি গদ্যছন্দে না লিখে, পদ্যছন্দে লিখতে চাইতেন, তা'হলে উপরোক্ত কাব্যাংশ হয়তো অনেক বেশি প্রাণবান, সজীব এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। শুধু ফররুখ আহমদেরই নয়, যে-কোনো প্রতিভাবান এবং ভাষা ও ছন্দের দক্ষ রূপকার কবির হাতেই তেমন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। কেননা, গদ্যছন্দে রচিত হলেও, উপরোক্ত রচনাংশে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, আর এটা সম্ভব হয়েছে এ-কারণে যে, পদ্যছন্দের দক্ষ রূপকার ফররুখ আহমদের মনের মধ্যেও গদ্যছন্দের পরিমাপ বোধ ছিল, আর এটাও মনে রাখা দরকার যে, 'গদ্য কিংবা পদ্য' যা-ই হোক না কেন, ভাষামাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, এই বোধ যার নেই,

www.pathagar.com

তার পক্ষে 'অলঙ্কার শাস্ত্রের' সহায়তায় কোনো ছন্দই যথার্থরূপে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। ভাষার এই স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ এবং ছন্দোময়তা সম্পর্কে সচেতনতাই মাত্র ভাষার ব্যবহারকারীকে এর বৈচিত্র্যময় ছন্দ এবং ছন্দোপ্রকৃতি আবিষ্কারে সহায়তা করতে পারে। এমন সহায়তা পেয়েছেন বলেই, ফররুখ আহমদ গদ্যছন্দেও অসফল হননি ; বস্তুত, "হাবেদা মরুর কাহিনী"-তে তাঁর সাফল্য, কবির অন্যান্য কাব্যের তুলনায় ন্যূন হলেও, একটি রূপকাশ্রিত গদ্যকাব্য হিসাবে এ ফররুখ আহমদের এক উল্লেখযোগ্য রচনা।

*

কবি ফররুখ আহমদ নিজে "হাবেদা মরুর কাহিনী"র একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। সেটি এই।—

> রূপকথার 'হাবেদা মরুর' অন্য নাম 'হাওয়ার ময়দান'। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে ঐ মাঠের সওয়ালে।
>
> "হাবেদা মরুর কাহিনী"—গদ্যে লেখা রূপক কবিতা। ঈসায়ী উনিশশো সাতান্নর শেষ ভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশশো আটান্ন'র প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর ঈদ-উল-আজহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতাটি লেখা হয়। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল। আর সেই মারাত্মক নৈরাজ্যের মুখে যখন প্রত্যেক দেশাত্মবোধ সম্পন্ন নাগরিক কামনা করেছিলেন একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের।
>
> **ফররুখ আহমদ**

দিলরুবা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪/ফাল্গুন ১৪০০ ॥ প্রকাশক : আমীরুল ইসলাম। সভাপতি, চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯/এ জামাল খান সড়ক চট্টগ্রাম॥ স্বত্ব : বেগম ফররুখ আহমদ॥ মুদ্রণ তত্ত্বাবধান : কাভিকো এসোসিয়েটস, ৩২৯ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম॥ মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র॥ প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মোমিনউদ্দীন খালেদ॥

আবদুল মান্নান সৈয়দ রচিত "দিলরুবা" কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা গ্রথিত হলো।—

এক

যতো দিন যাচ্ছে ততোই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) এক বহুমাত্রিক, বহুকক্ষময়, ক্রমবিবর্তিত, আত্মঅতিক্রমী ও গতিশীল কবির নাম। এক যুগেরও আগে, যখন ফররুখ-কাব্যের সঙ্গে আমার ততো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়নি (এখনো তাঁকে সার্বিক জানার অনেক বাকি আছে), তখনো আমার মনে হয়েছিলো, 'সম্ভবত ফররুখ আহমদই চল্লিশের দশকের দুই বাংলার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'[১] এখন এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। ফররুখ আহমদের কবিতা তথা সাহিত্য একটির-পর-একটি বৃত্ত

www.pathagar.com

অতিক্রম ক'রে গেছে ; আপাতভাবে তা সাযুজ্যরহিত ; কিন্তু শেষ-অবধি তা একটি মৌচাকেরই বিভিন্ন কোটর। এখন, ফররুখ-কাব্যের আরেকটি মধুময় কক্ষ বাঙালি পাঠকের সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে : "দিলরুবা"—ফররুখ আহমদের প্রেমের কবিতার এক অসামান্য সংগ্রহ। আর এ সংগ্রহ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত প্রেমের কবিতার কোনো চয়নিকা নয় — কবির স্বহস্তে প্রস্তুত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি। বস্তুত আত্মপ্রত্যয়ী ফররুখ তাঁর পাণ্ডুলিপির-পর-পাণ্ডুলিপি থরে-থরে সাজিয়ে রেখে গেছেন আমাদের জন্য। অগ্রজ কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) মতোই জীবৎকালে তাঁর অসংখ্য রচনার অনুপাতে প্রকাশক তেমন জোটেনি। তাই জীবদ্দশায় যে-কবির ছয়টি মাত্র কবিতাগ্রন্থ ("সাত সাগরের মাঝি", ১৯৪৪ ; "আজাদ করো পাকিস্তান", ১৯৪৬ ; "সিরাজাম মুনীরা", ১৯৫২ ; "নৌফেল ও হাতেম", ১৯৬১ ; "মুহূর্তের কবিতা", ১৯৬৩ ; "হাতেম তা'য়ী", ১৯৬৬) প্রকাশিত হয়েছিলো—তাঁর মৃত্যুর পরে তার চেয়ে বেশি অপ্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ বেরিয়েছে : "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা", ১৯৭৫ ; "হে বন্য স্বপ্নেরা", ১৯৭৬ ; "মুহূর্তের কবিতা", পরিশোধিত সংস্করণ, ১৯৭৮ ; "ফররুখ-রচনাবলী", প্রথম খণ্ড, ১৯৭৯ ; "ইকবালের নির্বাচিত কবিতা", ১৯৮০ ; "কাফেলা", ১৯৮০ ; "হাবেদা মরুর কাহিনী", ১৯৮১ ; "তসবিরনামা", ১৯৮৬ ; "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য", ১৯৯১ ; "নির্বাচিত কবিতা", ১৯৯২ ; প্রভৃতি। এই তালিকায় এখন যুক্ত হ'লো আরো একটি সম্পূর্ণ কবিতাগ্রন্থ : "দিলরুবা"। কবির মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে প্রকাশিত হচ্ছে এই বইটি। আমরা যদ্দুর জানি, এটিই শিশুসাহিত্য ব্যতিরেকে কবির স্বহস্তে প্রস্তুত সর্বশেষ পাণ্ডুলিপি (সর্বশেষ এই অর্থে যে, কবিকর্তৃক প্রস্তুত পাণ্ডুলিপিগুলি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হ'য়ে গেছে)। এই কবিতাগ্রন্থের প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ঘটনা এজন্যে যে আদর্শবাদী কবি ফররুখ আহমদের আরেকটি অজ্ঞাতপ্রায় অধ্যায়ের উন্মোচন হ'লো। এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের মধ্য দিয়ে ফররুখ আহমদের কবিতা কাব্যভুবনের আরেকটি দিগন্ত দখল করলো।

দুই

"দিলরুবা"[২] সাতটি স্তবকে সমাপ্ত এক সনেট-পরম্পরা। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো সৈয়দ আলী আশরাফ-সম্পাদিত[৩] ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দিলরুবা' নামক মাসিক সাহিত্যপত্রে। 'দিলরুবা' পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখের 'দিলরুবা' কবিতাগুচ্ছের প্রকাশের ধারাক্রম এখানে উল্লিখিত হ'লো :

১. দিলরুবা (প্রথম স্তবক : ১-৫)[৪]। বৈশাখ ১৩৫৬।
২. দিলরুবা (দ্বিতীয় স্তবক)। আষাঢ় ১৩৫৬।
৩. দিলরুবা (তৃতীয় স্তবক : ১-৭)। ভাদ্র ১৩৫৬।
৪. দিলরুবা (চতুর্থ স্তবক : ১-৫)। আশ্বিন ১৩৫৬।
৫. দিলরুবা (পঞ্চম স্তবক : ১-৬)। অগ্রহায়ণ ১৩৫৬।
৬. দিলরুবা (ষষ্ঠ স্তবক : ১-৬)। ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৫৬।
৭. দিলরুবা (সপ্তম স্তবক : ১-৯)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭।

www.pathagar.com

১৩৫৬ অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে "দিলরুবা"র পাণ্ডুলিপি সম্পাদককে অর্পণ করায় বোঝা যাচ্ছে, "দিলরুবা " অন্তত ১৯৪৯ সালেই লেখা হ'য়ে গিয়েছিলো। এদিকে, আমরা জানি, ফররুখ আহমদের সাহিত্যজীবনের দুটি পর্যায় : ১৯৩৭-৪৮ কলকাতায়, ১৯৪৮-৭৪ ঢাকায়। ঢাকায় এসে কবি প্রথমে অনিয়মিত স্টাফ আর্টিস্ট হিশেবে ঢাকা বেতারে যোগদান করেছিলেন, পরে স্থায়ী হন। "দিলরুবা" কাব্য ঢাকায় এসে এই সময়েই লেখা হয়, এই আমাদের ধারণা। সেকালের কবিদের মতো ফররুখের একটি অভ্যাস ছিলো কোনো পত্রিকার নামে কবিতা লেখা। যেমন : তিনি 'অগত্যা' পত্রিকায় 'অগত্যা' নামে কবিতা লিখেছিলেন, 'বই' পত্রিকায় 'বই' নামে কবিতা লিখেছিলেন, 'মদিনা' পত্রিকায় 'মদিনাতুন্নবী' নামে কবিতা লিখেছিলেন, 'সৈনিক' পত্রিকায় লিখেছিলেন 'আমাকে সৈনিক করো' নামে কবিতা। "দিলরুবা" কবিতাগুচ্ছের সূচনা হয়েছিলো "দিলরুবা" পত্রিকার নামেই, কিন্তু কবিতাগুলি যে নিছক পত্রিকানামকে অতিক্রম করেছিলো, তা স্বতঃপ্রকাশ।[৫]

এতোদিনে ফররুখ-কাব্যামোদীরা জেনে গেছেন কবির বারবার পরিমার্জনা-পুনর্মার্জনার অভ্যাস ছিলো। পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই কবি অনেক সময় পরিশোধন করেছেন (যেমন "নয়া সড়ক" সংকলনে তাঁর 'রাজরাজড়া' নাটক), প্রকাশিত বই-এরও কবিতা কবি ব্যাপকভাবে পরিশোধন-পরিবর্ধন করেছেন (যেমন "মুহূর্তের কবিতা"), তেমনি "দিলরুবা" পত্রিকার পাঠ থেকে বর্তমান গ্রন্থের পাঠ বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র। "দিলরুবা" কাব্যগ্রন্থের তিনটি লেখন আমরা পাচ্ছি :

১. "দিলরুবা" : 'দিলরুবা' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখন।
২. "দিলরুবা" কাব্যের খসড়া লেখন : প্রথম পাণ্ডুলিপি।
৩. "দিলরুবা" কাব্যের চূড়ান্ত লেখন : দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি।

আমরা অবলম্বন করেছি চূড়ান্ত লেখনের এই দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি। ফররুখ তাঁর পাণ্ডুলিপিতে সাধারণত রচনা বা পরিশোধনের তিথি-তারিখ উল্লেখ করতেন না। এই পাণ্ডুলিপি-খাতায়ও কোথাও সাল-তারিখের কোনো উল্লেখ নেই। তবে, আমাদের অনুমান, পত্রিকার প্রকাশ থেকে এই পরিশোধনের তারিখ খুব দূরবর্তী নয়। তৃপ্তিহীন ফররুখ এমনকি এই চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিতেও কিছু-কিছু রদবদল করেছেন। শাদা একসারসাইজ খাতার প্রথম পাতায় "দিলরুবা" কথাটি কবি স্বয়ং কালো-নীল দু'রকম কালিতে চিত্রিত করেছেন। তারপরই আছে বাংলা ও ইংরেজিতে উৎসর্গ—কিন্তু দুটিই কেটে-দেওয়া।[৬] নিচে কবির স্বাক্ষর। কেটে-দেওয়া উৎসর্গপত্রের পাঠ—যদ্দুর পড়া যাচ্ছে—এরকম :

পূর্ব দিগন্তের নায়িকার প্রতি
To the Lady of Eastern Horizon

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আরেকটি উৎসর্গ আছে—সেটাও কেটে-দেওয়া :

সহস্র রাত্রির অপরিচিতার প্রতি

এর পরে পর-পর সাতটি স্তবকের সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থটি। কাব্যগ্রন্থটি শেষ হওয়ার পরেও "দিলরুবা" লিখে কেটে দেওয়া শিরোনামের নিচে অকর্তিত এই তিন পঙক্তি :

www.pathagar.com

যে মন ঘুমায়েছিলো বালুচাপা মরুভূর মত
সে মন উঠিল জেগে দূরে দেখি তোমার শ্যামল
মেঘচ্ছায়া অপরূপ

সাতটি স্তবকের সনেট সংখ্যা এরকম :

প্রথম স্তবক	:	১–৬
দ্বিতীয় স্তবক	:	১–৭
তৃতীয় স্তবক	:	১–৮
চতুর্থ স্তবক	:	১–৫
পঞ্চম স্তবক	:	১–৬
ষষ্ঠ স্তবক	:	১–৭
সপ্তম স্তবক	:	১–১০

সম্পূর্ণ স্তবকের সর্বমোট সনেট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে : ৪৯টি। চূড়ান্ত এই পাণ্ডুলিপিতেও কবি যে পরিশোধনগুলি করেছেন, সেগুলি আমরা এখানে উল্লেখ করছি :

প্রথম স্তবক	: সনেট ১	: পঙক্তি ৯	:	ছিলো 'সেই রাতে' হয়েছে 'সে নিশীথে'।
ঐ	: সনেট ২	: পঙক্তি ৯	:	ছিলো 'কামনা' হয়েছে 'আকাঙ্ক্ষা'।
ঐ	: সনেট ২	: পঙক্তি ১০	:	ছিলো 'কামনা' হয়েছে 'বাসনা'।
ঐ	: সনেট ৪	: পঙক্তি ১৩	:	ছিলো 'আচ্ছন্ন দিগন্ত–পথ' হয়েছে 'সংশয়িত বাঁকা পথ'।
ঐ	: সনেট ৬	: পঙক্তি ১৪	:	ছিলো 'হারালো সে' হয়েছে 'তাহাদেরি'।
তৃতীয় স্তবক	: সনেট ১	: পঙক্তি ১	:	ছিলো 'প্রতীক্ষাতুর' হয়েছে 'গ্রীষ্মের'।
চতুর্থ স্তবক	: সনেট ৫	: পঙক্তি ২	:	ছিলো 'জানাজানি' হয়েছে 'কানাকানি'।
পঞ্চম স্তবক	: সনেট ২	: পঙক্তি ৪	:	ছিলো 'মৌন সম্মতির কথা পারেনি ঢাকিতে তব বুক' হয়েছে 'পারেনি ঢাকিতে কিছু ও হৃদয় একাগ্র উন্মুখ'।
ঐ	: সনেট ৫	: পঙক্তি ১৪	:	ছিলো 'পারেনি উত্তর দিতে' হয়েছে 'উত্তর দেয়নি আর'
ষষ্ঠ স্তবক	: সনেট ১	: পঙক্তি ৬	:	ছিলো 'তোমারে' হয়েছে 'সত্তারে'।
ঐ	: সনেট ৪	: পঙক্তি ৬	:	ছিলো 'মিটে যায়' হয়েছে 'শ্রান্ত হয়'।
সপ্তম স্তবক	: সনেট ৫	: পঙক্তি ৯	:	ছিলো 'তীব্র' হয়েছে 'তিক্ত'।
ঐ	: সনেট ৭	: পঙক্তি ১১	:	ছিলো 'দৃষ্টি কাড়ে' হয়েছে 'স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার'।
ঐ	: সনেট ৭	: পঙক্তি ১৩–১৪	:	ছিলো 'তোমার পথের পরে — যদি নামে অন্ধ ঘনরাতি অমাকৃষ্ণ শর্বরীতে দেখা দেবে সে পথের সাথী।' হয়েছে 'তোমার পথের' পরে যদি নামে অন্ধ ঘন ছায়া বিস্মৃত ইঙ্গিত তার কেটে যাবে শর্বরীর কায়া।'
ঐ	: সনেট ৮	: পঙক্তি ১	:	ছিলো 'আদমের' হয়েছে 'মানুষের'।

পত্রিকার থেকে চূড়ান্ত পাঠের যে-পরিস্রাবণ তাতে কবিতার মূল প্রবাহ অক্ষুণ্ণই থেকেছে, শব্দ বা পঙক্তির পরিবর্তন ঘটেছে, কখনো একটি স্তবকের কোনো সনেটের স্থানবদল,

www.pathagar.com

কিংবা কখনো নতুন একটি সনেটও যুক্ত হয়েছে (যেমন : সপ্তম স্তবকের ৪-সংখ্যক সনেটটি পত্রিকায় ছিলো না)। সর্বশেষ সনেটটি পত্রিকায় ও চূড়ান্ত পাঠে একই আছে অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থেও অবিকল। সাধারণত পত্রিকা থেকে চূড়ান্ত পাঠে ছোটোখাটো রদবদলই হয়েছে। যেমন — একটিমাত্র উদাহরণ উপস্থিত করছি — পঞ্চম স্তবকের ৫-সংখ্যক সনেটটির চূড়ান্ত পাঠ এবং ফুটনোটে পত্রিকার পাঠ উল্লিখিত হ'লো :

শুনিতে চেয়েছি আমি—তোমার ক্ষণিক অদর্শন
এ মনের অধিরাজ্যে এনেছে কী অন্তহীন কাল
সুকঠিন প্রতীক্ষায়।[ক]—উত্তর দিয়াছে দু'নয়ন
তব পথ-প্রান্তে জাগি শ্রান্তিহীন[খ] প্রদোষ সকাল।
শুনিতে চেয়েছি আমি—অরণ্যের সকল ভাষণ
মেটাতে কি পারিয়াছে তব কণ্ঠ-ধ্বনির পিপাসা
অনির্বাণ মোহময়।—বলিয়াছে আমার শ্রবণ
উৎকর্ণ তোমার স্বরে আজো মোর[গ] মেটে নাই আশা।
শুনিতে চেয়েছি আমি—পল্লবিত পদ্মের মধুর
পাপড়ি কি দিতে পারে তনুস্পর্শ নিত্য কমনীয়
তোমার স্পর্শের চেয়ে।—বলিয়াছে বক্ষ লোভাতুর
অতৃপ্ত জীবনে আর কোন স্পর্শ নহে স্মরণীয়।[ঘ]
শুনিতে চেয়েছি আমি সবচেয়ে কাম্য কোন ক্ষণ
উত্তর দেয়নি আর তব অঙ্গ-লিপ্সু মোর মন॥[ঙ]

ক. প্রতীক্ষার
খ. শ্রান্তিহারা
গ. তার
ঘ. অতৃপ্ত জীবনে তব স্পর্শের মুহূর্তে স্মরণীয়।
ঙ. পারেনি উত্তর দিতে তব সঙ্গলিপ্সু মোর মন।

এই ক্রমাগত পরিশোধন-পুনঃশোধনের মধ্য দিয়ে এবং "দিলরুবা" কাব্যের একটি সম্পূর্ণ স্বহস্তে প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি রেখে যাওয়ায় এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফররুখ এই কাব্যগ্রন্থকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এবং এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরে—আশা করি—এই কাব্যগ্রন্থকে ফররুখ-কাব্যধারার একটি মাইল-ফলক হিশেবেই চিহ্নিত করতে হবে।

তিন

ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৪৪ সালে, কলকাতায় ; কবির স্বহস্তে-প্রস্তুত সর্বশেষ প্রাপ্তবয়স্ক কাব্যগ্রন্থ "দিলরুবা"। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে, প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে. চট্টগ্রাম থেকে। ১৯৪৪-৯৪—এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ফররুখ আহমদের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হ'য়ে গেলো (যদিও অজস্র কবিতা পত্রিকা-পাণ্ডুলিপি-সংকলনগ্রন্থাদিতে পরিকীর্ণ অবস্থায় র'য়ে গেছে এখনো)। ১৯৪৪-৯৪—এই পঞ্চাশ বছর ধ'রে কলকাতা-ঢাকা-চট্টগ্রাম থেকে ফররুখ আহমদের যে-কবিতাগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হ'লো—তার কিছু-কিছু পর্যালোচনা

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে হয়েছে, যা হয়েছে কম নয়, আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ভাবী বংশধরেরা তার আরো-বিশদ আরো-অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করবেন।

কবির প্রধান দুই আদর্শিক কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) ও "সিরাজাম মুনীরা"-র (১৯৫২) মধ্যবর্তী এই কবিতাগ্রন্থ "দিলরুবা" (রচনা : ১৯৪৯, প্রকাশ : ১৯৯৪)। প্রেমের আবেগে আন্দোলিত এ কাব্যগ্রন্থ এক-হিশেবে ফররুখ-কাব্যধারায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, অন্য হিশেবে অনুসৃতও বটে। ব্যতিক্রম এজন্যে যে আদর্শপ্রত্যাশী ফররুখ-কাব্যপাঠকের মনে হবে, ফররুখ এরকম প্রেমের কবিতা কেন লিখতে গেলেন—তাঁর কাছে মনে হবে, এ এক সম্পূর্ণ অচেনা অজ্ঞাত ফররুখ। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই বোঝা যাবে : এখানে ফররুখ কোনো আদর্শভঙ্গ ঘটাননি। একজন সামাজিক কবি ব্যক্তিগত আবেগে আলোড়িত হ'য়েও এখানে যেন অব্যক্তিক—ব্যক্তিগত থেকে কোথায় একটি দূরত্বও যেন রচনা করেছেন। মহাকবি য়োহান উল্‌ফগং ফন গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) যেমন অজস্র আত্মজৈবনিক রচনার মধ্যেও একটি নৈর্ব্যক্তিক ব্যবধি রচনা ক'রে রাখেন, এখানেও যেন ব্যক্তিগতের মধ্যেও একটি আস্বচ্ছ কাচের দেয়াল রয়ে গেছে। ঐ কাচের দেয়াল ভেদ ক'রে ব্যক্তি-ফররুখকে কোথাও যেন ঠিক স্পর্শসহ পাওয়া যায় না। প্রেমের কবিতা রচনা করেও ফররুখ যেন এখানেও সামাজিক কবি হিশেবেই থেকে গেলেন। 'অজান্তিকার প্রতি', 'পূর্ব দিগন্তের নায়িকার প্রতি', 'সহস্র রাত্রির অপরিচিতার প্রতি'—"দিলরুবা" কাব্যগ্রন্থের এইসব বর্জিত উৎসর্জন এই কাব্যের অন্তর্লোকে আলো ফেলে। এই কাব্যের 'তুমি', যাকে কবি অনেক সময় 'বিচিত্রা', 'শ্যামলী', 'সুদূরিকা' বা 'অজানিতা' ব'লে সম্বোধন করেছেন—সে-ও মনে হয় কোনো বিশিষ্টা প্রেমিকা নয়, এক চিরন্তনী নারী। বাঙালি পাঠকের মনে প'ড়ে যাবে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) বিখ্যাত 'অ-নামিকা' (রচনা : চট্টগ্রাম, ২৭-২-২৬, "সিন্ধু-হিন্দোল", ১৯২৭) কবিতার কথা—সেখানেও বিশেষ কোনো নারী নয়, নির্বিশেষ প্রিয়তমার বন্দনা। ঐ কবিতার প্রথম কয়েকটি পঙক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষা-জাগানিয়া।
তোমার বন্দনা করি...
হে আমার মানস-রঙ্গিনী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী!
নাম-নাহি-জানা ওগো আজো-নাহি-আসা!
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালোবাসা...
গোপন-চারিণী, মেয়ে, লো চির-প্রেয়সী!
সৃষ্টি-দিন হ'তে কাঁদো বাসনার অন্তরালে বসি—
ধরা নাহি দিলে দেহে।
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিল না
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেহে।
অসীমা! এলে না তুমি সীমারেখা-পারে।

[অ-নামিকা, সিন্ধু-হিন্দোল : নজরুল]

www.pathagar.com

নজরুলের 'অ-নামিকা' ও ফররুখের "দিলরুবা" কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুচ্ছে—দুটিতেই—প্রেমের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে দুই কবিরই ঝোঁক স্পষ্ট ; 'সুদূরিকা' শব্দটিও দুই কবিই ব্যবহার করেছেন।[৭] কিন্তু নজরুলের প্রবল ইন্দ্রিয়লিপ্সা ও সর্বপ্রেমবাদ থেকে ফররুখের কবিতা স্বতন্ত্র : নজরুল কবিতা শেষ করছেন এক আতীব্র সংরাগে :

প্রেম এক প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—
সে শরাব লোহু ।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।

ফররুখের কাব্যগ্রন্থ শেষ হচ্ছে রক্তিম বাসনায় নয়—প্রেমেরই অপরিম্লান বিজয়নিশান উড়িয়ে :

পরিপূর্ণরূপে তাই তোমাকে যে হয় নাই জানা
তাতে মোর নাই ক্ষোভ, শুধু আমি আশা ক'রে আছি
যে মধু-পিপাসু চিত্ত একদিন মেলিয়াছে ডানা
তোমার রাত্রির স্বপ্নে ঠাঁই পাবে কভু সে মৌমাছি—
জাগ্রত চেতনা মাঝে অথবা বিশ্রান্ত ঘুমঘোরে
আত্মার স্মরণালোকে—প্রেমের প্রোজ্জ্বল স্মৃতিডোরে॥

আর সামগ্রিকভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রেমকাব্যগুলির সঙ্গে তুলিত হ'তে পারে এই গ্রন্থ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) "পূরবী" ও "মহুয়া", কাজী নজরুল ইসলামের "চক্রবাক" ও "সিন্ধু-হিন্দোল", জীবনানন্দ দাশের "বনলতা সেন", অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-৭৬) "অমাবস্যা", বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-৭৪) "কঙ্কাবতী", অজিত দত্তের (১৯০৮-৭৯) "কুসুমের মাস" প্রভৃতির সঙ্গে। শেষ এই কাব্যগ্রন্থটির পাশে আমাদের এক-লহমা দাঁড়াতে হবে। অজিত দত্তের "কুসুমের মাস" (১৯৩০)-এর অধিকাংশই সনেট—এবং ফররুখ যাঁদের দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছিলেন কোনো-না-কোনোভাবে (মোহিতলাল, নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ প্রমুখ), অজিত দত্ত তাঁদেরই একজন। "কুসুমের মাস" বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য।

ফররুখের প্রাকরণিক বিশিষ্টতা এখানে যে এরকম সাতটি স্তবকে গাঁথা সপ্তপদী সনেট-সিকোয়েন্সের প্রেমের কবিতাগ্রন্থ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় আর-কোনো বই নেই। ছান্দসিক-কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪) সনেট-সিকোয়েন্স বা সনেট-পরম্পরা সম্পর্কে লিখেছেন :

> ...চতুর্দশপঙক্তি কবিতা মাত্রই 'সনেট' নয়। সনেট এক বিশেষ ধরনের চতুর্দশপঙক্তি কবিতা। একটি সনেটে থাকে একটি বিশেষ ভাব বা অনুভূতির সম্পূর্ণ রূপায়ণ। একটি মূল ভাব বা ভাবনাকে সনেট-পরম্পরায় (Sonnet Sequences) সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত আছে বটে, —যথা মধুসূদনের 'উপক্রম', দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'দুহিতা-মঙ্গল-শঙ্খ', রবীন্দ্রনাথের 'চিরদিন', মোহিতলাল মজুমদারের 'রুপার্ট ব্রুক', বুদ্ধদেব বসুর 'প্রেম ও প্রাণ', অথবা ফররুখ আহমদের 'ময়নামতীর মাঠে' ; কিন্তু এরূপ সনেটগুচ্ছের অন্তর্গত সনেটগুলি বিচ্ছিন্নভাবেও সম্পূর্ণাঙ্গ ও সুখপাঠ্য হইলেই রচনা হিসাবে হয় সার্থকতার অধিকারী।[৮]

www.pathagar.com

এর সঙ্গে এটুকু যোগ করতে চাই : একটি সনেট চৌদ্দ পঙক্তিতেই সম্পূর্ণাঙ্গ বটে, কিন্তু সনেট-সিকোয়েন্স বা সনেট-পরম্পরা রচনার প্রয়োজন তখনই হয়, যখন চৌদ্দ পঙক্তিতে কবির বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না—আরো এক বা অনেক সনেটে চারিয়ে যায়। কাজেই সনেট-সিকোয়েন্স দুই বা অনেকগুলি সনেট-সিকোয়েন্স মিলিয়েই সম্পূর্ণাঙ্গ হয় : এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র সনেটকে সম্পূর্ণতা দিতে হয় আবার সব-মিলিয়ে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা রচনা করতে হয়। জীবনানন্দের "রূপসী বাংলা" বা ফররুখ আহমদের "দিলরুবা" দেশপ্রেম বা ব্যক্তিপ্রেমের ভাবপ্রবাহকেই একটি অখণ্ড মণ্ডলাকারে রচনা করেছে। এই দুই কবিতাগ্রন্থেরই এক-একটি স্বতন্ত্র সনেট আত্মসম্পূর্ণ, আর সব-সনেটগুলি সম্মিলিত হ'য়েই এদের পূর্ণতা। আমার মনে হয় : সনেট-সিকোয়েন্সের কবিকে এই স্বাতন্ত্রিকতা ও সম্মিলিত সম্পূর্ণতাকে একই সঙ্গে চরিতার্থ করতে হয়। আমার মনে হয় : জীবনানন্দ দাশ ও ফররুখ আহমদ ঐ দুই গ্রন্থে তা শিল্পসফলভাবেই সম্পন্ন করেছেন।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে ফররুখের সমসাময়িক কবিদের কথা। এঁদের মধ্যে ব্যক্তিবাদী কবি যাঁরা, যেমন অরুণকুমার সরকার (১৯২১) বা নরেশ গুহ, এঁরা স্বভাবতই অনেক প্রেমের কবিতা লিখেছেন, সমাজবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০) বা সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) প্রেমের কবিতা লেখেনইনি বলতে গেলে।[৯] দুটি উল্লেখযোগ্য প্রেমের কবিতাসংগ্রহের কথা এখানে আসতে পারে—যেখানে ফররুখের সমসাময়িক কবিদের প্রেমের কবিতা সংকলিত হয়েছে। আবু সয়ীদ আইয়ুব-সম্পাদিত "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা" (বৈশাখ ১৩৬৩, সিগনেট প্রেস, কলকাতা) সংগ্রহে ফররুখের সমসাময়িক যাঁদের প্রেমের কবিতা গৃহীত হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮), অশোকবিজয় রাহা (১৯১৯), বাণী রায় (১৯১৯), মণীন্দ্র রায় (১৯১৯), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০), অরুণকুমার সরকার (১৯২১), মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২১), শুদ্ধসত্ত্ব বসু (১৯২১), আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৯২২), নরেশ গুহ (১৯২৪), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪), রাম বসু (১৯২৪), জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯২৪), বটকৃষ্ণ দাস (১৯২৫), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) প্রমুখ। আবদুর রশীদ খান ও মোহাম্মদ মামুন-সম্পাদিত "প্রেমের কবিতা" (অগস্ট ১৯৫৯, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা) সংকলনে ফররুখ আহমদ ও তাঁর সমসাময়িক কবিরা হচ্ছেন : ইমাউল হক (১৯১৩), আজিজুর রহমান (১৯১৩), মতিউল ইসলাম (১৯১৪), রওশন ইজদানী (১৯১৬), আহসান হাবীব (১৯১৭), ফররুখ আহমদ (১৯১৮), তালিম হোসেন (১৯১৮), আবদুল হাই মাশরেকী (১৯১৯), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০), হাবীবুর রহমান (১৯২১), আবুল হোসেন (১৯২২), চৌধুরী ওসমান (১৯২২), সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪), সানাউল হক (১৯২৪), আতাউর রহমান (১৯২৪), আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৬) প্রমুখ।[১০] ফররুখের সমসাময়িক এইসব কবি প্রেমের কবিতা রচনা করলেও ফররুখের ধরনে একক সনেট-সিকোয়েন্সের প্রেমের কবিতাগ্রন্থ লেখেননি কেউ।

আবার, ফররুখ নিজেও "দিলরুবা"-র মতো কোনো সম্পূর্ণাঙ্গ প্রেমের কবিতাগ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু এই আদর্শবাদী কবি, যিনি মুসলিম তাহজীব ও তমদ্দুনের কথা অপরূপ শিল্পদক্ষতায় প্রকাশ করেছেন, তিনি নারী-পুরুষের এই পারস্পরিক প্রেমের

www.pathagar.com

চিরন্তন সত্যের প্রতি বিমুখ থাকেননি। আরো কোনো-কোনো মাত্রার মতো এখানেও সুভাষ-সুকান্ত থেকে জীবনের আরো বৃহত্তর আয়তনে তিনি প্রবেশ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে ফররুখ কিছু-কিছু প্রেমের কবিতা লিখেছেন ; নারীরূপের বর্ণনা দিয়েছেন ; নারীপুরুষের প্রেমের গান রচনা করেছেন ; 'আনারকলি' ('পাকিস্তানী খবর', ৯ এপ্রিল ১৯৬৬) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য রচনা করেছেন ; 'শিরী ফরহাদ' নামে একটি কাব্যনাট্য লেখাও শুরু করেছিলেন—অসম্পূর্ণ থেকে যায়। "সাত সাগরের মাঝি"র 'শাহরিয়ার' ও 'ঝরোকায়' কবিতাদ্বয়ে হয়তো একটু অন্তরাল রচনা ক'রে প্রেমেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে। প্রথম কবিতার অপরূপ একটি চিত্রকল্প থেকে প্রেমের সন্দীপন : 'চাঁদির তখতে চাঁদ ডুবে যায়/পাহাড় পেতেছে জানু,/নতুন আকাশে জীবনের সুর/জাগাও হাসিন বানু' কিংবা বিচ্ছেদের এই আশ্চর্য সুশান্তি : 'বসে আছি অন্ধকারে নিশীথ-প্রচ্ছায়,/পাপড়ি যায় না দেখা, আজ শ্রান্ত ধমনীর আগ্নেয়-উৎসব। /শুধু একা করি অনুভব/তোমার হারানো গন্ধ সুরভি-প্রশ্বাস,/মনের অলিন্দে শুধু দেখা দেয় তন্দ্রাতুর তোমার আকাশ।' আরব্যোপন্যাসের কাহিনীর আড়ালে এখানে ব্যক্তিগত প্রেমের আনন্দ-বেদনা উদ্বেলিত। ("দিলরুবা" কাব্যে ঐ আড়াল ঘুচে গেছে। ঐ কাব্যের উৎসর্গপত্র কবি নিজেই বর্জন করেছেন—কিন্তু ঐ কর্তিত উৎসর্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগতের-ঊর্ধ্বের ফররুখী জগৎটির ইশারা কিছু ঝলক দিয়েই যায়।) স্মরণীয় : ১৯৫০-এর দিকে ("দিলরুবা"-র কবিতাগুচ্ছও মোটামুটি এই সময়কালেই লেখা) ফররুখ দীওয়ান-ই-হাফিজ অবলম্বনে চারটি সনেট লিখেছিলেন। তা থেকে কেবল একটি সনেট উদ্ধৃত করছি, "দিলরুবা"-র সঙ্গে পাঠক লক্ষ্য করবেন—এর সম্বন্ধ অনতিদূর :

'দী ও য়া ন- ই- হা ফি জ' অ ব ল ম্ব নে
[হাফিজ]

সেই বন্য হরিণীকে বোলো তুমি ভোরের বাতাস
কতকাল আমাকে সে ফেরাবে মরুর কিনারায়?
যে মধু বেসাতি করে মন তার কেন গো কষায়—
এ মধুলোভীকে কেন দেয় না সে মধুর আশ্বাস?
সুধায়ো তন্বীকে যার সুগঠিত গোলাবী লেবাস্
রূপের গরবে কেন বুলবুলের দিকে না তাকায়?
গুণের ঐশ্বর্য জানি সে প্রাজ্ঞ শিকার খুঁজে পায়।
পারে না ধরিতে যারে প্রজ্ঞা কেন্দ্রে যার অধিবাস।

প্রেমের সুরভি হায় কেন জানি থাকে না তাদের
সুঠাম, সরল তবু সুর্মা কালো যাহাদের আঁখি
তোমার সৌন্দর্যে শুধু এ অভাব (জেনে রাখো সাকী)
করুণার তিল নাই কোন প্রান্তে তব আননের
যখন বন্ধুর কণ্ঠে দেবে মালা আনন্দলোকের
ভুলিও না তাকে তুমি যে পেয়েছো ঝড় ও বৈশাখী।[১১]

"মুহূর্তের কবিতা"র (পরিমার্জিত সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৮, বর্ণমিছিল, ঢাকা) 'ফাল্গুনে', 'সন্ধ্যাতারা', 'রূপমুগ্ধ', 'লোকসাহিত্যের নায়িকা', 'তোমাকে জাগাবো', 'তুমি

www.pathagar.com

জাগলে না' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের অনুভূতি-অভিজ্ঞতা স্পষ্ট। এর একটিমাত্র কবিতা—সনেটও বটে—উদ্ধৃত করছি :

স ন্ধ্যা তা রা

আমার গোধূলি-স্বপ্নে আছো তুমি অযুত বৎসর,
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা জেগে আছো নিভৃতে একাকী।
যখন রাত্রির তীরে ফিরে যায় নীড়ে শ্রান্ত পাখী
তখন তোমাকে দেখে ঘন বন, সমুদ্র প্রান্তর।
আশ্চর্য বিভায় দীপ্ত কে জেনেছে তোমার খবর
অচেনা রহস্যময়ী ; তবু আমি স্বপ্নছবি আঁকি
মেঘের নেকাব এসে ঢেকে ফেলে সমুজ্জ্বল আঁখি
(রহস্যের অন্তরালে জাগো একা নিঃসঙ্গ বাসর)।
রাঙ্গা দুল্‌হিন তুমি ছুঁয়ে আছো আকাশ কিনার
উজ্জ্বল পরীর মত (বেশর হয় না প্রয়োজন),
অথবা আতশী রূপে পেয়েছো যে সৌন্দর্যসম্ভার
অম্লান, অক্ষয় হ'য়ে ঘিরেছে যা মানুষের মন ;
হাজার শতাব্দী যাবে পথ চেয়ে এভাবে তোমার
একান্তে প্রতীক্ষমাণা (বক্ষে নিয়ে বহ্নি অসহন)॥[১২]

বিবাহিত প্রেম, শরীরী প্রেম, আধ্যাত্মিক প্রেম, মানবীয় প্রেম—এই চার ধারার প্রেমের কবিতাই ফররুখ লিখেছেন ;—কিন্তু ফররুখ মূলত মানবীয় প্রেম অর্থাৎ চিরন্তন নারী-পুরুষের প্রেমেরই কবি। ১৯৪২ সালে ফররুখ বিয়ে করেন তাঁর খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুন (লিলি)-কে। নিজের বিবাহ-উপলক্ষে তিনি 'উপহার' নামে একটি কবিতাও লেখেন 'সওগাত' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৪৯)। এই কবিতার কেবল প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করছি :

আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর,
রবে চিরদিন এ স্বয়ম্বরে সত্যের স্বাক্ষর,
রবে চিরদিন বিবাহ-লগ্ন
রইব প্রেমের মধুতে মগ্ন
হাতে হাত রেখে চলব আমরা অন্তরে অন্তর ;
আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাধব বাসর-ঘর॥

ঐ বছরই 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় (বসন্ত ১৩৪৯) স্ত্রীর ডাকনাম 'লিলি' শিরোনামে স্বরবৃত্তে-অক্ষরবৃত্তে-মেলানো যুগ্ম ছন্দে একটি কবিতা লেখেন।[১৩] ঠিক প্রত্যক্ষভাবে শরীরী প্রেমের কবিতা যাকে বলে তা কবি একটিও লেখেননি। তার মধ্যেও 'বন্দরে সন্ধ্যা' ("সাত সাগরের মাঝি") কবিতায় হয়তো পরোক্ষ কিংবা 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি' ("হে বন্য স্বপ্নেরা") কবিতায় হয়তো সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে শারীরিকতার কিছু ইঙ্গিত আছে। 'প্রেমপন্থী', 'অশ্রুবিন্দু' ("সিরাজাম মুনীরা") প্রভৃতি কবিতায় আধ্যাত্মিক প্রেমের চূড়া স্পর্শ করেছে—এ ধরনের কবিতাও যে কবি খুব বেশি লিখেছেন, তা নয়। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেমের কবিতা হিশেবে একটি কবিতা এখানে উৎকলন করা হ'লো :

www.pathagar.com

প্রে ম প ত্থী

প্রেমের জটিল পথে যাত্রা যার দীর্ঘদিন হ'তে
সমান হয়েছে তার দৃষ্টিমুখে বাধার প্রাকার,
ফরহাদের প্রেমশিখা আনিয়াছে প্রিয়াকে আলোতে ;
গোলাব ধরিতে বুকে প্রয়োজন ছিলো এ কাঁটার।
প্রয়োজন ছিলো এই বিচ্ছেদ-বেদনা বিরহের...
মৃত্যুর দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া পার হ'য়ে প্রাণের মঞ্জিলে
যে পথ চলিয়া গেছে, সহস্র আঘাত সে পথের
অগ্নিবর্ণ স্বপ্ন হ'য়ে জাগে লক্ষ বিরহী নিখিলে।

তৌহিদের পানপাত্র ওষ্ঠে তুলি যে করিবে পান,
নিষ্প্রেম জীবন তার রাঙাবে যে তৌহিদী সুরায়,
সহস্র আগ্নেয় শিলা—বিচ্ছেদ-অনলে বহ্নিমান
অগণ্য সঙ্কটে তারে ডাক দেবে প্রেমপরীক্ষায়।
মেটাতে পারেনি প্রজ্ঞা কোনদিন সে প্রাণ পিপাসা !
সৃষ্টির প্রথম কথা—শুধু প্রেম, শুধু ভালোবাসা॥

এইভাবে ফররুখ প্রেমের কেবল একটি-দুটি স্তরে নয়—বহু স্তরে পরিভ্রমণ করেছেন : আর এইসব সফর সবসময়ই হিরে-জহরত তুলে এনেছে। লায়লি-মজনু, শিরী-ফরহাদ—শাশ্বত প্রেমিক-প্রেমিকা বারবার ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়—নানা রূপকে-প্রতীকে। বাংলা কবিতায় অসাধারণ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে আধুনিক বাংলা কবিতায়ও যে-ধারা বলীয়ান ছিলো, ফররুখের এসব কবিতা তার বিপরীত আর-এক জগতের উন্মোচন ঘটিয়েছে। ফররুখ দ্বি-স্তর বা বহুস্তর কবিতাও রচনা করেছেন, প্রেমের প্রবেশ সেখানে অনেক সময় হিরের ছুরির মতো। যেমন, 'এই সংগ্রাম' কবিতায় 'আরক্ত দল দিন কোথা পলে পলে/ফুটে ওঠে ক্রমাগত.../হানা দেয় তার প্রতি পাপড়িতে শবভুক দলে দলে,/তবু বিকশিত প্রতি মুহূর্ত বিজয়ের পথে চলে,/পাহাড়তলীর আকাশ গন্ধে ভরে/প্রথম প্রেমের মত !' কিংবা শিরী-ফরহাদের এই প্রতীকী রূপায়ন 'ইশারা' কবিতায় 'তুমি এনেছো এ পাথরে পাহাড়ে শিরীনের সংবাদ ;/ভাঙে ফরহাদ কুঠারের মুখে প্রবল বাধার বাঁধ।'[১৪] এই রচনার প্রথম বাক্যে ফররুখকে বলেছি 'বহুমাত্রিক' কবি ;—বহুমাত্রিক কবির লক্ষণ জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন আয়তনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্তঃপ্রবেশ। ফররুখ-কাব্য থেকে এরকম একটিমাত্র উদাহরণ এখানে উপস্থিত করবো। 'মুজাদ্দিদ আলফেসানী' ("সিরাজাম মুনীরা") কবিতায় তিনি লিখেছেন 'সেলিমের শিরস্ত্রাণ ধুলায় হয়েছে একাকার/মুক্তপ্রাণ সাধকের সত্যের দুর্জয় স্রোতাবেগে !' এখানে সেলিমের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ আলফেসানীর বিজয় ঘোষিত হয়েছে ; কিন্তু 'আনারকলি' নাটকে (পূর্বে উল্লিখিত) সেই প্রেমিক সেলিমেরই জয়গান করা হয়েছে। না—প্রেমিকতাকে ফররুখ তাঁর আদর্শবিরোধী কোনো বিষয় ব'লে গণনা করেননি ; যদি করতেন, তাহ'লে তিনি অনেক প্রেমের কবিতা লিখতে পারতেন না, "দিলরুবা" নামে সম্পূর্ণ একটি প্রেমকাব্য লিখতে পারতেন না। নারীরূপের বর্ণনা দিতেও কি তিনি ইতস্তত করেছেন? করেননি ; যেমন :

www.pathagar.com

বলো কোন্ শাহাবাদে অপরূপ সওদাগরজাদী
গোলাবকুঁড়ির মত মেলেছে রূপের মুক্ত দল
নিখুঁত সুঠাম তনু, অতুলন মুখের আদল ;
অমা অন্ধকার যার কেশপাশে হয়েছে বিবাদী?

[হাতেম তা'য়ী, পৃ. ১৮]

তাঁর এই "হাতেম তা'য়ী" মহাকাব্যের নায়ক হাতেম তা'য়ী হ'লেও তার সমস্ত অভিযানই তো সম্পন্ন হয়েছে হুসনা বানুর প্রতি মুনীর শামীর প্রেমের তীব্রতার ফলে। আর তাঁর সমস্ত প্রেমের কবিতার চারিত্র, "দিলরুবা"-র চারিত্র ধরা পড়ে অসামান্য একটি লিরিকে :

বি দা য়

শুনেছিলাম স্বপ্নঘোরে তোমার নাম,
ছুঁয়েছিলাম কেশররাশি, অলকদাম,
হাজার রাতের কথায় তোমার জেগেছে ভয় ;
তোমায় হারাই চিত্ত আমার শংকাময়,
পুরানো চাঁদ দেখি দ্বারে চিরনূতন
চম্পা হ'য়ে ফোটে আমার বিস্মরণ,
প্রাচীন কথায় গাঁথা তোমার নতুন মালা
চির-নতুন পূর্ণিমা ওই চাঁদের থালা ;
তোমার প্রেমের জাফরানে আজ সব রঙিন
শাহেরজাদী ! বিদায়, দেখ জাগছে দিন।

[শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১৪৭]

যে-কবিতার নাম 'বিদায়' সেখানেও বিষাদ-কারুণ্য-হাহাকার নেই—সেখানেও কবিতার শেষে জাফরান-রঙা দিন জেগে ওঠে। এই তো ফররুখ আহমদের সমস্ত কবিতার কেন্দ্রীয় চারিত্র—তা সব বিষাদ, বেদনা, মর্বিডিটির উর্ধ্বে। পরিপূর্ণরূপে প্রিয়তমাকে না-জেনেও "দিলরুবা" কাব্য তাই শেষ হয় 'প্রেমের প্রোজ্জ্বল স্মৃতিডোরে'। 'বিদায়' কবিতায় যে-লিরিক গীতলতা "দিলরুবা" কাব্যে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনানন্দ-কথিত 'চিন্তার আভার ব্যবহার' : স্বরবৃত্ত আর অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পার্থক্যের জন্যেও ঘটেছে, সনেটের স্বধর্মের জন্যেও তা ঘটেছে। ফলে সনেটবন্ধের ছাঁচে ফুটে উঠেছে অনেক মহার্ঘ হীরা-জওহর :

১. যে স্বপ্ন ভাঙিয়া পড়ে সেই স্বপ্ন গ'ড়ে তুলি আমি। (১ : ২)
২. কালবৈশাখীর দেশে চলো তবে নিশ্চিত নির্ভয়ে। (১ : ৫)
৩. প্রেম তবু বেঁচে আছে, বেঁচে থাকে প্রেম যুগে যুগে। (২ : ৭)
৪. স্বেচ্ছাবন্দী আমি তব স্বৈরাচারী প্রেমের নিকটে। (৩ : ৬)
৫. তোমাকে বাসিয়া ভালো পৃথিবীকে ভালোবাসিয়াছি। (৩ : ৭)
৬. শিরির ঝরোকা খুঁজে অধীর ফরহাদ ভ্রাম্যমাণ। (৪ : ১)
৭. আশ্চর্য নিয়তি এই—পতঙ্গের ললাট লেখন। (৪ : ১)
৮. বহ্নিশিখা নও শুধু, সত্তা তব অশ্রুতে বিলীন
এক চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি ; অন্য চোখে সুতীব্র অশনি। (৪ : ৪)
৯. দুর্বোধ্য অজানা তুমি চিরদিন, হায় অজানিতা ! (৪ : ৪)
১০. সে পিপাসা অন্তহীন মুছিবে না নিভৃত নিচোলে। (৬ : ৪)

www.pathagar.com

১১. তোমার পথের 'পরে আমার হৃদয় রাখিলাম। (৬ : ৫)
১২. আমার প্রেমের স্পর্শে প্রেম তব হবে মহীয়ান। (৭ : ৬)

ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'রাত্রি' ('বুলবুল', শ্রাবণ ১৩৪৪) বা 'পাপ-জন্ম' ('মাসিক মোহাম্মদী', শ্রাবণ ১৩৪৪) ছিলো যেমন সনেট, তেমনি তাঁর সর্বশেষ কবিতা '১৯৭৪'-ও একটি সনেট। সনেট-মাধ্যমটিই ফররুখের প্রিয়তম প্রকরণ। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের সবগুলি উৎসর্গই এক-একটি সনেট। ফররুখের জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর ছয়টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একটি গ্রন্থ, "মুহূর্তের কবিতা" (১৯৬৩), সম্পূর্ণতই সনেট-গ্রন্থ—সনেট-সিকোয়েন্সের গ্রন্থ নয় অবশ্য। এতে স্থান পেয়েছিলো একশো সনেট। প্রকাশিত কোনো গ্রন্থ কবি এতোটা পরিশোধন-পরিবর্জন করেননি। "মুহূর্তের কবিতা"-র পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। কিন্তু, এখন, এতদিনে আবিষ্কৃত হ'লো "মুহূর্তের কবিতা"রও একটি অগ্রসূরী সনেট-কাব্য প্রণয়ন করেছিলেন কবি—সে এই "দিলরুবা"। এই দুই কাব্যের গভীরতর অপ্রাকরণিক সাযুজ্য এখানে যে এই দুই কাব্যই দেশজ : "মুহূর্তের কবিতা" মূলত দেশপ্রেমের কাব্যগ্রন্থ ব'লেই দেশজতা ও লোকজীবন সেখানে গভীরপ্রোথিত ; কিন্তু ব্যক্তি-ও-ব্যক্তি-উর্ধ্ব প্রেমের কবিতা হ'লেও "দিলরুবা"য় বৈদেশি আবহ নেই : সমুদ্রচারিতা নেই, মরুচারিতা নেই, মধ্যপ্রাচ্যের সুরভি নেই। ফলত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারও নেই। "সাত সাগরের মাঝি", "সিরাজাম মুনীরা", "হাতেম তা'য়ী" প্রভৃতি কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের যে-অকৃপণ ব্যবহার তা থেকে "মুহূর্তের কবিতা" যেমন আশ্চর্যভাবে মুক্ত, তেমনি মুক্ত "দিলরুবা"-ও। শেষ-পর্যন্ত মানবিকতাই যে সমগ্র ফররুখ-কাব্যের মূলসূত্র এই গ্রন্থে তা আরেকবার প্রমাণিত হয়—প্রেমিকা নারীর উদ্দেশে তাঁর এই স্যন্দমান বন্দনায়। 'প্রেম-পন্থী' কবিতায় যে-অর্থেই তিনি ব'লে থাকুন, "দিলরুবা" কাব্যের ক্ষেত্রে তা অন্য অর্থে সত্য, সমগ্র ফররুখ-কাব্যের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। 'সৃষ্টির প্রথম কথা—শুধু প্রেম, শুধু, ভালোবাসা।' 'The eternal womanly draws us above'—মহাকবি গ্যেটে-র এই অমর বাণী "দিলরুবা" কাব্যের সনেটে-সনেটে অবিশ্রাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে॥

---

১ "সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে' (রচনাকাল : ১৯৮১)। "ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য" : আবদুল মান্নান সৈয়দ। জুন ১৯৯৩। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৫৬।

২ "দিলরুবা" (১৯৯৩) নামে কবি আবদুল কাদিরের (১৯০৬-৮৪) প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিলো তিরিশের দশকে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এই কাব্যগ্রন্থের একটি আলোচনাও লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য, কবি আবদুল কাদিরের "দিলরুবা" কাব্যের সঙ্গে ফররুখের "দিলরুবা" কাব্যের কিছুমাত্র সাযুজ্য নেই। তবে তিরিশের ও চল্লিশের দশকের এই দুজন কবিই ধ্রুপদ-স্বভাবী, এবং সনেট রচনায় দুজনই সমান কুশলী।

৩ "দিলরুবা"-সম্পাদক কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আশরাফ (জন্ম ১৯২৪) এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন দুটি উল্লেখযোগ্য তথ্য : এক, ফররুখ আহমদের "দিলরুবা" কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি সম্পূর্ণভাবেই পেয়েছিলেন। পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশে মাঝে-মাঝে বিরতি পড়লেও সেটা কবির কারণে নয়—ভিন্ন কোনো কারণে বিরতি পড়েছিলো—সম্ভবত ছোটো পত্রিকার স্থান সংকুলানের অভাববশত) ; দুই, 'দিলরুবা' পত্রিকার মালিক ছিলেন এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের, দিলরুবা ঐরই পরলোকগতা প্রিয়তমা স্ত্রীর নাম, স্ত্রীর নামেই তিনি পত্রিকাটি বের করেছিলেন (দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৭য় 'স্মরণে' শিরোনামে ইনি স্ত্রীর উদ্দেশে একটি

www.pathagar.com

এলেজি রচনা করেন, এই সংখ্যায় তাঁর স্ত্রী দিলরুবার ফোটোও ছাপা হয়, মৃত্যুসাল লেখা আছে ১৩৫৩, 'দিলরুবা' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালের বৈশাখ মাসে। বলা বাহুল্য, ফররুখ-কাব্যের দিলরুবা তাঁরই মনোজগতের রচনা।)

৪ এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের-সম্পাদিত ইংরেজি 'Dilruba' পত্রিকার Vol. 11 No. 1 1st Quarter ১৯৫৩ চিহ্নিত সংখ্যায় বেগম নুরুন নাহার ইংরেজিতে তরজমা করেন ফররুখ আহমদের "দিলরুবা" কাব্যের প্রথম স্তবক (১-৫)।

৫ এই রচনায় "দিলরুবা" পত্রিকা বোঝাতে সবসময় একক ঊর্ধ্বকমা, ফররুখ আহমদের "দিলরুবা" কাব্য বোঝাতে সবসময় যুগ্ম ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করেছি।

৬ "দিলরুবা" কাব্যের প্রথম পাণ্ডুলিপির উৎসর্গপত্রে লেখা ছিলো : 'অজান্তিকার প্রতি'।

৭ 'সুদূরিকা' নামে বুদ্ধদেব বসু প্রথম যৌবনে একটি কবিতাও লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : নজরুলের 'অ-নামিকা' কবিতার প্রভাব বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় স্পষ্ট।

৮ ভূমিকা, "বাঙলা সনেট" : আবদুল কাদির-সম্পাদিত। আগস্ট ১৯৭৪। মুক্তধারা, ঢাকা। পৃ. ৫।

৯ আবু সয়ীদ আইয়ুব অবশ্য তাঁর সম্পাদিত "পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা" (দ্বি মুদ্রণ, মাঘ ১৩৬৬, সিগনেট প্রেস, কলকাতা) সংগ্রহে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মিছিলের মুখ' ও 'বধূ' এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ব্যর্থতা' কবিতা সংকলন করেছেন। কিন্তু এ অনেকটা রেওয়াজ রক্ষা, কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রকৃতার্থে এগুলি প্রেমের কবিতা নয়।

১০ আবদুর রশীদ খান ও মোহাম্মদ মামুন-সম্পাদিত "প্রেমের কবিতা" (১৯৫৯) সংকলনে যাঁদের সর্বাধিক কবিতা গ্রহণ করা হয়েছে, ফররুখ তাঁদের একজন। ফররুখের এই কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে : 'নাম', 'শাহরিয়ার', 'দিলরুবা' ও 'গজল'। "প্রেমের কবিতা" সংকলনে বর্তমান "দিলরুবা" গ্রন্থের প্রথম স্তবকের ২, ৩, ৪ ও ৫ এই চারটি সনেট 'দিলরুবা' নামে সংকলিত।

১১ "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" : আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত। অক্টোবর ১৯৭৮। বর্ণমিছিল, ঢাকা। পৃ. ৮০।

১৩ 'উপহার' ও 'লিলি' দুটি কবিতার জন্য দ্রষ্টব্য : "ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য"। পৃ. ৫-৭।

১৪ 'এই সংগ্রাম' ও 'ইশারা' দুটি কবিতাই "সিরাজাম মুনীরা" গ্রন্থভুক্ত।

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য॥ ফররুখ আহমদ॥ বাসাপ প্র-২৮॥ প্রকাশক : আবদুল মান্নান তালিব॥ পরিচালক : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭॥ প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৯৮/অক্টোবর ১৯৯১॥ প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : হামিদুল ইসলাম॥ কম্পিউটার কম্পোজ : এ্যাড প্রিন্ট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন : ৮৩১৬৮৪॥ মুদ্রক : মিনার্ভা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস লিঃ, ঢাকা॥ দাম : ৪০ টাকা॥

Oytihashik Onytihashik Kabbo॥ A collection of Poems by Farrookh Ahmad. Published by Abdul Mannan Talib. Director Bangla Shahitta Parishad, 171 Bara Maghbazar, Dhaka-1217 Published on October 1991 Price : 40.00

এই বইএর ভূমিকা লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। ভূমিকাটি এই।—

সৃষ্টিশীলতার অফুরান উৎসাহে উন্মত্ততায় উৎসবেই অনেক সময় প্রকৃত কবি-শিল্পীকে চিহ্নিত করা যায়। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান চারজন পুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ও জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) ভিতরে এই অনিঃশেষ সৃষ্টিশীলতার উৎসারণ দেখতে পাই। কবি ফররুখ আহমদের (১৯১৮-৭৪) মাত্র ছাপ্পান্ন বছরের স্বল্প আয়ুষ্কালও অবিশ্রাম সৃজ্যমানতায় ভাস্বর। প্রকৃত শিল্পীর মধ্যে পরিতৃপ্তি থাকে না ; এই

www.pathagar.com

অপরিতৃপ্তিই তাকে ক'রে তোলে ক্লান্তিহীন। ফররুখ আহমদ অক্লান্ত শুধু কবিতা রচনায় নয়—কবিতার অবিরল পরিবর্জন-পরিবর্ধন-পরিশোধনেও শ্রান্তিহীন। একজন কবি কেবল সৃষ্টিশীল নন—তিনি নির্মাণশীলও বটে। আমাদের কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদ এই সৃষ্টি ও নির্মাণের অবিরল যন্ত্রণায়-আনন্দে জীবনভোর আন্দোলিত হয়েছেন। আবার তাঁর কবিতার জগৎ যেমন সৃজনশীলতায় উর্বর, তেম্নি আয়তনেও বিশাল বটে। কবিতার আধার ও আধেয়কে তিনি সমান মূল্য দিতেন। তাই তাঁর কবিতায় যেমন তিনি এক রূপকল্প থেকে আরেক রূপকল্পে নিরন্তর সফর ক'রে ফিরেছেন, তেম্নি বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এই স্বপ্নকল্পনার ফেরিঅলা একান্ত বাস্তবেরও রূপদানকারী। আবার এসবই সম্ভব হয়েছে তাঁর অবিচ্ছেদী চারিত্রের আসঞ্জনে—সমস্ত মিলিত হয়েছে একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে। তাঁর রোমান্টিকতা ও আদর্শবাদিতা ও বাস্তববাদিতা কোনো পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাপার নয় ; —অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বও এখানে একই সমতলে দাঁড়িয়ে। প্রথম জীবনে রোমান্টিক, উত্তরকালে আদর্শবাদী—ফররুখ আহমদে এরকম কোনো ব্যাপার আমরা দেখি না : ফররুখ আহমদের রোমান্টিকতা আর আদর্শবাদিতার উৎস একই : তাঁর ব্যক্তিত্বে। সেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। তাঁর এরকমই একটি প্রকাশরূপ তাঁর ব্যঙ্গকবিতা।

তিরিশের দশকের উপান্তে কবিতা লেখা শুরু করেন ফররুখ আহমদ। চল্লিশের দশকেই তাঁর কবিব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকশিত হয়। তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"র (১৯৪৪) কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪৩-৪৪। এই ১৯৪৩-৪৪ সালেই তিনি তাঁর কেন্দ্র খুঁজে পান। "সাত সাগরের মাঝি"র কবিতাগুচ্ছ রোমান্টিকতার চূড়াস্পর্শী ; যেন সেই পাহাড়ের পাদদেশ থেকেই একটি বিচিত্র ঝরনা উৎসারিত হয়—তাঁর ব্যঙ্গকবিতা। মধ্য-চল্লিশ থেকেই শুরু হয় ফররুখের ব্যঙ্গকবিতার প্রস্রবণ—যা শেষ-পর্যন্ত প্রত্যক্ষে-তির্যকে অব্যাহত ছিলো। ফররুখের মধ্যে কেবল রোমান্টিকতা-আদর্শিকতা ছিলো না, ছিলো ব্যক্তিমানুষটির মধ্যে 'অন্তরঙ্গ মউজী চরিত্রে'র ব্যাপারও। তিনি পূর্বজ আধুনিক বাংলা কবিতার ঘনিষ্ঠ পাঠক তো ছিলেনই—'শনিবারের চিঠি' ও 'রবিবারের লাঠি'র মতো রঙ্গব্যঙ্গাত্মক পত্রিকারও নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ছিলেন সুকুমার রায়ে (১৮৮৭-১৯২৩) মুগ্ধ। আর শুধু পাঠকই ছিলেন না, নিজেও রঙ্গব্যঙ্গ কবিতা লিখে আনন্দ পেতেন ও দিতেন। তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৬) ও আবুল হোসেনও (জন্ম ১৯২২) প্রচুর হাল্কা কবিতা ও ব্যঙ্গকবিতা লিখেছেন। তবে মনে হয় এক্ষেত্রে তাঁর সহজীবী আরেকজন কবিবন্ধু সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৯-৭৫) সঙ্গেই তাঁর সাযুজ্য ছিলো বেশি : রঙ্গব্যঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত সরস স্বভাবী সাবলীলতায়। তবে ব্যঙ্গকবিতা রচনার অজস্রতায় তিনি সমকালীন সকলকেই অতিক্রম করেছিলেন।

দেশবিভাগের পর, ক্রমশ, তাঁর ব্যঙ্গকবিতা রচনা দৃঢ়মূল ও অজস্রধার হ'য়ে ওঠে। দেশবিভাগের আগে তাঁর ব্যঙ্গকবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিলো ধনতন্ত্রের উৎসাদন এবং দেশবিভাগের পর সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়। অজস্র ছদ্মনামে তিনি ব্যঙ্গকবিতা লিখতেন : হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী, ইয়ারবাজ খান, মুনশী তেলেসমাত, কোরবান বয়াতী, গদাই পেটা হাজারী, আবদুল্লা বয়াতী, জাহেদ আলী ঘরামী, মানিক পীর, শাহ বেয়াড়া বাউল, ঘুঘুবাজ খান, সরফরাজ খান, শেখ কোরবানউদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুল

www.pathagar.com

জলিল, আহমদ আবদুল্লা, মাহবুব আবদুল্লাহ প্রভৃতি। এই ছদ্মনামগুলির মধ্যে খ্যাততম হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী।

অসংখ্য বিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গকবিতা ব্যতিরেকেও ফররুখ আহমদ অন্ততপক্ষে আটটি ব্যঙ্গকবিতা-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এর একটিমাত্র, "ধোলাই কাব্য" (সম্পাদক : ফারুক মাহমুদ) তাঁর ও কবি ফারুক মাহমুদের (জন্ম ১৯৩৪) কবিতা সংবলিত হ'য়ে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৬৩ সালে। "ধোলাই কাব্যে"র 'পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, অতীব পরিষ্কার' দ্বিতীয় সংস্করণ তথা 'সহীহ বড় সংস্করণে'র জন্যে একটি ব্যঙ্গাক্ত ক্ষুদ্র ভূমিকাও ফররুখ লিখে রেখে গিয়েছিলেন। এই ভূমিকা ও কবি ফারুক মাহমুদের ভূমিকা যুক্ত হ'য়ে ঐ বইএর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুলাই ১৯৮৬ সালে। 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' স্বাক্ষরিত তাঁর কোনো অনির্দেশিত ব্যঙ্গকবিতা-গ্রন্থের জন্যে আরেকটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্যভূমিকাও তিনি লিখেছিলেন। এই মুখবন্ধের 'পুনশ্চ'-অংশটি "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য" পাঠকের জন্যে সুপ্রাসঙ্গিকই হবে :

> আমার বই পড়ে যদি কারুর মনে রচনার সত্যাসত্য, মৌলিকত্ব অথবা অন্য কোনোরকম খটকা জাগে তাহলে অকারণে আমাকে প্রশ্ন ক'রে উত্যক্ত করবেন না। প্রশ্ন করলেও আমি উত্তর দেব না। কারণ একটি সওয়ালের জওয়াব দিলেই হাজার সওয়াল উঠবে। ব্যাহত জনমত ও গণতন্ত্রকে বাচনিক শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হলেও উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমি মনে করি। এ শিক্ষা আমি পেয়েছি ধুরন্ধর মুর্শিদানের কাছে যাঁরা ইসলামের নাম নিয়ে নির্বিকার চিত্তে ইসলামের বরখেলাপ করে থাকেন। মসজিদে, জনসেবার ময়দানে অথবা রাজনীতির আখড়ায় ইয়াজুজ মাজুজের বংশাবলীর মত এঁদের ক্রমবর্ধমান শাগরিদ সংখ্যা দেখে আমি নিজেও তরক্কীর আশায় সজাগ হ'য়ে পড়েছি।
>
> তবে যাঁরা আমার তারিফ করতে চান। (আমীরানা জবানে যাকে মোসাহেবী বলা হয়) তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে আমার কাছে চিঠি লিখতে পারেন। শুধু মেহেরবানী করে বেয়ারিং চিঠি পাঠাবেন না।

"ধোলাই কাব্য" বাদে ফররুখ আহমদের প্রস্তুত সাতটি ব্যঙ্গকবিতা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এই : ১. "তসবিরনামা", ২. "টুকরো কবিতা", ৩. "নসিহতনামা", ৪. "অনুস্বার", ৫. "রসরঙ্গ", ৬. "মজার ছড়া" (শিশুকিশোরতোষ), ৭. "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য"। এর মধ্যে "তসবিরনামা" ১৯৮৬ সালে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। এখন প্রকাশিত হচ্ছে "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য"।

"ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য" (অথ মীর-জাফর সংবাদ) প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজ' পত্রিকার আজাদী-সংখ্যায় (১৪ আগস্ট ১৯৫৭)। সেখানে ঐ দীর্ঘকবিতার দু'টি অংশ ছিলো : 'মীর-জাফরের কৈফিয়ত' ও 'মীর-জাফরের শিকায়েত' নামে। রচনাকাল লেখা ছিলো : ২৫শে জুন ১৯৫৭। কবিতাটি পরে কবি আরো পরিশোধন-পরিবর্ধন করেন। সেই পরিশোধিত-পরিবর্ধিত লেখনই এখন গ্রন্থধৃত হ'লো। স্মরণীয় : ঐ ১৯৫৭ সালেই ফররুখের ব্যঙ্গকবিতা নিয়ে সরকারি উপর-মহলে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়। এমনকি এজন্যে কবিকে গা ঢাকা দিয়েও থাকতে হয়েছিলো কয়েকদিন—নিজের বাসা ছেড়ে কমলাপুরে মামার বাসস্থলে ছিলেন সে-সময়। তাঁর ব্যঙ্গকবিতা যে প্রতিপক্ষকে আমূল বিদ্ধ করতো, এই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

দেশবিভাগের পর অচিরেই ফররুখ আহমদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিলো। আদর্শবাদী কবি বাস্তব পৃথিবীতে তাঁর স্বপ্নের রূপায়ন দেখতে পাননি। সমকালীন সমান অভিজ্ঞতার অংশভাক কবি তালিম হোসেন (জন্ম ১৯১৮) লিখছেন : 'পাকিস্তানকে ঘিরে যে স্বপ্নকল্পনা নিয়ে এসেছিলোাম, ঢাকার জীবনে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে অতি স্বল্প সময়েই তার মধ্যে আমরা উভয়েই কেবলি আশাভঙ্গের উপাদান দেখতে লাগলাম। পাকিস্তানের ছিলো দুটো দিক। একদিকে যারা তার বাস্তবের আরাধনা করেছিলো—তাদের ভাগ্যোন্নয়নের সোনার কাঠি সহজে হস্তগত করার লক্ষ্যে, আর অন্যদিকে ইতিহাসসম্পৃক্ত অথচ বহুকাল নাগালের বাইরে থাকা একটা দুরূহ অথচ মহীয়ান আদর্শবাদের রূপায়ন-স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছিলো আমাদের মনে এবং তারই প্রেরণার উদ্দামতায় টালমাটাল হয়েছিলো আমাদের স্বপ্নলোক। তাই নতুন তথাকথিত আদর্শ রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায় থেকেই আমাদের বিক্ষুব্ধ হৃদয় কিভাবে কাজ করেছিলো, অল্পদিনের ব্যবধানে পরস্পরকে নিবেদিত আমাদের দুটি কবিতায় তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।' ('ফররুখ আহমদ ও আমি', দৈনিক 'ইনকিলাব', ৩০ আশ্বিন ১৩৯৩) এখানে উল্লেখিত ফররুখের 'আহ্বান কবির প্রতি' সনেটটি বেরিয়েছিলো ১৯৫২ সালে, দৈনিক 'মিল্লাতে'। এই সনেটটির প্রথম চতুষ্কটি উদ্ধৃত না-ক'রে পারছি না :

আত্মবঞ্চনার মাঠে অনুকারী দাসের জীবনে
সত্যের দিশারী কবি—তোমার একান্ত প্রয়োজন।
আমরা পাইনি মুক্তি, শুনি নাই ঝড়ের স্পন্দন
গোলামী জিঞ্জিরে তাই শোকোচ্ছ্বাস ওঠে প্রতি ক্ষণে।

'গোলামী জিঞ্জিরে তাই শোকোচ্ছ্বাস ওঠে প্রতি ক্ষণে!' একি ফররুখ আহমদের কণ্ঠ! যে-ফররুখ এই নবীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে একদিন ঢেউয়ের মতো উত্তাল-উদ্দাম হ'য়ে উঠেছিলেন! যাঁর একটি গ্রন্থের নামই "আজাদ করো পাকিস্তান" (১৯৪৬) ! কিন্তু এই-ই হয়। কবির স্বপ্ন আর বাস্তবতা কখনো এক রেখায় মেলে না।

ব্যঙ্গ সৃষ্টি হয় গোপন রোষ থেকে। অসংখ্য ব্যঙ্গকবিতার মধ্য দিয়ে রুষ্ট ফররুখ আহমদ সমকালীন দেশ-কালকে স্পর্শ করেছেন। তবে "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য" ঠিক ব্যঙ্গাত্মক কাব্যগ্রন্থ নয়। একটু লঘু ভঙ্গিতে লেখা এই দীর্ঘ কাব্য শেষপর্যন্ত বক্তব্যে সিরিয়াস—যদিও হালকা টোন শেষ-পর্যন্তই বহাল রেখেছেন কবি। কমলাকান্তী ভঙ্গিতে শুরু ও শেষ—বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) "কমলাকান্তের দপ্তর" ছিলো তাঁর প্রিয় পাঠ্যের অন্তর্গত—এই গ্রন্থে কবিতা ও নাট্যের সমীভবন ঘটেছে। এ বই পুরোটাই আত্মসমালোচনা। যারা 'অপরূপ ধর্মের মুখোশে/সুযোগসুবিধামত মুনাফার মাঠ খায় চষে', কবি তাদের সেই মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। কবি দেখছেন : দেশ-কাল-সমাজ এক সার্বিক অবক্ষয়ে ধ্বস্ত। তাই 'উত্থানের পূর্বাহ্নে পতন' ঠেকাতে চেয়েছেন কবি। 'জামার আস্তিনে, বাহুডোরে' যারা পোকা পোষে, তাদের বিরুদ্ধে এই কলমী জেহাদ ঘোষণা করেছেন কবি। ('হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'নয়া জিন্দেগী' শীর্ষের—কার্তিক ১৩৫৯—একটি কাব্যনাট্যে যে-ভাবে কথোপকথনের ঢং

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়েছিলো, তার সঙ্গে মিল আছে "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্যে"র রূপকল্পের। তফাৎ এই : এখানে তিনি বর্ণনাত্মক—ফলে কাব্যনাট্যের ধরন ব্যবহার ক'রেও এ কাব্যনাট্য হ'লো না—১৮ মাত্রার মিলান্ত অক্ষরবৃত্তে পুরো বইটি লেখা।) পুরাণ বা ইতিহাস ফররুখ যখনই প্রয়োগ করেছেন, তখনই তার প্রাচীন আখ্যানের মধ্যে ব্যবহার করেছেন নতুন অন্তরাখ্যান। সিন্দাবাদ ও হাতেম তা'য়ী—তাঁর এই দুই নায়কের পাশাপাশি ইতিহাসের এক কুখ্যাত চরিত্র মীর জাফরকে তিনি এনেছেন এখানে। কবির সঙ্গে মীর জাফরের কথোপকথনের মধ্যে (বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর এখানে একটু নতুনরূপে চিহ্নিত) উন্মোচিত হয়েছে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক 'চরিত্র, চাতুর্য, চুক্তি, চক্রান্ত, বিচিত্র ব্যবহার !' যেন এই কাব্যের মুখ্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হ'লো আদর্শবাদী কবির হুঁশিয়ারি। এ গ্রন্থে ফররুখের আদর্শবাদিতারই আরেক দিক প্রকাশিত। স্বপ্নদ্রষ্টা কবির স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা। এ এক সাহিত্যিক শ্বেতপত্র—কালের কুঠার। এ গ্রন্থ আরেকবার প্রমাণ করলো : ফররুখ যতখানি ব্যক্তির কবি তার চেয়ে বেশি জাতির কবি। ব্যক্তিগত আবেগের চেয়ে জাতিগত আবেগই তাঁকে উন্মথিত রেখেছে চিরকাল। এই কাব্যে তাঁর সেই অব্যক্তিক আবেগের এক বহিঃপ্রকাশ—এক সম্প্রসার। ফলত 'অচ্ছেদ্য মিল্লাতে'র ভাবনা-বেদনাই ফররুখকে চিরকাল কবি করেছে।

এ গ্রন্থ রচনারও এক দশক আগে, ১৯৪৮-এ, ফররুখ লিখেছিলেন "রাজরাজড়া" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রহসন—হোবুচন্দ্র—গোবুচন্দ্র—সুয়োরানি-দুয়োরানিকে জড়িয়ে-মিশিয়ে। ফররুখ আহমদের প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত শুধু "মেঘনাদবধ কাব্য"-"বীরাঙ্গনা"র জনয়িতা নন—তিনিও লিখেছিলেন "একেই কি বলে সভ্যতা"-"বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"র মতো প্রহসন। ফররুখ আহমদও কেবল "সাত সাগরের মাঝি"-"সিরাজাম মুনীরা"-"হাতেম তা'য়ী"র কবি নন—"রাজরাজড়া"-"ঐতিহাসিক-অনৈতি-হাসিক কাব্যে"রও তিনি প্রণেতা। স্বপ্ন ও বাস্তব তাঁর বিশাল কাব্যজগতের দুই প্রান্ত। যে-হুঁশিয়ারি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তা আজো উচ্চার্য। "ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য" বিশেষভাবে কাললগ্ন। কিন্তু এর অন্তর্গত সত্য কালোত্তর। রচনার তিন দশক পরেও তার প্রকাশকে তাই স্বাগত জানাই।

তসবিরনামা

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৬॥ প্রকাশক : নয়া দুনিয়া পাবলিকেশনস, ৪৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১॥ প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ সরকার॥ মুদ্রক : দিনকাল মুদ্রায়ণ, ঢাকা॥ মূল্য : ২৩ টাকা॥ পৃষ্ঠা : ৫৬॥

ইকবালের নির্বাচিত কবিতা

ইসাকেরা প্রকাশনা ৭ ইফা প্রকাশনা ২৭৬॥ প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭, রজব ১৪০০, জুন ১৯৮০॥ প্রকাশক : মাসুদ আলী, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী॥ প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : আবদুর রউফ সরকার॥ মুদ্রক : মনোরম মুদ্রায়ণ, ২৪ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা॥ মূল্য ১০ টাকা॥

www.pathagar.com

IQBALER NIRBACHITA KOBITA ॥ The Selected Poems of Iqbal : Translated and compiled by Farrukh Ahmed. Published by Islamic Cultural Centre, Rajshahi. Price : TAKA TEN.

ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রাজশাহীর আবাসিক পরিচালক মাসুদ আলী 'প্রকাশকের কথা'য় বলেন :

বিশ্বসাহিত্যের বরেণ্য কবি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপকার মহৎ মানবতাবাদী আল্লামা ইকবালের কয়েকটি কবিতা নির্বাচন ও অনুবাদ করেছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ যিনি নিজে তাঁর জীবন ও কর্মে ইসলামকে অনুশীলন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন আন্তরিকভাবে—এ যেন এক প্রদীপের আলোকে অন্য এক প্রদীপ আলোকিত হবার মতো দুর্লভ ঘটনা।

আমরা কবি ফররুখ আহমদ-এর নির্বাচিত ইকবালের কবিতা প্রকাশ করতে পেরে শুকরিয়া জানাচ্ছি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে।

"ইকবালের নির্বাচিত কবিতা" গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। ভূমিকাটি এই।—

একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-কবি হিসাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত ; তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপকার, মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসাবে স্বদেশে-বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর রচনার অন্তর্গত বাণীর আবেদন ছাড়াও রূপের ঐশ্বর্য এবং শিল্প-সাফল্যও ইকবালকে এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেয়। স্বদেশের বিভিন্ন ভাষায় যেমন তেমনি আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায়ও ইকবালের কবিতার, কাব্যগ্রন্থের এবং দার্শনিক চিন্তামূলক প্রবন্ধাদির অনুবাদ হয়েছে। এই অনুবাদের তালিকা যেমন দীর্ঘ, অনুবাদকের সংখ্যাও তেমনি স্বল্প নয়। ইকবালের কাব্য ও অন্যান্য রচনার অনুবাদকদের মধ্যে রয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল-কাব্যের ও তাঁর অন্যান্য রচনার অনুবাদ শুরু হয় চলতি শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকেই। গত প্রায় অর্ধ শতকেরও অধিককাল ধরে বাংলা ভাষায়ও ইকবালের কাব্যগ্রন্থ, কবিতা ও গদ্যরচনার বহু অনুবাদ হয়েছে। তাঁর অনেক বিখ্যাত কাব্য এবং কবিতার অনুসরণে ও অনুকরণে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে কিছু কিছু কবিতা ও কাব্য। উপজীব্য আহরণে যেমন, রচনার আঙ্গিক ও রূপরীতি অনুসরণ এবং উপমা, চিত্রকল্প, রূপক ইত্যাদি ব্যবহারেও তেমনি ইকবালের প্রভাব বর্তেছে অনেক বাঙালি কবির ওপর। ফররুখ আহমদের কোনো কোনো কবিতায়ও এর স্বাক্ষর আছে। ইকবাল-কাব্যের একনিষ্ঠ পাঠক, তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনার অনুরাগী, আদর্শের অনুসারী এবং ইকবালের বহুসংখ্যক কবিতার অনুবাদক হিসাবে ফররুখ আহমদের ওপর এই প্রভাব ছিল খুবই স্বাভাবিক।

মনে রাখা দরকার যে, ইকবাল-কাব্য অনুবাদে বাঙালি মুসলমান লেখকদের আত্মনিয়োগের মূলে সাহিত্য-শিল্পগত কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

এবং ঐতিহ্যগত কারণও ছিল। ইকবালের কবিতা ও অন্যান্য রচনার সাথে বাঙালি মুসলমান লেখকদের পরিচয় ঘটে এমন এক সময়ে যখন উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণ আন্দোলন জোরদার হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামও ব্যাপ্তি লাভ করেছে ; পরবর্তীকালে 'রেনেসাঁ-আন্দোলনের' পটভূমিতে ইকবালের রচনা ও তাঁর চিন্তাধারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও অনুপ্রেরণা জোগায় এবং উৎসে পরিণত হয়। উর্দু, ফারসি, ইংরেজি—এই তিন ভাষায়ই ইকবাল কাব্য রচনা করেছেন, যদিও তাঁর দার্শনিক রচনাবলি প্রধানত ইংরেজিতেই লেখা। তবে অনেকের মতে, ফারসি ভাষায় রচিত ইকবালের কবিতাবলিই উৎকৃষ্টতর। এর মূলে ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব এবং কাব্য-ঐতিহ্য কতটা কাজ করেছে তা বিশেষজ্ঞরাই ভালো বলতে পারবেন। যেহেতু ফারসি ইরান ছাড়াও সন্নিহিত অঞ্চলের জনগণের ভাষা এবং এই উপমহাদেশে এককালে রাষ্ট্রভাষা ছিল, ফারসি জানা লোকের সংখ্যাও কম নয়, সে কারণেও সম্ভবত ইকবাল ফারসি ভাষায় কাব্য রচনা করে থাকবেন। হয়তো কবির মনে এই বাসনাও সংগোপন ছিল যে, তাঁর বাণী ও কাব্য-শিল্পের আবেদন আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ুক।

ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম রেনেসাঁর রূপকার এবং স্বদেশ ও স্বজাতির নবজাগরণের বাণীবাহক হলেও ইকবাল ছিলেন মূলত মানবতাবাদী কবি, তাঁর বাণী এবং কাব্য-শিল্পের আবেদনও তাই বিশ্বমানবতার কাছেই। ইকবাল-সাহিত্যের এই বিশ্বজনীন আবেদনের জন্যে তো বটেই, উপরন্তু, মুসলিম নবজাগরণ এবং ইসলামী আদর্শের বাণীবাহক বলেও, এই মহাকবির রচনা এ দেশের বিদ্বজ্জনমহলে এবং পাঠক-মনেও ব্যাপকতর ও গভীরতম আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত ইকবালের কাব্যকবিতার মূলের সাথে পরিচয়ের সুযোগ সীমিতসংখ্যক লোকেরই ঘটেছে বটে, তবে অনুবাদেও তাঁর রচনার আবেদন কম ব্যাপ্তি লাভ করেনি। এর প্রধান কারণ, বাংলা ভাষায় যাঁরা ইকবালের কাব্যকবিতার অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান কবি। কাজী নজরুল ইসলাম ইকবালের কোনো রচনা অনুবাদ করেননি বটে, তবে প্রাচ্যের এই মহাকবির রচনার সাথে যে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, সে কথা মুহম্মদ সুলতান অনূদিত ইকবালের "শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া" কাব্যগ্রন্থের 'ভূমিকা' পাঠেই বোঝা যায়। তাতে নজরুল এই অনুবাদ মূলের সাথে মিলিয়ে পড়েছেন বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন।

ফারসি কাব্যের সুদক্ষ অনুবাদক, বাংলায় হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষান্তরকারী নজরুলের কাছ থেকে আমরা ইকবালের কোনো অনুবাদ পাইনি বটে, তবে তাঁর পূর্বসূরী-উত্তরসূরী অনেক খ্যাতিমান কবিই ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে তাঁদের শ্রম ও অভিনিবেশ নিয়োজিত করেছেন, দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গত অর্ধশতকেরও অধিককালের পরিধিতে যাঁরা ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, অমিয় চক্রবর্তী, আবদুল কাদির, মহীউদ্দিন, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, তালিম হোসেন, আবুল কালাম মুস্তফা, মনিরউদ্দিন ইউসুফ, আবদুল হাফিজ, মুনীর চৌধুরী, আবদুর রশীদ খান, মুফাখখারুল ইসলাম, নেয়ামাল বাসির প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইকবাল-কাব্যের অনুবাদের পটভূমি এবং এক্ষেত্রে

www.pathagar.com

পূর্বসূরীদের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

> বাংলাতে তাঁর [ইকবালের] প্রথম অনূদিত গ্রন্থ "শেকোয়া"। যে-সময় বাঙালি মুসলমান নজরুল ইসলামকে পুরোভাগে রেখে আপন দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি খুঁজছে, স্বস্তিহীন মুহূর্তে সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছে, তখন ইকবালের "শেকোয়ায়" সে আপন মনের অনুরণন শুনেছিলো। চরম দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট, দুঃখে জর্জরিত এবং তৎহেতু আত্মঘাতী কবি আশরাফ আলী খান "শেকোয়া"র প্রথম তর্জমা করেছিলেন। আশ্চর্য আবেগ এবং গতির মধ্যে আশরাফ আলী "শেকোয়া"য় আপন মনের প্রতিফলন দেখেছিলেন, তাই তাঁর অনুবাদ আক্ষরিক না হলেও, আন্তরিকতায় উজ্জ্বল এবং কাব্য-সৌন্দর্যে নবোদিত সূর্যের বর্ণবৈচিত্র্যের মতো। এর পর "শেকোয়া"র তর্জমা অনেক হয়েছে—মুহম্মদ সুলতান, মীজানুর রহমান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—এ তিনজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
>
> "আসরারে খুদী"র প্রথম বাংলা তর্জমা করেন সৈয়দ আবদুল মান্নান। অনুবাদটি জনপ্রিয়ও হয়েছে। আবদুল মান্নান গদ্যে তর্জমা করেছেন। এর পর আমি সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত কাব্যানুবাদ করেছিলাম। আমি মূলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিনি, শুধু মূলীভূত তত্ত্ব এবং আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছি। ফররুখ আহমদও কাব্যে অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন।

ফররুখ আহমদ অনূদিত 'ইকবালের কবিতা' সম্পর্কে আলোকপাত এবং এই অনুবাদকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে স্বভাবতই কিছুটা ইতিহাস এবং উপরোক্ত পটভূমিকার দিকে ফিরে তাকাতে হয়। মূল লেখক ও অনুবাদকের অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা, সাহিত্যে—বিশেষ করে কাব্যক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্য অবদান, চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শের দিক থেকে উভয়ের মিল ও মানস-সাযুজ্য এবং সর্বোপরি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের নবরূপায়ণে, আর স্বদেশ ও স্বজাতির নবজাগরণে তাঁদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা ও অবদানই এটুকু দাবী করে।

বিভাগ-পূর্বকালেই ফররুখ আহমদ ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। চল্লিশের দশকে 'রেনেসাঁ-আন্দোলনের' পটভূমিতেই ইকবালের কবিতা ও তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে ফররুখ আহমদের ব্যাপক পরিচয় ঘটে। সে-সময়েই তিনি ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে আত্মনিবেদিত হন এবং ইকবাল সম্পর্কে প্রবন্ধও লেখেন একই সময়ে। তাঁর সমসাময়িক ও সহযাত্রী অনেক কবিও ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে, ইকবাল-সাহিত্যের মূল্যায়নে ব্রতী হন। ইকবাল-কাব্যের সাথে পরিচয় ও তাঁর কাব্যানুবাদের এই পটভূমি বিশ্লেষণ করে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

> নজরুল ইসলামকে পুরোভাগে রেখে বাঙ্গালী মুসলমান যখন জীবনের ভিত্তিহীনতার জন্য অভিযোগ তুলছে, তখন ইকবালের "শেকোয়া"র সঙ্গে আমাদের পরিচয়। নজরুলকে পথিকৃৎ মেনে আশরাফ আলী খান আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন আমাদের জীবনের বিপর্যয় ও স্বস্তিহীনতার জন্য এবং সত্যাদর্শের অভাবের জন্যও। "শেকোয়া"য় তিনি আপন মনের অনুরণন

www.pathagar.com

শুনলেন। কাব্য হিসেবে "শেকোয়া"র মূল্য যতই লঘু হোক না কেন, এর অভিযোগ আমাদের অনুভূতিতে শিহরণ তুলেছিলো। নজরুলকে ভালো লেগেছিলো, ইকবালকে আরও ভালো লাগলো। নজরুলের দীপ্তি অসাধারণ, কিন্তু সেই দীপ্তির দাহন আছে—স্নিগ্ধতা নেই ; ইকবালের কাব্যে জ্বালা আছে কিন্তু ধর্মের স্থির সত্যের সঙ্গে তার অসদ্ভাব নেই, তাই তা মূলত প্রশান্ত এবং জীবনানুভূতিতে অতুলনীয়।

এর পর যখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় হিন্দু থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে ভারতীয় মুসলমানকে অন্য এক জাতীয় ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান করতে বললেন, তখন তাঁকে আমরা নেতৃপদ দিলাম। ... পাকিস্তান পরিকল্পনার উন্মেষ হলো এভাবেই। রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা নয়, কিন্তু আদর্শের স্বীকার। সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা শুনা যেতে লাগলো আরও পরে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের পর। বলা হলো প্রকাশ্যেই যে, আমাদের সাহিত্য হবে আলাদা, কেননা, আমাদের জীবনবোধ হিন্দুদের সঙ্গে সংসক্ত নয়। কবিতার ক্ষেত্রেই এ আদর্শের অনুসৃতি হলো সার্থক। পাকিস্তান তখনও পর্যন্ত আবেগ, উল্লাস ও কল্পনার এবং কবিতাই হলো এ আবেগ প্রকাশের একমাত্র পরিসর। এ বক্তব্যের সঙ্গে রূপকল্পের সমন্বয় সাধনের পর কখনও কখনও কারো কবিতা শ্রোত্ররসায়নও হয়েছে। কিছুটা অগভীরভাবে হলেও, কাব্যক্ষেত্রে তিনটি ধারার চিহ্ন দেখা গেলো—ইসলামী ঐতিহ্যের কাহিনী ও সৌন্দর্যের ধারা ; ইসলামের সত্য বিশ্বাস এবং উপলব্ধিগত আদর্শ জীবনবোধ এবং সর্বশেষে পুঁথি-সাহিত্য ও পল্লীগীতির রূপ এবং কল্পনার জীবন। ইকবালের প্রভাব কার্যকরী হয়েছিলো প্রথম দু'টি ক্ষেত্রে। ইকবালের প্রভাবে এ দু'টি ধারা বলিষ্ঠ হয়েছিলো এবং নতুন রূপ নিয়েছিলো—ক্ষীণ প্রাণধারা স্রোতাবেগ পেয়েছিলো।

[ইকবালের কবিতা, ভূমিকা দ্রষ্টব্য]

উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতার সমর্থন মিলবে সে-সময়ে লেখা ফররুখ আহমদের ও তাঁর সমসাময়িক ও সহযাত্রী কবিদের অনেকের রচনায়। বলেছি, ফররুখ আহমদ যেমন ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ করেছেন, তেমনি এই মহাকবির কোনো-কোনো কবিতা অবলম্বনে লিখেছেন নতুন কবিতা। প্রসঙ্গত তাঁর "জওয়াব-ই-শেকোয়া"র অনুকরণে 'জওয়াব' শীর্ষক কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। কাব্য-সাধনার প্রাথমিক-পর্বেই ফররুখ আহমদ তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন :

এ আকাশ মুছে যাক এ আকাশে এসেছে জীর্ণতা।

তিনি আরও বলেছেন :

তবে মুখ ঢাকো আজ হায় বন্ধ্যা আচ্ছন্ন সবিতা
দীপ্ত দিন তুলে ধরো আঁধারের কালো যবনিকা।

[নাটক]

মনে হয়, প্রাচ্যের দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবিতার সঙ্গে ফররুখ আহমদের অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর কাব্যসাধনার প্রাথমিক পর্বেই ঘটে গিয়েছিলো। ফররুখ আহমদ-অনূদিত ইকবালের একটি কবিতায় আছে : 'এ আকাশ জরাজীর্ণ এইসব তারারা

www.pathagar.com

পুরান/আমি চাই সদ্যজাত পৃথিবী নতুন।' ইকবালের মতো দার্শনিক মনের অধিকারী না হলেও, কাব্যক্ষেত্রে প্রাচ্যের এই মহাকবির আদর্শের অনুবর্তিতা ফররুখ আহমদের রচনায় বিশেষভাবেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। ১৯৪৫ সালেই কাজী আবদুল ওদুদ ফররুখ-কাব্যের এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন : 'বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য সাহিত্যিক তারা অবশ্য প্রধানত বুদ্ধির মুক্তিবাদী। তবে মোটের ওপর নিঃসঙ্গ সাহিত্যিক। আত্মনিয়ন্ত্রণী দলের সাহিত্যিক ও সাহিত্যোৎসাহীদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হয়েছেন ফররুখ আহমদ। তিনি ইকবালের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করেছেন, যদিও ইকবালের দার্শনিক মেজাজ তাঁর নয়। তিনি তরুণ, বিচার-বিশ্লেষণ নয়, সুপরিণতিই তাঁর জন্য আজ কাম্য।'

পরবর্তীকালে, ইকবালের কবিতা অনুবাদে আত্মনিয়োগের ফলে এই আদর্শ-অনুবর্তিতা এবং অনুসরণ আরও স্পষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভাগপূর্বকালে তো বটেই (সাবেক) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও গত দুই-আড়াই দশকে ফররুখ আহমদ ইকবালের বহুসংখ্যক কবিতা অনুবাদ করেন। সে-সব কবিতার মধ্যে রয়েছে—তাঁর পূর্বসূরী ও সমসাময়িক কবিদের অনূদিত কবিতা ছাড়াও, ইকবালের অনেক কবিতা—যা ইতিপূর্বে হয়নি। কিন্তু বহুসংখ্যক কবিতা অনুবাদ করা সত্ত্বেও, এই দীর্ঘ সময়ের পরিধিতেও, ফররুখ আহমদ-অনূদিত ইকবালের কবিতা আলাদাভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত ও সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত "ইকবালের কবিতা" সংকলনে স্থান পায় ফররুখ আহমদ-অনূদিত ইকবালের ১২টি কবিতা। বাকী কবিতাগুলির অনুবাদক সৈয়দ আলী আহসান ও আবুল হোসেন। এ-প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন :

> বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও আমার তর্জমা। ... অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধানত আমাদের অবলম্বন ছিলো ইকবালের কবিতার ইংরেজী তর্জমা। "আসরারে খুদী" ছাড়া অন্যান্য কবিতার ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছে। যাতে ভাষান্তর মূলের সঙ্গে যথাযথ থাকে।
>
> ফররুখ আহমদের 'পূর্বাণী', 'বুআলী কলন্দর' ও 'ভিক্ষা' "আসরারে খুদী"র তিনটি অধ্যায়ের তর্জমা—প্রথমটি অংশবিশেষ, পরের দুটি সম্পূর্ণ। অনুবাদের জন্য ফররুখ আহমদের অবলম্বন ছিলো নিকলসনকৃত "আসরারে খুদী"র ইংরাজী তর্জমা।
>
> [ঐ]

পরবর্তীকালে, ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান পাবলিকেশান্স-প্রকাশিত "ইকবাল-চয়নিকা" সংকলন-গ্রন্থেও ফররুখ আহমদ-অনূদিত অনেকগুলি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়।

"ইকবালের নির্বাচিত কবিতা"ই ফররুখ আহমদ-অনূদিত কবিতার প্রথম গ্রন্থ। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের অন্তর্গত ইকবালের কবিতাবলী ইতঃপূর্বে আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত "ফররুখ-রচনাবলী"তেও স্থান পেয়েছে। এসব অনূদিত কবিতায় ফররুখ আহমদ মূলের সাথে কতটা সঙ্গতি রক্ষা করতে পেরেছেন, ভাষান্তরে দিতে পেরেছেন কতটা দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয়, তা বিচার করতে হলে, অনুবাদের নিয়মকানুন, কায়দা-কৌশল এবং শিল্পরূপের নিরিখেই তা যাচাই করতে

www.pathagar.com

হবে। মনে রাখা দরকার, ফররুখ আহমদ তাঁর অনুবাদকর্মে অবলম্বন করেছেন মূল রচনার ইংরেজী অনুবাদ এবং অন্য অনুবাদকদেরও অবলম্বন হয়েছে প্রধানত ইংরেজী অনুবাদই। মূল রচনা এবং ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ছাড়াও, অন্যদের অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে তুলনামূলক বিচারেও এই অনুবাদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, অনুবাদ 'কাশ্মীরী শালের উল্টোপিঠের মতো।' সঙ্গত কারণেই, অনুবাদে মূলের সৌন্দর্যের সাক্ষাৎলাভ সব ক্ষেত্রে সহজ নয়, সম্ভবও নয়। বিশেষ করে কাব্যের অনুবাদে ভাবদেহের পরিচয় মিললেও, রূপ-সৌন্দর্য এবং কাব্যের মনোহর লাবণ্যের সাক্ষাৎ সব সময় মেলে না। স্বল্পশক্তিমান অনুবাদকের হাতে পড়ে এ-কারণেই বহু মহৎ কবির কাব্যের বিপর্যয় ঘটেছে, তাঁদের সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। উৎকৃষ্ট অনুবাদের অভাবে এবং দুর্বল অনুবাদের দরুন, সমগ্র বিশ্বপটভূমিকায় রবীন্দ্র-কাব্যের মহিমা যে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, এ দুঃসংবাদ বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি রচনায় কয়েক বছর আগেই পরিবেশন করেছিলেন। অবশ্য অনুবাদে নবসৃষ্টি মহিমা পায়। ইকবালের জন্যে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, অনেক অক্ষম অনুবাদকের হাতে তাঁর কাব্যের মহিমা ও মাধুর্য লাঞ্ছিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় যাঁরা ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ করেছেন, তাঁদের অনেকেই সৃজনক্ষমতার অভাবে এবং আক্ষরিকভাবে মূলানুগ হবার মূঢ় বাসনায় উদ্দীপিত হয়ে, ইকবালকাব্যের বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। তাঁরা এ সত্য বিস্মৃত হয়েছেন যে, অনুবাদ-অর্থ মূলের ভাষান্তর মাত্র নয়, মূল সৌন্দর্যের নবরূপায়ণও বটে। নব সৃষ্টির মহিমায় মাধুর্যময় এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে না পারলে, অনুবাদ বিপর্যয়কেই প্রশ্রয় দেয়। উল্লেখিত অনুবাদকদের কল্যাণে আমরা 'দার্শনিক' ইকবালকে পেয়েছি বটে, কিন্তু কবি ইকবালকে অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়েছি।

ইকবাল সম্পর্কে প্রখ্যাত উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ বলেছেন : তাঁর দর্শন ও জীবনের অন্যান্য দিক নিয়ে যতো লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনায় তাঁর কবি-প্রতিভা ও সৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক শক্তিমত্তা সম্পর্কে খুব কম বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হয়েছে। অথচ তাঁর বাণীর প্রাণবস্তু এবং শক্তির উৎস হচ্ছে তাঁর কবিতা। ফয়েজের লেখা থেকে জানা যায়, উর্দু কাব্যে ইকবাল অর্ধ ডজন নতুন ছন্দ প্রবর্তন করেন, প্রথম সার্থকভাবে নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করেন এবং অসংখ্য নতুন শব্দ আমদানী করেন। অপরিচিত ধ্বনি, শব্দ ও বিশেষ্য পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ইকবালের কাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে ফয়েজ বলেন : ইকবালের মতো আর কোনো কবি উর্দু কবিতায় ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের এতখানি ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেননি। এ পদ্ধতির তিনিই উদ্গাতা। আর ইকবালের অন্বেষা হলো বিশ্ব-জগত ও মানুষ, বিশ্ব-জগতের মুখোমুখি মানুষ। তাঁর কবিতার শেষ কথা হলো : মানুষের কথা, মানুষের বিশ্বের কথা, মানুষের একক মর্যাদার কথা। ফয়েজের দৃষ্টিতে, এই মূল্যবোধই ইকবালের কবিকীর্তিকে অতুলনীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

ভাব-সম্পদের মতো কাব্যের রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ইকবাল নবসৃষ্টির মহিমা সঞ্চারিত করেছেন। কাব্যের টেকনিক বা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইকবালের সাফল্য যেমন

www.pathagar.com

বিস্ময়কর, তেমনি নব-উদ্ভাবিত টেক্‌নিকে কবিতার ঐন্দ্রজালিক রূপসৃষ্টিতেও তাঁর পারঙ্গমতা দুর্লভ শিল্পীজনোচিত। ইকবালের কাব্যের মূলের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, অনুবাদের মাধ্যমেই যারা দার্শনিক-কবি ইকবালকে জানেন, তাদের পক্ষে ইকবাল-কাব্যের বিস্ময়কর শিল্পরূপ এবং অন্তঃসত্তার প্রকৃত পরিচয় লাভ অসম্ভব, কারণ, অনুবাদে মূলের ভাব ধরা দিলেও, অনেক ক্ষেত্রেই এর শিল্পরূপ ধরা দেয় না ; ফলে অনুবাদ পাঠের মাধ্যমে 'দার্শনিক' ইকবালকে জানা সম্ভব হলেও, কবি ইকবালকে জানা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, তাঁর শিল্পদক্ষতা থেকে যায় পাঠকের বোধের পরপারে ; এর জন্যে অক্ষম অনুবাদও কম দায়ী নয়। আশার কথা এই যে, কয়েকজন প্রতিভাধর কবি ও সহমর্মী ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে তাঁদের শ্রম ও সাধনা নিয়োজিত করার ফলে আমরা বাংলা ভাষায়ও প্রাচ্যের এই মহান দার্শনিক-কবির অনেক কবিতার চমৎকার ভাষান্তর উপহার পেয়েছি।

ফররুখ আহমদ-অনূদিত এই গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাবলী পাঠ করলেও, ইকবাল-কাব্যের বাণীর এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে সাথে তার সৌন্দর্য এবং লাবণ্যমহিমার সাথেও পরিচিত হওয়া যাবে। এবং অনুবাদ পাঠে স্পষ্টতই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে যে, ইকবাল শুধু আত্মার রহস্য-সন্ধানী এবং আত্মসত্তার উদ্বোধনকামী মহৎ দার্শনিকই নন, তিনি মহৎ কবিও। ইকবাল তাঁর জীবনাদর্শ, জীবনানুভূতি এবং স্বতন্ত্র জীবনদর্শন ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কাব্যের ভাষা এবং আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এবং ভাবনা উৎসারিত হয়েছে গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে, আর এ-কারণেই প্রত্যক্ষতার বন্ধন অতিক্রম করে তা অনেকখানি রহস্যময় চারিত্র অর্জন করেছে। ইকবালের সৌন্দর্যদৃষ্টি ও অপরিমেয় কল্পনাশক্তি তাঁকে করে তুলেছে ব্যঞ্জনাময়। উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও রূপক প্রতীকের ব্যবহারের সাহায্যে ইকবাল তাঁর বক্তব্যকে দিয়েছেন সৃজনধর্মিতা, করেছেন অনিঃশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। ইকবাল যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প সৃষ্টি ও রূপকের ব্যবহারে অন্যান্য বিশ্ববিশ্রুত মহৎ কবিদের মতোই সুদক্ষ—এর পরিচয় আমরা ফররুখ আহমদ-অনূদিত এই গ্রন্থের কবিতাবলীতেও পাবো।

ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে ফররুখ আহমদের দক্ষতার পরিচয় তুলনামূলক বিচারে এবং এই স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়, তবুও, কয়েকটি উদাহরণ থেকেই বুঝা যাবে, ইকবালের আদর্শের অনুবর্তী, প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদের সৃজনীক্ষমতায়, অনুবাদও কতখানি নবসৃষ্টির মহিমা লাভ করেছে। উপমা ও রূপপ্রতীক সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য কবিতার ভাষান্তর করেছেন ফররুখ আহমদ এইভাবে :

দুরন্ত দস্যুর মত যখন প্রোজ্জ্বল সূর্য হানা দিল শর্বরীর 'পরে
আমার ক্রন্দনধারে শিশির-সিঞ্চিত হল গোলাবের মুখ,
নার্গিসের ঘুমঘোর মুছে নিল মোর অশ্রুকণা,
উজ্জীবিত তৃণদল উল্লাসে ছড়ায়ে যায়
আমারি সে একাগ্র আবেগে।
[আসরার-ই-খুদী, সূচনা খণ্ড]

সৈয়দ আলী আহসান উপরোক্ত স্তবকেরই অনুবাদ করেছেন এইভাবে :

দিনের প্রথম সূর্য দুরন্ত আঘাতে যবে

www.pathagar.com

শর্বরীর তিক্ত ক্লান্তি করিলো হরণ
অশ্রুর নীহারে কাঁপে নিষিক্ত পুষ্পের দল
রক্তিম বরণ ;
নার্গিস ফুলের তন্দ্রা মুছিয়া দিলাম আমি
অশ্রুর প্রবাহে
জাগিয়া উঠিল অনু অচেতন ছিলো যাহা
মৃত্যুর প্রদাহে।
আমার উচ্ছ্বাসে জাগে শীত-শীর্ণ কিশলয় দল।

উদ্ধৃত কবিতাংশের দু'জন অনুবাদকই আমাদের সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি, এবং অনুবাদে তাঁদের দক্ষতাও স্বয়ংপ্রকাশ ; তবুও, দুটি কবিতাংশই পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লে অনুভব করা যাবে যে, ফররুখ আহমদের ভাষা, তাঁর নিজের কবিতার ভাষার মতোই, অনেক বেশী গাঢ়বদ্ধ, সংহত এবং প্রাণবান। মূলের আক্ষরিক অনুবাদ হয়তো কেউ-ই করেননি, কেননা সৈয়দ আলী আহসান নিজেই বলেছেন, ইংরেজী থেকে অনুবাদেও তিনি মূলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি, শুধু মূলীভূত তত্ত্ব এবং আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন। তবুও, এঁরা নিজেরা সৃজনশীল কবি বলেই, ইকবালের উপমা-চিত্রকল্পও অনেকখানি ভাষান্তরিত হয়ে এসেছে। 'দুরন্ত দস্যুর মতো যখন প্রোজ্জ্বল সূর্য হানা দিল শর্বরীর 'পরে'—ফররুখ আহমদ-অনূদিত এই চিত্রকল্পটি তো অনবদ্য রূপমহিমা লাভ করেছে। তাঁর অনূদিত অন্যান্য কবিতায়ও লক্ষ্য করা যাবে যে, তিনি শুধু ইকবালের বাণীর আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাষান্তরই করেননি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পেরও নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন ; এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, ফররুখ আহমদ নিজেও শক্তিমান এবং রূপদক্ষ কবি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও ছিল তাঁর পারঙ্গমতা। ফররুখ আহমদ-অনূদিত 'খোদার দুনিয়া' কবিতাটি নিম্নরূপ :

কে তিনি—মাটির নিবিড় আঁধারে লালন করেন বীজ ?
কে তিনি—ওঠান সহজে এ মেঘ দরিয়ার ঢেউ থেকে ?
কে তিনি—আনেন পশ্চিমী হাওয়া, সুফলপ্রসূ এ বায়ু ?
এ জমিন কার ? অথবা এ কার সূর্য-রশ্মিধারা।
মুক্তার মত ফসল করেন শস্যের শীষে জমা।
কার ইঙ্গিতে অনুভূতিময় মাসের পরিক্রমা ?
শোন জমিদার—এ ক্ষেত-খামার এ তোমার নয়, এ তোমার নয়,
এ নয় তোমার কোন সম্পদ ; আমারো এ নয় কোন সঞ্চয়॥

আবুল হোসেনের অনুবাদ :

মাটির আঁধার গর্ভে লালন করে কে লক্ষ বীজ ?
সমুদ্রের ঢেউ থেকে আকাশে তোলে কে কালো মেঘ ?
পশ্চিম পাহাড় থেকে ডেকে আনে কে মধুর হাওয়া ?
এ সোনার মাঠ কার, কার ওই সূর্যের স্বচ্ছ আলো ?
মুক্তার দানায় ভরে কে সোনালি ফসলের শীষ ?
মাসগুলো ঘুরে ঘুরে আসে কার অমোঘ আদেশে ?
এ জমি তোমার নয়, হে ভূস্বামী তোমার তো নয়
নয় পূর্ব-পুরুষের, তোমার আমার কারো নয়।

www.pathagar.com

দু'জন কবিই অনুবাদে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এঁরা শক্তিমান ও রূপদক্ষ কবি বলেই, অনুবাদেও উপমা-চিত্রকল্প আকর্ষণীয়রূপে ভাষান্তরিত হয়েছে। অনুবাদের ভাষা ব্যবহারে আবুল হোসেন অবলম্বন করেছেন অনেকটা কথ্যরীতি এবং ঘরোয়াভঙ্গী, ফলে ছন্দনির্ভর এই অনুবাদও অনেকটা গদ্যের ধার ছুঁয়ে গেছে ; অন্যপক্ষে ফররুখ আহমদের ভাষা অনেকটা ক্লাসিকধর্মী, উচ্চারণ গম্ভীর এবং ছন্দও সুনিরূপিত ও বাণীবদ্ধ। ফলে কবিতাটি পাঠ বা আবৃত্তিকালে এর ধ্বনিময়তা, গাম্ভীর্য এবং গতিময়তা চেতনাকে স্পর্শ করে, হৃদয়ে অনেক বেশী আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়। 'মুক্তার দানায় ভরে কে সোনালি ফসলের শীষ?/মাসগুলো ঘুরে ঘুরে আসে কার অমোঘ আদেশে'—এই অনুবাদ হয়তো অনেকখানি মূলানুগ, কিন্তু 'মুক্তার মত ফসল করেন শস্যের শীষে জমা।/কার ইঙ্গিতে অনুভূতিময় মাসের পরিক্রমা?'—যে ভাষার ক্লাসিকধর্মিতা ও ছন্দধ্বনিময়তার কারণে অধিক আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, তা অস্বীকার করা যাবে না।

ইকবাল-কাব্যের অন্যতম দক্ষ অনুবাদক, এবং উর্দুভাষায় অভিজ্ঞ মনিরউদ্দীন ইউসুফ লিখেছেন, 'ইকবালের উর্দু ক্লাসিক্যাল উর্দু, অর্থাৎ তাঁর ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য ও প্রাচুর্য সুপ্রকট। Image allusion-এর জন্যই যে এ প্রাধান্য তা-ও নয় ; ভাষার গাম্ভীর্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা রক্ষার খাতিরেই বরং ভাষার ক্লাসিক্যাল রূপকে কবি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগের দিক থেকেও প্রাচীন রীতিই তাঁর কাছে বেশী উপযোগী মনে হয়েছে।' ("ইকবালের কাব্য-সঞ্চয়ন", ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) ক্লাসিক্যাল ভাষা ও বাণীভঙ্গী অনুসরণ, ছন্দ ও শব্দের নিপুণ ব্যবহার এবং উপমা-চিত্রকল্প রচনায় দক্ষতার গুণে অনুবাদও কতটা মৌলিক কবিতার চারিত্র্য অর্জন করতে পারে, ফররুখ আহমদ-অনূদিত "ইকবালের নির্বাচিত কবিতা"য়ও তার পরিচয় মিলবে। 'আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন' কবিতাটিই ধরা যাক ; এর প্রথম স্তবকটি হলো :

খোল আঁখি দেখ চেয়ে এ পৃথিবী, দেখ নভঃতল ;
দেখ এই বাষ্প আর হাওয়ার মহল।
তিমির বিদার সূর্য দেখ চেয়ে দীর্ণ করে সুপ্ত পূর্বাচল॥
গুণ্ঠন-বিমুক্ত স্বপ্ন সংগোপন দেখ এই উজ্জ্বল আলোতে,
বিচ্ছেদ দিনের ব্যথা, অশেষ যন্ত্রণাবহ্নি
দেখ তুমি ধরাবক্ষ হ'তে।
অধীর হ'য়ো না তবু আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে
আবর্তিত সংগ্রামের স্রোতে॥

[ফররুখ আহমদ-অনূদিত]

এই কবিতাটির একাধিক অনুবাদ হয়েছে এবং অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকরা। কারো কারো অনুবাদ মূল থেকেই ; তবুও অনুবাদগুলির পাশাপাশি সংস্থাপন এবং তুলনামূলক পাঠে এটাই স্পষ্ট হয় যে, ফররুখ আহমদের অনুবাদের মতো এতটা সংহত ও সুন্দররূপ, উপমা-চিত্রকল্পের সমবায়ে এমন প্রাণময়তা ও গতিশীলতা, আর কারো ভাবান্তরে মূর্ত হয়নি। বরং অনেকের অনুবাদে জড়তা এবং ক্লিষ্টতাই অনুভবযোগ্য। এর প্রধান কারণ, ভাষা ও ছন্দ-নির্বাচনে তাঁদের যথার্থবোধের অভাব, ভাষা ও ছন্দকে বাণীবহনের উপযোগী করে ব্যবহারের ক্ষমতার ন্যূনতা এবং উপমা ও

www.pathagar.com

চিত্রকল্পে নতুন প্রাণ-সঞ্চার করতে না পারা। এই কবিতাটির উল্লেখযোগ্য অংশের কয়েকটি অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো :

মেল আঁখি হের সুন্দর
হের নভঃতল, প্রকৃতি হের ;
পূর্ব-দিগন্তে উদিত সূর্য
ক্ষণিকের লাগি তাহারে হের।
গুণ্ঠনহীন উজ্জ্বল বিভা
গুণ্ঠন ঢাকা তাহারে হের,
বিরহ যুগের যাতনা মথিত
অত্যাচারিত হৃদয় হের।
অধীর হয়ো না। দেখ কী দ্বন্দ্ব
রয়েছে আশা ও ভীতির মাঝে।
[অনুবাদ : সুফিয়া কামাল]

খোল আঁখি, হের ধরা, দেখ চেয়ে গগন প্রাঙ্গণ,
কেমনে উদিছে ওই পূর্বাচলে ভাস্কর তপন!
সে নগ্ন প্রকাশ হের, যবনিকা—মাঝারে গোপন।
অত্যাচার দেখ আজ দিবারাত্র তব বিচ্ছেদের
অধীর হয়ো না বন্ধু, দ্বন্দ্ব হের আশা ও ভয়ের।
[অনুবাদ : মনিরউদ্দীন ইউসুফ]

উপরোদ্ধৃত সবগুলো অনুবাদই সুন্দর এবং প্রশংসার দাবী রাখে। দুটি ছন্দোবদ্ধ এবং একটি গদ্য-ছন্দের অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দেখলেও বুঝা যাবে যে, ফররুখ আহমদ মূল থেকে তেমন দূরে সরে যাননি, বরং মূল ভাববস্তু এবং শিল্প-সম্পদের ওপর ভিত্তি রেখেই, তাঁর সৃজনক্ষমতার স্পর্শে এই অনুবাদ কবিতাটিকেও নতুন মহিমা দিয়েছেন, এবং তাতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। আর এ-ক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক হয়েছে ভাষা ও ছন্দের ওপর অবাধ অধিকার এবং কল্পনা-প্রতিভা। তিনি যখন উচ্চারণ করেন :

ওঠো—দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও।
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও॥
করো ঈমানের আগুনে তপ্ত গোলামী খুন
বাজের সমুখে চটকের ভয় ভাগিয়ে দাও॥
ঐ দেখ আসে দুর্গত দীন-দুখীর রাজ ;
পাপের চিহ্ন মুছে দাও, ধরা রাঙিয়ে দাও॥
কিষাণ-মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল,
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও॥
স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও...

তখন এই রচনা আদৌ অনুবাদ বলে মনেই হয় না, এটি ইকবাল কিংবা অন্য কারো কবিতা কিনা, সে-প্রশ্নও মনে জাগে না, বরং একটি মৌলিক কবিতারূপেই পাঠকের চেতনায় আঘাত হানে, মনে অনুরণন জাগায়। অনুবাদের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কি হতে পারে? অনেকেই এই কবিতাটির অনুবাদ করেছেন, কিন্তু ফররুখ

www.pathagar.com

আহমদের অনুবাদের মতো এতটা জনপ্রিয়তা আর কারো ভাষান্তরই লাভ করতে পারেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বাস জোর না বাঁধলে বাক্যবন্ধন দৃঢ় হয় না ; আদর্শবাদী ও জীবনশিল্পী কবি ইকবালের বিশ্বাস ছিল গভীর ও অনমনীয়, এবং তা-ই তাঁর কবিতায় বাক্যবন্ধনের দৃঢ়তায়, রূপে-রঙে, মনোহর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ইকবালের কাব্যাদর্শের অনুরাগী ও অনুবর্তী, ফররুখ আহমদেও বিশ্বাস ছিল সুগভীর, তিনিও ছিলেন আদর্শবোধে উজ্জীবিত এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী। এই প্রত্যয়ের পরিচয় তাঁর মৌলিক রচনায় যেমন, তেমনি অনুবাদেও দৃঢ় বাক্যবন্ধনের রূপে, উপমা-চিত্রকল্পের মনোহারিতায় আকর্ষণীয় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ফররুখ আহমদ-অনূদিত এই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলেও উপলব্ধি করা যাবে যে, ইকবালের কবিতা ভাবের সঙ্গে মনোহর রূপের সমন্বয়েই মহৎ এবং মাধুর্যময়। তাঁর বিশিষ্ট জীবন-দর্শন যেমন কবিতাকে সারবান করেছেন, তেমনি তাঁর ব্যাপক জীবনদৃষ্টি ও দুর্লভ সৃজনক্ষমতা দিয়েছে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের আভা। ইকবাল-কাব্যের সৌন্দর্য-মহিমা শুধু এর বহিরঙ্গেই বিদ্যুতের মতো ঝলসিত নয়, এর অন্তঃপ্রবাহেও বিচ্ছুরিত। ইকবাল কাব্যপাঠে—এই অনুবাদেও, পাঠক যে উপঢৌকন পাবেন, তার পরিচয় দিতে গিয়ে, ইকবাল-কাব্যের সুদক্ষ অনুবাদক, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় বলতে হয়, 'কবি ইকবালের কাব্যকাননে বিচরণ করলে সৌরভি কুঞ্জ দেখতে পাব, খররৌদ্র ধূলিতে শ্যামল মেলে আছে, অগণ্য মনোহর বীথি আহ্বান করে নিয়ে যায় গভীর ভাবনার নির্দেশে। বাক্যের ভঙ্গী, রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্ত দৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা তাঁর বহু কবিতায় উপকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে, তা উর্দু বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম করে সর্বমানবের চিত্তহারী।' (সাম্প্রতিক, পৃ. ১২৯)

---

১ ইকবালের কবিতাসমূহ দুনিয়ার বহু ভাষায় প্রধানত ইংরেজি, জার্মান, ইতালীয় ও রুশ ভাষায় তর্জমা করা হয়েছে। তাঁর কবিতার কতিপয় তর্জমা বেরিয়েছে ফরাসি, তুর্কি ও আরবি ভাষায়। তাঁর বেশির ভাগ রচনা উর্দু ও ফারসি ভাষায় লেখা। বহু সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর ফারসি কবিতাসংগ্রহ কেবল সংখ্যায় নয়, বরং গুণের দিক দিয়েও তাঁর রচনাবলীর শ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচিত হবার দাবী রাখে। (ইকবাল : বিশ্বজনীনতার কবি, ডক্টর এম. ডি. তাসীর. এম. এ. পিএইচ. ডি. (ক্যান্টাব), অনুবাদ : সৈয়দ আবদুল মান্নান, ইকবাল-মানস, পৃ. ৫৩)

২ ইকবালের কবিতা, ভূমিকা দ্রষ্টব্য, প্রকাশক : প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১৯৫২।

৩ 'তাঁহার কবিতায় শিল্পী ও স্রষ্টার সম্মেলন ঘটিয়াছে, ফারসী ও উর্দু উভয় ভাষারই চোস্ত ও সুমার্জিত কবিতায় ইকবাল মিনারেটসমূহের সুদূরবর্তী ইশারা ও আরবীয় মরুবালুকায় চাকচিক্যময় স্বপ্ন আমাদের চোখে জাগাইয়াছেন। জীবনের বাস্তবতার পটভূমিকায় নীলিম নিঃসীমতা যেন এখানে গলিয়া পড়িতেছে। তাঁহার রহস্যবাদ জীবনের সম্মুখীন হইয়াছে, তবু ইহা যেন রহস্যের অতলতাকে স্পর্শের জন্য ব্যাকুল। তাঁহার ভাষায়ও প্রাঞ্জল শব্দাবলী যেন অগম্য অতলতাকে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। সুদক্ষ জহুরী যেভাবে স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি চয়ন করিয়া থাকে ইকবালও তেমনই সতর্কতাসহকারে শব্দ চয়ন করিতেন। তবুও তাঁহার শৈল্পিক নৈপুণ্যতা ও ভারসাম্য রক্ষার অন্তরালে স্রষ্টার বাস্তবতাবোধ প্রভমান।' (ইকবাল, অমিয় চক্রবর্তী, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ্ বাহার-সম্পাদিত "কবি ইকবাল", বুলবুল হাউস, কলকাতা, ১৯৪১, দ্রষ্টব্য)

*

গ্রন্থের পরিশেষে 'ইকবাল-চর্চা' শিরোনামে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ মন্তব্য করেন :

একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-কবি হিসাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত ; তাঁর জীবদ্দশায়ই তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপকার, মহৎ

www.pathagar.com

মানবতাবাদী কবি হিসাবে স্বদেশে-বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর রচনার অন্তর্গত বাণীর আবেদন ছাড়াও, রূপের ঐশ্বর্য এবং শিল্প-সাফল্যও ইকবালকে এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেয়। স্বদেশের বিভিন্ন ভাষায় যেমন, তেমনি আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায়ও ইকবালের কবিতার, কাব্যগ্রন্থের এবং দার্শনিক চিন্তামূলক প্রবন্ধাদির অনুবাদ হয়েছে। এই অনুবাদের তালিকা যেমন দীর্ঘ, তেমনি অনুবাদকের সংখ্যাও স্বল্প নয়। ইকবাল-কাব্যের অনুবাদকদের মধ্যেও অনেকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষায় ইকবালের রচনা ব্যাপকভাবে অনূদিত হলেও এ-সম্পর্কে আমরা খুব বেশী অবহিত নই ; কয়েক বছর আগে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় তরুণকুমার ভাদুড়ীর লেখা 'মরু-প্রান্তর' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনায় ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ইকবালের রচনার অনুবাদ ছাড়াও প্রাচ্যের এই মহাকবির অন্যান্য রচনাও যে ব্যাপকভাবে পঠিত ও অনূদিত হচ্ছে, ইকবাল-চর্চায় অনেক খ্যাতনামা লেখক, গবেষক-পণ্ডিত তাঁদের শ্রম ও অভিনিবেশ নিয়োজিত করেছেন, তা বিভিন্ন তথ্য থেকেই জানা যায়।

আফগানিস্তান, ইরান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশ ছাড়াও, মধ্যপ্রাচ্যের এবং আরব জাহানের অন্যান্য দেশেও ইকবালের রচনা অনূদিত হয়েছে, এবং ইকবাল-চর্চা চলে আসছে বহুকাল থেকেই। উর্দু, ফারসি, ইংরেজী—এই তিন ভাষায়ই ইকবাল কাব্য রচনা করেছেন, যদিও তাঁর দার্শনিক রচনাবলী প্রধানত ইংরেজীতেই লেখা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইকবালের "পায়ামে মাশ্‌রিক" কাব্যগ্রন্থটি আফগানিস্তানের বাদশাহ্ আমানুল্লাহর নামে কবি উৎসর্গ করেছিলেন। আফগানিস্তান ভ্রমণ ও কাবুলে অবস্থানের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'পরিব্রাজক' শীর্ষক কবিতায়। প্রাচ্যের এই দার্শনিক মহাকবিকে কাবুলের সুধীমণ্ডলী ও সারস্বত সমাজ আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করেন। জীবদ্দশায়ই ইকবাল এই প্রতিবেশী দেশের স্বীকৃতি, সম্মান ও শ্রদ্ধা কুড়ান। সরদার সালাহউদ্দীন সেলজুকি ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সেকালেই ইকবালের কবিতা ও জীবনদর্শন সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন, এবং সে-সব গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়।

ইরানে ইকবাল-চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয় ত্রিশের দশকের শেষ দিকে ; প্রখ্যাত ফারসি কবি বাহার খোরাসানী ইরানে ইকবালকে পরিচিত করার ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত সমালোচনামূলক গ্রন্থ "সচক নিনাসী"তে ইকবাল-কাব্যের আলোচনায় একটি অধ্যায়ই ব্যয় করেন। এ-ছাড়াও একটি দীর্ঘ কবিতায় কবি বাহার ইকবালের প্রতি নিবেদন করেন তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। পরবর্তীকালে ইরানে ইকবাল-চর্চা ব্যাপকতা পায় এবং এই দার্শনিক কবির কাব্য ও জীবন-দর্শন সম্পর্কে রচিত হয় প্রচুর প্রবন্ধ, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ড. মুজতবা মিনাবীর "ইকবাল লাহোরী" শীর্ষক গ্রন্থটি এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইকবাল উর্দু ও ফারসি—এই উভয় ভাষায়ই কবিতা রচনা করেছেন ; তবে অনেকের মতে ফারসি ভাষায় রচিত ইকবালের কবিতাবলীই উৎকৃষ্টতর। এর মূলে ফারসি ভাষায় শ্রেষ্ঠত্ব এবং কাব্য-ঐতিহ্য কতটা কাজ করেছে, বিশেষজ্ঞরাই তা বলতে পারবেন। তবে,

www.pathagar.com

ফারসি যেহেতু উপমহাদেশের বাইরেও প্রচলিত, এবং ইরান দেশের জনগণের ভাষা, সে-কারণেও সম্ভবত ইকবাল ফারসি ভাষায় কাব্য রচনা করে থাকবেন। হয়তো কবির মনে এই বাসনাও সংগোপন ছিল যে, তাঁর বাণী ও কাব্যশিল্পের আবেদন আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়ও ছড়িয়ে পড়ুক। ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম রেনেসাঁর কবি, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির নবজাগরণের বাণীবাহক হলেও ইকবাল ছিলেন মূলত মানবতাবাদী কবি, তাঁর বাণী এবং কাব্য-শিল্পের আবেদনও তাই বিশ্ব-মানবতার কাছেই। এই প্রেক্ষিতে যথার্থই বলা হয়েছে যে, 'It is true that Iqbal himself wanted is poetry to reach wide a circle of humanity as was sosible, and that was one of the many reasons why he took to writing in Persian. When a scholar asked Iqbal is to why he started writing Poetry in Parsian in preference to urdu his reply was very significant. Iqbal said : "Because I would not write in Arabic, so I took to Persian." At that time little did Iqbal know that his works will reach the Arabic-speakig world through excellent translations which would possess all the glory and majesty of the Original.' (Introduction to Iqbal, S-A-Vahid)

অনুবাদের মাধ্যমেই ইকবাল স্বদেশে-বিদেশে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন, শুধু প্রাচ্যে নয়, পাশ্চাত্ত্য জগতেও ইকবালের কবিতা ও অন্যান্য রচনা অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। আরবী ভাষায় ইকবালের রচনাবলী অনূদিত হওয়ার ফলে তিনি আরব জাহানে বিশেষ খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন। ইকবালের "তারানা-ই-মিল্লী", "শিকোয়া ও জওয়াব-ই-শিকোয়া", "পায়ামে মাশ্‌রিক", "জরবী-কলিম", "আসরার ও রমুজ" প্রভৃতি কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আরবি ভাষায় ইকবাল-কাব্যের অনুবাদে এবং ইকবাল-সাহিত্যের মূল্যায়নে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আমিনা নূরুদ্দীন, ডক্টর আবদুল ওয়াহাব আজম। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসির অধ্যাপক, ডক্টর ওয়াহাব আজম একাধারে কবি, ভাষাতত্ত্ববিদ ও সুপণ্ডিত। শুধু ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ এবং মূল্যায়নেই নয়, আরব জাহানে প্রাচ্যের এই দার্শনিক কবিকে ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তুরস্কেও কবি ইকবালের ব্যাপক পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা আছে ; তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বহু রচনা এবং একাধিক কাব্যগ্রন্থ। ডক্টর আলী গাঞ্জেলী অনূদিত "পায়ামে মাশ্‌রিক"-এর কথা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইকবালের রচনার অনুবাদ ছাড়াও এই কবি সম্পর্কিত সমালোচনামূলক রচনাও প্রকাশিত হয়েছে তুর্কি ভাষায়। ইন্দোনেশিয়ায়ও ইকবাল-কাব্য অনূদিত হয়েছে বহুকাল আগেই। বাহরাম রাংহুতি-অনূদিত ইকবালের কবিতা—বিশেষ করে "আসরার-ই-খুদী"র অনুবাদ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ইকবালের রচনা ছাড়াও, ইকবাল-সম্পর্কিত আলোচনাও অনেক প্রকাশিত হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল-কাব্যের ও তাঁর অন্যান্য রচনার অনুবাদ শুরু হয় এই শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকেই। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর এ. আর. নিকলসন-কৃত "আসরার-ই-খুদী"র অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। ইকবালের পরামর্শক্রমে, এই অনুবাদের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালে।

www.pathagar.com

ডক্টর নিকলসন সুপণ্ডিত ও অনুবাদক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। তাঁর এই অনুবাদকর্ম আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্যে ইকবালের পরিচিতি ও খ্যাতির প্রসারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। "আসরার-ই-খুদী"র অনুবাদ ছাড়াও, নিকলসন ইকবালের অনেক খণ্ড-কবিতারও অনুবাদ করেন, এবং ইকবালের কবিতা ও জীবন-দর্শন সম্পর্কে রচনা করেন বহু মূল্যবান প্রবন্ধ। ইকবাল-কাব্যের আরেকজন প্রখ্যাত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনুবাদক হলেন অধ্যাপক এ. জে. আরবেরী। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম হলো "পায়ামে মাশ্‌রিক", "জবুর-ই-আজম" ও "রমুজ-ই বেখুদী"।

ইংরেজী ছাড়াও, রুশ, জার্মান এবং ফরাসী ভাষায়ও ইকবালের কবিতা, কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অনূদিত হয়েছে। আরলেনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেল জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন ইকবালের "পায়ামে মাশ্‌রিক"। ইকবাল-কাব্যের আরেকজন প্রখ্যাত অনুবাদক ও সমালোচক হলেন অধ্যাপক অ্যানিমেরী শিমেল। তিনি ইকবালের কবিতা, দর্শন ও অবদান সম্পর্কে অনেক গবেষণাধর্মী, তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইকবাল-চর্চায় তাঁর শ্রম ও অভিনিবেশ, এবং পাণ্ডিত্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্যারিসের মাদাম ইভা মেরুবিচ ফরাসী ভাষায় ইকবালের "Reconstruction of Religious Thought in Islam" ("ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন") গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম হলো ইকবালের "Development of Metaphysics in Persia" গ্রন্থটির ফরাসী-রূপান্তর। মূল থেকে ইকবালের রচনার অনুবাদের উদ্দেশ্যে ইভা মেরুবিচ ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং সম্ভবত তিনি "জবুর-ই-আজম" কাব্যগ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদও করেন। যতদূর জানা যায়, ইটালীতেই ইকবাল সর্বাধিক জনপ্রিয়। এবং ইটালী ভাষায় তাঁর বহু রচনাও অনূদিত হয়েছে। ইকবালের "জাবিদনামা" কাব্যগ্রন্থের অনুবাদক এবং ইকবাল-সম্পর্কিত বহু মূল্যবান প্রবন্ধের রচয়িতা অধ্যাপক আলেসান্দ্রো বসানিও ইকবালকে ইটালীতে পরিচিত করার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকবাল-চর্চা শুরু হয়েছে দীর্ঘকাল আগেই। এক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন অধ্যাপক এফ. এস. সি-নর্থ্রস।

উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায়ও ইকবালের রচনা ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়েছে ; এসব অনুবাদের অনেকগুলিই মূল থেকে এবং অনুবাদকেরাও স্ব-স্ব ভাষার খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিত। ইকবালের রচনার অনুবাদ ছাড়াও, ইকবাল-সম্পর্কিত গ্রন্থও কম প্রকাশিত হয়নি। ইংরেজী, উর্দু, বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায়ও গত অর্ধশতকে রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ এবং ইকবাল-চর্চার পটভূমি এই গ্রন্থের ভূমিকাতেই তুলে ধরা হয়েছে।

হাল্কা লেখা

কবি-কর্তৃক প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি। এই প্রথম প্রকাশিত হলো। ফররুখ আহমদ অজস্র ব্যঙ্গকবিতা লিখেছেন। "হাল্কা লেখা"-ও ব্যঙ্গকবিতার বই। "ধোলাই কাব্য" (ফারুক মাহমুদ-সম্পাদিত, ১৯৬৩, দ্বি সং ১৯৮৬), "অনুস্বার" ("ফররুখ আহমদ রচনাবলী", প্রথম খণ্ড, ১৯৯৫, এ অন্তর্ভুক্ত) প্রভৃতির সঙ্গে পঠনীয়।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ

ফররুখ আহমদের অগ্রন্থিত কয়েকটি প্রবন্ধ এই অংশে একত্রগ্রন্থিত করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক তথ্য যুক্ত হলো এখানে।—

'ইকবাল প্রসঙ্গ'। প্রথম প্রকাশ : 'সওগাত', মাঘ ১৩৫৩। প্রবন্ধশেষে 'ক্রমশ' নির্দেশ ছিলো, কিছু আর প্রকাশিত হয়নি অর্থাৎ প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

'নজরুল প্রসঙ্গ'। প্রথম প্রকাশ : "ফররুখ-রচনাবলী" (প্রথম খণ্ড, ১৯৭৯, আহমদ পাবলিশিং হাউস)।

'নজরুল-সাহিত্যের পটভূমি'। প্রথম প্রকাশ : "নজরুল পরিচিতি" (১৯৫৯, পাকিস্তান পাবলিকেশনস)। ঢাকা রেডিওতে বেতার-কথিকা হিশেবে কবি-কর্তৃক পঠিত।

'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য'। প্রথম প্রকাশ : 'সওগাত', আশ্বিন ১৩৫৪। '১৩৫৪ সালের ভাদ্র মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে মাসেই তিনি [ফররুখ আহমদ] সওগাতের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখলেন—'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' নাম দিয়ে। এ প্রবন্ধটি পরবর্তী সংখ্যা আশ্বিনের 'সওগাতে' ছাপা হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি লিখেছিলেন : 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, এ নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনা হয়েছে। জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।' ভাষা সম্পর্কে আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্বেই ফররুখ আহমদ এ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।' ('কবি ফররুখ আহমদ' : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, 'সওগাত', আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১)।

'ব্যায়ামশিক্ষক মোহাম্মদ জনাব আলী'। 'সওগাত', আশ্বিন ১৩৪৫। এফ. আহমদ নামে ফররুখ আহমদ এই লেখাটি লিখেছিলেন।

নাটক

ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় এক "নৌফেল ও হাতেম" ছাড়া তাঁর কোনো নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। অথচ ফররুখ বেশ-কিছু নাটক লিখেছিলেন। ঢাকা বেতার থেকে তাঁর কয়েকটি নাটক সম্প্রচারিত হয়েছিলো। "ফররুখ আহমদ রচনাবলী"র বর্তমান খণ্ডে কবির 'রাজরাজড়া' প্রহসন ও 'আনারকলি' গীতিনাট্য সংকলিত হলো।

'রাজরাজড়া'। প্রথম প্রকাশ : "নয়া সড়ক" (১৯৪৮)। 'ফররুখ ভাই পাকিস্তান ও ইসলামী আদর্শের অনুরাগী ও অনুসারী বরাবর, কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানী ও পূর্ব পাকিস্তানী শাসকেরা ইসলামের নামে যা করছিলেন, তাতে তাঁদের ওপরে সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ ছিলেন ফররুখ ভাই। তিনি ঐ শাসকদের ব্যঙ্গ করে 'রাজরাজড়া' নামে একটা নাটক লিখেছিলেন এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হয়েছিল। বেনজীর আহমদ ও আবু জাফর শামসুদ্দীন-সম্পাদিত "নয়া সড়ক" সংকলনে নাটকটি প্রকাশিত হয়।' ('অনন্য পুরস্কার' : রফিকুল ইসলাম। "ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি")।

www.pathagar.com

'আনারকলি'। প্রথম প্রকাশ' 'পাকিস্তানী খবর', ৯ এপ্রিল ১৯৬৬। পুনর্মুদ্রণ : "ফররুখ আহমদ" (১৯৮৭, সেবা, ঢাকা)।

ফররুখ আহমদের গল্প

ফররুখ আহমদের গল্প॥ সম্পাদক : আবদুল মান্নান সৈয়দ॥ সপ ৩৫ ছগ ৪॥ প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৯৬/ জানুয়ারি ১৯৯০॥ প্রকাশক : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ৯৯ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, করিম চেম্বার (৫ম তলা), ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ ॥ গ্রন্থস্বত্ব : বেগম ফররুখ আহমদ॥ প্রচ্ছদ : মোমিনউদ্দীন খালেদ॥ মুদ্রক : পেপার কনভার্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, ৯৯ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, করিম চেম্বার (৫ম তলা), ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ॥ মূল্য : ৪০ টাকা॥

FARRUKH AHMEDER GALPA [Stories by poet Farrukh Ahmed] Published by Srijan Prokashoni Limited, Dhaka, Bangladesh. Price : Tk. 40.00.

এই গ্রন্থের সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ-প্রণীত ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো। —

এক

ফররুখ আহমদের গল্প। এ প্রায় সেই বিস্ময়ই সৃষ্টি করে, যেমন করেছিলো কিছু কাল আগে প্রকাশিত "জীবনানন্দ দাশের গল্প" বইটি[১] কিংবা "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা" বইটি[২]। 'আরে, কবি জীবনানন্দ দাশ গল্প লিখেছেন নাকি!' কিংবা 'কী আশ্চর্য, কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখলেন কবে!'—এরকম বিস্ময়ই ঘটে যায় ফররুখ আহমদের (১৯১৮–৭৪) ক্ষেত্রেও। কবি হিশেবে তাঁর পরিচিতি এমনই সর্বব্যাপী যে ফররুখ আহমদ যে প্রথম জীবনে কয়েকটি গল্প লিখেছেন, তা আমরা ভুলেই গিয়েছি।

যতোদূর দেখা গেছে তাতে মনে হয় : বাংলা ১৩৪৪ বা ইংরেজি ১৯৩৭ সালে ফররুখ আহমদ সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। এই বছরই 'বুলবুল' (সম্পাদক : হাবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুননাহার) ও 'মাসিক মোহাম্মদী' (সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ) পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনাবলী প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয়, 'বুলবুলে' প্রকাশিত 'রাত্রি' সনেটটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা (শ্রাবণ ১৩৪৪)। ঠিক তার পরের মাসেই ফররুখ আহমদের প্রথম গল্প 'অন্তর্লীন' প্রকাশিত হয় 'মাসিক মোহাম্মদী'তে (ভাদ্র ১৩৪৪)। বছর তিনেকের মধ্যে তাঁর পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হয় 'বুলবুল' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায়। পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচটি গল্পের পরিচয় এরকম :

১. অন্তর্লীন। মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৪৪।
২. বিবর্ণ। মাসিক মোহাম্মদী।
৩. মৃত বসুধা। মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৪৪।
৪. যে পুতুল ডলির মা। বুলবুল, বৈশাখ ১৩৪৫।
৫. প্রচ্ছন্ন নায়িকা। মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৪৬।

www.pathagar.com

১৩৪৪-৪৬ অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৯—এই হচ্ছে ফররুখের গল্প রচনার কাল।[৩] এই সময়পর্যায়ে ফররুখ কলকাতার রিপন কলেজে আই.এ. পড়ছেন। ১৯৩৭ সালে খুলনা থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলকাতায় গিয়ে তিনি রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ; ১৯৩৯ সালে ঐ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। ১৩৪৪ (১৯৩৭) সালে ফররুখ কবিতা ও গল্প সমেতই সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন। স্মরণীয় : ফররুখের সাহিত্যজীবন (১৯৩৭-৭৪) দুই কেন্দ্রে অতিবাহিত হয়েছে—কলকাতা ও ঢাকায়। কলকাতায় কাটে তাঁর ১৯৩৭-৪৮ সময়পর্যায় আর ঢাকায় ১৯৪৮-৭৪ সময়পর্যায়। এই গল্পগুলি তাঁর কলকাতা-পর্বে লেখা।

১৯৩৯-এর পরে ফররুখ কি গল্প লেখেননি আর?—ঠিক গল্প নয়। সম্ভবত একটি ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টা তিনি নিয়েছিলেন বছর দশেক পরে। 'মৃত্তিকা' (সম্পাদক : কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ) পত্রিকায় 'সিকান্দার শা-র ঘোড়া' নামে ফররুখের একটি অসম্পূর্ণ কথাসাহিত্যিক গদ্য প্রকাশিত হয়েছিলো (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৩)। রচনাটির শেষে লেখা ছিলো 'ক্রমশঃ', পত্রিকায় আর বেরোয়নি। এই অসম্পূর্ণ রচনাটি বাদে সাময়িক পত্রিকার ধূসর পৃষ্ঠা থেকে ফররুখের আরো দু-একটি গল্প যদি প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। তবে এও সত্য যে, ফররুখ পরবর্তীকালে কথাসাহিত্য মাধ্যমটিই বর্জন করেন, এবং পুরো আত্মনিয়োগ করেন কবিতা চর্চায়।

আশ্চর্যজনক এই সংবাদ যে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে প্রথম যে-মন্তব্য আমরা পাই, তা তাঁর কবিতা সম্পর্কে নয়—গল্প সম্বন্ধেই। তা থেকে মনে হয়, অল্প কয়েকটি গল্প লিখেই ফররুখ সমকালীন পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৩৯ (১৩৪৬) সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের কথাসাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণে খান সাহেব মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ বলেন :

> তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেও কয়েকজনের উদ্যম আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে। আবু রুশদ, ফররুখ আহমদ, আবুজাফর শামসুদ্দীন, নাজীরুল ইসলাম প্রভৃতির রচনা সাময়িক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় ইতস্তত ছড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু এ সম্পর্কে ইঁহাদের নাম উল্লেখ না করিলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ সত্য সত্যই ইঁহাদের মধ্যে শক্তির পরিচয় লক্ষ্য করা গেছে।
>
> ['মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬]

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহর অভিভাষণে তৎকালীন কয়েকজন কথকের নাম পাওয়া যাচ্ছে : আবু রুশদ, ফররুখ আহমদ, আবুজাফর শামসুদ্দীন, নাজীরুল ইসলাম। এঁদের মধ্যে আবু রুশদ ও আবুজাফর শামসুদ্দীন উত্তরকালেও গল্প-উপন্যাস লিখে গেছেন। কিন্তু ফররুখ আহমদ কবিতার রাজ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করেন আর নাজীরুল ইসলাম স্বনিযুক্ত হন প্রবন্ধকর্মে। তখন অর্থাৎ চল্লিশের দশকে আরো গল্প লিখতেন শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, শাহেদ আলী, রশীদ করীম, ফজলুল হক,[৫] সরদার জয়েনউদ্দীন প্রমুখ। এঁদের কেউ-কেউ তখনো গ্রামের বাসিন্দা। তবে কলকাতা মহানগরেই চল্লিশের দশকে বাঙালি-মুসলমানের হাতে আধুনিকতার উদ্বোধন ঘটে। সমসাময়িক কবি আবুল হোসেন লিখেছেন :

www.pathagar.com

> এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আমরা যে সাত-আটজন অখ্যাত তরুণ মুসলিম বাংলা সাহিত্যের মাঠে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে আধুনিকতার ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম এলোমেলোভাবে, ওয়ালীউল্লাহ সেই দলে ভিড়েছিলেন সবশেষে। ফররুখ, আহসান হাবীব, আবু রুশদ, শওকত ওসমান, গোলাম কুদ্দুস, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, ওয়ালীউল্লাহ এবং আমাকে নিয়ে সেদিন কলকাতায় আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বেশ কিছুটা বিব্রতই বোধ করতেন।
>
> ['কিছু স্মৃতি : ওয়ালীউল্লাহ', 'সময়', ১৯৮০]

এঁদের মধ্যে আবু রুশদ, শওকত ওসমান, শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর হাতে আমাদের আধুনিক গল্প-উপন্যাসের সূচনা হয়। অন্যেরা—ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, গোলাম কুদ্দুস, আবুল হোসেন কবিতার আধুনিকতার জন্ম দেন। এখানে স্মরণীয় : ফররুখ আহমদের মতোই আহসান হাবীব ও সৈয়দ আলী আহসান কবি হিশেবে খ্যাতিমান হলেও একসময় কিছু গল্পও লিখেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে সব সময়ই অমন ঘটে : সৃষ্টিশীলতাকে সব সময় বিভক্ত করা চলে না ; আর তাকে ঘিরে রহস্যময়তা চলতেই থাকে। দুই বাল্যবন্ধুর মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রথম জীবনে গল্প লিখতেন আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৭৬) লিখতেন কবিতা। উত্তরজীবনে নজরুল হয়ে ওঠেন কবি, আর শৈলজানন্দ কথাসাহিত্যিক। তাই বলে এটাও আমাদের মনে থাকে না যে নজরুল পরবর্তী জীবনেও গল্প-উপন্যাস লিখেছেন এবং তাঁর কথাসাহিত্যিক কৃতিও উল্লেখযোগ্য। তিরিশের অন্তত কোনো-কোনো লেখক তো কবি ও কথক দুই হিশেবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যেমন, কল্লোল যুগের তিন নায়ক : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)। কিন্তু চল্লিশের দশকে কবিতা ও কথাসাহিত্যের চর্চা ভাগ হয়ে যায় : একদিকে সমরেশ বসু (১৯২১-৮৮), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-৭৫), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-৮২) প্রমুখ—অন্যদিকে সমর সেন (১৯১৬-৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-৮৫), অরুণকুমার সরকার (১৯২১-৮১), নরেশ গুহ (১৯২৪) প্রমুখ। আমাদের কবি-কথকদের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে : কবি ও কথকেরা আলাদা-আলাদা এলাকায় সাফল্য রোজগার করেছেন।

ফররুখ আহমদও তাই : কবি হিশেবেই তিনি পূর্ণ বিকশিত হয়েছেন। কবি হিশেবে যেহেতু তিনি একটি চূড়ায় পৌঁছেছেন, কেবল সেজন্যেই প্রাথমিকভাবে আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় তাঁর গল্প ব্যাপারে। সেই প্রাথমিক কৌতূহল চরিতার্থতার পরেও কিছু থেকে যায়,—ফররুখ আহমদের সমগ্র সাহিত্যকর্মে একটি অভিনব, এতোকাল-অভাবিত, বাস্তব অথচ দিব্য মাত্রা যোজনা করছে এই একগুচ্ছ গল্প।

দুই

তিন বছরে লেখা পাঁচটি গল্পের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে।

'মৃত বসুধা' গল্পটির পটভূমি গ্রাম ; বাকি গল্পগুলির পটভূমি নগর—কলকাতা। ১৯৩৯ সালে, ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে-আগে, ফররুখ আহমদের গল্প লেখা শেষ হয়ে যায়। মহাযুদ্ধের কালো প্রাক-ছায়া যেন গল্পগুলিতে আস্তীর্ণ হয়ে আছে। সমুদ্রের ডাক ফররুখের তখনো শ্রবণে পশেনি। "সাত সাগরের মাঝি"-র কবিতা লিখবেন এই কবি

www.pathagar.com

ও লেখক, তা তখন অকল্পনীয়। গল্পগুলিতে কলকাতার খিন্ন-দীর্ণ-ক্লিন্ন জীবন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাহলেও ফররুখের প্রাথমিক কবিতার সঙ্গে এই গল্পগুলির একটি সাযুজ্য আছে। ফররুখের প্রথম পরিকল্পিত কবিতাগ্রন্থ "হে বন্য স্বপ্নেরা"র জগতের সঙ্গে এই গল্পগুলির কিছু সাদৃশ্য আছে। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "হে বন্য স্বপ্নেরা" (১৯৭৬)-র ভূমিকায় ঐ গ্রন্থের সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন :

> ফররুখ আহমদের প্রাথমিক রচনায় যে লক্ষণগুলি ধরা পড়বে, এবং তা আবশ্যিকভাবেই পড়বে, সে হল তারুণ্য ও নাগরিকতা,—নাগরিকতা মেজাজের নয়, দৃশ্যপটের। সাতচল্লিশের দেশ-বিভাগের আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, ফররুখ আহমদ কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার বাইরে বেশী দিন কোথায়ও থাকেননি। এ-সব কবিতার গায়ে সূক্ষ্মভাবে ঐ সময়কার কলকাতার গন্ধ লেগে আছে—বামপন্থী রাজনীতির সুর, কখনো অস্পষ্ট, কখনো বা স্পষ্টতর ; এবং অল্পকাল পরেই পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কালো হাওয়া।
>
> [ভূমিকা, "হে বন্য স্বপ্নেরা", ১৯৭৬]

১৯৩৭-৩৯ কালপর্বে লেখা ফররুখ আহমদের গল্পগুচ্ছ সম্পর্কেও এই উক্তি অনেকটা প্রযোজ্য। আবার এই নগর-দৃষ্টির খানিকটা হলেও ফররুখ পেয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে। সমসাময়িক লেখক আবু রুশদ তখনই লক্ষ্য করেছিলেন ফররুখ আহমদের উপরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছায়াপাত।[৬] প্রেমেন্দ্র মিত্র ফররুখ আহমদ-আহসান হাবীব-সৈয়দ আলী আহসান,—চল্লিশের এই তিনজন কবিকেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছিলেন। ফররুখের গল্পেও প্রেমেন্দ্রের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়, তবে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের কলাকুশলতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র (সাংকেতিক একটি গল্প, 'যে পুতুল ডলির মা' হয়তো তাঁর সমানধর্মী)।

গল্পগুলিতে একটি শ্বাসরোধী আবহাওয়া আছে। এদিক থেকে তিনি বরং তাঁর জগতের সম্পূর্ণ বিরোধী জগদীশ গুপ্ত-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জগৎকে স্মরণ করিয়ে দেন ; কিন্তু তলে-তলে তখনই বোঝা যায় তাঁর আভিমুখ্য কোনখানে—সেদিক থেকে তিনি পূর্বোক্তদের মতো নির্লিপ্ত নন, যুক্ত : বিপরীতভাবে যুক্ত, যা পরে মুক্তি পেয়েছে এক আতীব্র আদর্শবাদিতায়।

'মৃত বসুধা' গল্পটি সমতল, বর্ণনাত্মক, একলক্ষ্য। সুপ্রচুর উপমার পর উপমার মালা গাঁথা হয়েছে। প্রথম বাক্য : 'নদীর ঘাটে প্রাচীন অশথের তলায় বৈকালিক আসর বসে গ্রাম্য বৃদ্ধদের।' শেষ বাক্য : 'বসুধা ওখানে মৃত-উৎপাদিকা শক্তিহীন।' মধ্যবর্তীতে বর্ণিত হয়েছে এক বৃদ্ধ খোন্দকার রউফ শাহেবের কাহিনী। 'শয়তানের হাতে বন্দী মানবের মত তিনি ছিলেন যৌবন-বন্দী অসহায়।' 'যৌবন-বন্দী'—এই সুন্দর যৌগিক শব্দে রউফ শাহেবের চারিত্র ধৃত। প্রকৃত গল্পকার-শোভন ইঙ্গিতময়তা আছে একটি উপমায় : 'যে-চঞ্চলতায় আঁধার থাকতে পাখি বাসা ছেড়ে উড়ে গিয়ে শিকারীর হাতে ধরা দেয়, সেইরকম আত্মঘাতী ভোগস্পৃহা তখন জেগেছিল তাঁর মনে।' 'আত্মঘাতী ভোগস্পৃহা' শব্দদ্বয়ে গল্পের পরিণাম ব্যঞ্জিত। স্বেচ্ছাচারী রউফ শাহেব রাহেলাকে ভোগদখল করেন বটে, কিন্তু তার আত্মাহুতির দৃশ্য তিনি ভুলতে পারেন না ; আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটে রাহেলার কন্যা লতিফাকে দিয়ে, তারও রক্তে তাঁরই মতো বাসনার বন্যা, প্রেমিকের সঙ্গে সে পালিয়ে যায়, মৃত্যুকালেও তার মুখ আর দেখতে পান না রউফ শাহেব। শস্যহীন শক্তিহীন একটি মাঠের বর্ণনায় গল্প সমাপ্ত হয়। 'মৃত বসুধা' নামটি একটি সরল প্রতীক।

www.pathagar.com

'বিবর্ণ' গল্পটি একেবারে তুচ্ছ, সামান্য একটি বিষয় নিয়ে। প্রথম বাক্য : 'জীবন, আলো আর আ-দিগন্ত মুক্তি।' শেষ বাক্য : 'আকাশে তখন কাজল মেঘ কেটে গেছে,—সেখানে জেগে উঠেছে নির্মম ঔদাসীন্যের কঠোর বিবর্ণতা।' ('মৃত বসুধা' ও 'বিবর্ণ' দুটি গল্পেই প্রাকৃতিক বর্ণনা গল্পের অন্তর্লোকে আলো ফ্যালে। গল্পে ফররুখ একলক্ষ্য এবং তাঁর গল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বরাট—ঐ সূচনা ও সমাপ্তি থেকেই তা প্রতীত হয়। নিটোল গোল করে শেষ হচ্ছে 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পটিও—যার শুরু 'শেষ রাত্রি।' এই বাক্যবন্ধে। আর সমাপ্তিতেও তাই : 'শেষ রাত্রির বাতাস গভীর হয়ে ঘরে ঢুকল। হারুনের ক্লান্ত শরীরে চোখের পাতায় ঘুমের প্লাবন—বিস্মৃতির প্রথম প্রলেপ।' — দেখা যাচ্ছে : ফররুখ ঐ তরুণ বয়সেই গল্পের সংগঠন ও আসঞ্জনে সিদ্ধি দেখিয়েছেন।) 'বিবর্ণ' গল্পেও উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রাচুর্য। প্রকৃতির প্রতীক পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হয়েছে। চরিত্র : মা হাসিনা, ছেলে হাসান, মেয়ে, বৃদ্ধা মা। পটভূমি : কলকাতা। কিন্তু আড়িয়ল খাঁ নদীর তীরের সমৃদ্ধ দিনগুলির জন্যে হাসিনার মনে বেদনা জেগে উঠেছে। সাধারণ একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে কলকাতার জীবনের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা, হাসিনার জীবনের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা বর্ণিত।[৭]

'অন্তর্লীন'ও হতাশার গল্প। পূর্বোক্ত গল্পদ্বয়ে প্রথম বাক্যের সঙ্গে শেষ বাক্য অচ্ছেদ্য। কিন্তু এখানে প্রথম বাক্য : 'কল্পনাবিলাসী শাহরিয়ার'। প্রথম বাক্যেই গল্পের শুধু নয়—একেবারে চরিত্রপাত্রের অন্তরে প্রবেশ করেছেন লেখক। শেষ বাক্যে বোঝা যায় : ইতিমধ্যে গল্প অন্য জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে : 'কল্পনাবিলাসী' এই নিরীহ শব্দটি শাহরিয়ারের জীবনে যে কী মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তা-ই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শেষ বাক্য : 'বহুদিন আগেকার একটি বঞ্চিত রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে রিহানার অতৃপ্ত কামনা অনুভব করে সে [শাহরিয়ার] বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ল।' রিহানা একদিন তীব্রভাবে সন্তান কামনা করেছিল, তার সেই তৃষ্ণা অতৃপ্ত রয়ে যায়, কেননা আকস্মিকভাবেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর শাহরিয়ারের মধ্যেও বিপুলভাবে জেগে ওঠে সন্তানের জন্যে পিপাসা—কিন্তু ততোদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। দুজনার জীবনই বেদনা-মথিত।

'যে পুতুল ডলির মা' একটু যেন সাংকেতিক রেখায় আঁকা। গল্পে কি নিয়তি প্রতীকায়িত হয়েছে? ঘুমঘোরে ডলির মায়ের 'দুর্বোধ্য হাসি' (লেখকের ভাষাতেই) কি জীবনের ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত দিচ্ছে? ('অন্তর্লীন' গল্পের একটি বাক্যাংশে কি এই গল্পের চাবি লুকোনো আছে : '...দৈহিক ক্ষুধার উপরেও ... নারীর মনে সন্তানের জন্য আর একটি ক্ষুধা আছে..'?)

'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' ফররুখ আহমদের সবচেয়ে পরিণত ও শ্রেষ্ঠ গল্প। ভাষার বুনোটের দিক থেকে পাকা অনেক (যেমন : গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদেই একটি ইশারাবাহী চিত্রকল্প : 'আকাশে তারার স্তব্ধ সঙ্কেত, নিচে পিচের আচ্ছাদনে ঢাকা পৃথিবীর একটি বিচ্ছিন্ন অংশ গ্যাসের অস্পষ্ট আলোর দুর্বোধ্য সংশয়ে শংকিত।' কিংবা এ ধরনের বাঁকা প্রকাশ : '...সমস্ত রাত কলকাতার বিভিন্ন পথে হারুনের অসংখ্য পায়ের ছাপ পড়ে।' কিংবা এ ধরনের অপরূপ উৎপ্রেক্ষা : '...তারপর সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে যেন দিক্‌ভ্রান্ত স্টেপের বুনো ঘোড়া।') চরিত্রায়নের দিক থেকেও পাকা হাতের পরিচয় মেলে। প্রধান তিন চরিত্র—হারুন, ওয়াজেদ ও সালেমা-কে খুব স্বচ্ছস্পষ্টভাবেই চেনা যায়। নায়ক হারুন

www.pathagar.com

আদর্শবাদী, একটু বাম-ঘেঁষা, আবেগী আবার কঠোর : '...দিনের বেলায় সে অত্যন্ত সহজ ও মিশুক, আর রাত্তিরে গভীর ভাবপ্রবণতার আবছায়ায় রহস্যময়। নভেল পড়ার ফাঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে বিপ্লবী রাশিয়ার, জীবনদৃষ্টান্ত হারুনের ভাবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজের নেশায় মাতাল করে তুলেছে।' '...হারুণের মধ্যে ভাব-বিলাসিতা আছে প্রচুর পরিমাণে, তবু তার মধ্যে নমনীয়তা নাই।' এদের নেতা ওয়াজেদ শাহেব বিশ-তিরিশ-চল্লিশ দশকের বিপ্লবী নায়কদের মতো যক্ষ্মারোগে ভোগে। হারুনের বন্ধু নকীব ওয়াজেদ শাহেবের গায়ে হাত দিয়ে জ্বর টের পেলে ওয়াজেদ সাহেবের উক্তি : 'ও কিছু না, ও সেরে যাবে। ওরকম প্রায়ই হয়।...' ওয়াজেদ শাহেব আদর্শনিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী, সর্বত্যাগী কর্মী। গল্পের নায়িকা সালেমা বেগম সন্তানপিপাসায় কাতর : '...মেয়েদের জীবনে মাতৃত্বের চাইতে বড় সার্থকতা কি থাকতে পারে!' সালেমা বেগমেরই প্রণোদনায় তাকে মা ডেকেছিলো হারুন। কিন্তু আকস্মিকভাবে সালেমা বেগমের কয়েকটি চিঠি পড়ে (বিভিন্ন পুরুষের কাছে লেখা পত্রগুচ্ছে শরীরী বাসনার অলজ্জ প্রকাশ ছিলো) আর সালেমা বেগমকে একটি পুরুষের সঙ্গে নগ্ন শায়িত দেখে হারুনের স্বপ্নভঙ্গ হয়। গল্পের শেষটি একেবারে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়-যন্ত্রণায় দীর্ণ কিন্তু তারই মধ্যে হারুন আবার সঞ্জীবিত-উজ্জীবিত হয়ে উঠবে, এরকম একটি ইঙ্গিতও আছে মনে হয়।

পাঁচটি গল্পেই অবক্ষয়, শীত, নাস্তির একচ্ছত্র রাজত্ব। ফররুখ যদি শুধু এই পাঁচটি গল্প লিখতেন, তাহলে তাঁকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যেতো একজন শূন্যতাবাদী ও অবক্ষয়ী লেখক হিশেবে। কিন্তু তারপরেও নিবিড় পাঠে দেখা যাবে ('মৃত বসুধা' ও 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পদ্বয় বিশেষভাবে স্মরণীয়)—ফররুখ নির্বিচার ভোগবাদকে সমর্থন করেননি বরং তার বিরোধিতাই করেছেন। সমকালীন জীবনের ছাপ এইসব গল্পে প্রবল প্রচুর। কলকাতা মহানগরী নানাভাবেই উপস্থিত। 'বিবর্ণ' গল্পে মহানগরের শ্বাসরোধী আবহাওয়া চিত্রিত। 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পে ফররুখের প্রথম জীবনের কিছু কি ছায়াপাত হয়েছে? কবি-কন্যা লিখেছেন, 'প্রথম জীবনে আব্বা ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত মানবতাবাদী কমরেড এম. এন. রায়ের শিষ্য।' 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা'র কেন্দ্রীয় চরিত্র হারুনের মধ্যে বিপ্লবের বান ডেকেছে, লেখক স্পষ্টই বলেছেন 'বিশেষ করে বিপ্লবী রাশিয়ার' ভক্ত সে। কিন্তু তাদেরই মহিলা সমিতির নেত্রী সালেমা বেগমের দুশ্চরিত্রতা যখন জেনে ফ্যালে সে, তখনই তার মোহভঙ্গ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা তখন আসন্ন ; ফররুখ নিজেও তখন তরুণ ; তবু যেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খান্‌খান্ দিনগুলির প্রাক-ছায়া গল্পগুলির উপরে নিপতিত হয়েছে।

এই গল্পগুলি যখন লিখছেন ফররুখ, তখনো তিনি তো কবিতা লিখছেন। সুতরাং কবির রচনা যখন, তখন কাব্যকুশলতা তো প্রযুক্ত হবেই। হয়েছেও। এবং দেখা গেছে, ফররুখের এইসব কাব্যকুশলতা গদ্যকর্মেরই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পে হারুনের স্বপ্নভঙ্গের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে নানাভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি ফররুখ আহমদই জয়ী হয়েছেন। একটিমাত্র উৎপ্রেক্ষা হারুনের হাহাকারকে দীর্ঘ বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশি লক্ষ্যভেদীভাবে ধারণ করেছে : 'তার মনে হল যেন কালপুরুষের শাণিত তরবারি কটিবন্ধ ভেঙে গঙ্গায় ধসে পড়েছে।' এইসব গল্পে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে উপমা-উৎপ্রেক্ষা। উপমা-উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে কবিতার সেই কুশলতা, যা রূপ-

www.pathagar.com

কালংকারের অন্তর্ভূত, আরিস্টটল যে-রূপকালংকার বা 'মেতাফোরা'কে কাব্যকর্মে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৯] এইসব গল্পে ফররুখ আহমদের গাদ্যিক উপমা-উৎপ্রেক্ষার একটি চয়নিকা তৈরি করে দিলাম :

১. বুকের ভিতরটা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের মত সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য হয়ে যায় ; তারপর হঠাৎ আসে দমকা ঝড়ের মত নিষ্ঠুর নিশ্বাস-বন্যা। বুকের শীর্ণ পাঁজরগুলো থরথর কাঁপতে থাকে সেই বেগে কালবৈশাখীর আঘাতে শুকনো পাতার মত।

[মৃত বসুধা]

২. রউফ সাহেব তখন পূর্ণ যুবক। তাঁর দেহ ইস্পাতের মত দৃঢ়, দেওদারের মত উন্নতশীর্ষ।

[মৃত বসুধা]

৩. যে-চঞ্চলতায় আঁধার থাকতে পাখি বাসা ছেড়ে উড়ে গিয়ে শিকারীর হাতে ধরা দেয়, সেইরকম আত্মঘাতী ভোগস্পৃহা তখন জেগেছিল তাঁর মনে।

[মৃত বসুধা]

৪. যে-তারকাপথ বেয়ে একদিন অসীম শক্তিতে ক্ষয়িষ্ণু উল্কা কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, আজ সে মাটির বুকে আশ্রয় চায়।

[মৃত বসুধা]

৫. মোমের মত নরম, শীতরৌদ্রের মত স্নিগ্ধ উষ্ণ লতিফার ছোট ছোট হাত-পা—ওকে দেখলে একটা পাখীর মত মনে হয়।

[মৃত বসুধা]

৬. সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণধার তরবারির মত সেই বিশাল স্রোত মৃত্যুর ভ্রূকুটির মত দুই তীরের বাড়ী আর গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকত।

[বিবর্ণ]

৭. আদরযত্ন পাওয়া তো দূরে থাক সাথীহারা ডাহুকীর মত তার চোখ সজল হয়ে ওঠে।[১০] কোলের কাছে সেলাই কল টেনে নিয়ে হাসিনা সেলাই করতে বসে। অনবরত দ্রুত গতিতে চাকা ঘুরতে থাকে যেন ঋতুচক্রের দ্রুত পরিক্রমা।

[বিবর্ণ]

৮. একপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে উপরে যেন মুমূর্ষু যক্ষ্মারোগীর হৃৎপিণ্ডমুখী শীর্ণ বুকের হাড়ের অসজ্জিত সংস্থাপন। নগ্ন ইটের বুকে মাঝে মাঝে সিমেন্টের ধ্বংসশেষ টুকরো দেখা যায় অনাদৃত পূর্ব সমৃদ্ধির মত।

[প্রচ্ছন্ন নায়িকা]

৯. দিনগুলো টুকরো কাগজের মত ওড়ে।

[প্রচ্ছন্ন নায়িকা]

১০. সমস্ত মুখে রক্তের ছায়াও নাই, যাদুঘরের স্পিরিটের মধ্যে রাখা আদিযুগের সরীসৃপের মত ওর ধূসর চেহারা।

[প্রচ্ছন্ন নায়িকা]

১১. তার মনে হল যেন কালপুরুষের শাণিত তরবারি কটিবন্ধ ভেঙে গঙ্গায় ধসে পড়ছে।

[প্রচ্ছন্ন নায়িকা]

হ্যাঁ, ফররুখের গল্পে কাব্যকুশলতার ব্যবহার আছে ; কিন্তু তাঁর কোনো গল্পই শেষপর্যন্ত কাব্যিক নয়। বাস্তবতার ভিত্তিতেই রচিত। এখানেই তাঁর গল্প গল্প।

www.pathagar.com

তিন

পঞ্চাশ বছর আগে লেখা হলেও ফররুখ আহমদের এই গল্পগুলিতে কোথাও একতিল জং ধরেনি। এর কারণ মনে হয় ফররুখের আত্মস্বভাবী বলিষ্ঠতা, অগুপ্ততা। তখনো সাধু গদ্যভাষা ব্যবহার করছিলেন অনেকে ; কিন্তু ফররুখ তখনই চলতি গদ্যের নিঃসংশয় সাধক। তখনই তাঁর সহজ স্বাভাবিক সাবলীল স্বধর্ম আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর গল্পের প্লট নিয়েছেন তিনি মুসলিম জীবন থেকেই। ফররুখ তাঁর স্বভাবী বলিষ্ঠতায় এখানে যৌনতাকেও ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোনো মর্বিডিটির আশ্রয় নেননি। যৌনতাকে তিনি অকপটে উন্মোচন করেছেন, সেখানেও একটি স্বাভাবিকত্বকে তিনি অঙ্গীকার করেছেন : 'অন্তর্লীন' গল্পে শাহরিয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'শারীরিক কামনাকে সে সহজ এবং প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে। কিন্তু সে অসচ্চরিত্র বা অসংযমী নয়।' সালেমা বেগমের গোপন পত্রগুচ্ছে শারীররতির অলজ্জ প্রকাশ ঘটেছে (যেমন : 'আমার স্বামী বেঁচে থাকতেও আপনি আমার দেহ-মন পেয়েছেন, উপভোগ করেছেন, তবু কি আপনার তৃপ্তি হল না' কিংবা 'এ জীবন তোমাকেই দিলাম, তুমি নাও, আমার সব নাও, দস্যুর মত আমাকে উপভোগ কর।') এখানে যে-সাহস ফররুখ দেখিয়েছেন, তা শিল্পীর সাহস : অর্দ্ধনগ্নতা একে কদর্য করে দিতো। কিন্তু এই অলজ্জ চিত্রণ আসলে ভোগবাদের সমর্থন নয়—বিরুদ্ধতা। কিন্তু এও সত্য—যৌনতা এইসব গল্পের একটা কেন্দ্রীয় উপজীব্য। এবং ফররুখ জীবনের এই সারসত্যকে তাঁর সাহিত্যে স্বীকৃতি দিয়ে ভালো করেছেন। 'মৃত বসুধা'র রউফ শাহেব বা 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা'র সালেমা শাহেবার স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করেছেন ফররুখ। বিষয়টি স্বচ্ছ করা দরকার। কবিতায় মোহিতলাল মজুমদার বা নজরুল ইসলামের বলিষ্ঠ ভোগবাদ (মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র' বা নজরুলের 'পূজারিণী', 'মাধবী প্রলাপ' প্রভৃতি স্মরণীয়) সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কোনো-কোনো কল্লোলীয় লেখকের গল্প-উপন্যাসে—বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় বা প্রবোধকুমার সান্যালে। উত্তরকল্লোলী হয়েও ফররুখ কিন্তু সে-পথে যাননি। সেদিক থেকে তাঁর পরবর্তী আদর্শবাদিতা এই গল্পগুচ্ছের আদর্শবাদিতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। সমকালীন গল্পকার শাহেদ আলীর কয়েকটি গল্পে তাঁর আদর্শবাদিতা রূপায়িত হয়েছে। সাধারণত গল্পকাররা জীবনচিত্রণেই নজর দেন, আদর্শ রূপায়নের চেষ্টা করেন না—ফররুখ-সমকালীন শাহেদ আলীর কয়েকটি গল্প তার ব্যতিক্রম।

ফররুখের পরবর্তী সাহিত্যকর্মের একটি কুটিল বীজ কি রয়ে গেছে এইসব গল্পের গহনে? এইসব গল্পের সারাৎসার তো শূন্যতা, সুধীন্দ্রনাথ-কথিত 'নিখিল নাস্তি' : 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পের সালেমা বেগমকে মা বলে ডেকেছিলো আদর্শবাদী তরুণ হারুন, একদিন তার স্বপ্নভঙ্গ হয় যখন সে দ্যাখে ও জানে যে সালেমা বেগম বিভিন্ন পুরুষকে শরীর দানে অভ্যস্তা ; 'মৃত বসুধা' গল্পের নায়ক বৃদ্ধ খোন্দকার রউফ শাহেবের জৈবনিক-যৌবনিক উদ্দামতার ফসল তাঁরই আত্মজা একটি ছেলের সঙ্গে চিরদিনের জন্যে গৃহত্যাগ করে—এমনকি মৃত্যুর সময়েও তিনি তাকে শেষ-দেখা দেখতে পান না ; 'বিবর্ণ' গল্পের নায়িকা স্বামীহীন হাসিনা, ছেলেকে নিয়ে কলকাতার আবদ্ধ ঘর থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসার একটুখানি সাধও পূর্ণ হলো না তার মায়ের বাদ সাধার ফলে ; 'অন্তর্লীন' গল্পে রিহানার

www.pathagar.com

জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় মাতৃত্ব পূর্ণ না হওয়ায়—অ'র তার মৃত্যুর পরে তার স্বামী শাহরিয়ারও একই যন্ত্রণায় দীর্ণ ; — ইত্যাদি।

এই গল্পগুলি ফররুখ আহমদের সাহিত্যজগৎকে নিশ্চিতভাবে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করলো। ফররুখের একেবারে প্রাথমিক সাহিত্যিক শস্য হিশেবেই এগুলি কেবল মূল্যবান নয়, এগুলি মহার্ঘ এজন্যে যে এ ফররুখ-সাহিত্যে একটি সম্পূরক ভূমিকা উদযাপন করবে। যে-জগৎ এখানে রূপায়িত হয়েছে, তার সঙ্গে ফররুখের কাব্যপৃথিবীর কোনো মিল নেই। ব্যঙ্গবিদ্রূপময় ফররুখের পরবর্তী তিক্ত কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে এর একটুখানি সমান্তরালতা আছে হয়তো কিংবা "রাজরাজড়া" নামের ব্যঙ্গাত্মক গদ্যনাটকের সঙ্গেও হয়তো—তবু, শেষ পর্যন্ত, সে-সব তির্যক দর্পণ। তাঁর গল্পগুচ্ছে, ঐ একবারই, ফররুখ বাস্তবকে সরাসরি মোকাবিলা করেছেন। "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) বা "হাতেম তা'য়ী"র (১৯৬৬) কাব্যজগৎ এই গল্পজগৎ থেকে সুদূর। ফররুখ-রচিত সর্বশেষ গল্প 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা'র নায়কের মতো ফররুখ যেন অতঃপর পিছুটানহীন আদর্শবাদিতার দিকে অসংকোচে দৃপ্ত পায়ে অগ্রসর হয়ে গেছেন।

এই গল্পগুলির আবিষ্কার একটি সাহিত্যিক ঘটনা বলেই মনে করি।

---

১ সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফী-সম্পাদিত "জীবনানন্দ দাশের গল্প" বইটি বেরিয়েছিলো ১৯৭২ সালে। এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত তিনটি গল্পের বিশদ আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য আবদুল মান্নান সৈয়দের "শুদ্ধতম কবি" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭)। সমগ্রভাবে জীবনানন্দ দাশের গল্পের আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্পে"র (১৯৮৯) প্রবেশক।

২ যুগান্তর চক্রবর্তী-সম্পাদিত "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা" প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৭১ সালে। এই বইয়ের বিস্তারিত আলোচনা, আবদুল মান্নান সৈয়দ-প্রণীত 'শব্দ-মদের বিরুদ্ধে', পাওয়া যাবে ভূঁইয়া ইকবাল-সম্পাদিত "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়" (১৯৭৫) সংকলনে।

৩ এই গল্পগুলির সমসাময়িক অর্থাৎ ১৩৪৪-৪৬ সমপর্যায়ে প্রকাশিত ফররুখ আহমদের কবিতার একটি তালিকা এখানে পেশ করা হলো :

১. রাত্রি। বুলবুল। শ্রাবণ ১৩৪৪।
২. অপ্রয়োজন। ঐ। ভাদ্র ১৩৪৪।
৩. মৃত্যু-রূপা। ঐ। পৌষ ১৩৪৪।
৪. নগর-পথ। ঐ। ফাল্গুন ১৩৪৪।
৫. অন্যায়। ঐ। চৈত্র ১৩৪৪।
৬. জন্মদৈন্য। ঐ। বৈশাখ ১৩৪৫।
৭. প্রলোভন। মাসিক মোহাম্মদী। মাঘ ১৩৪৫।
৮. ইতিহাস আর আজকের রাত্রি। ঐ। ফাল্গুন ১৩৪৫।
৯. একটি কবিতা। ঐ। ফাল্গুন ১৩৪৫।
১০. নির্লজ্জ। ঐ। আষাঢ় ১৩৪৬।
১১. জীবন-ছন্দ। ঐ। আষাঢ় ১৩৪৬।
১২. আঁধারের স্বপ্ন। সওগাত। পৌষ ১৩৪৫।
১৩. চৈত্র-প্রভাতের সুর। ঐ। ফাল্গুন ১৩৪৫।
১৪. নাটকীয়। ঐ। চৈত্র ১৩৪৫।
১৫. চৈত্র সন্ধ্যার সুর। ঐ। বৈশাখ ১৩৪৬।
১৬. কর্পূর। ঐ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।

৪ সমসাময়িক কবি সৈয়দ আলী আহসান ফররুখ-সংক্রান্ত একটি স্মৃতিচারণায় ("সতত স্বাগত") জানিয়েছেন যে ফররুখের 'সিকান্দার শা-র ঘোড়া' লেখা হচ্ছিলো উপন্যাস হিশেবে। 'মৃত্তিকা'

www.pathagar.com

পত্রিকায় ঐ অসম্পূর্ণ উপন্যাসের সাত পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছিলো। ঐ সাত পৃষ্ঠায় উপন্যাসের দুটি পরিচ্ছেদ ছাপা হয়েছিলো : 'এ কোন দেশ?' আর 'সীমানা'।

৫ সমসাময়িক লেখক শওকত ওসমান "ফজলুল হকের গল্প" প্রকাশ করে অধুনাবিস্মৃত গল্পকার ফজলুল হককে আবার সামনে এনেছেন।

৬ আবু রুশদের মন্তব্যটি ছিলো : 'আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ আহমদের উপর যদি থেকে থাকে ত' তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র।' ('আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ', 'সওগাত', ভাদ্র ১৩৪৮)

৭ মধ্যবিত্ত জীবনে নারীর রুদ্ধশ্বাস অবস্থার এক আশ্চর্য চিত্রণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পে—কিন্তু ঐ গল্প অনেকখানি প্রতীকী, 'বিবর্ণ' তুলনায় অনেকবেশি প্রত্যক্ষ।

৮ একই বিষয়ের জাটিল্য ধ'রে দিয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "প্রতিবিম্ব" নামক একটি নভেলায়।

৯ 'মেতাফোরা' বা রূপকালংকার প্রসঙ্গে আরিস্টটলের উক্তি :

It is a great thing, indeed, to make a proper use of these poetical forms, as also of compound and strange words. But the greatest thing by far is to be a master of metaphor. It is one thing that cannot be learnt from others ; and it is also a sign of genius, since a good metaphor implies an intuitive perception of the similarity in dissimilars.

১০ এই উপমাটি আমাদের মনে পড়িয়ে দ্যায় ফররুখের 'ডাহুক' ("সাত সাগরের মাঝি") কবিতাটি। এই তথ্যও স্মরণীয় : বাল্যকালে ফররুখ মধুমতী নদীর পাড়ে বাঁশঝাড়ের পাশে গিয়ে ডাহুকের ডাক শুনতেন। তাঁর রচিত আরো কোনো-কোনো কবিতায় ডাহুক প্রসঙ্গ আছে—তা যতোটা কাব্যপ্রচল হিশেবে এসেছে (যেমন এসেছে নজরুল ইসলামের কবিতায়-গানে), তার চেয়ে এসেছে অভিজ্ঞতা হিশেবে।

উপন্যাস

ফররুখ আহমদ কোনো সম্পূর্ণ উপন্যাস লেখেননি। 'সিকান্দার শা-র ঘোড়া' নামে 'মৃত্তিকা' পত্রিকার আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৩ সংখ্যায় উপন্যাসটি শুরু হয়েছিলো মাত্র। ঐ সংখ্যায় দুটি অংশ প্রকাশিত হয়েছিলো : 'এ কোন দেশ' ও 'সীমানা'। রচনাশেষে 'ক্রমশঃ' কথাটি ছিলো। কিন্তু পরে আর বের হয়নি সম্ভবত। বা লেখাও হয়নি। ফররুখের অনেক পাণ্ডুলিপি গোছানো আছে, কিন্তু এই উপন্যাসের পরবর্তী কোনো পরিচ্ছেদ পাওয়া যায়নি। '[ফররুখ আহমদের] পিতা ছিলেন বিত্তবান পুরুষ এবং ইংরেজ আমলের দুর্ধর্ষ পুলিশ অফিসার। এক সময় কলকাতায় কাজি আফসারউদ্দিনের 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় সে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেছিলো, যার নাম দিয়েছিলো 'রুস্তম শা'র ঘোড়া'। ফররুখের মুখেই তার পিতার ঐশ্বর্য, অহমিকা এবং প্রতাপের কথা শুনেছি। ফররুখ ঐশ্বর্য চায়নি কিন্তু প্রতাপ চেয়েছিলো। প্রতাপ ছিলো তার কণ্ঠস্বরে, বলিষ্ঠ গতিভঙ্গিতে, দৃষ্টির তীক্ষ্ণ শাসনে।' ('ফররুখ আহমদ', "সতত স্বাগত", সৈয়দ আলী আহসান। ১৯৮৩।) সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতিবিভ্রম-বশত 'রুস্তম শা'র ঘোড়া' লিখেছিলেন—হবে 'সিকান্দার শা-র ঘোড়া'।

www.pathagar.com

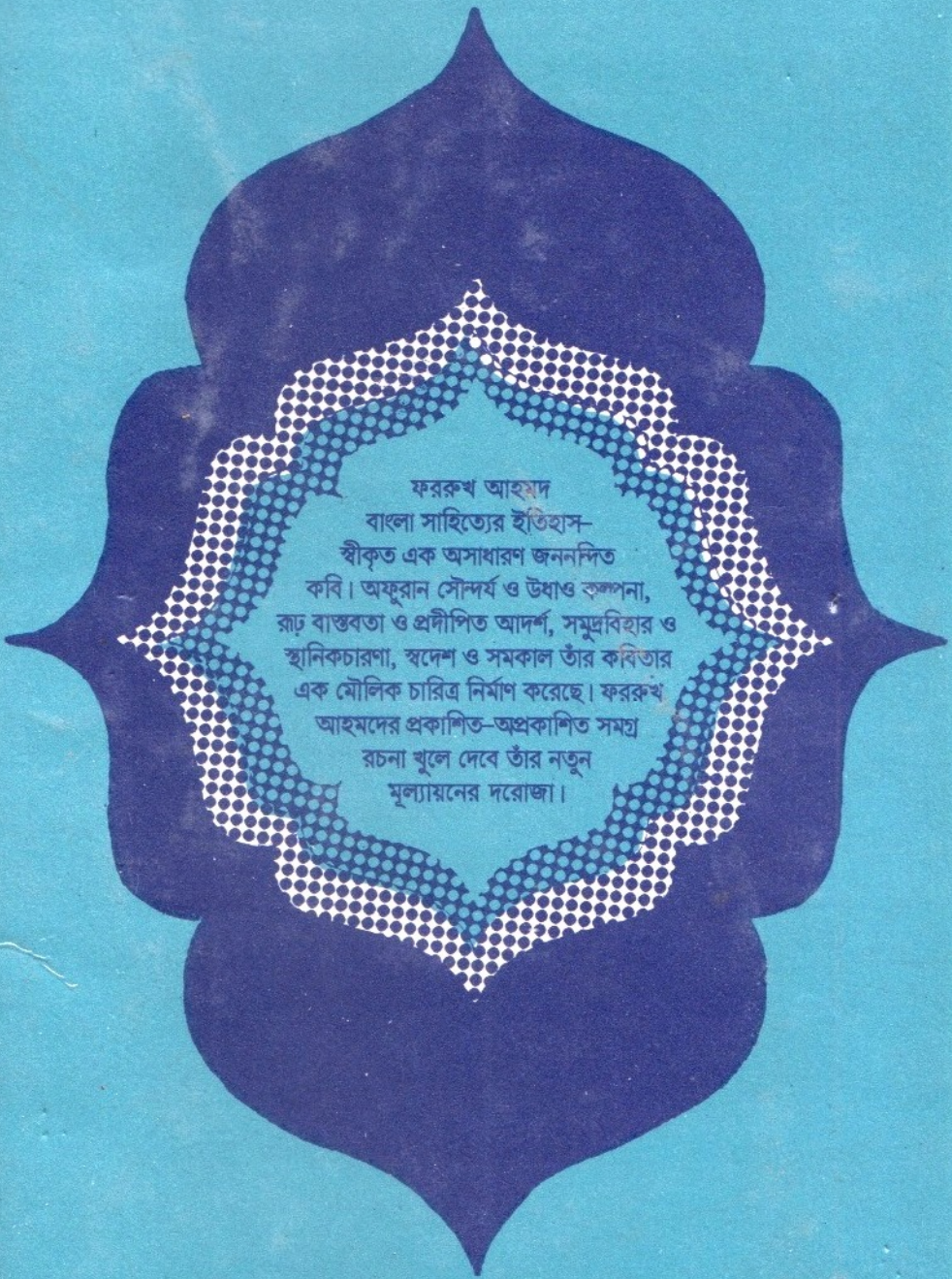
ফররুখ আহমদ
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-
স্বীকৃত এক অসাধারণ জননন্দিত
কবি। অফুরান সৌন্দর্য ও উধাও কল্পনা,
রূঢ় বাস্তবতা ও প্রদীপিত আদর্শ, সমুদ্রবিহার ও
স্থানিকচারণা, স্বদেশ ও সমকাল তাঁর কবিতার
এক মৌলিক চারিত্র নির্মাণ করেছে। ফররুখ
আহমদের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সমগ্র
রচনা খুলে দেবে তাঁর নতুন
মূল্যায়নের দরোজা।